মহাশান্তি মহাপ্রেম

(তিন পর্ব একত্রে)

শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী

যাদব বড়ুয়া প্রকাশন ট্রাস্ট
পি ৬৮ বয়ুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

MAHA SHANTI MAHA PREM

By

Silananda Brahmachari

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

ভগবান বুদ্ধ ভারতবাসীর কাছে এখন আর নাস্তিক নন। তাঁর সম্বন্ধে সংশয়ের ঘনমেঘ কেটে গিয়েছে। ভারতের শাস্ত্রে পুরাণে ধর্মে দর্শনে শিল্পে ভাস্কর্যে যিনি গভীর ছাপ রেখে গিয়েছেন, বিস্মৃতির অতল তলে তাঁর সমাধি কি কখনো সম্ভব? উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তাঁকে ও তাঁর ধর্মমতকে নতুন করে জানার আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর মনে জেগে উঠেছে। সার্ধদ্বিসহস্রতম বুদ্ধজয়ন্তীর পর থেকে তা বিপুলাকার ধারণ করেছে। এর ফলে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক পুস্তিকা প্রচার লাভ করেছে।

বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, পালি ত্রিপিটকের মূলগ্রন্থে অর্থকথায় টীকায় ও পারিভাষিক গ্রন্থসমূহে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বুদ্ধজীবন সম্পর্কিত ঘটনানিচয় যখন ছাত্রজীবনে পাঠ করতাম, তখন মনপ্রাণ অজানা স্পর্শে অভিভূত হত। আজও সে ঘটনাবলীর পর্যালোচনা মনপ্রাণকে তেমনি অভিভূত করে। বস্তুত সরস মধুর ও অধ্যাত্মতত্ত্বপূর্ণ কাহিনীগুলো পাঠকের সংসারতাপতপ্ত মনে শান্তির স্পর্শ বুলিয়ে দেয়। এজন্যই এগুলো জনগণের কাছে এত চিত্তাকর্ষক। শতাব্দীর পর শতাব্দী বয়ে গিয়েছে, তবুও কালের কঠিন আঘাত এগুলোকে জীর্ণ পুরাতন করতে পারেনি। এ কাহিনীগুলোকে বাঙলা ভাষায় সংকলন করার সংকল্প থেকেই মৎসম্পাদিত (মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত) 'সম্বোধির পথে' পুস্তকখানির উৎপত্তি। সে রচনা পূর্বাভাষ মাত্র এবং সংকল্প সিদ্ধির পক্ষে অপর্যাপ্ত। তাই পালি সাহিত্যের গহন অরণ্য পরিক্রমণ করে এ দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনে উদ্যত হয়েছি। পরিকল্পিত সংকলনের প্রথম অংশ মহাশান্তি মহাপ্রেম রচনার প্রথম খণ্ডরূপে বাঙলার পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। এতে যদি পাঠকসমাজের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, তাহলে শ্রম সার্থক মনে করব।

যিনি আমাকে একার্যে সর্বপ্রথম উৎসাহিত করেন, সে পূতচরিত্র আদর্শ শিক্ষাব্রতী পাটনা বি এন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ৺দেবেন্দ্র নাথ সেনকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। এ গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু, অধ্যাপিকা ডঃ নারায়ণী বসু, গুরুভাই শ্রীমৎ ধর্মপাল স্থবির, শ্রীমৎ ধর্মসেন স্থবির, মতিঝিল কলেজের গ্রন্থাগারিক স্নেহাস্পদ শ্রীঅমর সেন আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহার্য্য করেছেন। নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ এর শ্রদ্ধেয় শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল

নিজে প্রুফ সংশোধন করে সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রন্থখানি মুদ্রণ করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণী।

এ গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য ডাঃ যাদব চন্দ্র বড়ুয়া। তাঁর অপরিসীম উৎসাহ ও বদান্যতা ব্যতীত একার্য আমার পক্ষে সম্ভব হত না। তাঁর অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষা কোন প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না। তবুও এজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। ইতি—

'সংগীতি'
মধ্যমগ্রাম
ফাল্গুনী পূর্ণিমা ১৩৭২

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী

প্রথম পর্ব

উৎসর্গ

দ্বাবিংশ-ভাষাবিদ অধ্যক্ষ শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু—

'কে ও? থামাও থামাও।'

শ্বেতাশ্বযুক্ত সুন্দর রথ থামলো। তখনও সূর্যের শেষ রশ্মি মেলায়নি। দূরে বনানীর শিরে তার রক্তিম ম্লান রেখা স্পষ্ট। পরিচ্ছন্ন রাজপথের অনুপম শোভাকে যেন উপহাস করে একটি কঙ্কালসার দেহ লাঠি ভর করে অতিকষ্টে চলছে সম্মুখপানে। তার চোখ দুটি কোটরগত, চামড়া কোঁচকানো, চুল দাড়ি শণের মতো সাদা, পিঠ ধনুকের মতো বাঁকা। তাঁর জীর্ণ ভগ্ন দেহ যেন আর বইতে পারছে না দেহভার। শীর্ণ মলিন মুখ শ্রান্তি ক্লান্তিতে ভরা। সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞেস করলেন—'ছন্ন, কে ও?'

'যুবরাজ, লোকটি বৃদ্ধ—বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে তার দেহ, একদিন ঐ দেহেও ছিল শক্তি সৌন্দর্য, সব আজ নিশ্চিহ্ন।'

'ছন্ন, সবাই কি বৃদ্ধ হয়?'

'হাঁ যুবরাজ, বয়স হলে যৌবন ভেঙে গেলে সবাই বৃদ্ধ হয়। তখন দেহের কমনীয়তা সৌন্দর্য কিছুই থাকে না, দেহ হয় দুর্বল—নিস্তেজ এবং লাঠি ভর করে চলতে হয়।'

সিদ্ধার্থ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সারথির কথা, স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধের পানে। সে মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টির একটি পর্দা যেন খসে পড়ল। তাঁর অনাবৃত দৃষ্টিতে প্রতিভাত হল যৌবনের পরিণতি—তাঁর সুন্দর সুঠাম দেহ ছিন্ন কুসুমের মতো দেখতে দেখতে হবে শ্রীহীন জরার কঠিন আঘাতে, শক্তি সামর্থ্য যাবে নিঃশেষে ফুরিয়ে; তখন পথের ধারের ঐ বৃদ্ধ এবং তাঁর মধ্যে থাকবে না কোন তফাৎ। সেদিনের সন্ধ্যার কাকলি, ফোয়ারার অবিশ্রান্ত শব্দ এবং দূরের জনকোলাহল—সমস্তই তাঁর কাছে করুণ বিষণ্ন মনে হল। তিনি চিন্তামগ্নভাবে ফিরলেন প্রাসাদে।

সেকালের রাজা রাজড়ারা হেমন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা—এ তিন ঋতুর উপযুক্ত তিনটি প্রাসাদ গড়তেন নিজেদের থাকার জন্য। যখন যে প্রাসাদে থাকতেন, তখন সে প্রাসাদকে বহুমূল্য আসবাবপত্রে ও মণিমাণিক্যে সাজানো হত ইন্দ্রপুরীর মতো। সেখানে তাঁদের পার্শ্বচারিণী হয়ে আসত রূপসী তরুণীর দল। তাদের সংখ্যা যাঁর যত বেশী হত, তাঁর ততই বাড়ত রাজ-মর্যাদা। হাস্য-পরিহাসে নৃত্য-গীতে মুখর হয়ে থাকত প্রাসাদ। রাজারাজড়াদের ছেলেরা যখন বড় হত, তাদের জন্যও পিতারা করে দিতেন পুরুষহীন প্রমোদাগারে সুখসম্ভোগের ব্যবস্থা। সিদ্ধার্থও যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিলেন তিন ঋতুর উপযোগী তিনটি

প্রাসাদ। সুন্দরীর দল তাঁকে ঘিরে রচনা করেছিল সুখস্বর্গ। সেই থেকে ঊনত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমোদ-প্রমোদের একটানা স্রোতে জীবন বয়ে চলেছিল তাঁর। সেই স্রোতঃপথ এক নিমেষে রুদ্ধ হয়ে গেল জরার দৃশ্য-দর্শনে। জীবনের স্রোত বইতে শুরু করল উল্টোদিকে। পথের দেখা সেই কঙ্কালসার জীর্ণ দেহ ভেসে ওঠে তাঁর সামনে, কানে কানে যেন বলে দেয়—ঐ সুন্দর সুঠাম দেহের পরিণতিও ওই, জরার হাত থেকে রেহাই নেই। সিদ্ধার্থ উন্মনা হয়ে বসে থাকেন। প্রমোদাগারের নর্মসহচরীদের রসচক্র জাগায় না আবেশ। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয় তাঁর মন। তাঁর ভাবান্তরের কথা গেল রাজা শুদ্ধোদনের কানে। তিনি সারথিকে ডেকে সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনলেন, শঙ্কিত হলেন দৈবজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করে। সিদ্ধার্থের জন্মদিনে দৈবজ্ঞেরা বলেছিলেন, 'এ শিশু বড় হয়ে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসের চারিটি দৃশ্য দেখে সংসার ত্যাগ করবে।' সেদিন রাজা ভেবেছিলেন মনে মনে—এই চারিটি দৃশ্য এমন কি! তাঁর রাজাজ্ঞার কাছে কোথা দাঁড়াবে এগুলো? তাই তিনি পুত্রের যৌবনারম্ভের পূর্বেই রাজ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, সিদ্ধার্থের সম্মুখে যেন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, রোগাতুর শীর্ণদেহ, প্রাণহীন মৃত এবং গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী না আসে। যে পথ দিয়ে সিদ্ধার্থ চলবেন, সে পথে রাজাদেশে এ চারিটি দৃশ্যের কোনটির আবির্ভাবের অবকাশ ছিল না। অন্য দিকে রাজা করেছিলেন পুত্রের জন্য সুখসম্ভোগের বিরাট আয়োজন, যাতে বৈরাগ্যের চিন্তাও মনে স্থান না পায়। রাজার গর্ব ছিল কোথায় সে পালিয়ে যাবে, কঠিন নিগড় দিয়ে বেঁধেছি তাকে। পুত্রের ভাবান্তরের কথা তাঁর সে গর্ব চূর্ণ করে দিল। তিনি ভাবতে লাগলেন, কি করে সম্ভব হল এ দৃশ্য—সবার চোখে ধুলো দিয়ে, আরও দৃঢ়তর অবস্থা অবলম্বন করতে হবে; না না সম্ভব হতে দেব না দৈবজ্ঞের সে কথা।

নিয়তিকে কে ঠেকাতে পারে? সিদ্ধার্থ আবার বের হলেন বেড়াতে। কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতে তাঁর কানে ভেসে এল করুণ আর্তনাদ। সেদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে তিনি দেখলেন—এক শীর্ণকায় দুর্বল ব্যক্তি নিজের মলমূত্রের মধ্যেই পড়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে তাঁর মনের ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠল। তিনি সারথিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছন্ন কি হয়েছে ওর?'

'যুবরাজ, লোকটি কঠিন ব্যাধিতে ভুগছে।'

'ছন্ন, কেন এ ব্যাধি হয়?'

'যুবরাজ, শরীর থাকলে ব্যাধি হয়, ব্যাধি শরীরের ধর্ম; এর আক্রমণে

শরীর ভেঙে যায়, মন অবসন্ন হয়, শক্তি সামর্থ্য কিছুই থাকেনা।' সিদ্ধার্থ শুনে তন্ময় হয়ে ভাবেন—তাঁর দেহও ব্যাধির অধীন অর্থাৎ যে কোন মুহূর্তে তাঁকে ব্যাধি আক্রমণ করতে পারে, ব্যাধিগ্রস্ত হলে তাঁর শরীর এমনি ভেঙে যাবে, লুপ্ত হবে সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত শক্তি ; তখন কোথায় থাকবে আমোদ প্রমোদের অবকাশ, দৃপ্ত যৌবনের আড়ম্বর? যতই তিনি ভাবেন, ততই সুখ-সম্ভোগের প্রতি রাজ্য সম্পদের প্রতি আসে তাঁর বিতৃষ্ণা। যে দেহ জরাব্যাধির আধার, তাকে নিয়ে মেতে থাকা তাঁর মনে হয় নিছক অজ্ঞতা।

দুই

সিদ্ধার্থ উন্মনা হয়ে বসে থাকেন। কোন দিকে খেয়াল নেই তাঁর। সুন্দরীর দল তাঁকে কেন্দ্র করে আমোদ প্রমোদের ফোয়ারা সৃষ্টি করে। কিন্তু তার বহুদূরে পড়ে থাকে তাঁর মন। আসন্নপ্রসবা যশোধরা স্বামীর উন্মনাভাব লক্ষ্য করে অমঙ্গল আশঙ্কায় শিউরে ওঠেন। কারণ তিনি ছিলেন পতিপ্রাণা—স্বামীর সুখেই তাঁর সুখ, স্বামীর দুঃখে তাঁর দুঃখ। স্বামীর বিষণ্ণ চেহারা দেখে মোটেই তিনি শান্তি পান না। যশোধরার প্রতি সিদ্ধার্থের ছিল গভীর অনুরাগ। তিনি কখনো এমন আচরণ করতেন না, যাতে পত্নীর প্রাণে ব্যথা লাগে। পরস্পরের প্রতি তাঁদের ভালবাসা ছিল স্বচ্ছ গভীর, কিন্তু পর পর দুইটি দৃশ্য দেখে সিদ্ধার্থ যেন কেমন হয়ে গেলেন। তিনি কত চেষ্টা করেন মনের ভাব গোপন করে পত্নীর সঙ্গে সহজ ভাবে বাক্যালাপ করতে। তাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। যেখানে মন নেই, সেখানে বাক্য অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। তা তাঁর কানে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মতো বাজে। স্বামীর ভাবগতিক লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন হলেন যশোধরা। অজানা ভয়ে অভিভূত হল তাঁর মন।

আসন্ন সন্ধ্যায় রথ এসে দাঁড়ালো প্রাসাদের দ্বারে। সারথি বলল, 'যুবরাজ, রথ প্রস্তুত।' সিদ্ধার্থ এতক্ষণ বসেছিলেন চিন্তামগ্ন হয়ে। সারথির ডাকে তিনি সুপ্তোত্থিতের মতো একবার তার পানে তাকালেন, বললেন, 'চলো।' প্রাসাদের ফটক পেরিয়ে রথ চলতে লাগলো। কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতে একদল লোক গেল তাঁর সামনে দিয়ে। তারা কাঁধে বহন করেছিল একটি নিস্পন্দ দেহ। তার পেছনে চলছিল এক শোকাতুরা নারী। তার করুণ বিলাপ যেন সমস্ত পরিবেশকে শোকাচ্ছন্ন করে তুলেছে। এ দৃশ্য সিদ্ধার্থকে অত্যন্ত অভিভূত করল। তিনি অভিভূত দৃষ্টিতে তাকাতে

লাগলেন। তাঁর মনে হল, সংসার যেন একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি। সংসারের আমোদ প্রমোদের সঙ্গে সন্মুখের এ দৃশ্যের সামঞ্জস্য খুঁজে পেল না তাঁর মন। সারথি বলে উঠল, 'যুবরাজ, ও মরে গেছে, শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' সিদ্ধার্থ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আবার তাকালেন মৃতদেহের প্রতি। মানুষ জন্মায়, মরে; জন্মালে মরতেই হবে, রেহাই নেই মৃত্যুর হাত থেকে, মৃত্যুতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে সকল রঙ্গরস, সকল সুখসম্ভোগ, সকল রাজৈশ্বর্য। ভাবতে ভাবতে স্পষ্ট হয়ে উঠল মৃত্যুর ছবি তাঁর মনে—মৃত্যু যেন সমগ্র বিশ্বসংসারকে বেষ্টন করে ভয়ঙ্কর রবে গর্জন করছে। অস্ফুট স্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'উঃ।' রথ ফিরে যায় প্রাসাদের দিকে।

সিদ্ধার্থকে ঘিরে বসে নৃত্যগীতের আসর নির্দিষ্ট নিয়মে। চলতে থাকে নাচগান। কিন্তু তাঁর বিবাগী মন সে আসরের সীমা ছেড়ে পড়ে থাকে বহুদূরে। নর্মসহচরীরা প্রাণপণ চেষ্টা করে আসর জমিয়ে তুলতে। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ করে ভেঙে যায় আসর। পরপর যে তিনটি দৃশ্য দেখেছিলেন সিদ্ধার্থ, সেগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাঁর মন। আসর জমবে কি করে? উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তাঁর মনের মধ্যে বইতে লাগলো চিন্তার ঝড়। জরা! ব্যাধি! মৃত্যু! তিনি যে দেখেছেন স্বচক্ষে জরার স্পর্শ কত নির্মম, ব্যাধির আঘাত কত কঠিন, মৃত্যুর আলিঙ্গন কত ভয়ঙ্কর। এগুলো ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় যৌবন, ভেঙে চুরে দেয় ভোগ-বিলাসের সুখনীড়, শূন্যে মিলিয়ে দেয় রাজ্যসম্পদ। অনন্তকালের তুলনায় জীবনের দিনগুলো কত সামান্য, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে এদিনগুলো। ঘুম ভাঙলে যেমন স্বপ্নের আবেশ কেটে যায়, তেমনি কেটে যেতে লাগলো সিদ্ধার্থের রাজৈশ্বর্যের সকল মোহ। দুদিনের জন্য কেন পৃথিবীতে আসা, জীবন কি অর্থহীন, কোন কর্তব্য কি নেই? নানারকম প্রশ্ন জাগল তাঁর মনে, কিন্তু কোন সমাধান মিলল না। মূর্ছারোগগ্রস্ত যেমন বারবার মূর্ছাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি সিদ্ধার্থ চিন্তামগ্ন হতে লাগলেন।

তিন

রাজা শুনলেন সমস্ত বৃত্তান্ত। শিউরে উঠল তাঁর মন। দৈবজ্ঞের সে কথা বার বার তাঁর মনে পড়ল। ভবিতব্যের কথা চিন্তা করে তাঁর উদ্বেগ অশান্তির সীমা রইল না। পুত্রকে ধরে রাখার জন্য কি না তিনি

করেছেন। তাঁর সকল চেষ্টা যে ব্যর্থ হতে চলেছে, তা বুঝতে আর বিলম্ব হল না। পুত্র সংসার ত্যাগ করে চলে যাবে, ছিন্ন কন্থা পরে ভিক্ষুক হবে—এ কথা ভাবতেই তাঁর মন মুষড়ে পড়ে, চারি দিক অন্ধকার মনে হয়।

. রাজার হুকুমকে সিদ্ধার্থের ভ্রমণের পথে কড়া পাহারার ব্যবস্থা হল, যাতে তাঁর চোখে না পড়ে কোন অননুকূল দৃশ্য। প্রহরীরা তাঁর ভ্রমণের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট পথে লোক চলাচল বন্ধ হবার উপক্রম হয়। তাই প্রায় জনহীন পথ দিয়ে সেদিন সিদ্ধার্থ চলেছেন বেড়াতে। এ পাহারার ব্যবস্থা তাঁর চোখেও অদ্ভুত ঠেকল। রথ চলতে চলতে যখন উদ্যানে এসে পড়ল, তখন এক শান্ত সৌম্য সন্ন্যাসী সম্মুখ দিয়ে চলেছেন মন্থর গতিতে। তাঁর দৃষ্টি শান্ত, মুখ উজ্জ্বল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সংযমের সৌন্দর্য। তাঁর কোথাও বেশভূষার পারিপাট্য নেই, অথচ দীপ্ত সৌন্দর্য যেন তাঁকে ঘিরে আছে। সিদ্ধার্থ নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইলেন। যতই তিনি দেখেন, ততই দেখতে ইচ্ছা হয়—দেখার সাধ যেন মেটে না। তিনি আপন মনে বললেন, 'ইনি কে, কেন এঁকে এত ভাল লাগে? কারও সঙ্গে যে এঁর মিল নেই, একেবারে নির্বিকার নিস্পৃহ পুরুষ, শান্তিতে ভরে আছে এঁর মন, উদ্বেগ অশান্তির চিহ্ন নেই এঁর কোথাও।'

সারথি বলল, 'যুবরাজ, ইনি সংসারত্যাগী যোগী পুরুষ, এঁর কোথাও কোন বন্ধন নেই।'

'বন্ধনহীন মুক্ত পুরুষ?'

'হাঁ যুবরাজ, তাই।'

সিদ্ধার্থ তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলেন 'আহা, এ অবস্থা কবে আমার হবে, কবে আমি এঁর মতো সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়ব বিশ্বের মুক্ত প্রাঙ্গণে, যেখানে জরা নেই, ব্যাধি নেই, মৃত্যু নেই, সেই অজর অব্যাধি অমৃত লোকের সন্ধান করব?'

সিদ্ধার্থ যখন দেখেছিলেন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, শীর্ণকায় রোগাতুর এবং প্রাণহীন মৃতদেহ, তাঁর মন সংসারের প্রতি তিক্ত বিরক্ত হয়েছিল, অস্বস্তিতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শুধু চিন্তামগ্ন হয়েছিলেন। তাঁর উদ্বেগ অশান্তির সীমা ছিল না। কিন্তু চতুর্থ দৃশ্য দেখে—সন্ন্যাসীকে দেখার পর থেকে সে উদ্বেগ অশান্তির অবসান ঘটল। তাঁর মনে হল যেমনি দুঃখ রয়েছে,

তেমনি আছে দুঃখমুক্তির পথ; খুঁজে বের করতে হবে সেই পথ, নিবাতে হবে দুঃখজ্বালা। যখন এমনিভাবে তিনি চিন্তামগ্ন হলেন, তখন অন্তঃপুর হতে সংবাদ এল তাঁর পত্নী যশোধরা নির্বিঘ্নে পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। পুত্রের জন্ম সংবাদ শুনে সিদ্ধার্থ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুই কথা—রাহু জন্মেছে, বন্ধন বেড়েছে। তাঁর কথার মর্ম বুঝতে পারল না সংবাদবাহক। জিজ্ঞাসু নয়নে সে চেয়ে রইল কতক্ষণ যুবরাজের মুখের পানে। তারপর সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করল।

রাজার মনে পড়ল সে অতীত দিনের কথা যেদিন তাঁর অগ্রমহিষী মায়াদেবী লুম্বিনী উদ্যানে শালতরুর ছায়ায় পুত্রসন্তান প্রসব করেছিলেন। এ সংবাদ যখন তাঁর কানে এসেছিল, আনন্দের সীমা ছিল না। রাজার মনে হল—আজও তেমনি পুত্রের জন্মসংবাদ পেয়ে সিদ্ধার্থের আনন্দের সীমা থাকবে না, পুত্রের মুখ দেখে আবার তার মন বসবে সংসারে, ব্যর্থ হবে দৈবজ্ঞের কথা। রাজা উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে ওঠেন সিদ্ধার্থের পরিবর্তনের কথা ভেবে। দূতকে দেখেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'যুবরাজ খুশী হয়েছে তো, কি বলল সংবাদ পেয়ে?'

'মহারাজ, তিনি শুধু বললেন রাহুল।'

যুবরাজের উচ্চারিত 'রাহু' শব্দ দূতের কানে বেজেছিল 'রাহুল'। তাই ঐ কথাটিই বলল দূত। এ কথার মধ্যে রাজা খুঁজে পেলেন না সিদ্ধার্থের মনের ঠিকানা। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যা হোক, নব জাতকের নাম রাখা হোক—রাহুল।'

পুত্রমুখ দর্শন করেই সিদ্ধার্থ অনুভব করলেন অজানা এক আকর্ষণ। কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকল তাঁকে সংসারের পানে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনের সম্মুখে ভেসে উঠল সেই চারিটি দৃশ্য। তাঁর মনের মধ্যে চলল ভাবের দ্বন্দ্ব। পতিপ্রাণা সতী, নিরপরাধ শিশুপুত্র ও পুত্রবৎসল পিতার চিন্তা যেমন একদিকে তাঁর সম্মুখে অনন্ত মায়াজাল বিস্তার করে, তেমনি অন্যদিকে বন্ধনহীন সন্ন্যাসীর শুদ্ধ শান্ত জীবনের আদর্শ তাঁকে আহ্বান করে বিশ্বের মুক্ত প্রাঙ্গণে। দুই বিরুদ্ধ চিন্তার স্রোত বইতে লাগলো তাঁর মনে। শান্ত সন্ধ্যায় তিনি অভ্যস্ত ভ্রমণে বের হলেন। তখন কিসাগোতমী প্রাসাদের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশান্ত সুন্দর মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মধুর কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন:—

নির্বৃত সে পিতা এ ধরার
যাহার এহেন সন্তান,
সে জননী পেয়েছে তাহাতে
বিপুল শান্তির সন্ধান
ধন্য ধন্য আজি এ বিশ্ব-ভুবনে
সেই গরীয়সী নারী,
পতি এহেন যাহারি
নিঃসীম আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া
আহা, সে পেয়েছে নির্বাণ।

সঙ্গীত থেমে গেল। সিদ্ধার্থ চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। 'নির্বাণ' শব্দটি তাঁর কানে যেন সুধা ঢেলে দিল, প্রাণ উতলা হয়ে উঠল। তাঁর অভীপ্সিত লক্ষ্য যেন তাতেই মূর্ত হয়ে তাঁকে আহ্বান করল। গায়িকার প্রীতি তাঁর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। তিনি তার উদ্দেশ্যে বহুমূল্য মণিহার পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরলেন। 'নিবাণ' কথাটি বারবার তাঁর কানে বাজতে লাগলো। তার অপূর্ব মাধুর্য মনপ্রাণকে অভিষিক্ত করে দিল। সে রাতের নাচ গানের আসরে যোগ দেবার মত অবস্থা তাঁর হল না। তাঁর উন্মনাভাবের জন্য আসরও জমল না। তিনি আসর ত্যাগ করে শয়নঘরে প্রবেশ করলেন। মনে হল যেন নির্বাণের আলো তাঁর চারিদিকে নেমেছে। মরুমায়ার মতো সংসার শূন্যে মিলিয়ে গেছে। তারই আলোয় তাঁর যাত্রাপথ যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর মন কোন বাধা মানতে চাইল না। মমতার নাগপাশ শিথিল হয়ে এল।

রাত্রি তখন গভীর। চারিদিক নিস্তব্ধ। তাঁর জীবনসঙ্গিনী নবজাত শিশুটিকে বুকে নিয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। শিয়রের কাছে একটি নির্বাণোন্মুখ দীপ নিবে নিবে জ্বলে উঠছিল। সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে শয্যা ছেড়ে দাঁড়ালেন। আপনার অজ্ঞাতে তাঁর দৃষ্টি স্ত্রী-পুত্রের ওপর গিয়ে পড়ল। মনে হল যেন তাদের ঘুমন্ত মুখ আসন্ন বিপদের ছায়ায় ম্লান, সমস্ত আবেষ্টনী যেন বিদায়ের সুরে করুণ। মুহূর্তের জন্য তাঁর হৃদয় অভিভূত হল। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসে অন্তরের ব্যথা ছড়িয়ে দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

চার

দূরে গাছপালার আড়ালে চাঁদ ডুবে গেল। আকাশের অগণিত তারা যেন বেদনাতুরা বিরহিণীর মতো শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সিদ্ধার্থ সারথি ছন্নকে

সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে অন্ধকারে চলতে লাগলেন। তাঁর কানে কানে কে যেন বলে দিল নির্বাণ। এ নির্বাণ-মন্ত্রে যেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। আকাশের তারার আলোর অক্ষরে এ মন্ত্রই যেন লেখা রয়েছে। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আড়ালে গোপন থেকে এ মন্ত্র যেন মানুষের অন্তরে অনাদ্যন্ত রবে ধ্বনিত। এ ধ্বনি সঙ্গীতের মতো কানে বাজতে লাগলো।

সিদ্ধার্থ অভিভূত হয়ে ঘোড়ার ওপর বসলেন। ছন্ন ঘোড়াকে চালিয়ে নিল। উভয়ের মুখে কোন কথা নেই! গ্রাম নগর প্রান্তর ছাড়িয়ে ঘোড়া চলল। তার খুরের শব্দ নিস্তব্ধ নৈশ-প্রকৃতির নীরবতা ভঙ্গ করতে লাগলো।, সারা রাত অবিশ্রান্ত চলার পর ঘোড়া এসে থামলো অনোমার পারে। তখন আকাশের পূর্বপ্রান্তে আলোর রেখা ফুটে উঠেছে, অন্ধকার হালকা হয়ে এসেছে। অনোমার বালুকাস্তৃত তীরে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ একটির পর একটি অঙ্গের আভরণ খুলে ছন্নের হাতে দিলেন এবং রাজ-পরিচ্ছদ ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করলেন। ছন্ন তাঁর পানে চেয়ে চোখের জল সংবরণ করতে পারল না। তারপর তিনি চির-সহচর ছন্ন এবং প্রিয় অশ্ব কন্থককে বিদায় দিয়ে একা পথ বেয়ে চললেন। আজ তিনি একা—নিতান্ত একা, তাঁর গন্তব্য স্থানের ঠিকানা নেই। তিনি শুধু জানলেন তাঁকে চলতে হবে।

চলতে চলতে তিনি রাজগৃহে (বর্তমান রাজগীর) এসে পৌঁছলেন। তখন আহারের সময় আসন্ন, আজ যে ভৃত্যেরা সুপাচক রচিত খাদ্যসম্ভার নিয়ে তাঁর সম্মুখে আসবে না, তা তাঁর অজানা নয়। তিনি অনুভব করলেন পেটের ক্ষুধা মেটাবার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাঁকে ভিক্ষায় সংগ্রহ করতে হবে। তিনি পাত্র হাতে নিয়ে ভিক্ষায় বের হলেন। তরুণ নবীন সুন্দর সন্ন্যাসীকে দেখে কৌতূহলাক্রান্ত জনতা তাঁকে অনুসরণ করল। তাঁর দেহের অপরূপ সৌন্দর্য, প্রতিভাদীপ্ত প্রশস্ত ললাট, প্রশান্ত উজ্জ্বল বদন-মণ্ডল দর্শকগণকে সত্যই মুগ্ধ করেছিল। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ করে তিনি যখন গাছের ছায়ায় বসে আহারের উদ্যোগ করছিলেন, তখন ভিক্ষার অন্ন-ব্যঞ্জন দেখে তাঁর খাবার ইচ্ছা আর রইল না। তিনি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে নিজেকে সংযত করে ভাবলেন—তিনি সন্ন্যাসী, ভিক্ষান্ন তাঁর সম্বল; ভিক্ষান্নকে ঘৃণা করলে চলবে না। এইভাবে তিনি মনের প্রতিকূল চিন্তা দমন করে আহার সমাপ্ত করলেন।

তখন সমৃদ্ধ রাজগৃহ মগধরাজ্যের রাজধানী, রাজা বিম্বিসার সেখানকার অধীশ্বর। সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি রাজা বিম্বিসারের ছিল একটি স্বাভাবিক

আকর্ষণ, নবীন সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থের কথা শুনে রাজা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। প্রথম দর্শনেই রাজা মুগ্ধ হলেন। এমন শান্ত সৌম্য রূপবান পুরুষ তিনি কোনদিন দেখেননি। সন্ন্যাসীকে রাজার অত্যন্ত আপনার জন বলে মনে হল। রাজা তাঁকে অনুরোধ করলেন রাজগৃহে থাকার জন্য এবং তাঁর সেবার সুযোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সিদ্ধার্থ শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'রাজন্, আমি মহাসত্যের সন্ধানে দুঃখমুক্তির পথদর্শনের আশায় সর্বস্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছি। আমার অভীষ্টসিদ্ধির পূর্বে আপনার অনুরোধ পালন করতে পারব না। তবে সিদ্ধিলাভের পর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।'

এর পর সিদ্ধার্থ অন্তরে বিপুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নানা স্থান ঘুরে গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন। অনেক সন্ধানের পর সেই যুগের প্রসিদ্ধ গুরু আড়ার কালামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। সদ্‌গুরু রূপে এই বর্ষীয়ান সন্ন্যাসীর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে অধ্যাত্মোপলব্ধির মণিকাঞ্চন-সংযোগে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল একটি বিরাট আদর্শ। সিদ্ধার্থ তাঁকে গুরু বলে বরণ করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে গুরুর অধ্যাপিত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। কিন্তু এতে তাঁর মন তৃপ্ত হল না, তিনি ভাবলেন—শুধু শাস্ত্রাধ্যয়নে কি হবে, যদি অন্তরে উপলব্ধি না হয়; গুরুর যোগসাধনেও অধিকার লাভ একান্ত প্রয়োজন; তিনি পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে সাধনায় রত হলেন। অচিরেই তাঁর সিদ্ধিলাভ হল। কিন্তু সিদ্ধার্থের ঊর্ধ্বগামী মন এতেও তৃপ্ত হল না; তিনি অনুভব করলেন, এখানেই সাধনার পরিসমাপ্তি নয়, আরও অগ্রসর হতে হবে। গুরু যখন তাঁকে সাধনায় উন্নততর স্তরের নির্দেশ দিতে অসমর্থ হলেন, গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণ করে অন্য উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে তিনি আবার ঘুরতে লাগলেন। অনেক ঘোরাঘুরির পর তিনি রামপুত্র উদ্রকের সন্ধান পেলেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। সেখানেও সিদ্ধার্থ অনায়াসে গুরুর শাস্ত্রে পারদর্শী হলেন। এর পর তিনি গুরুর নির্দিষ্ট সাধনায় আত্মনিয়োগ করে তাতে অধিকার লাভ করলেন। পূর্বগুরু আড়ার কালামের চেয়ে এ গুরুর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি উন্নততর বটে, কিন্তু তাও সিদ্ধার্থের উন্নতিশীল ভাবধারাকে পরিতৃপ্ত করতে পারল না। তিনি বৃহত্তর সন্ধানের জন্য এই গুরুর নিকটও বিদায় নিতে বাধ্য হলেন।

আবার তিনি গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন। বহু সাধু মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল; কিন্তু কেউ তার জ্ঞানপিপাসা মেটাতে পারলেন না। অবশেষে

তিনি গুরুসন্ধানের চেষ্টা পরিত্যাগ করলেন। মনের উন্নতিশীলভাব তেমনি অটুট রইল। তাঁর মনে হতাশার স্থান নেই, সংকল্পের বিপর্যয় নেই। তাঁর অটল বিশ্বাস—সিদ্ধিলাভ হবেই, সিদ্ধির গোপন পথ সন্ধান করা তাঁর একমাত্র কর্তব্য, সন্ধানীর কাছে সে পথ অনাবিষ্কৃত থাকতে পারে না। তাঁর অসীম ধৈর্য ও অতুল পরাক্রম তাঁকে সম্মুখপানে এগিয়ে দিল। বিপুল আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি কঠোর সাধনায় রত হতে বদ্ধপরিকর হলেন।

পাঁচ

সেকালে একদিকে যেমন লোকায়তিকগণ সুখসম্ভোগে মগ্ন হয়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত-সাধনকে জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করতেন এবং ভোগবিলাসের প্রাচুর্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়পর হয়ে থাকার জন্য সচেষ্ট হতেন, তেমনি অন্যদিকে বিশ্বাসী পরিব্রাজকগণ আধ্যাত্মিক কল্যাণকামনায় ঐহিক সুখ ও আরাম দলিত করে নানাভাবে ক্লেশকর কৃচ্ছ্রসাধনায় ব্রত হতেন। সিদ্ধার্থ আপনার অভীপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হবার আশায় কৃচ্ছ্রসাধনরত পরিব্রাজকগণের পন্থা নুসরণ করলেন। তিনি সেকালের প্রচলিত কঠিনতম চতুরঙ্গ ব্রহ্মচর্যসাধনা শুরু করলেন। তপস্বিতা, রুক্ষাচার, জুগুপ্সা ও প্রবিবেক—এ সাধনার চারি অঙ্গ।

তিনি আপনার পরনের বস্ত্রখণ্ড ফেলে দিয়ে নগ্ন থাকলেন। তাঁর অনাবৃত দেহ গ্রীষ্মের খরতাপে ও শীতের কনকনে হাওয়ায় অপরিমেয় ক্লেশ বরণ করল। তিনি লোকালয়ের ভিক্ষান্ন গ্রহণ ত্যাগ করে ফলমূলভোজী হলেন। কিন্তু গাছ থেকে ফল পেড়ে খাওয়া তাঁর বারণ। ফল যখন গাছ থেকে আপনা আপনি ঝরে পড়ত, তখন তিনি তা কুড়িয়ে খেতেন। কখন নীবার ধান, কখন ঘাসপাতা ইত্যাদি কুড়িয়ে খেয়ে তিনি জীবন ধারণ করতে লাগলেন। শরীরের আরাম যাতে না হয় তাই কাঁটা হল তাঁর পীড়াদায়ক শয্যা। উর্ধ্ববাহু ও উৎকুটিক হয়ে তিনি তপস্যারত হলেন। এইভাবে অনেক প্রকার কায়ক্লেশ বরণ করে তিনি তপস্বিতার শেষ সীমায় পৌঁছলেন, শরীরের প্রতি তাঁর কোন যত্ন রইল না। বহুবর্ষসঞ্চিত ধূলিবালুকায় ঢাকা পড়ে গেল তাঁর দেহ, শরীরে হাত বুলানোও তাঁর বারণ, এমন ছিল তার রুক্ষাচার! তিনি সব সময় সতর্ক অবহিত হয়ে রইলেন। ক্ষুদ্র জীবাণুর প্রাণ বধের ভয়ে জলবিন্দুর প্রতিও তাঁর ব্যবহার ছিল সদয়। এমন ছিল জুগুপ্সা বা পাপের প্রতি ঘৃণা।

প্রবিবেক বা নির্জনবাসের জন্য তিনি জনহীন নিবিড় অরণ্যে বাস করতেন।

রাখাল, কাঠুরে প্রভৃতি বনচর লোকের দৃষ্টি এড়াবার জন্ত তিনি বন থেকে বনে, কন্দর থেকে কন্দরে এবং উপত্যকা থেকে উপত্যকায় আত্মগোপন করতেন অর্থাৎ সর্বদাই লোকলোচনের আড়ালে থাকতেন। এ নির্জনবাসের সময় কোন কোন দিন তিনি নির্জন শ্মশানে শবাস্থির ওপর শুতেন। এ তপশ্চর্যার সময় এমন হত যে তিনি যখন আসন করে বসতেন, রাখাল ছেলে এসে তাঁর নিশ্চল দেহের ওপর মূত্র ত্যাগ করত, ধুলো ছড়িয়ে দিত। তিনি দৈনন্দিন এ অত্যাচার নীরবে সহ্য করতেন এবং করুণাবিগলিত হৃদয়ে তাদের ক্ষমা করতেন।

'জনবাদের' ওপর আস্থাবান হয়ে তিনি আহারশুদ্ধিতে রত হলেন। একটি মাত্র কুল খেয়ে অথবা একটি মাত্র চাল খেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। অত্যন্ত অল্পাহারের ফলে তাঁর দেহ ভেঙে গেল, হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়ল, চক্ষু কোটরগত হল। তাঁর শীর্ণ হাত যখন পেটে পড়ত, তখন শিরদাঁড়া হাতে লাগত। এক কথায় সমস্ত শরীর একটি চর্মাবৃত কঙ্কালে পরিণত হল। শরীরকৃত্য করতে গিয়ে তিনি কোন কোন দিন উপুড় হয়ে পড়তেন। অবশেষে তিনি উত্থানশক্তি-রহিত হলেন।

এমন কঠোর তপশ্চর্যায়ও যখন তাঁর সিদ্ধিলাভ হল না, তখন তাঁর মনে হল তাঁর অবলম্বিত তপশ্চর্যা সত্যের পথ নয়, এতে শুধু দেহমনের নিপীড়ন হয়েছে। তিনি যখন একথা ভাবতে লাগলেন, তখন অদূর থেকে ভেসে এল তাঁর কানে বীণার মৃদু ঝঙ্কার, প্রাণে বুলিয়ে দিল শান্তির পরশ। তিনি উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন, ক্রমশঃ বীণার তন্ত্রী দ্রুতলয়ে বেজে উঠল, সিদ্ধার্থের মন বিরক্ত হল। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন না, না, না। সেই সুর আবার অত্যন্ত ঢিমে হয়ে গেল। তখন তিনি বিরক্তিতে বলে উঠলেন,—না, না, না। বীণার তন্ত্রী যখন দ্রুত ঢিমে দুই বাদ দিয়ে মাঝামাঝি বাঁধা হল, তাঁর মধুর রাগিণী তখন সিদ্ধার্থের মনপ্রাণ অভিসিক্ত করে তুলল। তিনি চোখ মুদে বললেন, মধ্যপন্থা। সাধনার ক্ষেত্রেও বীণার মতো মধ্যপন্থার আবশ্যকতা তিনি অনুভব করলেন। এর পর তিনি কঠোর সাধনা ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন। যে সহচর সন্ন্যাসীরা এতদিন তাঁর কৃচ্ছ্র সাধনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সেবাযত্ন করতেন, তাঁরা ভাবলেন—সিদ্ধার্থ পথভ্রষ্ট। তাঁদের ক্ষোভ ও পরিতাপের সীমা রইল না। তাঁরা ক্ষুণ্ণমনে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করলেন।

সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ মধ্যপন্থা অনুসরণ করে নতুন সাধনাপদ্ধতি আরম্ভ

করলেন। তাঁর অন্তরে নতুন আলোর স্পর্শ এল। পুলকে হৃদয় ভরে উঠল। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। বসন্তসমাগমে যেমন বনে বনান্তরে নতুনের সমারোহ শুরু হয়, তেমনি তাঁর মনোজগতে দেখা দিল নতুন পরিবর্তন। মনে হল যেন তার লক্ষ্য আসন্ন। বৈশাখের শুক্ল পক্ষের চন্দ্র দিনের পর দিন যতই বাড়তে লাগলো, ততই আসন্ন অজ্ঞাত সম্ভাবনায় তাঁর মন পুলকে শিউরে উঠল। অননুভূত উদার স্পর্শে তিনি অভিভূত হতে লাগলেন। চতুর্দশী তিথির প্রভাতে তিনি একটি বটবৃক্ষের ছায়ায় ভাববিভোর হয়ে বসলেন। তাঁর দেহ হল নিশ্চল, চোখে মুখে ফুটে উঠল অপূর্ব ধ্যানদীপ্তি। সেখানে উপস্থিত হলেন কুলবধূ সুজাতা। তিনি ভাবমগ্ন সিদ্ধার্থের জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখে মনে মনে ভাবলেন তাঁর আরাধ্য বৃক্ষদেবতা সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। সুজাতা একদিন এ বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে বলেছিলেন—'যদি আমার প্রথম সন্তান পুত্র হয়, তা হলে এখানে পূজা দিয়ে যাব।' তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। তাঁর কোল আলো করে এসেছে সোনার চাঁদ ছেলে। এজন্য বৃক্ষদেবতার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদনের দিন আজ। সিদ্ধার্থকে মূর্ত দেবতা মনে করে আনন্দের সীমা রইল না। সুজাতা হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে ভক্তিভরে সুরচিত পায়সের স্বর্ণপাত্র তুলে দিলেন তাঁর হাতে। সেখানে বসেই তিনি সুসংযত-ভাবে আহার করলেন সে পায়সান্ন। এ আহার মুছে দিল যেন তাঁর দীর্ঘ দিনের কঠোর সাধনার পুঞ্জীভূত গ্লানি। আহারান্তে তিনি মৃৎপাত্রের মতো নৈরঞ্জনার জলে ফেলে দিলেন সে স্বর্ণপাত্র। স্রোতের টানে তা তীরবেগে ছুটে চলল জলের ওপর, ইঙ্গিত দিল অগ্রগতির। তিনি তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলেন।

নৈরঞ্জনার কুলকুল-শব্দ সিদ্ধার্থের কানে নতুন করে বাজতে লাগলো, প্রাণ উতলা করে তুলল। তিনি আস্তে আস্তে চললেন তার তীর বেয়ে। তাঁর চোখে নৈরঞ্জনা আজ সম্পূর্ণ নতুন। সে যেন উদার আনন্দে নতুন ছন্দে অজানার পানে ছুটে চলেছে। চোখ ভরে তাঁর অপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে তিনি ভাবমগ্ন হয়ে গেলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধারায় চারিদিক প্লাবিত হল। তার মনে জাগলো এক অপূর্ব আলোর অনুভূতি। অন্তরে বাইরে সর্বত্রই আলোর বান ডাকলো। তিনি অদূরে দেখতে পেলেন তপস্যার উপযুক্ত রমণীয় স্থান, সুন্দর বনভূমি। তাঁর কথায় বলতে গেলে, 'রমণীয়ো ভূমিভাগো পাসাদিকো চ বনসণ্ডো নদী সন্দন্তী

চ সেতকা সুপতিত্থা রমণীয়া সমন্তা গোচরগামো অলং বতিদং কুলপুত্তস্স পধানত্থিকস্স পধানায়াতি।' তিনি বুদ্ধত্ব-লাভের কঠিন সংকল্প নিয়ে সেখানে অশ্বত্থগাছের তলায় আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর চোখ ধ্যান-নিমীলিত হয়ে এল। মন ক্রমশঃ ধ্যানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সুখদুঃখের অতীত সহানুভূতিযুক্ত শুদ্ধ শান্ত চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হল।

তাঁর সমাহিত চিত্ত 'পূর্বনিবাসানুস্মৃতি' বা জাতিস্মর জ্ঞান লাভ করল। তিনি দর্পণে প্রতিফলিত বস্তুর মতো জন্ম-জন্মান্তরের চিত্র দেখতে লাগলেন। রাত্রির প্রথম যামেই এ প্রথম বিদ্যা তাঁর আয়ত্ত হল। দ্বিতীয় যামে দ্বিতীয় বিদ্যা—'চ্যুত্যোৎপত্তি' জ্ঞান লাভ হল অর্থাৎ তাঁর কাছে জন্মমৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। তিনি দিব্য দৃষ্টি মেলে প্রত্যক্ষ করলেন জীবজগতের আসাযাওয়ার খেলা। তৃতীয় যামে হল 'আস্রবক্ষয়' জ্ঞানের উদয়—অন্তরের সমস্ত মারসৈন্য বা রিপুগুলোকে নির্মূল করে তাঁর চিত্ত হল মুক্ত—বন্ধনহীন। এখানেই তাঁর বুদ্ধজীবনের বিকাশ, সাধনার পরিপূর্ণতা, কর্তব্যের অবসান—'নত্থি উত্তরি করণীয়ং,' এর পর আর করণীয় কিছু নেই। এ অবস্থাকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, ভাষা এখানে মূক, মানবের চিন্তাধারা এখানে স্তব্ধ।

ছয়

'এ আসনে আমার হাড় মাংস চামড়া শুকিয়ে যাক, দেহ বিলীন হোক, তবু বুদ্ধত্ব লাভ না করে এ আসন ত্যাগ করব না' সিদ্ধার্থের এ কঠিন সংকল্পের জয় হল। তিনি হলেন বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানের ঘনমূর্তি। বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁর হৃদয় থেকে হঠাৎ অশ্রুতপূর্ব বাণী উদ্‌গত হল। তিনি নৈরঞ্জনা-সৈকত প্রতিধ্বনিত করে উচ্চারণ করলেন—

অনেকজাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা।

—বহু জন্ম ব্যর্থভাবে ফিরিয়াছি তাহার সন্ধানে
এই দেহ-গৃহ মোর কে কোথায় গড়িছে গোপনে,

ওগো গৃহকার![1] আজি এই দিনে দেখিনু তোমায়,
কৃতকার্য হবে নাকো তুমি আর গৃহ-রচনায়,
যত ছিল কড়িকাঠ ভাঙিয়াছি আমি একে একে
উন্মূলিয়া গৃহকূট[2] চিরতরে চোখের পলকে।
সকল সংস্কার আজি গেছে খসি মোর চিত্ত হতে।
তৃষ্ণা নিঃশেষিত করি মগ্ন আমি বিপুল শান্তিতে।

বুদ্ধত্ব-লাভের উদ্বেল আনন্দ ব্যাপ্ত করে দিয়ে কণ্ঠ থেমে গেল। চারিদিক আবার নিস্তব্ধ হল। বুদ্ধ বিমুক্তির গভীর আনন্দে মগ্ন হয়ে সে আসনেই সাতদিন কাটিয়ে দিলেন। তাঁর সমস্ত সত্তা এত অভিভূত হয়ে পড়ল যে, সকল শারীরিক কৃত্য তিনি কিছুদিনের জন্য একেবারেই ভুলে গেলেন। আসন ত্যাগ করেই তিনি যখন সেই গাছটির দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর মনে হল তাঁর বুদ্ধজীবনের বিকাশে এ গাছ শাখা মেলে তাঁকে ছায়াদান করেছিল, অনাবিল শ্রদ্ধায় ও গভীর কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে উঠল। তিনি ভাবমগ্ন হয়ে পলকহীন চোখে সে গাছটির পানে চেয়ে নীরব অশ্রুপাতে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। এর ছায়ায় তাঁর বোধি অর্থাৎ মহাজ্ঞানের উদয় হয়েছিল বলে একে বলা হয় বোধিতরু। সেজন্য সেই সম্মানদান বুদ্ধের 'বোধিতরুপূজা' নামে অভিহিত হয়।

বোধিতরু ত্যাগ করে বুদ্ধ আর একটি বটগাছের ছায়ায় এসে বসলেন। এ গাছকে বলা হত অজপাল বটগাছ। এখানেও তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে সাত দিন কাটিয়ে দিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর জনৈক জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। ব্রাহ্মণ সেখানে দাঁড়িয়ে গর্বোদ্ধতভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি করে ব্রাহ্মণ হতে হয় এবং ব্রাহ্মণের ধর্ম কি কি তা জানেন কি?' প্রশ্ন শুনে বুদ্ধ ভাবাবেগে আপন মনে বললেন—'যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যবান্ সংযত নিষ্পাপ নির্মল অহঙ্কারহীন অধ্যাত্মোপলব্ধি সম্পন্ন, তিনিই ধর্মতঃ ব্রাহ্মণত্বের দাবি করতে পারেন।' তাঁর উক্তি শুনে ব্রাহ্মণ প্রস্থান করলেন।

---

১ সংসারের প্রতি তৃষ্ণা বা আসক্তিকে এখানে গৃহকার বা গৃহনির্মাতা বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ এ আসক্তি জীবকে জন্ম-জন্মান্তরের পথে নিয়ে যায় এবং জীবের দেহরূপ গৃহ-রচনার হেতু হয়।

২ অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা এখানে গৃহকূট বা গৃহের মূলস্তম্ভ বলে বর্ণিত হয়েছে।

এর পর বুদ্ধ অজপাল বটগাছ ত্যাগ করে মুচলিন্দে এসে গাছের ছায়ায় বসলেন। সেখানেও তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে সাত দিন ধরে প্রবল ধারায় বৃষ্টিপাত হতে লাগলো। একটি প্রকাণ্ড সর্প তাঁর দেহ বেষ্টনপূর্বক মাথার ওপর বিশাল ফণা বিস্তার করে তাঁকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে লাগলো। সাত দিন পরে আকাশ মেঘমুক্ত হল। প্রভাতের স্বচ্ছ আলোয় চারিদিক ঝলমল করে উঠল। ধ্যানভঙ্গের পর তিনি ভাবাবেগে নির্জন প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করে গাইলেন :

সুখো বিবেকো তুট্‌ঠস্‌স সুতধম্মস্‌স পস্‌সতো
অব্যাপজ্‌জং সুখং লোকে পানভূতেসু সংযমো
সুখা বিরাগতা লোকে কামানং সমতিক্কমো
অস্মিমানস্‌স যো বিনযো এতং বে পরমং সুখং।
— মন যার ডুবিয়াছে ধর্মের গভীরে
তুষ্ট সদা মন লঙ্ঘি ক্ষোভের সীমারে,
তাহার বিবিক্তবাস কি আনন্দময়!
অহিংসা বাড়ায় তার আনন্দসঞ্চয়।
বৈরাগ্য আনন্দময় কামনা-বর্জন
পরম আনন্দ আহা অস্মিতানাশন।[৩]

বুদ্ধ এমনি মগ্নভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে দিয়ে যেদিন আহারের প্রয়োজন অনুভব করলেন, সেদিন বণিক তপস্সু ও বণিক ভল্লিক পণ্যসম্ভার নিয়ে তাঁর সামনের পথ ধরে চলছিলেন। হঠাৎ তাঁদের পুরোগামী শকট থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শকটগুলো থামলো। তাঁরা শকট থামবার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অদূরে গাছতলায় বুদ্ধকে দেখতে পেলেন। তাঁর মুখে চোখে অপূর্ব ধ্যানের দীপ্তি, চারিদিকে যেন আলোর ঢেউ বইছে। মানুষের এত সৌন্দর্য কোন দিন তাঁদের চোখে পড়েনি ; প্রথম দর্শনেই তাঁরা অভিভূত হলেন এবং তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে বললেন—ভগবন, তোমার শরণ নিলাম, তোমার ধর্মের শরণ নিলাম। তখনই তাঁরা তাদের আহার্যভাণ্ড খুলে ছাতু মধুপিণ্ড তাঁর ভিক্ষাপাত্রে অর্পণ করলেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধের এই প্রথম আহার গ্রহণ।

এ বণিকদ্বয় বৌদ্ধ সাহিত্যে 'দ্বিবাচিক উপাসক' নামে পরিচিত। তখনও সঙ্ঘের জন্ম হয়নি বলে এঁরা ত্রিশরণের পরিবর্তে দ্বিশরণ গ্রহণ করেছিলেন।

---

৩ অস্মিতানাশন অহংভাব-পরিত্যাগ বা আমি 'আমার' ধারণার মূলোৎপাটন।

সাত

সকল অবস্থায় বুদ্ধের মনে হতে লাগলো বুদ্ধত্ব-লাভের কথা। তিনি ভাবতে লাগলেন—"অতিকষ্টে উপলব্ধ হল ধর্ম, যা সহজে জানা যায় না বোঝা যায় না, তর্কে ধরা যায় না এবং যা অন্তরে বইয়ে দেয় অনন্ত শান্তির অনন্ত আনন্দের নির্ঝর। যে সত্য শুধু জ্ঞানীর বোধগম্য, তা লোকের মধ্যে প্রচার করে কি হবে? যারা সংসারে ডুবে আছে মত্ত হয়ে আছে বাইরের রূপে রসে, তারা কি বুঝবে কার্যকারণের কথা, তারা কি গ্রহণ করবে নির্বাণের উপদেশ? তবে কেন প্রচার করব উপলব্ধ ধর্ম? এতে শুধু হবে কষ্ট আর লাঞ্ছনা।" ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে জাগলো নির্জনে শান্তিতে মুক্তির আনন্দে জীবনের বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দেবার সংকল্প। জনগণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের আকাঙ্খা তাঁর রইল না। পরে যখন তিনি দিব্যদৃষ্টি প্রসারিত করলেন জগতের দিকে, তিনি দেখলেন কমল-সরোবরে নানারকম কমলের মত জগতে রয়েছে নানা ধরণের লোক—নির্মল-মলিন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-স্থুলবুদ্ধি, সুচরিত্র-দুশ্চরিত্র, মহৎ-ক্ষুদ্র এবং পাপভীরু পরলোক-বিশ্বাসী। তাঁর প্রতীতি হল—সত্য উপলব্ধি করবার লোক আছে, শুধু উপদেশের অভাব। তখন তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—সকলের জন্য অমৃতের দ্বার উন্মুক্ত হোক, যার কান আছে সে শুনুক, বিশ্বাস করুক।

বুদ্ধ ভাবলেন—কাকে এ ধর্ম প্রথম জানাই, কে এ ধর্ম প্রথম বুঝতে পারবে। তাঁর মনে পড়ল ঋষি আড়াড় কালামের কথা। কারণ, তিনি ছিলেন পণ্ডিত বুদ্ধিমান ও শুদ্ধাচারী; তাঁর পক্ষে ধর্মবোধ হত সহজ। কিন্তু সপ্তাহকাল পূর্বেই তিনি গত হয়েছেন জেনে বুদ্ধ ব্যথিত হলেন। তারপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল উদ্রক রামপুত্রের ওপর। উদ্রক রামপুত্রেরও পরলোক-গমনের কথা জানতে পেরে তিনি স্মরণ করলেন পাঁচজন ব্রাহ্মণ তাপসকে যাঁরা তাঁর কঠিন তপস্যার সময় প্রাণ ঢালা সেবা করেছিলেন। তিনি যাত্রা করলেন তাঁদের উদ্দেশে বারাণসীর মৃগদায়ের দিকে। পথে দেখা হল পরিব্রাজক উপকের সঙ্গে। উপক মুগ্ধ দৃষ্টিতে বার বার তাঁর পানে তাকালেন এবং কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—বন্ধু, তুমি কে? সোনার বরণ তোমার তনু, মুখ তোমার সমুজ্জ্বল, কে তোমার গুরু? কার ধর্ম তুমি গ্রহণ করেছ? শান্ত কণ্ঠে বুদ্ধ উত্তর করলেন—অন্তরের সকল রিপু জয় করে আমি হয়েছি মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ, আমার কোন গুরু নেই, কাকে আমি

গুরু বলে নির্দেশ করব! উপক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বল্লেন—হুঁ, যা বলছ তা হতেও পারো।

উপককে বিদায় দিয়ে বহুদূর পথ অতিক্রম করে বুদ্ধ এসে পৌছলেন মৃগদায়ের প্রান্তরে। দূর থেকে তাঁকে দেখলেন সে-ই ব্রাহ্মণ তাপসগণ। বিরক্তিতে তাঁদের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, তপস্যা ত্যাগ করে বিলাসী হয়ে গৌতম আসছেন, তাঁকে অভিবাদন করব না, সম্মান দেখাব না, আগুবাড়িয়ে আনব না, শুধু একখানি আসন পেতে রাখব, ইচ্ছা হলে তিনি বসবেন। কিন্তু যতই তিনি কাছে আসতে লাগলেন ততই তাঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—কেউ আগুবাড়িয়ে আনতে গেলেন, কেউ আসন পাতলেন, কেউ জল নিয়ে দাঁড়ালেন। তবে তাঁরা তাঁকে নাম ধরে ডাকলেন, বন্ধু বলে সম্বোধন করলেন। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন—ভিক্ষুগণ, তথাগতকে নাম ধরে ডেকো না, বন্ধু বলে সম্বোধন করো না, আমি অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ, জীবন-সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত আমি লাভ করেছি, তা তোমাদের বিতরণ করব, তোমরা শোনো; আমার উপদেশ পালন করো, তাতে তোমাদের সন্ধান সার্থক হবে। তাঁরা তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, বললেন—বন্ধু গৌতম, তুমি অতি কঠিন তপস্যা করেও যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারোনি যে সত্য উপলব্ধি করতে পারোনি, আজ তপোভ্রষ্ট বিলাসী হয়ে কি করে সে-ই জ্ঞান সে-ই সত্য তোমার লাভ হলো? তিনি আবার তাঁদের জানালেন নিজের সত্যোপলব্ধির কথা, বর্ণনা করলেন বুদ্ধত্বলাভের ইতিবৃত্ত। তাঁরা মানতে চাইলেন না সে কথা সে ইতিবৃত্ত, জানালেন প্রতিবাদ। তাঁর তৃতীয়বারের উক্তিও তেমনি বিফল হল। তখন তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কি কখনো আমার মুখে এরকম কথা শুনেছো? তাঁরা উত্তর করলেন—না প্রভু, আপনার মুখে এমন কথা তো শুনিনি। তাঁদের সুর নরম হয়েছে- জেনে তিনি বললেন—তবে শোনো, সত্যের পথ তোমাদের বলে দিচ্ছি।

তখন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। পূর্ব গগন-প্রান্তে পূর্ণ চন্দ্র মেঘের ফাঁকে শুভ্র কিরণ জাল ছড়িয়ে দেখা দিয়েছিল। জ্যোৎস্নালোকস্নাত তপোবনে বুদ্ধ শুরু করলেন তাঁর উপদেশ :—“হে ভিক্ষুগণ, যে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয় মুক্তির সন্ধানে, তাকে বর্জন করতে হবে দুটি চরম পন্থা—প্রথম হল ইন্দ্রিয়পরতা যা লোককে করে দেয় হীন বর্বর অশ্লীল এবং অনর্থের ভাগী, দ্বিতীয় কৃচ্ছ্রতা বা সাধনার নামে আত্মপীড়ন, যাতে হয় শরীরের ভোগান্তি মনের অবসন্নতা।

এ দুইটি চরম পন্থা বর্জন করে আমি খুঁজে পেয়েছি মধ্যপথ যা চোখ খুলে দেয়, আলো আনে, কামনা বাসনার বহ্নি নিবিয়ে দেয়, নির্বাণে নিয়ে যায়। মধ্য পথের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি আর্যসত্যের কথা টেনে আনলেন—দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখরোধ ও দুঃখরোধের পন্থা। জগৎ দুঃখপীড়িত—জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, বিচ্ছেদ-বিয়োগ, অপ্রিয়সংযোগ, ক্ষয়-ক্ষতি, নৈরাশ্য, শোক-সন্তাপ ইত্যাদি কত দুঃখ কত হাহাকার জীবের জীবনকে ছিন্নভিন্ন করছে। দিনের পর দিন চলেছে এ দুঃখের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। দুঃখকে জয় করে সুখের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই, কিন্তু মানুষ অসহায়ভাবে সে দুঃখের কাছেই বার বার মাথা নত করে। কারণ দুঃখের মূল নষ্ট না হলে দুঃখ তো যাবে না। কাটা অশ্বত্থ গাছের মত তার ফেকরি বের হবেই। তৃষ্ণা বা আসক্তিই দুঃখের কারণ বা মূল। লোক যা দেখে, যা শোনে, যা আস্বাদন করে, যা আঘ্রাণ করে, যা স্পর্শ করে, যা ভাবে, সে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি তার আসক্তি অনুরাগ জন্মে। একে বলা হয় তৃষ্ণা। এ তৃষ্ণা লতার মত ওতপ্রোতভাবে তাকে জড়িয়ে ফেলে। মাকড়সা যেমন নিজের জালে নিজে জড়িয়ে যায়, ঠিক তেমনি লোক নিজের অন্তরের তৃষ্ণায় নিজে জড়িয়ে যায়। সে কুচিন্তা করে ইন্দ্রিয়পর হয়, তার তৃষ্ণার জাল দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে থাকে। তখন তার জন্ম-জন্মান্তর ভ্রমণ অফুরন্ত হয়। ফলে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, সন্তাপ, ইত্যাদি দুঃখরাশি তাকে ঘিরে থাকে। এজন্য তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল। এ তৃষ্ণার উৎসাদনে ক্ষয়ে সকল দুঃখরোধের পন্থা হল অষ্টাঙ্গ আর্যপথ যার অনুসরণে তৃষ্ণার মূলোচ্ছেদ হয়, অন্তরে আনন্দ ও শান্তির উৎস খুলে যায়। মধ্যপথ এরই নামান্তর। এর আটটি অঙ্গ—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক বীর্য, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এ পথ দুঃখ জয়ের পথ, মুক্তির মার্গ ও নির্বাণের সোপান।

সম্যক দৃষ্টি—যথাযথ ধারণা। বিপরীত দৃষ্টিতে ভুল ধারণায় লোক অনিত্যকে নিত্য ভাবে অসারকে সার ভাবে। তখন সে বিভ্রান্ত হয়ে মরীচিকালুব্ধ মৃগের মত জীবনের দিনগুলি ক্ষয় করে। এই বিভ্রান্তিকে অতিক্রম করে দৃষ্টিকে শুদ্ধ করাই সম্যক দৃষ্টি।

সম্যক সংকল্প—সুশোভন চিন্তা। মন হতে বিষয় ভোগের কল্পনা হিংসাদ্বেষের চিন্তা দূর করে দিয়ে মৈত্রী করুণাস্নিগ্ধ অন্তরে মুক্তির চিন্তাই সম্যক সংকল্প।

সম্যক বাক্য—সৎবাক্য। মিথ্যাকথা, রূঢ়বাক্য, পিশুন বাক্য ও বাচালতা পরিত্যাগ করে সুন্দর মধুর অর্থপূর্ণ বাক্যালাপ সম্যক বাক্য।

সম্যক কর্ম—প্রাণিহত্যা চুরি ইত্যাদি কলুষিত কর্ম পরিত্যাগ করে সৎকর্মে রত হওয়াই সম্যক কর্ম।

অপূর্ব বর্ণনাভঙ্গীতে নিপুণ ব্যঞ্জনায় সুললিত কণ্ঠে বুদ্ধ যখন আর্যসত্যের উপদেশ বর্ষণ করতে লাগলেন, তখন একটি অপূর্ব ভাবগম্ভীর ধর্মীয় পরিবেশের সৃষ্টি হল। ব্রাহ্মণ তাপসগণ তদ্‌গত চিত্তে শুনতে শুনতে তাঁদের নায়ক কৌণ্ডিণ্যের মন মগ্ন হল ধর্মের গভীরে। তিনি সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন আর্যসত্য। সকল সংশয়ের অন্ধকার বিদূরিত করে উন্মীলিত হল তাঁর ধর্মচক্ষু। তিনি বুদ্ধের চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন তাঁর শিষ্যত্ব। বুদ্ধ প্রেম-মধুর বচনে বললেন—ভিক্ষু এসো, সকল দুঃখজ্বালার অবসানের জন্য ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হও। এটি হল কৌণ্ডিণ্যের দীক্ষামন্ত্র। তিনি ভিক্ষু হলেন। তারপর বুদ্ধ অবশিষ্ট চারজনকে শোনাতে লাগলেন নিরন্তর উপদেশ। সে উপদেশে তাঁদেরও অন্তর সত্যের আলোকে উদ্‌বুদ্ধ হল। তাঁরাও ভিক্ষু হলেন। এই পাঁচজন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু নামে বৌদ্ধ জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

আট

গভীর রাত্রি। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। প্রাসাদকক্ষে হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হল শ্রেষ্ঠী-পুত্র যশের। তিনি চোখ মেলে দেখলেন—মেঝের ওপর নর্তকীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। কারো চুল এলোমেলো, কারো মুখে লালা ফেনিয়ে উঠেছে, কারো কণ্ঠে ঘর্ঘর শব্দ হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে তাঁর ভোগবিমুখ মন সংসারের প্রতি আরও বিরক্ত হয়ে উঠল। তাঁর সামনেই যেন শ্মশানের শব পড়ে রয়েছে। টুটে গেল তাঁর মোহের ক্ষীণ আবরণ। তিনি জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে বাগানের দিকে চেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—উপদ্রব অত্যাচার! কথা দুটি রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ

সম্যক জীবিকা—অসদুপায় ও পাপবৃত্তি ত্যাগ করে সৎভাবে জীবন যাপন।

সম্যক বীর্য—মনে উদিত অশোভন ভাবকে বিদূরিত করার জন্য অনুৎপন্ন অশোভন ভাবের অনুৎপত্তির জন্য অনুৎপন্ন শোভন ভাবের উৎপত্তির জন্য এবং উদিত শোভন ভাবের শ্রীবৃদ্ধির জন্য উদ্যম বা প্রচেষ্টা।

সম্যক স্মৃতি—আত্ম-বিস্মৃতিকে বর্জন করে সদাজাগ্রত থাকা। দেহ, মন, অনুভূতি ও মানসিক বৃত্তির উপর স্মৃতিকে নিরন্তর নিবদ্ধ রাখা সাধনার একটি বিশেষ পন্থা। সেটিই সম্যক স্মৃতি।

সম্যক সমাধি—মনের সুসমাহিতভাব প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যানাদি ধ্যানস্তরে সমাধিস্থ হওয়া সম্যক সমাধি।

করে তাঁর কানেই বেজে উঠল। তখন প্রাসাদে কেউ জেগে নেই, প্রহরীরাও ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি আস্তে আস্তে ফটকের কাছে এলেন এবং দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন।

কোথা যাবেন কোনদিকে অগ্রসর হবেন কিছুই জানা নেই। শুধু তাঁর মনে হল চলতে হবে। তিনি চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ চলার পর তিনি নগর ছাড়িয়ে এসে পড়লেন প্রান্তরে। অন্ধকারাচ্ছন্ন সে প্রান্তরের সীমানা যেন মিশে গেছে তারা-খচিত আকাশের প্রান্তে। সেই দিকে চেয়ে তিনি আবেগে উচ্চারণ করলেন—উপদ্রব অত্যাচার! কথা দুটি যেন প্রান্তরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। অদূরে গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যেও যেন সেই কথা দুটি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। আকাশ বাতাস মথিত করে ঐ একই কথা তাঁর অন্তর্কর্ণকে অভিভূত করে দিল। তিনি অভিভূতভাবে চলতে চলতে এসে পড়লেন মৃগদায়ের পাশে। তখন অরুণিমার রক্তরাগ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশের পূর্ব প্রান্তে। তিনি আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—উপদ্রব অত্যাচার। সে মুহূর্তেই সান্ত্বনার সুরে যেন বাণী ভেসে এল—নাহি হেথা উপদ্রব নাহি অত্যাচার। এ বাণী তাঁর অন্তরে শান্তির স্পর্শ বুলিয়ে দিল। তিনি বুঝতে পারলেন না এ বাণী অন্তরের না বাইরের। কী অপূর্ব তার ব্যঞ্জনা! কি মধুর তার সুর! তার মর্মকোষে রয়েছে যেন তাঁর লক্ষ্যের ঠিকানা। তিনি ভাববিভোর হয়ে চোখ মুদলেন। আবার বাণী ভেসে এল—নাহি হেথা উপদ্রব, নাহি অত্যাচার। যশের যেন হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হল। তিনি চোখ মেলে দেখলেন—সম্মুখে দিব্য পুরুষ দাঁড়িয়ে। তাঁর অঙ্গে পীতবাস, মুখে মৃদু মৃদু হাসি। তাঁর দিব্য কান্তি যেন প্রভাতের আলো ম্লান করে দিয়েছে। তাঁর সত্তা যেন মহাশান্তির মহানন্দের মূর্ত প্রকাশ। তিনি সস্নেহে সম্বোধন করলেন যশকে। যশ অভিভূত হয়ে লুটে পড়লেন তাঁর পায়ে। যশের অন্তর ভরে গেল শান্তিতে তৃপ্তিতে। বুদ্ধ শোনালেন তাঁকে আর্যসত্যের উপদেশ। তাঁর অনাবিল চিত্ত অভিষিক্ত হল অমৃত-রসে। সত্যের উপলব্ধিতে খুলে গেল দৃষ্টির আবরণ। বুদ্ধ তাঁকে ভিক্ষুর দীক্ষামন্ত্রে বরণ করলেন।

যশের আকস্মিক অন্তর্ধানে তাঁর পিতা বারানসী-শ্রেষ্ঠীর বাসভবনে বজ্রপাত হল। শ্রেষ্ঠীর মহাসৌধে কান্নার রোল আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। তাঁর জননী একমাত্র পুত্রের অদর্শনে পাগলিনীর মত প্রলাপ বকতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রীর হৃদয় বিরহ-বেদনায় ভেঙ্গে পড়ল। চারিদিকে তাঁর

খোঁজ হতে লাগলো। শ্রেষ্ঠী দুঃসহ শোকে বেরিয়ে পড়লেন পুত্রের খোঁজে। পায়ে চলার পথ ধরে তিনি চললেন। অনভ্যস্ত ভ্রমণে তাঁর পদদ্বয় স্ফীত হয়ে উঠল ও দেহভার বহনে অক্ষম হল। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে তিনি একবার বসেন আবার চলেন। এভাবে তিনি দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মৃগদাবে এসে পৌঁছলেন। তপোবনে প্রবেশ করে তিনি বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন—একজন যুবক কি এদিকে এসেছে? বুদ্ধ উত্তর করলেন—হ্যাঁ, আপনি বসুন; তাকে এখানেই দেখতে পাবেন। শ্রেষ্ঠী উত্তর শুনে খুশী হলেন এবং বুদ্ধকে প্রণাম করে একান্তে বসলেন।

বুদ্ধ শুরু করলেন ধর্মালাপ। শ্রেষ্ঠী তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন। সে অপরূপ কথা তাঁর অন্তর মথিত করে ভাবলোক সৃষ্টি করল। তিনি ভাবে গদ্‌গদ হয়ে বলে উঠলেন—আহা! কি সুন্দর কথা! কি সুন্দর ভাব! আপনি সত্যকে অনাবৃত করলেন, আমাকে পথ দেখালেন, আলো বিতরণ করে চোখের অন্ধকার দূর করলেন, আমি আপনার শরণাগত হলাম, আপনার প্রবর্তিত ধর্মের ও প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করলাম। ইনিই সর্বপ্রথম ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। এজন্য ত্রিশরণগত প্রথম উপাসকরূপে এঁর নাম অমর হয়ে আছে ত্রিপিটকের পাতায়। এঁর পূর্বে তপস্সু ও ভল্লিক নামক বণিকদ্বয় গয়ার অরণ্যপথে বুদ্ধত্বলাভের সপ্ত সপ্তাহ পরে বুদ্ধ ও তৎপ্রবর্তিত ধর্মের শরণ নিয়ে দ্বিশরণগত উপাসক হয়েছিলেন। কারণ, তখনও সঙ্ঘের জন্ম হয়নি।

ধর্মকথার শেষে শ্রেষ্ঠী দেখলেন নিজের পলাতক পুত্রকে শ্রমণের বেশে। তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, অঙ্গে পীতবাস, মুখমণ্ডলে অপরূপ দীপ্তি। প্রথম দর্শনে শ্রেষ্ঠী অবাক্‌ হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—বাবা যশ, তোমার পলায়নে আমাদের কি অবস্থা হয়েছে, তা তুমি বেশ বুঝতে পারো; তোমার জননীর প্রাণদান করো। ভিক্ষু যশ একবার নির্বাক নয়নে বুদ্ধের পানে তাকালেন। বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীকে সম্বোধন করে বললেন—শেঠজী, যশ এখন জীবনের উন্নততম অবস্থা লাভ করেছে—সে এখন শুদ্ধ মুক্ত অর্হৎ তার অন্তরে কামনা বাসনা চিরনির্বাসিত, সে কি আবার সংসারী হয়ে সংসার ধর্ম পালন করতে পারবে? বুদ্ধের মুখে পুত্রের এ উন্নততম অবস্থার কথা শুনে উদ্বুদ্ধ পিতার অন্তর আনন্দে ভরে উঠল। তিনি আবেগে উচ্চারণ করলেন—যশের পরম সৌভাগ্য যে সে আজ এ অবস্থা লাভ করছে, তার জীবন ধন্য।

শ্রেষ্ঠী যশ সহ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর বাড়ীতে পরদিন আহার-গ্রহণের জন্য। যথাসময়ে বুদ্ধ যশের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন। যশের জননী

অধিনায়ক নদীকাশ্যপের শিষ্যসংখ্যা ছিল তিনশ এবং তৃতীয় আশ্রমের আচার্য গয়াকাশ্যপের দু'শ। এ অধিনায়কত্রয় ছিলেন তিন সহোদর। সারা মগধ দেশ জুড়ে ছিল এঁদের খ্যাতি। বুদ্ধ জ্যেষ্ঠ তাপসগুরু উরুবেল কাশ্যপের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। তাপসগুরু নিজেই অতিথি সেবার ভার গ্রহণ করলেন। এ নতুন অতিথির কথায় আচরণে তাঁর হৃদয় অভিভূত হল। অতিথির অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ দেখে তাঁর ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। তার মধ্যে তাপসগুরু পেলেন সত্যপথের নির্দেশ। তাঁর সংশয় ঘুচে গেল, তিনি বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে প্রার্থনা করলেন ভিক্ষুত্ব। বুদ্ধ বললেন—কাশ্যপ, তুমি তো তাপসসঙ্ঘের গুরু; তোমার বহুশিষ্য রয়েছে, তাদের মতামত একবার চাও। তাপসগুরু তখনি শিষ্যদের সমবেত করে বললেন—বৎসগণ, শ্রমণ গৌতম আমাকে পথের সন্ধান দিয়েছেন, আমি তাঁর চরণাশ্রয় করবো, তোমরা নিজেদের পথ দেখে নাও। তাঁরা বললেন—প্রভু, আপনার পথই তো আমাদের পথ, আমরাও আপনার অনুগামী হবো। বুদ্ধ সকলকেই ভিক্ষুত্বে দীক্ষা দিলেন। এ সংবাদ সমগ্র উরুবেলায় ছড়িয়ে পড়ল। অল্পদিনের মধ্যেই নদীকাশ্যপ ও গয়াকাশ্যপ সদলবলে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

বুদ্ধ এ নবদীক্ষিত শিষ্যবৃন্দ পরিবৃত হয়ে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘুরতে লাগলেন লোকের কল্যাণে। যেখানে তাঁরা উপস্থিত হলেন, সেস্থান লোকে লোকারণ্য হল। একসঙ্গে এত সন্ন্যাসীর আগমন লোককে কৌতূহলাক্রান্ত করল। বুদ্ধ তাদের শোনাতে লাগলেন শান্তির উপদেশ মৈত্রীর বাণী। তারা মুগ্ধ হয়ে তাঁর শরণগত হতে লাগলো। এভাবে নানাস্থান পরিভ্রমণ করে তিনি এসে পড়লেন গিরিপ্রাচীরবেষ্টিত রাজগৃহের সীমান্তে। তাঁর মনে জেগে উঠল সেদিনের স্মৃতি যেদিন তিনি গৃহত্যাগ করে প্রথম এসেছিলেন এ রাজগৃহের পাহাড়ের ধারে। কান্তিমান প্রিয়দর্শন তরুণের সন্ন্যাসীর বেশ দেখে লোক অবাক হয়ে তাঁর পশ্চাদনুসরণ করেছিল। এখানেই তিনি দ্বারে দ্বারে সংগৃহীত প্রথম ভিক্ষায় দুর্বার বমনেচ্ছা দমন করে আহার করেছিলেন। এ শান্ত সুদর্শন নবীন সন্ন্যাসীর আগমন-বার্তা শুনেই রাজা বিম্বিসার এসেছিলেন তাঁর কাছে এবং সাদরে আহ্বান করেছিলেন তাঁকে মগধের রাজপ্রাসাদে থাকবার জন্য। তিনি তাঁর উদার সংকল্পের কথা জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন রাজার কাছে।

বিদায় মুহূর্তে রাজা বলেছিলেন—আপনার সংকল্পসিদ্ধির পর আমায় দর্শন দান করবেন। তিনি রাজার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সিদ্ধিলাভ করে দর্শন-দানের জন্য। সেই প্রতিজ্ঞা পালনের দিন আজ সমাগত।

অতীত দিনের স্মৃতিজড়িত রাজগৃহ তাঁর কাছে স্বপ্নময় মনে হল। তার সমস্ত পরিবেশ নতুন অনুভূতি জাগালো। ছয় বৎসর আগে যে নবীন সন্ন্যাসী আপনার কমনীয়তায় রাজগৃহে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর কথা রাজগৃহবাসী জনসাধারণ এতদিন মনে রাখেনি। তা তাদের বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হয়েছে। কিন্তু শুধু একজন তা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি। তিনি হলেন মগধরাজ বিম্বিসার। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। সেই সন্ন্যাসীর বিরাট সম্ভাবনার কথা তাঁরই শান্ত সুন্দর মূর্তিতে প্রতিভাদীপ্ত ললাটে জ্যোতির অক্ষরে যে লেখা ছিল, তা রাজার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেই মহাজীবনের পূর্ণ বিকাশ দেখার সাধ ছিল বলে রাজা ভুলতে পারেননি তাঁকে।

যখন বুদ্ধের আগমনবার্তা রাজা বিম্বিসারের কাছে পৌছল, তখন তাঁর মনে আনন্দ উদ্বেল হয়ে উঠল। ভাবে ভক্তিতে গদগদ হয়ে তিনি বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলেন। বুদ্ধ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এত অভিভূত হলেন যে, তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্যে অবচ্ছেদ ঘটল। পরদিন রাজকার্য স্থগিত রেখে সপার্ষদ তিনি যাত্রা করলেন বুদ্ধ-দর্শনে। বুদ্ধচিন্তায় মন তাঁর বিভোর হয়ে রইল। যান চলাচলের পথ যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে এসে রাজপথ থামল। সারথি বিনীতভাবে বলল—মহারাজ, এখানে অবরোহণ করুন। সারথির বাক্যে রাজার যেন চৈতন্যোদয় হল। তিনি একবার তাকালেন, তারপর ধীরে ধীরে রথ হতে অবতরণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীদল তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। তিনি বাক্য ব্যয় না করে চলতে লাগলেন সংকীর্ণ পথ ধরে। রাজ-পরিষদ তার পশ্চাবর্তী হল। দেখতে দেখতে পশ্চাতের পথ জনাকীর্ণ হয়ে উঠল। রাজা কিছুদূর অগ্রসর হয়েই দেখতে পেলেন সেই সৌম্য সুদর্শন মহাসন্ন্যাসীকে যেন উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জ চারিদিক আলো করে আছেন। দেখে তাঁর হৃদয় কানায় কানায় ভরল। তিনি বিহ্বল মনে লুটে পড়লেন বুদ্ধের চরণে এবং ভাবাবেগে বললেন—আমার আশা আজ সফল হল।

বুদ্ধের পাশে তাপসগুরু কাশ্যপকে দেখে লোকের মধ্যে কলরোল উঠল—কে গুরু কে শিষ্য? লোকের সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য কাশ্যপ বুদ্ধকে প্রণাম

করে শান্ত মধুর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—ভগবান বুদ্ধ আমার গুরু, আমি তাঁর চরণাশ্রিত। সভা নিস্তব্ধ হল। কাশ্যপ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ভাবাবেগে বলতে লাগলেন—এঁরই চরণাশ্রয়ে আমি নিজের অন্তরের মাঝে খুঁজে পেয়েছি অনন্ত শান্তির নির্ঝর যাতে কলঙ্ক কালিমা নেই, কামনা বাসনার পীড়ন নেই, যা অক্ষয় শাশ্বত এবং নিজের সাধনায় লভ্য; তাই আমি তাপস ক্রিয়া ত্যাগ করে এঁর চরণাশ্রয় করেছি। এ উদার উক্তি শুনে জনতা বিস্ময়াভিভূত হল। বুদ্ধ শুরু করলেন ধর্মকথা। তা তাদের অন্তর মথিত করে গভীর হতে গভীরতর হয়ে চলল। চার আর্যসত্যের অপূর্ব বর্ণনা শুনতে শুনতে রাজার অন্তর্চক্ষুর আবরণ খসে পড়ল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন আর্যসত্যের মর্মার্থ।

ধর্মকথার অবসানে রাজা পরম পরিতৃপ্তি জানিয়ে বুদ্ধের শরণাগত হলেন। জনতা তাঁর অনুসরণ করল। তিনি পরদিনের জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘসহ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করলেন রাজপ্রাসাদে। বুদ্ধ নীরবে সম্মতি জানালেন। রাজার আদেশে সমস্ত পথ সুসজ্জিত হল। পথের শোভা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সকাল হতেই পথের দুধারে জনতা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। বুদ্ধ শিষ্যদের নিয়ে রাজপ্রসাদের দিকে যাত্রা করলেন সেই সুসজ্জিত পথে। তাঁর সর্বাঙ্গ ঘিরে যেন পবিত্রতার ঢেউ বইছে। তাঁকে যাঁরা অনুসরণ করে চলেছেন, তাঁদেরও চোখে মুখে ফুটেছে ধ্যানের দীপ্তি। তাঁরা নীরবে নিঃশব্দে মন্থর গতিতে জনতার মধ্য দিয়ে পথ বেয়ে চললেন। তাঁদের প্রতিপাদক্ষেপে যেন রয়েছে সংযমের সুষমা, একাগ্রতার ছাপ। লোক চোখ ভরে দেখতে লাগলো এ পবিত্র দৃশ্য। তাদের অন্তরে জাগলো এক দিব্য অনুভূতি।

বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘসহ রাজভবনে প্রবেশ করে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। আহার যখন সমাপ্ত হল, রাজা তাঁর সম্মুখে বসে বললেন—ভগবন, আপনি এ রাজগৃহেই অবস্থান করুন সকলের কল্যাণে, আপনার বাসের উপযুক্ত স্থান আমি নির্বাচন করেছি; আমার প্রশস্ত 'বেণুবন' উদ্যান লোকালয়ের বাইরে, তপস্যার উপযুক্ত স্থান অথচ আপনার দর্শনার্থী ভক্তদের পক্ষেও দূর নয়; এই উদ্যানটি আপনার ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করতে সংকল্প করেছি। এ কথা বলেই তিনি স্বর্ণভৃঙ্গার হাতে নিয়ে বেণুবন উদ্যান উৎসর্গ করলেন। এটিই ভারতের প্রথম সঙ্ঘারাম।

দশ

তখন রাজগৃহ যেমনি ছিল সমৃদ্ধিশালী নগর, তেমনি ছিল সাধু সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল। রাজগৃহের উপকণ্ঠে পূরণকাশ্যপ, ককুধ কাত্যায়ন, সঞ্জয় প্রভৃতি

ছয়জন প্রখ্যাত যশস্বী ধর্মগুরুর ছয়টি বিরাট আশ্রম ছিল। বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী এ আশ্রমসমূহে অবস্থান করতেন। বেণুবন বিহারের গোড়াপত্তন হয় ঠিক এই সময়ে। গণগুরু সঞ্জয়ের আশ্রমে তাঁকে আশ্রয় করে আড়াইশ সন্ন্যাসী বাস করতেন। শারীপুত্র ও মৌদ্‌গলায়ন তাঁর শিষ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা দুজন ছেলেবেলা থেকেই পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ।

"শারীপুত্র ও মৌদ্‌গলায়ন রাজগৃহের অনতিদূরে দুটি গ্রামের ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের দুই পরিবার পুরুষপরম্পরা থেকে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে পরিচয় হয়। দুজনেই পরস্পরের খেলার সাথী হন এবং এক গুরুগৃহে অধ্যয়ন করেন। এভাবে দু-জনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় অতি নিবিড়। তাঁরা পরস্পরকে না দেখে থাকতে পারেন না। অসাধারণ ধীশক্তি ও চরিত্র মহিমায় উভয়েই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। যখন কৈশোরের সীমা ছাড়িয়ে তাঁরা যৌবনে উপনীত হন, তখন তাঁদের মনের ভাবধারা যেন গতানুগতিকতা পরিহার করে নতুন পথ কেটে চলতে থাকে।

সেকালে উৎসব আমোদ ছিল সমাজ-জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। বিশেষ সময়ে এ উৎসব যখন ঘোষণা করা হত, তখন দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎসব চলত। নৃত্যে গীতে বাদ্যে কৌতুকে তা মুখরিত থাকত। এমন একটি উৎসবে তরুণ শারীপুত্র ও মৌদ্‌গলায়ন অভিনয় দেখতে দেখতে দুজনের মনে একই ভাবের উদয় হল। মানুষের জীবনের খেলাও একটি অভিনয় ছাড়া কিছুই নয়। এ অভিনয়ের মত দেখতে দেখতেই ফুরিয়ে যাবে জীবন যৌবন। রঙ্গরসের চিহ্নও রবে না কোথাও। তবে মানুষ কেন মত্ত হয়ে ছোটে অন্ধ আবেগে আলেয়ার পানে? জীবন কি শুধু অভিনয়, তার পেছনে কি কোন সত্য নেই? ছায়া শুধু ছায়া নয়, তার পেছনে আছে কায়া। তেমনি জীবনের পেছনেও আছে এক উজ্জ্বল সত্য। তাকে খুঁজতে হবে। যখন অভিনয়ে অপর দর্শনার্থীরা মেতে রইল, বাহবা দিতে লাগল, তখন এ দুই বন্ধুর মনে রঙ্গরসের বিপরীত দিকে ভাবের তরঙ্গ বইল। তাঁদের চোখের সম্মুখে যা অভিনীত হল, তার কিছুই তাঁরা জানলেন না।

অভিনয় শেষে দুজনে যখন পরস্পরের কাছে মনোভাব ব্যক্ত করলেন, তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন—সত্যকে খুঁজতে হবে। সংসারের বন্ধনের মাঝে সত্যের সন্ধান যে সুকঠিন, তা তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট হল। তাই তাঁরা সংকল্প করলেন—সংসারের নাগপাশ কেটে বেরিয়ে পড়বেন।" তাঁদের সংকল্প কার্যে পরিণত হতে বেশী দিন লাগলো না। তাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন সঞ্জয়কে

শুরু করে। গুরু মুগ্ধ হলেন তাঁদের আচারে নিষ্ঠায় ও অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিতে। সেখানে তাঁরা অল্পদিনের মধ্যেই আয়ত্ত করলেন গুরুর সকল বিদ্যা। তাঁদের মান সম্মান আদর আপ্যায়নের সীমা রইল না। এ সমস্ত তাঁদের নির্লিপ্ত মনে কোন দাগ কাটল না। যে সত্যের খোঁজে তাঁরা জীবনের সুখ-সম্ভোগ আরাম বিলাসকে পরিহার করে পথে বেরিয়েছেন, সে সত্যের কোন আভাস ইঙ্গিত না পেয়ে উদ্বেগের মধ্যে তাঁদের দিন কাটতে লাগলো। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস টলল না, উদ্যমে ভাটা পড়ল না। তাঁরা অন্তরের অন্তরে অনুভব করলেন সত্য আছে, তবে সত্যের পথাবলম্বনে হয়েছে তাঁদের ভুল, তার গোপন পথ আবিষ্কার করতে হবে। সন্ধানীর কাছে পথ অনাবিষ্কৃত থাকতে পারে না। সত্যের পথ আবিষ্কারের চিন্তা তাঁদের মন জুড়ে রইল।

পূর্বেই বলা হয়েছে রাজগৃহ সাধুসন্ন্যাসীদের মিলনকেন্দ্র। নানাস্থান হতে নানামতাবলম্বী সাধুসন্ন্যাসীরা এখানে আগমন করেন। সত্যসন্ধ শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সত্যদ্রষ্টার সন্ধানে এসব সন্ন্যাসীদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁরা পরস্পরকে কথা দিলেন—তাঁদের মধ্যে যিনি প্রথম সত্যোপলব্ধি করবেন, তিনি অপরকে বলে দেবেন তার পথ। একদিন পূর্বাহ্নে শারীপুত্র যখন প্রাত্যহিক সফরে বেরুলেন, তখন তিনি দেখলেন এক শান্ত সৌম্য সন্ন্যাসী ধীর পদক্ষেপে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে রাজগৃহের পল্লীতে প্রবেশ করছেন। তাঁর মুখমণ্ডলে গভীর প্রশান্তি, ললাটে ধ্যানের দীপ্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে সংযম লীলায়িত। প্রথম দর্শনেই শারীপুত্র মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন—এ দিব্য পুরুষ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসম্পন্ন, তাঁর সত্তা অমৃতের অনাবিল হ্রদে স্নাত, তিনি বলে দিতে পারবেন সত্যের গোপন পথ। সে সন্ন্যাসীকে তিনি অনুসরণ করতে লাগলেন। সন্ন্যাসী যখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা গ্রহণ করে পল্লীর সীমা ছাড়িয়ে এলেন, শারীপুত্র সম্ভ্রমের সহিত তাঁর পাশে দাঁড়ালেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—সৌম্য, আপনি কে, কার কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, কে আপনার গুরু? নবীন ভিক্ষু অশ্বজিৎ মৃদু হেসে শান্ত মধুর বচনে বললেন—শাক্যপুত্র মহাশ্রমণ বুদ্ধ আমার গুরু, আমি তাঁর চরণে নিজেকে নিবেদন করেছি। শারীপুত্র আবার জিজ্ঞেস করলেন—আপনার গুরুর মতবাদ কি, তিনি কি বলেন?

ভিক্ষু অশ্বজিৎ—বন্ধু, আমি তাঁর নব দীক্ষিত শিষ্য। তাঁর ধর্মমত বিস্তৃতভাবে আপনাকে বুঝিয়ে বলবার শক্তি আমার নেই, তবে দু-একটি কথা বলতে পারি।

শারীপুত্র—অত বিস্তার করে না-ই বা বললেন, সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলুন। আমি শুধু সার কথাই শুনতে চাই।

ভিক্ষু অশ্বজিৎ—তবে শুনুন, যে ধর্মসমূহ হেতু হতে উৎপন্ন হয়, আমার গুরু সে ধর্মসমূহের হেতু নির্দেশ করেছেন। তিনি সে হেতুর নিরোধ এবং নিরোধের পন্থাও ব্যক্ত করেছেন।

তীক্ষ্ণধী শারীপুত্র এ সংক্ষিপ্ত কথার গভীর মর্ম নিমেষে বুঝতে পারলেন। তাঁর চোখ খুলে গেল, পথ পরিষ্কার হল। তিনি ভাবাবেগে উচ্চারণ করলেন—যদিও সামান্যমাত্র আভাস পেলাম, এই তো পথ যার সন্ধানে বহুকাল ক্ষয় করেছি। তিনি ভিক্ষুর নিকট বিনীতভাবে বিদায় গ্রহণ করে তখনি গেলেন বন্ধুর কাছে। তাঁর প্রফুল্ল মুখ দেখেই মৌদ্গলায়ন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—সৌম্য, সুখবর এনেছেন কি? শারীপুত্র নীরবে মাথা নাড়লেন। তারপর তিনি আদ্যোপান্ত খুলে বললেন। মৌদ্গলায়ন তদগত চিত্তে শুনতে লাগলেন সে কাহিনী। শুনতে শুনতেই তাঁর মনে জাগলো এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। নয়নের অন্ধকার বিদূরিত হল। চিরসঞ্চিত সত্যের পথ আবিষ্কৃত হয়ে গেল। তাঁর কণ্ঠেও ভাবোচ্ছ্বাসে বাণী উত্থিত হল—যদিও সামান্যমাত্র আভাস পেলাম, এই তো সত্যের পথ যাঁর সন্ধানে বহুকাল ক্ষয় করেছি।

এরপর তাঁরা দু-জনে সংকল্প করলেন—বুদ্ধের কাছে যাবেন, তাঁর চরণাশ্রয় করবেন। তাঁরা গুরুকে তাঁদের সংকল্প জানিয়ে বললেন—ভদন্ত, আমরা ভগবান গৌতমের শিষ্যের পবিত্র সংস্পর্শে পথের সন্ধান পেয়েছি, এখন হতে ভগবান গৌতমেরই চরণাশ্রয় করে সাধনার পথে এগিয়ে যেতে চাই, তাঁকে আমরা গুরু বরণ করব। আপনিও চলুন তাঁর কাছে, জীবন সার্থক হবে। এ প্রস্তাব শুনে গুরু সঞ্জয় বজ্রাহতের মত কিছুক্ষণ স্তব্ধ রইলেন, পরে বললেন—বৎসগণ, গৌতমের কাছে যাওয়া আমার পক্ষে উচ্ছিষ্ট ভোজনের মত নিন্দনীয়. তোমাদেরও ওখানে গিয়ে কি হবে, এখানেই থাকো, আমার শিষ্যসঙ্ঘের ভার তোমরাই গ্রহণ কর। তাঁরা আবার তাঁদের উদ্দেশ্য তাঁকে বুঝিয়ে বলে বিদায় চাইলেন। কিন্তু তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করে সঞ্জয় একই কথা বলতে লাগলেন। তাঁরা আর অনুমতির অপেক্ষা না করে আশ্রম ত্যাগ করলেন। সঞ্জয়ের সমগ্র শিষ্যমণ্ডলী আশ্রম শূন্য করে তাঁদের অনুসরণ করলেন।

ভগবান দূর থেকেই দেখতে পেলেন বহু সংখ্যক পরিব্রাজক বিহার লক্ষ্য করে আসছেন। তাঁদের আলাপগুঞ্জনে পথ মুখরিত। যে দুজন তরুণ

জ্যোতির্ময়। দেখে যশোধরার চোখ ছল ছল করে উঠল। রাহুলকে তিনি বুকের কাছে টেনে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলেন—বাবা! রাহুল কৌতূহল ভরে রাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করল, দেখল অনেক সন্ন্যাসী জনতার মধ্য দিয়ে চলেছেন। সন্ন্যাসী-নায়কের ওপর দৃষ্টিপাত পড়তেই তার ক্ষুদ্র হৃদয় যেন কিসের আকর্ষণে উদ্বেলিত হয়ে উঠল, দৃষ্টি নিশ্চল রইল, মুখের ভাষা থেমে গেল। যশোধরা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—উনিই তোমার বাবা। রাহুল সেই মুহূর্তেই সিংহ-শাবকের মত নির্ভীকভাবে প্রাসাদ হতে নেমে গেল। নামবার সময় তার মা তাকে ডেকে বললেন—তোমার পিতৃধন চেয়ে নিও। কথাটি রাহুলের কানে গেল, সে ফিরে চাইল না। একেবারেই বুদ্ধের পাশে গিয়ে তাঁর হাত ধরে দাঁড়াল, বলল—বাবা, তোমার ছায়া বড় মধুর। বুদ্ধ স্নেহার্দ্র নেত্রে তার পানে তাকালেন। সে দৃষ্টি তাঁর অন্তরের গভীর তল পর্যন্ত দেখিয়ে দিল। যারা এ দৃশ্য দেখল, তারা চোখের জল রাখতে পারল না। কি যেন উচ্চারণ করতে গিয়ে রাহুলের মুখের ভাষা থেমে গেল। চারদিকের জনতার নিঃশব্দ দৃষ্টির মাঝে অনেকক্ষণ মৌন থেকে সে এবার নীরবতা ভঙ্গ করে বলল—বাবা, আমার পিতৃধন আমায় দাও। 'বুদ্ধ বললেন—পিতৃধন তো তুমি পাবেই।

রাহুলের হাত ধরে বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘসহ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। দীর্ঘকালের পর পুত্রকে দেখে রাজা শুদ্ধোদনের আনন্দাশ্রু উদ্‌গত হল। রাজার আত্মীয়-বন্ধুগণ দাসদাসী পরিজন এসে ভিড় করল বুদ্ধকে দেখার জন্য, কিন্তু এলেন না সেখানে বুদ্ধের গৃহিজীবনের সহধর্মিণী শাক্যবধূ যশোধরা। অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে এ নিয়ে উঠল কলরব। তাঁরা দল বেঁধে গেলেন যশোধরার কাছে। বললেন—এসো, বুদ্ধকে দেখে যাও। তখন তাঁর দু'গণ্ড প্লাবিত করে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি শুধু নীরবে মাথা নাড়লেন। তাঁরা তাঁকে হাত ধরে অনুরোধ করলেন, তখন তিনি শুধু বললেন—যদি আমার সতীধর্মের সার্থকতা থাকে, আমার ব্রতপালন যদি সত্যি হয়, তবে বুদ্ধ নিজে এসে আমায় দেখা দেবেন। তাঁর কথায় সকলেই স্তব্ধ হলেন। অবশেষে বুদ্ধ তাঁর ঘরে গিয়ে নিজেই উপস্থিত হলেন। যশোধরা বুদ্ধের পদতলে মাথা লুটিয়ে দিলেন। নীরব অশ্রুধারায় পদদ্বয় ধৌত হয়ে গেল। এ করুণ দৃশ্য দেখে কারো চোখ শুষ্ক রইল না। রাজা শুদ্ধোধন পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন—বৎস, যেদিন তুমি গৃহত্যাগ করে চলে গেলে, সেদিন থেকেই বৌমা সংসারত্যাগিনীর বেশ নিয়ে সকল ত্যাগ করে তোমার পথ অনুসরণ করে

আসছে; তাঁর ত্যাগ ও কঠিন ব্রত নারীজীবনের উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে থাকবে।

রাজা ভেবেছিলেন তাঁর পুত্র আপনার শিষ্যদের নিয়ে রাজপ্রাসাদেই আহার গ্রহণ করবেন। কিন্তু তিনি যখন শুনলেন, বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে কপিলাবাস্তুর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করছেন, তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন, তখন লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে ম্রিয়মান হয়ে রাজা বেরিয়ে এলেন রাজপথে, পার্ষদবর্গ ছুটলেন তাঁর পেছনে। তিনি ভিক্ষারত বুদ্ধের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন—বৎস, তুমি আমার পুত্র হয়ে আমার রাজধানীতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে আমায় অপমান করছ কেন, আমি কি তোমাদের আহারের ব্যবস্থা করিনি? শান্ত কণ্ঠে বুদ্ধ উত্তর করলেন—বাবা, ভিক্ষা করে আমি কুলাচার রক্ষা করছি। রাজা উত্তর শুনে অধিকতর উত্তেজিত হয়ে বললেন—বৎস, তুমি বলছ কি, শাক্যকুলের এরকম অপবাদ দেবার স্পর্ধা কার আছে, আমাদের চৌদ্দপুরুষে এরকম ঘটনা কখনো ঘটেনি, ভিক্ষা—শাক্যদের কুলাচার! বুদ্ধ রাজাকে বুঝিয়ে বললেন—তাঁর বংশ শাক্যবংশ নয় যা তাঁর দেহমাত্রকে দাবী করতে পারে, তিনি যে কুলের অন্তর্গত, সেটি নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধকুল—ভিক্ষা তাঁদের জীবিকা, তরুতল বনগুহা তাঁদের আশ্রয়স্থল, সেই চিরাচরিত প্রথাই তিনি অনুসরণ করছেন ভিক্ষায় বেরিয়ে। তাঁর উত্তরে রাজা নীরব হলেন।

বুদ্ধ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে আশ্রমের দিকে ফিরলেন। সঙ্গে চলল রাহুল। সে আজ কড়াক্রান্তি হিসাব করে পিতৃধন আদায় করে নেবে। পেছনে পড়ে রইল রাজ্যসম্পদ, বন্ধু-পরিজন, জননী, পিতামহী ও বৃদ্ধ পিতামহ। এ পিতামহকে সে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে ভাবত। তার পিতার গৃহত্যাগের পর হতে এ পিতামহই অন্তরের সমস্ত স্নেহ তার ওপরে ঢেলে দিয়ে তার চিরসহচর হয়ে রয়েছেন। আজ সে পিতামহের স্নেহাতুর বুকে শেল বিদ্ধ করে সে যে পিতার পদানুসরণ করছে, তা রাহুল ভাবতেই পারল না। তবুও অজানা কারণে তার মনের কোণে বেদনা সঞ্চিত হতে লাগলো। পিতৃধন লাভের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা তাকে এমনিভাবে অভিভূত করেছিল যে সে বেদনা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তার ছিল না।

সম্মুখে বিস্তীর্ণ মাঠ। তার বুকের উপর দিয়ে একটি সংকীর্ণ পথ এঁকে বেঁকে দূর দিগন্তে মিশে গেছে। তখন আকাশ উঠন্ত সূর্যের আভায় স্বচ্ছ দর্পণের মত উজ্জ্বল। পিতাপুত্র ভিক্ষুসঙ্ঘের পুরোভাগে পথ বেয়ে চললেন। দুধারে

শস্যক্ষেত্রের বিশাল বিস্তার তাঁদের পীতবসনের আভায় যেন আরও অপরূপ সৌন্দর্য ধারণ করেছে। রাহুলের মনে পড়ল পিতামহের কথা। তাঁকে তো সঙ্গে আনতে পারত, তবে কেন আনল না? মনে ছিল না, এমন কি সে পিতামহের অনুমতিও গ্রহণ করেনি। কেন আজ এত বড ভুল হল, তার কারণ সে খুঁজে পেল না। আজ সে কিসের মায়ামন্ত্রে পিতামহকে ভুলে একা পিতৃধনের সন্ধানে চলেছে? এ সমস্ত ভাবতে ভাবতে সে অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলতে লাগলো। হঠাৎ বুদ্ধ ডাকলেন—রাহুল। সে প্রথম চিন্তাসূত্র হারিয়ে থতমত খেয়ে গেল, পরে বলল—বাবা। 'ঐ দেখ আমাদের বাসস্থান।' রাহুল চেয়ে দেখল সেখানে বড় বড় বটগাছ জটলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; তারা যেন নীরব দৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে আছে। কাছে কোন লোকালয় নেই। শুধু বন সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত শ্যামলতার ঢেউ তুলে চলেছে। মাঝে মাঝে আশ্রমের কুটিরগুলি যেন যোগীর সাধনায় তন্ময় হয়ে আছে। ভিক্ষুগণ আপন আপন কুটিরে চলে গেলেন। বুদ্ধ রাহুলকে একটি কুটিরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের আবাসে প্রবেশ করলেন। রাহুল এ অপরিচিত তপোবন ও নিজেদের রাজপ্রাসাদের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য অনুভব করল, তবুও আশ্রমটাকে শ্রীহীন মনে হল না। এর মাঝে কোথাও যেন সামঞ্জস্য রয়েছে। নিস্তব্ধতার ভিতর যেন ভাষা ফুটেছে, প্রকৃতি যেন এখানে প্রাণবন্ত। তবুও যেন তাঁর অন্তরটা কেঁদে উঠল। আবার মনে পড়ল পিতৃধনের কথা। সে পিতৃধনের আশায় শান্ত বালকের মত বসে রইল। আজ তার কোথাও বালসুলভ চপলতা নেই। আশ্রমের আবহাওয়ায় তার জীবন বদলে গিয়েছে— সে যেন ক্ষণকাল পূর্বের সে রাহুল নয়, সে এখন গোপন ধনের সন্ধানী যতি।

আহারের পর শ্রমণগণ দিবাবিহারে চলে গেলেন। রাহুল একটি বটগাছের ছায়ায় গিয়ে বসল। ক্রমে মধ্যাহ্ন বেলা সায়াহ্নের কোলে গড়িয়ে পড়ল। বুদ্ধ আপনার আবাস হতে প্রাঙ্গণে এসে রাহুলের সম্মুখে আসন গ্রহণ করে চোখ মুদলেন। রাহুল তাঁর ধ্যানগম্ভীর মুখের পানে চেয়ে রইল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল। পাখীর কলকূজন থেমে গেল। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। বুদ্ধ হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে ডাকলেন—রাহুল। এ ধ্বনি তপোবনে অপূর্ব সঙ্গীতের মত বেজে উঠল। তার মাধুর্য যেন অনন্ত কালের জন্য তপোবনের বুকে সঞ্চিত হয়ে গেল। রাহুল উত্তর করল না, শুধু নীরবে মুখপানে তাকাল। বুদ্ধ তাকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি পিতৃধন চাও? রাহুল উত্তর করল—হাঁ। বুদ্ধ বললেন—বৎস, যদিও পৃথিবীর

তিলমাত্র জায়গায় আমার অধিকার নেই, তবুও আমি নির্ধন নই; বহু কল্পের সাধনায় যে ধন আমি অন্তরে সঞ্চিত করেছি এবং জগতে যা বিতরণ করছি, তোমাকে সেই ধনে ধনী করতে চাই। রাহুল মৃদুকণ্ঠে বলল—তাই আমায় দিন। 'তবে তুমি এ বেশ নিয়ে আমার মত সন্ন্যাসী হও। রাজৈশ্বর্যের মধ্যে তোমার পিতৃধনের সন্ধান মিলবে না।' রাহুল বলল—তাই হোক।

বার

রাহুলের দীক্ষার কথা সমগ্র কপিলবাস্তুতে ছড়িয়ে পড়ল। রাজা শুদ্ধোদনের অন্তঃপুরে কান্নার রোল উঠল। যশোধরার বুক শূন্য হল। যে একমাত্র পুত্র স্বামীর শোকে ছিল তাঁর সান্ত্বনা, সে পুত্রের সংসারত্যাগে তাঁর হৃদয় একেবারে ভেঙে পড়ল। পিতা পুত্রকে নিয়ে গেছেন নিজের কাছে, কিন্তু তাঁর ঠাঁই তো হল না সন্ন্যাসী স্বামীর পায়ে। নারী বলে কি তাঁর এত লাঞ্ছনা! তিনি মহাপুরুষের সহধর্মিণী—দুঃখই তো তাঁর জীবনের অলঙ্কার। এই দুঃখের ভিতর দিয়ে একদিন ফুটে উঠবে তাঁর জীবনের মহিমা। স্বামীর সত্যিকার সহধর্মিণী তিনি হবেন। সেই দিনের প্রতীক্ষায় তাঁকে এ দুঃখের পসরা বইতে হবে। কত কথা ভাবেন, কিন্তু যশোধরার মন সান্ত্বনা পায় না। পুত্রবধূর মুখের পানে চেয়ে রাজার শোকের বাঁধ ভেঙে পড়ল। তিনি বালকের মত কাঁদতে লাগলেন। দুঃসহ ব্যথা বুকে চেপে সেদিনই তিনি গেলেন বুদ্ধের কাছে তাঁকে বললেন—বৎস, সন্তানহারা জনকজননীর ব্যথা আমি জানি, তাই তোমায় বলতে এসেছি—মাতাপিতার অনুমতি না নিয়ে কোন ছেলেকে সন্ন্যাসী করে নিও না, বৃদ্ধের একথাটি রেখো। বুদ্ধ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—বাবা, আপনার এ কথা পালন করতে অঙ্গীকার করছি, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর হবে না। তখনি তিনি শিষ্যদের সমবেত করে ঘোষণা করলেন—ভিক্ষুগণ মাতাপিতার বিনা অনুমতিতে কাউকে ভিক্ষু করবে না। সেই থেকে এ নিষেধ বাক্য বিনয়ের একটি বিধিতে পরিণত হল। এখনও তা প্রতিপালিত হয় বৌদ্ধ সঙ্ঘে।

রাহুলের দীক্ষার পর থেকে শাক্যদের মধ্যে সন্ন্যাস-গ্রহণের হিড়িক পড়ে গেল। বহু শাক্য-সন্তান বুদ্ধের উপদেশে মুগ্ধ হয়ে সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু হলেন। এখানে তাঁর ধর্মপ্রচারের ফলে নৈতিক আবহাওয়ার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হল। তাঁর শিষ্য সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেল। তিনি সদলবলে কপিলবাস্তু ত্যাগ করলেন। তখন তাঁর নিকট আত্মীয় মহানাম সংকল্প করলেন তিনি

মনে হল পিছন থেকে কে যেন তাকে ডেকে বলছে "ফিরো"। সে ফিরে তাকিয়ে দেখল—কোথাও কোন জনমানব নেই। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে পাখীর ডাক সে নিস্তব্ধতাকে আরও নিবিড় করে তুলছিল। বনের এ নিবিড়তার মধ্যে সে কথাটি যেন বার বার তার কানে বাজতে লাগলো। তার মন প্রাণ অভিভূত হয়ে গেল। সেখানেই সে লব্ধ মণিমুক্তার আভরণ লোষ্ট্রের মত নিক্ষেপ করে তার মনিবদের পথ অনুসরণ করল। তাকে এমনি উদাসভাবে ফিরতে দেখে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। উপালি সমস্ত খুলে বলল—তার সাধু উদ্দেশ্যের প্রশংসা করে তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে তাঁরা মল্লদের অনুপিয় আম্রকাননে পৌছলেন। বুদ্ধ তাঁদের সস্নেহ মধুর বচনে আহ্বান করলেন। তাঁরা তাঁর চরণে প্রণত হয়ে তাঁদের সংকল্প জানালেন।

শাক্যবংশের লোকেরা আভিজাত্যাভিমানের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। বংশগত এ সংস্কার হতে ভদ্দিয় ও তাঁর বন্ধু অনিরুদ্ধ প্রভৃতি শাক্যকুমারগণ মুক্ত নন। নাপিত উপালির প্রতি তাঁদের মনোভাব সহজেই অনুমেয়। ভিক্ষু-সঙ্ঘে ধনী দরিদ্র পণ্ডিত-মূর্খ ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সবার সমানাধিকার। সেখানে জাতিগত বা শ্রেণীগত কোন ভেদ নেই। তাঁদের জ্যেষ্ঠতার বিচার দীক্ষার তারিখ নিয়েই। বুদ্ধ শাক্যকুমারদের আভিজাত্যের অহঙ্কারে ঘা দেবার জন্য প্রথমে উপালিকেই দীক্ষা দিলেন। অতঃপর অনিরুদ্ধ প্রমুখ শাক্যকুমারগণ দীক্ষিত হয়ে তাঁদের আভিজাত্যাভিমান ত্যাগ করে পূর্বদীক্ষিত উপালিকে প্রণাম করলেন; এবং সঙ্ঘের নিয়মানুসারে তাঁকে জ্যেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নিলেন। উত্তরকালে উপালি আপনার প্রতিভাবলে ও অধ্যাত্মসিদ্ধির প্রভাবে সঙ্ঘে শ্রেষ্ঠ বিনয়ধরের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন এবং বৌদ্ধজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন প্রথম সঙ্গীতির অন্যতম অধিনায়করূপে।

ভদ্দিয় অনিচ্ছায় শুধু প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য ভিক্ষু হয়েছিলেন বটে, কিন্তু বুদ্ধের সান্নিধ্যে এসে তাঁর জীবন সম্পূর্ণ বদলে গেল। তাঁর পূর্ব জীবন তাঁর কাছে স্মৃতি মাত্রে পর্যবসিত হল। শ্রদ্ধায়, নিষ্ঠায়, ভাবে, পবিত্রতায় তাঁর ভিক্ষুজীবন সার্থকতায় ভরে উঠল। সাধনমার্গে তাঁর আলোকোন্মুখ মন সাবলীলভাবে অগ্রসর হতে লাগলো। তিনি অল্পকালের মধ্যেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে অর্হৎ বা মুক্ত পুরুষ হলেন। সেই থেকে সকল সময় সকল স্থানে তিনি ভাবাবেশে উচ্চারণ করতেন—অহো সুখং অর্থাৎ আহা কি আনন্দ। তাঁর মুখে স্বতঃ উদ্গত এ বাণী ভিক্ষুদের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। কেউ

কেউ বলতে লাগলেন—আয়ুষ্মান ভদ্দিয় অনভিরতভাবে অনিচ্ছায় ভিক্ষুজীবন যাপন করছেন, তিনি রাজ্যসুখ ভুলতে পারেননি। সেই সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে স্মরণ করে অনুতাপদগ্ধ হচ্ছেন। ভিক্ষুদের এ ভুল ধারণার কথা বুদ্ধের কানে পৌঁছল। তাঁদের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য তিনি তাঁদের সম্মুখেই ভদ্দিয়কে জিজ্ঞেস করলেন—ভদ্দিয়, তুমি না কি সকল সময় সকল স্থানে 'অহো সুখং' বলে থাক? ভদ্দিয় উত্তর করলেন—হাঁ, ভদন্ত। বুদ্ধ আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—কেন তা কর? উত্তরে তিনি বললেন—ভদন্ত, আমি যখন রাজা ছিলাম, তখন রাজসভায় কি অন্তঃপুরে কি বাইরে সব সময় প্রহরীবেষ্টিত হয়ে থাকতাম, আমার আরক্ষার কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তবুও ভয় ভাবনায় কুণ্ঠিত হয়ে থাকতাম, উদ্বেগ অশান্তির মধ্যে দিন কাটাতাম, এখন আমার সে প্রহরী নেই, সে রক্ষার ব্যবস্থা নেই, তবুও আমি অনুদ্বিগ্ন অকুণ্ঠিত ভয়মুক্ত, এখন গভীর অরণ্যে নির্জন গিরিগুহায় সঙ্ঘারামে যেখানে আমি থাকি না কেন, কখনও মনে ভয় জাগে না উদ্বেগ আসে না, শান্তিতে আনন্দে আমাব মন মগ্ন হয়ে থাকে। তাই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে 'অহো সুখং'। এ উত্তর শুনে সকলেই স্তব্ধ হলেন।

ভের

কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী ছিল সে যুগের এক সমৃদ্ধিশালী নগর। হরিবংশ পুরাণের মতে রাজা যবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্তই এ নগরের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁরই নামানুসারে এর নাম হয় শ্রাবস্তী। কোশলের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবস্তীর সমৃদ্ধিও চরম শিখরে পৌঁছে। শ্রাবস্তীতে বহু শ্রেষ্ঠীর বাস ছিল। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠী সুদত্ত (যিনি পরবর্তীকালে অনাথপিণ্ডদ নামে খ্যাত হয়েছিলেন) আপনার গুণ-গরিমায় ও দান-মহিমায় সমগ্র কোশল রাজ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি কার্যপ্রসঙ্গে গিয়েছিলেন রাজগৃহে ভগ্নীপতির বাড়ীতে। তখন সে বাড়ীতে চলছিল বিরাট আয়োজন। তাঁর ভগ্নীপতি অত্যন্ত ব্যস্ত, এতটুকু ফুরসৎ সেই তাঁর। লোকজনের ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে বাড়ীটি গম গম করছিল। শ্রেষ্ঠী সুদত্ত ভাবলেন—তাঁর ভগ্নীপতির বাড়ীতে কোন বড় যজ্ঞ হবে অথবা রাজা বিম্বিসার রাজ-পারিষদ সহ আসবেন, তাই এত আয়োজন। সুদত্ত যেখানে বসেছিলেন, সেখানেই বসে রইলেন, কেউ তাঁর অভ্যর্থনা করল না, কেউ কাছে এল না। চিরাচরিত আতিথেয়তার অভাব লক্ষ্য করে তিনি একটু অবাক হলেন।

বাড়ীর কর্তা যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে তাঁর পাশে এসে বসলেন, তখন তিনি

কুশলবাদের পর ভগ্নীপতিকে জিজ্ঞেস করলেন—কি হে তুমি কি রাজা বিম্বিসারকে নিমন্ত্রণ করেছ না তোমার বাড়ীতে কোন বড় যজ্ঞ হচ্ছে এত আয়োজন কেন? উত্তরে বাড়ীর কর্তা বললেন—না শেঠ, আমার বাড়ীতে কোন যাগযজ্ঞ হচ্ছে না, আমি রাজাকেও নিমন্ত্রণ করিনি, তবে শাক্যমুনি বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবেন। 'বুদ্ধ' শব্দটি শোনা মাত্রই শ্রেষ্ঠী সুদত্ত যেন কেমন হয়ে গেলেন। সে কথাটি শুধু তাঁর কানে নয়, প্রাণে গিয়ে পৌঁছল। তিনি উতলা হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি বললে কি 'বুদ্ধ'? কর্তা উত্তর দিলেন হ্যাঁ। সুদত্ত ভাবাবেগে উচ্চারণ করলেন—বুদ্ধ! বুদ্ধ! বুদ্ধ! আহা কি মধুর বুলি! বলতে বলতে তাঁর সমগ্র সত্তা অভিভূত হয়ে পড়ল। পুলকে শরীর শিউরে উঠল। তখন সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হয়ে চারিদিক ঢেকে ফেলেছে। আকাশে অগণিত তারা যেন অন্ধকারের শিয়রে জেগে অন্ধকারকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। নগরের কলকোলাহল মন্দভূত হয়ে আসছে। সুদত্ত আকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন—এখন কি বুদ্ধের দর্শন পেতে পারি? গৃহকর্তা বাধা দিয়ে বললেন—এখন তাঁর সাক্ষাতের উপযুক্ত সময় নয়, এখন তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন; তারপর তিনি লোকালয়ের বাইরে দূর বনভূমিতে থাকেন, এতরাত্রে বনের ভিতর দিয়ে যাতায়াত নিরাপদ হবে না, কাল সকালেই তাঁর দর্শন পাবে।

বুদ্ধ-দর্শনের আশায় আবেগে তিনি এত অভিভূত হয়েছিলেন যে সারারাত্রি তাঁর চোখে ঘুম এল না। তিনি উঠে বসে শুয়ে কখন প্রভাত হবে, তাই ভাবতে লাগলেন। সে রাত্রিকে তাঁর দীর্ঘতর মনে হল। বার বার জানালার ফাঁক দিয়ে প্রভাত হচ্ছে কিনা দেখতে লাগলেন। রাত্রির শেষ প্রহরে তাঁর শ্রান্ত শরীর ঘুমে ঢলে পড়ল। তিনি স্বপ্নে দেখলেন—আকাশে অনন্ত শূন্যে এক বিরাট জ্যোতিপুঞ্জ ফুটে উঠেছে, চারিদিক আলোয় ঝলমল করছে; তার মধ্য হতে এক দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন এবং স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন 'এসো সুদত্ত'। হঠাৎ শ্রেষ্ঠীর নিদ্রাভঙ্গ হল। তিনি ধড়মড় করে উঠে পড়লেন। তাঁর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। তিনি জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলেন পূর্বাকাশে উষার রক্তিম রাগ ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি দ্বার খুলে বেড়িয়ে পড়লেন। তখনও সমস্ত নগর নিস্তব্ধ, পথে দীপগুলি জ্বলছে এবং নগরদ্বার রুদ্ধ। তাঁকে দেখে দ্বারপাল সসম্ভ্রমে দ্বার খুলে দিল। বেরিয়েই তিনি দ্রুতপদে পথ চলতে লাগলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন

বনপথে এসে তাঁর মনে ভয়ের সঞ্চার হল। দু এক পা এগিয়ে তিনি থামলেন, আবার সাহস করে চললেন। এ ভাবে থেমে চলে তিনি প্রত্যুষেই শীতবনে পৌছলেন। চারিদিক বনাচ্ছন্ন, পাহাড়ের গায়ে তরুলতার অনন্ত বিস্তার মেলে ধরেছে তার শ্যামল শোভা। তার পাদদেশে বয়ে চলেছে মন্দস্রোতা পার্বত্যধারা। অদূরে শিশিরসিক্ত উন্মুক্ত আকাশতলে বুদ্ধ পায়চারি করছিলেন এবং দূর হতে শ্রেষ্ঠীকে দেখে 'এসো, সুদত্ত' বলে আহ্বান করলেন। সে আহ্বানে শ্রেষ্ঠীর ব্যাকুল দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বুদ্ধের ওপর। তার জ্যোতির্ময় মূর্তি মুখের শান্ত সৌন্দর্য করুণাস্নিগ্ধ চাহনি শ্রেষ্ঠীকে একেবারে অভিভূত করল। তিনি ভাববিহ্বল হয়ে বুদ্ধের চরণে লুটে পড়লেন। তাঁর মনপ্রাণ ভরে গেল। তখন ছিল শীতকাল। পাহাড়ের হিমেল হাওয়া গায়ের রক্ত হিম করে বয়েছিল। বুদ্ধের গায়ে ছিল শুধু একখানি উত্তরীয়। তিনি কি ভাবে রাত্রি যাপন করলেন ভেবে শ্রেষ্ঠী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ভদন্ত, এ কনকনে ঠাণ্ডায় আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটেনি তো? উত্তরে ভগবান বললেন—

"সব্বদা বে সুখং সেতি
ব্রাহ্মণো পরিনিব্বুতো
যো ন লিম্পতি কামেসু
সীতিভূতো নিরুপধি।"

ভাবানুবাদ—
কামনার বহ্নিজ্বালা নিভিয়াছে যার
অন্তরেতে অনাবিল শান্তি পারাবার
তরঙ্গিত নিরন্তর, ব্রাহ্মণ সেজন
করেন সকল কালে সুখেতে শয়ন।

তারপর বুদ্ধ সুদত্তের চিত্তের অনুকূল ধর্মালাপ সুরু করলেন। তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে তার ধর্মচক্ষু উন্মীলিত হয়ে গেল। তাঁর সকল সংশয়ের নিরসন হল। বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে তিনি ত্রিশরণ গ্রহণ করলেন এবং পরবর্তী দিনের জন্য শিষ্য সহ তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আত্মীয়ের গৃহে ফিরলেন। তাঁর আত্মীয় সে নিমন্ত্রণের কথা শুনে বললেন—ভাই, তুমি আমার অতিথি, আমি সকলভাবে তোমার শুভকার্যে সহায়তা করব। কিন্তু সুদত্ত আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করলেন না। পরদিন বুদ্ধ সশিষ্যে শুভাগমন করে শ্রেষ্ঠীর হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। শ্রেষ্ঠী পরম তৃপ্তি লাভ করলেন এবং শ্রাবস্তীতে বর্ষাযাপনের

জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন—আমি নির্জন স্থানে বাস করি, নির্জনতাই ভালবাসি। শ্রেষ্ঠী বললেন—তা আমি জানি, আপনার বাসোপযোগী স্থানের অভাব হবে না শ্রাবস্তীতে, আপনার বাসের উপযুক্ত ব্যবস্থাই করব।

শ্রেষ্ঠী সুদত্ত রাজগৃহে আপনার কর্তব্য সমাপ্ত করে শ্রাবস্তীতে ফিরলেন। তিনি বুদ্ধদর্শনের কাহিনী সকলকে বলতে লাগলেন। তাঁর মুখে বুদ্ধের গুণমহিমার কথা শুনে অনেকেই বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন হলেন। গৃহে ফিরে অবধি তাঁর মুখে অন্য বাক্যালাপ নেই, শুধু বুদ্ধের অমূল্য উপদেশেরই আলোচনা। এ আলোচনার মধ্যে তাঁর যে অপূর্ব ভক্তিভাব ফুটে উঠত, তা শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করত। শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের বর্ষাযাপনের কথা শুনে ভক্তগণ আনন্দ অনুভব করলেন। তাঁরা শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে বুদ্ধের যোগ্য বাসস্থান খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে রাজকুমার জেতের মনোরম উদ্যানটিকেই বুদ্ধ বিহারের উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করলেন। কারণ, এ স্থানটি ছিল নির্জন, জনকোলাহলের বাইরে এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্যে পূর্ণ। কুমার জেত আপনার প্রিয় উদ্যানটি হস্তান্তর করবেন কিনা এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠীর সন্দেহ হল। তিনি সমস্ত কিছুর বিনিময়ে এখানে বুদ্ধের আশ্রম তৈরী করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। এ স্থানটি জেতের বাল্যের লীলাভূমি এবং যৌবনের প্রমোদকানন। তিনি প্রাণ ঢেলে দিনের পর দিন উদ্যানটিকে রমণীয় করে তুলেছেন। যখন শ্রেষ্ঠী কুমার জেতকে আপনার সংকল্প জানিয়ে স্থানটি কিনতে চাইলেন, জেত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলেন। শ্রেষ্ঠীর সনির্বন্ধ কাতর অনুরোধ এড়াবার জন্য অবশেষে রাজকুমার বললেন—যদি আপনি উদ্যানটিকে স্বর্ণমুদ্রায় আবৃত করে সে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা আমাকে দিতে পারেন, তবে স্থানটি বিক্রয় করতে পারি। শ্রেষ্ঠী উৎফুল্ল হয়ে একবাক্যে বললেন—তাই হবে। রাজকুমার ভাবেননি শ্রেষ্ঠী এ অসম্ভব প্রস্তাবে সম্মত হবেন। তিনি অবাক হয়ে গেলেন। শ্রেষ্ঠী আপনার সঞ্চিত রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা শকটে আনিয়ে স্থানটি আবৃত করতে লাগলেন। এ অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখবার জন্য উদ্যানের চারিদিকে বিপুল জনসমাবেশ হল। শ্রেষ্ঠীর ত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করে জেতের হৃদয় গলে গেল। যে স্থানটি তখনও মুদ্রায় অনাবৃত ছিল, সে স্থানটি আবৃত করতে বাধা দিয়ে তিনি বললেন—আমি অবশিষ্ট স্থানটি বুদ্ধের উদ্দেশে দান করলাম। বুদ্ধের প্রতি জেতের এ আকস্মিক প্রসন্নতায় শ্রেষ্ঠী মুগ্ধ হলেন। অতঃপর তিনি এ উদ্যানে বিপুল অর্থব্যয়ে বিরাট সঙ্ঘারাম গড়ে তুললেন।

কুমার জেতের নামানুসারে স্থানটির নাম হল 'জেতবন'। সঙ্ঘারামটি শ্রেষ্ঠীর লোকদত্ত নামে 'অনাথপিণ্ডদের আরাম' বলে পরিচিত হল।

বর্ষা যাপনের জন্য বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীতে এলেন তখন সমগ্র নগর মেতে উঠল। তাঁর অমৃতময়ী বাণী শুনে বহু সন্ধানী আলোর সন্ধান পেলেন। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ মহাসমারোহে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নব নির্মিত সঙ্ঘারামটি উৎসর্গ করলেন। বুদ্ধ এ বিহারে উনিশ বৎসর বাস করেছিলেন। এখানে তাঁর ভাষিত বহু সূত্রের সঙ্গে ত্রিপিটকের পাতায় পাতায় অনাথপিণ্ডদের আরামের নাম অক্ষয় হয়ে আছে।

চৌদ্দ

কোশলরাজ প্রসেনজিতের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অসামান্য, জাত্যাভিমানী শাক্যবংশীয় রাজগণও তাঁকে সমীহ করে চলতেন। মগধরাজ বিম্বিসার তাঁর ভগ্নীকে বিবাহ করে কাশীরাজ্য যৌতুক পেয়েছিলেন। বহুদিন উভয়ে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ক্ষমতা প্রতিপত্তির জন্য প্রসেনজিতের গর্বও ছিল অত্যধিক। তাঁর রাজধানীর উপকণ্ঠে জেতবনে বুদ্ধের আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা এবং তাঁর রাজ্যবাসীদের মধ্যে বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের কাহিনী নানাভাবে তাঁর কানে এসেছিল। বিশেষভাবে বুদ্ধের বিরাট ব্যক্তিত্বের বর্ণনা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

তখন জেতবন একটি বিরাট সঙ্ঘারাম। নানা দেশ থেকে ভিক্ষুরা আসতেন সেখানে বুদ্ধের সাক্ষাতের জন্য। অগণিত ভক্ত উপস্থিত হতেন পুণ্য সঞ্চয়ের আশায়। প্রত্যহ অপরাহ্নে বুদ্ধ সভা ভবনে ভক্তদের দর্শন করতেন এবং ধর্মকথা শোনাতেন। একদিন অপরাহ্নে বুদ্ধের দর্শনপ্রার্থী জনতা জেতবনের সভাগৃহে সমবেত হয়ে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। তখনও অস্তোন্মুখ সূর্যের শেষ রশ্মি মিলিয়ে যায়নি। জেতবনে তরুলতার আড়ালে পাখীর কলকূজন সুরু হয়েছে। সভাগৃহে নিস্তব্ধ জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে হঠাৎ কোশলরাজ প্রসেনজিতের আবির্ভাব হল। জনগণ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। রাজা তাদের বসতে ইঙ্গিত করে একান্তে বসে পড়লেন। সভা আবার নিস্তব্ধতামগ্ন হল। বুদ্ধ যখন আপনার গন্ধকুটি থেকে বেরিয়ে সভাগৃহে আসছিলেন তখন তাঁর দিকে রাজার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তাঁর নবীন তরুণ মূর্তি দেখে রাজা যেন একটু হতাশ হলেন। জ্ঞান-গুণের খ্যাতির সঙ্গে বয়সের নবীনতা রাজার কাছে খাপছাড়া

মনে হল। সম্যক সম্বুদ্ধ বলে যাঁর এত নাম, তাঁর বয়স যে এত কাঁচা হবে, তা রাজা ভাবতে পারেননি। তাই গর্বোদ্ধত রাজা তাঁকে প্রণাম করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। কুশল জিজ্ঞাসার পরই তিনি বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন—ভবৎ গৌতম কি অনুত্তর বোধিজ্ঞান আয়ত্ত করেছেন বলে স্বীকার করেন? বুদ্ধ উত্তর করলেন—হাঁ। রাজা বললেন—ভবৎ গৌতম, এই যে খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ জনগুরু গণাচার্য তীর্থঙ্কর সাধু পুরুষগণ আছেন যেমন পূরণ কাশ্যপ, মক্খলি গোশাল, নিগ্রন্থ নাথপুত্র, সঞ্জয়, প্রকুধ কাত্যায়ন, কেশকম্বলী অজিত, তাঁরাও আমার প্রশ্নের উত্তরে অনুত্তর বোধিজ্ঞান লাভ করেছেন বলে স্বীকার করেননি, আপনার কথাই বা কি? আপনি তো বয়সে ও দীক্ষায় তাঁদের চেয়ে অনেক ছোট। সভাস্থ জনতা নিস্তব্ধ হয়ে এর উত্তর শুনবার জন্য ব্যাকুল দৃষ্টিতে বুদ্ধের মুখের পানে তাকাল। বুদ্ধ বললেন—মহারাজ, বিষধর সর্প, অগ্নি, রাজপুত্র ও সন্ন্যাসী এ চারজনকে ছোট বলে অবজ্ঞা করা উচিত নয়, ঘাঁটানো সংগত নয়, কারণ বিষধর সর্প ক্ষুদ্র হলেও তার দংশনে মানুষের জীবনান্ত ঘটে, অগ্নিকে ক্ষুদ্র বলে অবহেলা করলে উপাদান সংযোগে তা প্রকাণ্ড হয়ে ক্ষতি সাধন করে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজপুত্রকে নাবালক বলে যে অবহেলা করবে সে তার কোপ দৃষ্টিতে পড়বে যখন সে রাজপুত্র রাজা হয়ে সিংহাসনে বসবে, তেমনি সন্ন্যাসীও নবীন তরুণ বলে উপেক্ষনীয় হতে পারে না, বয়স কিংবা দীক্ষার দিন তার মাপকাঠি নয়, অধ্যাত্মসিদ্ধিই তার মানদণ্ড। বুদ্ধের উত্তর শুনে রাজা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—চমৎকার! চমৎকার! আপনার কথায় আমার ভুল ভেঙেছে, আমি আলো পেয়েছি, আমি আপনার শরণগত হলাম, আজ থেকে আমায় আপনার উপাসক বলে গ্রহণ করুন।

অতঃপর রাজা বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন—ভদন্ত, লোকের অন্তরের কোন বৃত্তিগুলি অনর্থাবহ? বুদ্ধ উত্তরে বললেন—লোভ দ্বেষ এবং মোহ, এ তিনটি মানুষের মনে উৎপন্ন হয়ে মানুষেরই ক্ষতি সাধন করে, অস্বস্তি বিধান করে এবং দুঃখাবহ হয়।

রাজা প্রসেনজিৎ—জগতে কোনো ব্যক্তির জরা মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই আছে কি?

বুদ্ধ—না, মহারাজ, জরা মৃত্যুর হাত থেকে কারো রেহাই নেই; ধন, যশ, মান কিছুই জরা মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, এমন কি মুক্ত সিদ্ধপুরুষের শরীরও ভঙ্গুর পরিত্যাজ্য।

রাজা—ভদন্ত, একদিন নিভৃতে আমার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়েছিল যারা কায়মনোবাক্যে পাপ কর্ম করে, তারা নিজেরা নিজেদেরি শত্রু এবং যারা সকল অবস্থায় সৎকর্মে রত, তারা নিজেরা নিজেদেরি বন্ধু।

বুদ্ধ—মহারাজ, তা ঠিক বটে, কাযেই যে নিজেকে ভালবাসে প্রিয় বলে জানে, তার দুষ্কর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ দুষ্কর্ম করলে দুঃখেরই উদ্ভব হয়। মানুষের পরলোক গমনের সময় শুধু তার কৃতকর্মই তার অনুসরণ করে এবং তা নিজস্ব হয়। তাই পরলোকের কল্যাণের জন্য সর্বদা সৎকর্ম করা একান্ত উচিত। এ তার পরলোকে সত্যিকার সম্বল হয়।

রাজা—ভদন্ত, জগতে যারা বিপুল ধনসম্পদ লাভ করে ধনমত্ত হয় না, ইন্দ্রিয়পর হয় না এবং পরকে দুঃখ দেয় না, তাদের সংখ্যা খুব কম; অথচ যারা ঐশ্বর্য লাভে মদমত্ত ব্যভিচারী হয় এবং পরকে কষ্ট দেয়, তাদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী।

বুদ্ধ—মহারাজ, আপনি ঠিক বলেছেন। নির্বোধ মৃগ যেমন আপনার নির্বুদ্ধিতার জন্যে পাশবদ্ধ হয়ে দুঃখ পায়, তেমনি নির্বোধ বিত্তশালী ব্যক্তিও আপনার ভোগপাশে বদ্ধ হয়ে আপনারই দুঃখ ডেকে আনে।

রাজা—ভদন্ত, কাকে দান দেওয়া উচিত?

বুদ্ধ—যাঁর প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হয় তাঁকেই দান দেওয়া উচিত।

রাজা—কাকে দান করলে দানের বড় ফল পাওয়া যায়?

বুদ্ধ—সুশীল সজ্জনকে দান করলে দানের বড় ফল হয়। মহারাজ, আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, আপনি উত্তর দিন। আপনাকে বিরাট সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হলে যদি কোন অনভিজ্ঞ ভীরু দুর্বল ব্যক্তি বিশিষ্ট সামরিক পদের জন্য আপনার নিকট আবেদন করে, আপনি কি সে পদে তাকে নিযুক্ত করবেন?

রাজা—ভদন্ত, তাকে নিযুক্ত করতে পারি না, কারণ সে পদের যোগ্যতা তার নেই।

বুদ্ধ—যদি আপনার আসন্ন যুদ্ধে অভিজ্ঞ সুশিক্ষিত নির্ভীক রণদক্ষ লোক সে পদের প্রার্থী হয়, তখন কি করবেন।

রাজা—তাকে তৎক্ষণাৎ সে পদে নিযুক্ত করব। কারণ সে পদের যোগ্যতা তার আছে এবং রণক্ষেত্রে এরকম লোকই চাই।

বুদ্ধ—মহারাজ, তেমনি যে গৃহত্যাগীর অন্তরে কামনা-বাসনার স্পর্শ নেই, বিদ্বেষ বিগত, সংশয় নির্মূলিত এবং শীল সমাধি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, তিনিই

দানের যোগ্য পাত্র। তাঁকে যে দান দেওয়া হয়, সে দানের ফল মহত্তর হয়।

রাজা—ভদন্ত, আমার মনে হয় আপনি ধর্ম প্রচার করেছেন সৎসঙ্গরত সজ্জনের জন্যই, কুসঙ্গরত দুর্জনের জন্য নয়।

বুদ্ধ—মহারাজ, আপনার ধারণা ঠিক। শাক্যরাজ্যের নগরক নামক স্থানে আমি যখন থাকতাম, ভিক্ষু আনন্দ আমায় বলেছিল—সৎসঙ্গ ও সচ্চিন্তা ব্রহ্মচর্যের অর্ধেক। আমি তখনি তাকে বলেছিলাম—শুধু অর্ধেক নয়, সমস্ত ব্রহ্মচর্যই সৎসঙ্গ ও সচ্চিন্তা। সৎসঙ্গ লাভ করে সাধনার পথে অগ্রসর হতে হয়, এ তার প্রমাণ। সম্বুদ্ধের সঙ্গলাভ অনেকের জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের হেতু হয়। সৎসঙ্গ যে সমস্ত ব্রহ্মচর্য, এতেই বোঝা যায়। সুতরাং সৎসঙ্গের জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। সৎসঙ্গে মানুষের অপ্রমত্ততা আসে চৈতন্যোদয় হয়। তা ইহলোকে ও পরলোকে সর্বত্র কল্যাণকর।

একদিন মধ্যাহ্নে রাজা প্রসেনজিৎ ব্যস্ত সমস্তভাবে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ তাঁকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন—মহারাজ, এ দুপুরের রোদে, এ ভাবে আপনি কোত্থেকে আসছেন? রাজা উত্তরে বললেন—ভদন্ত, এ শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী পরলোক গমন করেছেন, তিনি সন্তানহীন, তাঁর অপুত্রক সম্পদ রাজকোষাগারে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে এখানে আসছি; তাঁর ভাণ্ডারে আশী লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চিত ছিল, রৌপ্য ইত্যাদির কথাই বা কি? অথচ এ বিশাল সম্পদ তাঁর কোন কাজে লাগে নি। কদর্য আহার রুক্ষ বেশভূষা তাঁর ধনীত্বকে ব্যঙ্গ করে সীমাহীন কার্পণ্য প্রকাশ করত। ভগবান বললেন—মহারাজ! নির্বোধ অসাধু লোক বিপুল ধনসম্পত্তির মালিক হয়েও নিজে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারে না, স্ত্রীপুত্রকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করে না, মাতাপিতার সেবা করে না, দানে মুক্তহস্ত হয় না, তার ধনসম্পদের এই পরিণতিই হয়, কিন্তু সজ্জন ধনসম্পদ লাভ করে নিজে সুখী হয়; স্ত্রী পুত্রকে সুখী করে, মাতাপিতার সেবা করে, বন্ধুবান্ধবের উপকার করে এবং বিবিধ সৎকর্ম সম্পাদন করে, এভাবে তার অর্থলাভ সার্থক হয়।

রাজা প্রসেনজিৎ প্রায়ই বুদ্ধের সাক্ষাতের জন্য জেতবনে আসতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে বুদ্ধ তাঁকে বললেন—মহারাজ, জগতে চার রকমের লোক দেখা যায়। যথা—তমোতমপরায়ণ, তমোজ্যোতিপরায়ণ, জ্যোতিতমপরায়ণ এবং জ্যোতিজ্যোতিপরায়ণ; দারিদ্র্যক্লিষ্ট দুঃখপীড়িত পরিবারে জন্মগ্রহণ

করে রোগ-শোকে জর্জরিত হয়েও যে ব্যক্তি পাপ কর্মে লিপ্ত হয়, সে ব্যক্তিকে তমোতমপরায়ণ বলে জানবেন—অন্ধকার হতে অন্ধকারের দিকেই সে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যে থেকে আপনার আবিল কর্মের ভিতর দিয়ে সে পরলোককেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে; এরকম অন্ধকার আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে যে সর্বদা সৎকর্মে রত হয়, সে তমোজ্যোতিপরায়ণ অর্থাৎ অন্ধকার হতে সে আলোর দিকে যাত্রা করে; তার সুচরিত কর্ম তার পরলোককে উজ্জ্বল করে; যে ব্যক্তি ধনাঢ্য উচ্চবংশে জন্মলাভ করে সকল সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়েও দুষ্কর্মরত হয়, সে ব্যক্তি জ্যোতিতমপরায়ণ অর্থাৎ আলো থেকে সে অন্ধকারের দিকে ছোটে; সুখ-সৌভাগ্যময় জীবন পেয়ে যে সৎ ও ধার্মিক হয়, সে জ্যোতিজ্যোতিপরায়ণ অর্থাৎ আলো থেকে আলোর দিকে গমন করে—তার উভলোক উজ্জ্বল।

একদিন ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখলেন—রাজা প্রসেনজিতের হুকুমে বহু লোককে বন্দী করে নেয়া হচ্ছে, কেউ রজ্জুতে, কেউ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এ দৃশ্য দেখে তাঁদের অন্তর কেঁপে উঠল। অপরাহ্নের বৈঠকে এ বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলল। বুদ্ধ তাঁদের আলোচ্য বিষয় জেনে বললেন—ভিক্ষুগণ, এ বন্ধন তো দৃঢ় বন্ধন নয়, লৌহময় কাষ্ঠময় রজ্জুময় বন্ধন অতি তুচ্ছ বন্ধন, ধনসম্পদের প্রতি পুত্রকন্যার প্রতি অন্তরের আসক্তিই দৃঢ়তম বন্ধন—এ বন্ধন যদিও মানুষের শারীরিক ক্রিয়াকে ব্যাহত করে না, তবুও তার সমস্ত সত্তাকে অভিভূত করে রাখে, এ বন্ধন দুর্মোচ্য; ঋষিগণ এ বন্ধনকেই ছিন্ন করে মুক্তির উদার আনন্দে মগ্ন হন।

পনেরো

কোশলের অন্তর্গত সাকেতে নক্ষত্রোৎসবের বিরাট আয়োজন। নৃত্য-গীতে বাদ্য-কৌতুকে কোথাও ফাঁক নেই। এ উৎসবে সমস্ত নগরী মেতে উঠেছে। অন্তঃপুরিকারাও দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায় আমোদ-প্রমোদে অংশ গ্রহণের জন্যে। নগরের প্রান্তে নদীর ঘাটে কুমারীদের এক বিরাট বাহিনী জল-ক্রীড়ায় মেতেছিল। তখন দূরে আকাশের কোণে মেঘ সঞ্চিত হচ্ছিল। দেখতে দেখতে সে মেঘ চারিদিক আচ্ছন্ন করে বৃষ্টিধারায় নেমে এল। কুমারীরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালালো ক্রীড়া ফেলে। কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল একজন ষোড়শী রূপসী যে ছুটল না, কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না, মন্থর গতিতে রাজহংসীর মত পথ বেয়ে চলল। তার মুক্ত কেশ পিঠের

উপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল গুল্‌ফের কাছাকাছি। সিক্ত বসনের মধ্য দিয়ে ঠিকরে পড়ছিল তার সুগঠিত দেহের সুগৌর কান্তি। তার মুখে চোখে সর্বত্র অপরূপ সৌন্দর্য লীলায়িত। তাকে দেখে একদল লোক থমকে দাঁড়ালো, জিজ্ঞেস করল—মা, এ বৃষ্টিতে সব মেয়েরা ছুটে পালিয়েছে, তুমি ভিজে ভিজে আস্তে চলেছ কেন, তোমার শরীর কি দুর্বল? উত্তরে রূপসী বলল—মহাশয়গণ, এদের কারো চেয়ে শক্তি আমার কম নয়, তবে না ছোটার কারণ আছে; চার জনের দৌড়াতে নেই—অভিষিক্ত রাজার দৌড়ানো শোভা পায় না, রাজার সুসজ্জিত মঙ্গল হস্তী দৌড়ালে ভাল দেখায় না, শান্ত সংযত শ্রমণের দৌড়াদৌড়ি ভাল নয়, তেমনি বসনাভরণ-মণ্ডিতা নারীরও দৌড়াতে নেই। এ উত্তর তাদের মুগ্ধ করল। কুমারীর আলাপের সময় তারা আরও তার মুক্তাশুভ্র দন্তের সৌন্দর্য ও বীণানিন্দিত কণ্ঠের মাধুর্য লক্ষ্য করে সিদ্ধান্তে উপনীত হল—এ তাদেরই অনুসন্ধিত কুমারীরত্ন। তখনি তারা পরিয়ে দিল স্বর্ণমালা তার গলায়। কুমারী জিজ্ঞেস করল—আপনারা কোত্থেকে আসছেন? তারা উত্তরে বলল—শ্রাবস্তীর মহাশ্রেষ্ঠীর বাড়ী থেকে।

কুমারী—শ্রেষ্ঠীর নাম কি?

ঘটক—মৃগার শ্রেষ্ঠী।

কুমারী—তাঁর পুত্রের নাম কি?

ঘটক—কুমার পূর্ণবর্ধন।

কুমারী সম্মতি জানিয়ে বলল—আমি মহাশ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কন্যা বিশাখা। পরিচয় শুনে ঘটকদের আনন্দের সীমা রইল না। তারা শ্রেষ্ঠীপুত্র-নির্দিষ্টা সুলক্ষণা কন্যার সন্ধানে নানাস্থান পরিভ্রমণ করে আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বদিগ্ধ মনে এখানে এসেছিলেন। এমনি শুভযোগ হবে তা তারা ভাবতেও পারেন নি—শুধু কন্যারত্ন নয়, মহাভাগ ধনঞ্জয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ, যাঁর ধনভাণ্ডার অফুরন্ত, যাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি অসামান্য এবং যিনি শ্রেষ্ঠীকুলের শিরোমণি। বিশাখার বরণবার্তা শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কাছে পৌঁছল। পাঁচশ রথের শোভাযাত্রা সহ বিশাখাকে বাড়ী নেওয়া হল। ঘটকগণ আপ্যায়িত হলেন আহার পানীয়ে শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদে।

শ্রেষ্ঠী মৃগার যখন শুনলেন তাঁর ছেলের সঙ্গে ধনঞ্জয়-কন্যা বিশাখার বিবাহ স্থিরীকৃত হয়েছে, তাঁর প্রাসাদে আনন্দের কলরোল পড়ে গেল। এ শুভকার্য শীঘ্র সমাপনের জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়ে দূত পাঠালেন শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কাছে। রাজা প্রসেনজিৎ পরিষদ সহ বিবাহ সভায় উপস্থিত হবার

সম্মতি দিলেন। সমগ্র সাকেত নগর উৎসবে মেতে উঠল। খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয়ের সমারোহ চলল দিনের পর দিন। 'দেহি' 'দেহি' রবে মুখরী থাকলো সুসজ্জিত আহারসত্রগুলি। নৃত্য-গীত, বাদ্য-কৌতুকের অপূর্ব সমাবেশে নন্দন-কানন হয়ে উঠল আমোদ-প্রাঙ্গণগুলি। সাকেতে এত জন-সমাগম কেউ কোনদিন দেখেন নি। অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে আনন্দোজ্জ্বল উৎসবমুখর শুভলগ্নে এ পরিণয় কার্য সুসম্পন্ন হল।

পতিগৃহে যাত্রাকালে বিশাখা পিতাকে প্রণাম করলেন। তাঁর পিতার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি চোখের জলের ভিতর দিয়ে আশীর্বাদ বর্ষণ করে কন্যাকে দিলেন অমূল্য উপদেশ। সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করে বিশাখা যখন অশ্রুসজল চোখে সজ্জিত শিবিকায় যাত্রা করলেন, তখন সেই বিদায়করুণ পরিবেশের মধ্যে তার অনুসরণ করল সখীদল, দাসদাসী পরিজন। যৌতুক রূপে চলল শত শত কার্ষাপনের শকট, রজতের শকট, স্বর্ণের শকট, রত্নালঙ্কার শকট, পরিচ্ছদ শকট, তৈজস পত্রের শকট, আসবাব পত্রের শকট, ঘৃত তণ্ডুলের শকট এবং ফাল লাঙ্গলের শকট। শ্রেষ্ঠীর গোগৃহের গরুগুলি বেরিয়ে এসে সেই শোভাযাত্রার অংশরূপে বিবাহ যৌতুকের বহর আরও বাড়িয়ে দিল। এ অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখবার জন্য সাকেতের লোক কেউ ঘরে রইল না।

পুত্র ও পুত্রবধুকে বরণ করবার জন্য শ্রেষ্ঠী মৃগার বিরাট আয়োজন করলেন। শ্রাবস্তীর যে পথে সেই শোভাযাত্রার আগমনের কথা ছিল, সেই পথগুলিও সুসজ্জিত করা হল। মুখে মুখে প্রচারিত হল—মহাশ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কন্যা বিপুল ধনৈশ্বর্য নিয়ে বধূবেশে শ্রাবস্তী প্রবেশ করবেন। যখন গগন পবন প্রকম্পিত করে ঢাক ঢোলের বাজনার সঙ্গে সানাইএর রাগিনী শ্রাবস্তীর দ্বারে বেজে উঠল, পথের দুধার লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। পুরনারীদের হুলুধ্বনির সঙ্গে অবিশ্রান্ত শঙ্খনাদ শ্রাবস্তীকে মুখরিত করে তুলল। এ বিরাট সমারোহের মধ্যে বিশাখা পতিগৃহে প্রবেশ করলেন।

পতিগৃহের পরিবেশ বিশাখার পক্ষে অনুকূল হল না। তাঁর বয়স ছিল যখন সাত বৎসর, তখন বুদ্ধ গিয়েছিলেন ভদ্রিয় নগরে। পাঁচশ বালিকার অধিনায়িকারূপে তিনি বুদ্ধকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। অনাথপিণ্ডদের মত স্বতস্ফূর্ত বুদ্ধপ্রীতি তাঁকে তখন অভিভূত করেছিল। তাঁর কোমল মনে বুদ্ধের ধর্মালাপ গভীর রেখাপাত করেছিল। সেই থেকে তাঁর অন্তরে বইতেছিল ধর্মের ফল্গুধারা। কিন্তু পতিগৃহের ভাবধারা ছিল তার ঠিক উল্টো।

এ অসামঞ্জস্য অশান্তির কারণ হল। দিনের পর দিন বাধা বিরোধের মধ্য দিয়ে কাটতে লাগলো। ধর্মের ব্যাপারে পুত্রবধূর স্বাধীনতা যদিও শ্বশুরের অসহ্য মনে হল, তবুও তাতে হস্তক্ষেপ করতে তাঁর সাহস হল না। সুতরাং পুত্রবধূর প্রতি তাঁর মনে বিরক্তি ধূমায়িত হতে লাগলো। তা একটি ক্ষুদ্র ঘটনাবলম্বনে হঠাৎ ক্রোধাগ্নিতে জ্বলে উঠল। একদিন শ্বশুরের আহারকালে বিশাখা ব্যজন হস্তে শ্বশুরকে বাতাস করছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র হস্তে শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। শ্বশুরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশাখা একটু সরে দাঁড়ালেন। শ্বশুর একবার আড় চোখে ভিক্ষারত ভিক্ষুর পানে তাকালেন। তারপর কিছু না বলে আবার তিনি আহারে মনোনিবেশ করলেন। ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন দেখে বিশাখা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—ভদন্ত, আপনি অন্যত্র ভিক্ষা সংগ্রহ করুন, আমার শ্বশুর পুরাতন ভোজন করছেন। 'পুরাতন ভোজন' কথাটি শুনবামাত্রই ঘৃতসিক্ত অগ্নির মত শ্রেষ্ঠীর অন্তরে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে গর্জন করে দাস দাসীদের বললেন—বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও এ রাক্ষসীকে, আমি পুরাতন খাই, আমি উচ্ছিষ্ট খাই। এত আস্পর্ধা তার। দাস-দাসীরা পাথরের মত নিশ্চল রইল। শ্রেষ্ঠী আরও গর্জন করতে লাগলেন। বিশাখা শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—আপনি তো আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারেন না, তবে আমার বাবা যে সাতজন শ্রেষ্ঠীকে সম্মুখে রেখে আমায় সমর্পণ করেছিলেন, তাঁরা বিচার করুন আমি কি খারাপ কথা বললাম।

সাতজন শ্রেষ্ঠীর বৈঠক বসল শ্রেষ্ঠী মৃগারের প্রাসাদে। তাঁরা বিশাখাকে জিজ্ঞেস করলেন—মা, তুমি কেন শ্বশুরকে পুরাতন-ভোজী বলে অপমান করলে? উত্তরে বিশাখা বললেন—না, আমি তো তাঁকে অপমান করিনি, দ্বারে দণ্ডায়মান ভিক্ষুকে অন্যত্র ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য অনুরোধ জানিয়ে শুধু বলে দিয়েছি 'আমার শ্বশুর পুরাতন ভোজন করছেন অর্থাৎ প্রাক্তন সুকর্মের ফলভোগে মগ্ন আছেন—তাঁর কাছে ভিক্ষা লাভের আশা বৃথা' এ কথার মধ্যে অসত্যও নেই, অপমানেরও কিছু নেই। এ উত্তর শুনে তাঁরা মুগ্ধ হলেন। আরও কতকগুলি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে তাঁরা বিশাখার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মহত্তর গুণের প্রশংসা করতে লাগলেন এবং মৃগারকে বললেন—মহাশয়, এ আপনার পরম সৌভাগ্য যে আপনি পুত্রবধূরূপে এ মহীয়সী নারীকে পেয়েছেন।

সেই থেকে শ্রেষ্ঠী মৃগারের শুভ বুদ্ধির উদয় হল। বিশাখার ধর্মে কর্মে তিনি আর বাধা দিলেন না। পুত্রবধূর আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা

লাগলো। যতই দিন যেতে লাগলো, ততই পুত্রবধূর পবিত্র ভাব, মহৎ চরিত্র ও উদার কর্ম তাঁকে মুগ্ধ করতে লাগলো। এক কথায় বিশাখার সংস্পর্শে তাঁর জীবনের মোড় ফিরে গেল। তিনি বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত হলেন। বিশাখার নির্দেশে তাঁর বাসভবন বিরাট দানসত্রে পরিণত হল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দানযজ্ঞের অখণ্ড অনুষ্ঠান চলতে লাগলো। বিশাখার যশোগানে চারিদিক মুখরিত হতে থাকলো। তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘের জননীসদৃশা হলেন। তিনি যেমনি বুদ্ধ ও সঙ্ঘের সেবায় এবং আর্তের ত্রাণে তাঁর বিপুল ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত রেখেছিলেন, তেমনি বন্যার জলের মত তাঁর অর্থাগম হচ্ছিল। তাঁর পূর্ব-জন্মার্জিত-সুকৃতির ফলে ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা রইল। শ্রাবস্তীর সকলের তিনি ছিলেন আপনজন। সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তাঁর অংশ থাকত। তাঁর দর্শনও শুভ বলে বিবেচিত হত।

একদিন বিশাখা বুদ্ধের ধর্মকথা শুনতে গিয়ে তাঁর 'মহালতা' ভূষণ বিহার প্রাঙ্গণে ফেলে এলেন। সেকালে এ অলঙ্কার ছিল নারীর এক দুর্লভ সম্পদ। সমগ্র আর্যাবর্তে মাত্র তিনজন নারী এতাদৃশ অলঙ্কারের অধিকারিণী ছিলেন। স্মরণ হওয়া মাত্র বিশাখা দাসীকে বললেন—ওহে, তুমি জেতবনে গিয়ে আমার 'মহালতা' নিয়ে এসো, যদি ভিক্ষুগণ তা স্পর্শ না করে, যদি তাঁরা স্পর্শ করেন, তা তাঁদের হবে। দাসী জেতবনে গিয়ে জানতে পারল—ভিক্ষু আনন্দ তা প্রাঙ্গণ থেকে তুলে সযত্নে বিশাখার জন্য রেখে দিয়েছেন। বিশাখা হর্ষোৎফুল্ল মনে উচ্চারণ করলেন—আমার প্রিয় সম্পদ আজ ভিক্ষুসঙ্ঘের হল। তিনি ঘোষণা করলেন মহালতা বিক্রী হবে। কিন্তু তার উপযুক্ত ক্রেতা পাওয়া গেল না। অবশেষে তিনি নিজেই উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তা ক্রয় করলেন এবং সেই বিপুল ধনরাশি ব্যয় করে গড়ে তুললেন শ্রাবস্তীর পূর্বপ্রান্তে এক বিরাট সঙ্ঘারাম। এটিই হল ঐতিহাসিক পূর্বারাম যেখানে বুদ্ধ ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করেছিলেন। সেই অমর কাহিনী বৌদ্ধ সাহিত্যের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। মৈত্রী, করুণা ও মাতৃস্নেহের নির্ঝরিনী দানশীলা মহীয়সী বিশাখার অমর নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে তার সঙ্গে।

ষোলো

বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে বুদ্ধ প্রথম পাঁচজন ব্রাহ্মণকে ভিক্ষুত্ব দান করেন। সেই থেকে তাঁর ভিক্ষুসংখ্যা বর্ধিত হতে থাকে। বস্তুতঃ তাঁর অমূল্য উপদেশ শুনে বহুলোক সংসার ত্যাগ করে অধ্যাত্মসাধনায় রত হয়।

সত্যোপলব্ধিতে তাঁদের জীবন ধন্য হয়। তাঁরাও লব্ধ সত্য দিকে দিকে প্রচার করতে থাকেন। তখন এক বিরাট অধ্যাত্ম-আন্দোলন সেই যুগের সীমানা চিহ্নিত মধ্যদেশ আলোড়িত করে তোলে। ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকল স্তরের লোকের জন্য এ সাধনার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। সকল শ্রেণীর লোক সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। কিন্তু তখনও বুদ্ধপ্রবর্তিত সঙ্ঘ প্রবেশের পথ নারীর জন্য রুদ্ধ ছিল। নারীসমাজ শুধু গৃহবাসিনী উপাসিকা হবার সুযোগ পেয়েছিল। উপাসিকা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে কোন কোন নারী অধ্যাত্ম সাধনায় উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। বুদ্ধবিমাতা গোতমী একথা ভালভাবে বুঝেছিলেন বলে নারীদের সন্ন্যাসের পথ প্রদর্শনের জন্য জীবনপণ করেছিলেন। গোতমীই সর্বপ্রথম এ পথ প্রদর্শন করে ভিক্ষুনীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার অক্ষয় গৌরবের অধিকারিণী হয়েছিলেন।

প্রব্রজ্যার বহু পূর্বে রাণী গোতমীর হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। শুদ্ধোদনের দেহত্যাগের পর তা প্রবলতর হয়ে উঠল। রাজপ্রাসাদ তাঁর কাছে অন্ধকার কারাগৃহের মত মনে হল। তার সকল সজ্জার মধ্যে যেন রয়েছে বিদ্রূপের কশাঘাত। রাজৈশ্বর্য যেন দৃঢ় শৃঙ্খল হয়ে পা বেড়িয়েছে। এ কঠিন বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তপোবনের শান্ত পরিবেশের মধ্যে জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠল। একদিন তিনি আপনার মনোভাব বুদ্ধের নিকট ব্যক্ত করলেন। বুদ্ধ বাধা দিয়ে বললেন—মা, গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসের পথাবলম্বন নারীর পক্ষে সহজ হবে না, এ আকাঙ্ক্ষা তুমি পরিত্যাগ করো। গোতমী সঙ্ঘে নারীর দীক্ষার অনুকূলে অনেক যুক্তি দেখিয়ে তাঁকে বারবার অনুরোধ করলেন। কিন্তু কোন সুফল হল না। তবুও তিনি দীক্ষা গ্রহণের সংকল্প ত্যাগ করলেন না।

এরপর বহুদিন কেটে গেল। আকাশে মেঘজাল বিস্তার করে বর্ষা নেমে এল। গ্রীষ্ম তপ্তশ্বাস ত্যাগ করে অদৃশ্য হল। মাটির বুক হতে নির্গত তৃণগুল্ম পথ-প্রান্তর সবুজ করে তুলল। বুদ্ধ শিষ্যবৃন্দ পরিবৃত হয়ে কপিলবাস্তু থেকে বৈশালীতে গেলেন এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ কুটাগারে বর্ষা যাপন করতে লাগলেন। তাঁর কপিলবাস্তু ত্যাগে গোতমীর মন বিষাদগ্রস্ত হল। চারিদিক অন্ধকার করে ন্যগ্রোধারামের আলো যেন নিবে গেছে, কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই। কপিলবাস্তুতে থাকা গোতমীর পক্ষে অসম্ভব মনে হল। তিনি মস্তক মুণ্ডিত করে কাষায়বস্ত্র পরে নগ্নপদে বৈশালী

যাত্রা করলেন। বহু সংসার-বিরাগিণী শাক্যমহিলা তাঁর অনুবর্তিনী হলেন। কখনও ধূলিধূসরিত প্রান্তরপথে কখনও কাঁকর বাজি আচ্ছন্ন নদীপ্রান্তের ওপর দিয়ে কখনও ছায়াচ্ছন্ন বনপথ ধরে এ মহিলার দল দিনের দিন পর চলতে লাগলেন। অনভ্যস্ত পথশ্রমে তাঁরা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে কখনও বৃক্ষতলে কখনও শূন্য আশ্রমে কখনও পরিত্যক্ত কুটিরে রাত্রি যাপন করতেন। তাঁদের সুকোমল পদতল ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল। অবশেষে তাঁরা অবসন্ন দেহে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বৈশালীর কূটাগারে পৌছলেন। তাঁদের অপ্রত্যাশিতভাবে পরিশ্রান্ত দেহে ক্ষতবিক্ষত পদে ধূলিমলিনবাসে আসতে দেখে স্থবির আনন্দের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি তাঁদের অভ্যর্থনা করে আশ্রমে আনলেন। গৌতমী আনন্দকে সমস্ত খুলে বলতে গিয়ে হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত বেদনায় কেঁদে ফেললেন। আনন্দ গৌতমীকে সান্ত্বনা দিয়ে তখনি বুদ্ধের কাছে গেলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ জানিয়ে গৌতমীর সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু বুদ্ধ অনুমতি দানে রাজী হলেন না। তখন তিনি যুক্তির অবতারণা করে বললেন—ভদন্ত, আপনার প্রবর্তিত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে নারীর কি মোক্ষলাভের অধিকার নেই? এ প্রশ্নেরই সমাধানে বুদ্ধ নারীকে সঙ্ঘপ্রবেশের অধিকার দিয়ে বললেন—যদি আমার বিমাতা গৌতমী অষ্ট গুরুধর্ম বা আটটি বিশেষ নিয়ম পালনে স্বীকৃতা হন, তবে তার সঙ্ঘপ্রবেশে আপত্তি নেই; সে গুরুধর্ম হবে তার দীক্ষামন্ত্র।

বুদ্ধের অনুমতি পেয়ে গৌতমীর আনন্দের সীমা রইল না। তিনি তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে গুরুধর্ম গ্রহণ করে ভিক্ষুনী হলেন। তখনি বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—আনন্দ, যদি সঙ্ঘে নারীর প্রবেশের অধিকার না থাকত, তবে এ ধর্মবিনয় দীর্ঘকাল সমুজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করত। কিন্তু নারীর প্রবেশে তার আয়ুর সীমানা সঙ্কুচিত হল, ধর্ম-বিনয় দীর্ঘস্থায়ী হবে না; নারীবহুল পুরুষবিরল পরিবার যেমন নানা দোষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তেমনি যে ধর্মশাসনে নারীর সন্ন্যাসের অধিকার থাকে, সে ধর্মও অচিরে বিলুপ্ত হয়। পুকুরকে বন্যার জল থেকে বাঁচাবার জন্য লোকে যেমন পাড় বাঁধে, তেমনি সঙ্ঘকে কলুষবন্যা থেকে রক্ষা করবার জন্য ভিক্ষুনীদের অনতিক্রমণীয় অষ্ট গুরুধর্ম নির্দেশ করলাম।

ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদ আর্য্যাবর্তের নারী সমাজে ছড়িয়ে পড়ল। সংসারধর্মে বীতস্পৃহা বহু নারী সঙ্ঘে প্রবেশ করে ভিক্ষুণীসংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন। রাজরাণী থেকে দীনতমা নারী পর্য্যন্ত

সঙ্ঘে সমানাধিকার পেলেন। এমন কি পতিতা রমণীর জন্য ও সঙ্ঘের দ্বার রুদ্ধ রইল না।

সতেরো

শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে চলেছে বিরাট আয়োজন। তাঁর একমাত্র কন্যার বিয়ে সম্পন্ন হবে অভিজাত কুলের আর এক শ্রেষ্ঠীপুত্রের সঙ্গে। নাচ গানে বাদ্য-বাজনায় মুখর হয়ে উঠেছে শ্রেষ্ঠী-ভবন। কিন্তু শোনা গেল বিবাহানুষ্ঠান আরম্ভ হবার পূর্ব মুহূর্তে শ্রেষ্ঠীর সুরূপা কুমারী কন্যা নিরুদ্দেশ। শ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠী-পত্নীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে শ্রষ্ঠী একটি ঘরে অর্গল বন্ধ করে রইলেন। মুহূর্তে বিবাহোৎসবের সকল আনন্দ বাত্যাহত প্রদীপের মত অন্তর্হিত হল। বাড়ীর এক যুবক দাসের প্রতি কন্যা পটাচারার অস্বাভাবিক আকর্ষণ শ্রেষ্ঠী টের পেয়েছিলেন বহু আগে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই দাসকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ভৎ’সনা করে বাড়ী থেকে। কিন্তু তার এ পরিণতির কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন জীবনে কখনো এ কন্যার মুখ দেখবেন না।

পটাচারা তার প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে দূর পথ অতিক্রম করে এল এক গভীর অরণ্যের ধারে একটি ছোট গ্রামে। গায়ের অলঙ্কার পত্র বিক্রী করে কিছুদিন তাদের চলল বেশ। কিন্তু যখন অর্থাভাব দেখা দিল, তখন দিন আর চলে না। যুবক পরিশ্রম করতে পারত। তার ভাবনা ছিল না। কুটিরের সম্মুখের খোলা জমিতে সে সুরু করল চাষ। পটাচারা অনভ্যস্ত ধান মাড়া ইত্যাদি শ্রমসাধ্য কাজে যোগ দিল। গুরুতর পরিশ্রমের কাজ তার বেশ আয়ত্ত হয়ে উঠল। অরণ্যের এই নিভৃত পল্লীতে শ্রমের অন্ন খেয়ে এ দুই যুবক-যুবতীর যৌবনের স্বপ্নভরা দিনগুলি প্রেমের আলাপ-গুঞ্জনে বেশ কাটতে লাগলো। এই নিরঙ্কুশ সুখের মধ্যে পটাচারা হল সন্তানসম্ভবা। সে স্বামীর কাছে প্রকাশ করল পিতৃগৃহে যাবার ইচ্ছা। স্বামী বাধা দিয়ে বলল—“সে কি করে হয়, এর পরিণতির কথা তুমি ভেবেছ কি? তোমার পিতা তোমার আত্মীয় স্বজন আমাকে গুরুতর অপরাধী বলে ভাবেন। তাঁরা কি আমায় ছাড়বেন?” এ সমস্ত কথায় কর্ণপাত না করে পটাচারা স্বামীকে একই কথা বলতে লাগলো।

একদিন স্বামী বাইরে থেকে এসে দেখল কুটিরের দরজায় শিকল তোলা। সে প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করে জানল—পটাচারা বাপের বাড়ী রওনা হয়েছে।

সে তখনি সে পথ ধরে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে দেখতে পেল—একটি ঝোপে পটাচারা শুয়ে আছে, তার পাশেই একটি সদ্যোজাত পুত্র সন্তান। সে তাদের ঘরে নিয়ে এল। প্রতিবেশিনী মেয়েদের শুশ্রূষায় ও তার প্রাণঢালা সেবাযত্নে পটাচারা সুস্থ হয়ে উঠল। তাদের সুখের সংসারে আবার সুখ ফিরে এল। পুত্রকে পেয়ে তাদের আনন্দ ধরে না।

'পটাচারা আবার সন্তানসম্ভবা হল। এবারও সে স্বামীকে অনুরোধ করল তাকে বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে। স্বামী কত ভাবে তাকে বোঝায়, তবুও সে ছাড়ে না বাপের বাড়ী যাবার সংকল্প। স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে কুটিরের দরজা বন্ধ করে রওনা হল বাপের বাড়ী লক্ষ্য করে। স্বামী বাড়ী ফিরে এসে তাকে না দেখে প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করে ছুটল তার সন্ধানে। কিছুদূর এগিয়ে এসে স্বামী দেখল—পটাচারা পুত্রকে কোলে নিয়ে চলেছে আপন মনে। সে সামনে গিয়ে কাতরভাবে অনুরোধ করে বলল—"চলো, প্রিয়ে বাড়ী ফিরে চলো, সেখানে ভূমিষ্ঠ হবে আমাদের সন্তান।" পটাচারা কোন কথায় কান দিল না, তার সংকল্পে অটল রইল। এমন সময় আকাশ কালো করে মেঘ চারদিক ঢেকে ফেলল। প্রবল বেগে ঝড় সুরু হল। ঝড়ের কানফাটা শব্দ বনভূমিকে কাঁপিয়ে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারায় নেমে এল বৃষ্টি। দুর্যোগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন সুরু হল পটাচারার প্রসববেদনা। স্বামী ছুটল নিরাপদ স্থানের সন্ধানে ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে। সে কিছুক্ষণ ঘুরেই দেখতে পেল লতাপাতায় ঢাকা একটি ঝোপ। ভিতরে ঢুকে দেখল—এ প্রবল বৃষ্টিতেও সেখানে মাটি ভিজেনি। সে তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করতে লেগে গেল। হঠাৎ একটি কেউটে সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে ফণা বিস্তার করে ফোঁস করে উঠল তার সামনে এবং তাকে পালাবার অবসর না দিয়েই মারল ছোবল। সঙ্গে সঙ্গে সে সেখানে ছিন্নমূল বৃক্ষের মত পড়ে গেল। যন্ত্রণায় ছটপট করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। সে মূর্ছা আর ভাঙল না।

এদিকে পটাচারা পুত্রকে নিয়ে যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে, সেখানেই সে আর এক পুত্র সন্তান প্রসব করল। স্বামীর আসার বিলম্ব হওয়াতে সে উত্তেজিত হয়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে যা মুখে এল তা বলতে লাগলো। অবশেষে সে নবজাত সন্তানকে বুকে নিয়ে অন্যটিকে কোলে তুলে চলল স্বামীকে খুঁজতে, কিছুদূর এগিয়েই দেখল একটি ঝোপের ভিতর তার স্বামীর মৃতদেহ পড়ে আছে, সমস্ত দেহ নীল হয়ে গেছে। এ দৃশ্য সে সহ্য করতে পারল না। তার বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে পড়ল। তার করুণ বিলাপ

ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে নির্জন বন কাঁপিয়ে তুলল। অনেকক্ষণ কান্নার পর সে সেইস্থান ত্যাগ করে সন্তান দুটিকে নিয়ে আবার পথ চলতে সুরু করল। অবিশ্রান্ত পথ চলার পর সে এসে পড়ল একটি নদীর ধারে। নদী খরস্রোতা, অথচ কোমর পর্যন্ত জল। সে একসঙ্গে দুই সন্তান নিয়ে পার হতে সাহস করল না। তাই সে বড়টিকে বলল—বাছা, এখানে তুই বোস, ওপারে তোর ভাইকে রেখে আসি। এই বলে সে সন্তানটিকে কোলে নিয়ে জল ভেঙে চলে গেল ওপারে। সেখানে তাকে পাতায় শুয়ে রেখে বড় ছেলেকে আনবার জন্য আবার জল ভেঙে চলতে লাগলো। যখন সে নদীর মাঝখানে এসেছে, তখন একটি চিল পাতার ওপর শোয়ানো নবজাত শিশুটিকে মাংসপিণ্ড মনে করে ছোঁ মারার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ পিছন ফিরে পটাচারা দেখল সে দৃশ্য। তার বুক শিউরে উঠল। সে দু হাত তুলে চিলকে তাড়াবার জন্য চীৎকার করল। ততক্ষণ শিশুটিকে নিয়ে চিল আকাশে উঠেছে। কাঁদতে কাঁদতে পটাচারা অন্য পারের দিকে সজোরে চলল। সেদিকে ছেলেটি মায়ের হাত ছোঁড়া দেখে ও চীৎকার শুনে মনে করল তার মা তাকে ডাকছে। সে চলে এল নদীর কানায়, ঝুপ করে পড়ল জলে। 'পটাচারার চোখের সামনে সে স্রোতের টানে অতলে তলিয়ে গেল। চোখের পলকে এ সব দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সে বুঝতে পারল না সে এখন কি করবে। সে বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে নদী পেরিয়ে বাপের বাড়ীর দিকে চলল। পথে কত লোক জিজ্ঞেস করে—কি হয়েছে। সে কারো কথায় জবাব না দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পথ চলে। অবশেষে শ্রাবস্তীতে পৌছল। সেখানে সে এসে শুনল—তার বাবা মা ও ভাই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেছে এবং এক চিতায় তাদের শব দাহ করা হচ্ছে। এ নিদারুণ সংবাদ তার শোকাহত প্রাণে সহস্র শেলের আঘাতের মত আঘাত হানল। আঘাতের পর আঘাতে যেটুকু জ্ঞানবুদ্ধি তার অবশেষ ছিল, সমস্তটুকু তখন নিঃশেষে লুপ্ত হল। সে সম্পূর্ণ পাগলিনী হয়ে নিজের পরনের শাড়ী ফেলে দিল। গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে পথে পথে চলতে লাগল। তার গানের কথা হল :

দুই ছেলে মরল,
পথে মরল পতি।
এক চিতায় পুড়ছে মা বাপ
কি আমার গতি।

একদিন পাগলিনী পটাচারা গাইতে গাইতে এসে পড়ল জেতবনের ফটকের

কাছে। তখন অপরাহ্নের প্রাত্যহিক ধর্মসভায় বুদ্ধের উপদেশ সুরু হয়ে গেছে। ভক্তগণ শুনেছিলেন সে উপদেশ। পটাচারা নগ্ন দেহে সভার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো। লোক তাকে 'দূর হও, দূর হও' বলে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। করুণাঘন বুদ্ধ বারণ করলেন তাদের। তিনি করুণাস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তার পানে তাকালেন এবং তাকে 'ভগ্নি' বলে সস্নেহে সম্বোধন করলেন। এতে সে একেবারে অভিভূত হল। মুহূর্তের মধ্যে তার সংবিৎ ফিরে এল। সে লজ্জা ঢাকবার জন্য বিব্রত হয়ে উঠল। তখনি সভাস্থলের মধ্য হতে একখানি উত্তরীয় বস্ত্র এসে পড়ল তার কাছে। সে উত্তরীয়ে আপনাকে আবৃত করে বুদ্ধের চরণে লুটে পড়ল। বুদ্ধ তাকে উপদেশ গাথায় বললেন—পৃথিবীতে মাতা পিতা, পুত্র ও আত্মীয় বন্ধুগণ মানুষের ত্রাণ নয়, মৃত্যুর কবল থেকে তারা কেউ রক্ষা করতে পারবে না ; একথা সঠিক জেনে জ্ঞানী সজ্জন আপনার মুক্তির পথ পরিষ্কার করতে থাকেন। এ উপদেশের মধ্যে পটাচারা পেল শোকে সান্ত্বনা, অন্ধকারে আলো। সে ভিক্ষুণী হতে সংকল্প প্রকাশ করল।

পটাচারা ভিক্ষুণী হলেন এবং অসাধারণ অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার গুণে অল্পদিনের মধ্যে অধ্যাত্মসাধনায় চরম সিদ্ধি অর্হত্ব লাভ করলেন। উত্তরকালে তিনি ভিক্ষুণী-সঙ্ঘের শ্রেষ্ঠ বিনয়ধরারূপে খ্যাতি ও সম্মানের অধিকারিণী হয়েছিলেন।

আঠারো

অভাগিনী কিশা গোতমী দরিদ্র পিতার মেয়ে বলে সঙ্গতিসম্পন্ন শ্বশুরাশ্রয়ে নিতান্ত অবহেলার মধ্যে দিন কাটায়। চাকর-বাকর থেকে বাড়ীর কর্তা পর্যন্ত সকলেই তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। স্বামীর কাছেও তেমন আদর সে পায় না। এজন্য সে কারো দোষ দেয় না, নিজের অদৃষ্টকে মেনে নেয়। এ বিষাদভরা দিনগুলির মধ্যে সে সন্তানসম্ভবা হল। যথাসময়ে তার বিষণ্ণ মলিন মুখ আলো করে ভূমিষ্ট হল এক সুন্দর ছেলে। ছেলে দেখে শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর আনন্দ ধরে না। পাড়াপড়শীরা বলে ছেলে তো নয় আকাশের চাঁদ, একমাত্র রাজার ঘরেই একে মানায়।

দিন যায়, ছেলে বাড়তে থাকে। সবাই তাকে আদর করে। তাকে কোলে নেবার জন্য পাড়াপড়শীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এ ছেলের জন্য কিশা গোতমী শুধু স্বামীর নয়, শ্বশুর বাড়ীর সকলের ভালবাসা অর্জন করল। বহুদিনের রুদ্ধ জল যেমন বাঁধ ভাঙলে প্রচণ্ড বেগে বইতে থাকে,

তেমনি এতদিনের রুদ্ধ আবেগ আকাঙ্ক্ষা অর্গলমুক্ত হল কিশার। তার নিরানন্দ দাম্পত্য জীবনের দিনগুলি হঠাৎ প্রেমের আলাপ-গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠল। সে জানল কি করে তার জীবনে এ পরিবর্তন এল। তাই শিশু পুত্রের প্রতি তার ছিল একটি অস্বাভাবিক আকর্ষণ তার কাছে সমস্ত জগৎ একদিকে আর একদিকে তার ছেলে। এর জন্য তার গর্বের অন্ত ছিলনা। সন্তানের মুখে স্তন দিয়ে যখন কিশা তাকে ছড়া শোনাত, তখন সে ভুলে যেত বিশ্বসংসার।

ছেলে এখন চলতে শিখেছে। তার মুখে আধো আধো বুলি শুনতে বেশ লাগে। বালসুলভ চাপল্য যেমন বেড়েছে, তেমনি তার আচরণে রয়েছে বুদ্ধির প্রাখর্য। সবাই তারিফ করে তার বুদ্ধির। কেউ কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করে এ শিশু বড় হয়ে অসাধারণ কিছু হবে। আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মায়ের মুখ। ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে কিশার মন। কিন্তু তার সামনে সমস্যা এসে দাঁড়ায়। কয়েক বৎসর পরেই তো ছেলেকে পাঠাতে হবে তক্ষশীলায়, তখন সে কি করে থাকবে ছেলেকে ছেড়ে। একথা ভাবতেই তার মন কেমন করে ওঠে। তখন সে ভাবে—"না, না, না, ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। তাকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে পারব না, আমার বুকের মানিক আমার বুকে থাকবে, তক্ষশীলার গুরুগৃহে না-ই বা গেল, তবু আমার বাছা নিজের বুদ্ধিতে এখানে থেকেই আয়ত্ত করবে সকল শিল্প সকল বিদ্যা।" এমনি করে ছেলেকে নিয়ে মশগুল হয়ে থাকে কিশার মন।

একদিন গভীর রাত্রে ছেলেটি 'মা, মা' বলে চেঁচিয়ে উঠল। কিশা তাকে বুকে চেপে ধরে বলল—বাবা, কেঁদো না. এই যে মা। ছেলেটির কান্না থামে না। কিশা হাত দিয়ে দেখে—তার সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে। সে ছেলেকে কোলে নিয়ে সারারাত বাতাস করল। জ্বরের বেগ এত বেশী যে ছেলে চোখ মেলে না। ভোরেই বৈদ্যকে ডেকে আনা হল। বৈদ্য অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে অনুপান সহ খাইয়ে দিলেন ঔষধ। কিশা ভাবল বৈদ্য ঔষধ দিয়েছেন, এখনি সেরে উঠবে ছেলে। কিন্তু সারাদিনে কোন পরিবর্তন দেখা দিল না। প্রতিদিন ছেলের দৌরাত্ম্যে বাড়ী হাস্য কলরবে মুখর হয়ে থাকত। আজ যেন বাড়ীর কোথাও প্রাণের সাড়া নেই, সর্বত্র থমথমে ভাব। একদিনেই তার চেহারা যেন বদলে গেছে।

বৈদ্য আসেন, যান, ঔষধ দেন। ছেলের অসুখ বেড়েই চলে। আরও অনেক বৈদ্য ডেকে আনা হল। তাঁরা একসঙ্গে পরামর্শ করে ঔষধ প্রয়োগ

করতে লাগলেন। বৈদ্যদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে একদিন ভোরেই ছেলেটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। সমস্ত ছাপিয়ে বাড়ীতে উঠল কান্নার রোল। পাড়াপড়শীরাও কাঁদল তার শোকে। কিশার চোখে জল নেই। সে মরা ছেলেকে কাঁধে নিয়ে চলল বাড়ীর বাইরে। রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হল, তাকেই সে বলল আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও, যা চাও তাই দেবো। কেউ তার কথা শুনে তাকে পাগলিনী বলে মনে করল, কেউ তার ব্যথায় ব্যথিত হল। সে পথ চলে আর একই কথা বলে। পথে এক ভক্ত বিজ্ঞব্যক্তি তাকে দেখে ভাবলেন একমাত্র ভগবান বুদ্ধই এ নারীকে দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে পারেন। তাই তিনি কিশার কাছে গিয়ে সহানুভূতির সুরে তাকে জিজ্ঞেস করলেন 'বোন তোমার কি চাই।

"আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন ?"

"সে কি এমন বড় কথা ? তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে তোলার লোক আছেন।"

ব্যস্তসমস্তভাবে কিশা জিজ্ঞেস করল—সে কোথায় ? "বোন, যাও শ্রাবস্তীর প্রান্তে ঐ জেতবনে ; সেখানে আছেন মহাসন্ন্যাসী যিনি মরাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন। কিশা আশান্বিত হয়ে ছুটল সেদিকে মৃত পুত্রকে কাঁধে নিয়ে। জেতবনে প্রবেশ করেই সে হাঁকল কোথায় সে মহাসন্ন্যাসী যে আমার ছেলের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারবে। ভিক্ষুগণ পুত্রশোকাতুরা জননীর অন্তরের বেদনা অনুভব করে ব্যথিত হলেন। অদূরে ছিলেন বুদ্ধ। তাঁর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিশা সেখানে গিয়ে বুদ্ধের চরণে রাখল মৃত পুত্রকে, বলল মিনতির সুরে—প্রভো, বাঁচিয়ে তুলুন আমার বাছাকে, আপনার চরণের দাসী হয়ে থাকবো চিরকাল।

বুদ্ধ বললেন—বোন, তুমি এক মুঠো সর্ষ এমন লোকের বাড়ী থেকে নিয়ে এসো, যার কেউ মরে নি, সেই সর্ষ দিয়ে তোমার ছেলের প্রাণ ফিরিয়ে এনে দিই।

কিশার মুখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল মহাপুরুষের কৃপায় তার মৃত পুত্র ফিরে পাবে। সে জেতবনের ফটক পেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল শ্রাবস্তীর দিকে। সেখানে গিয়ে সর্ষের আশায় পল্লীতে গিয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলো সে বাড়ী যাদের কেউ মরেনি। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খুঁজেও সে পেল না এমন বাড়ী যাদের কেউ মরেনি। তখন তাঁর চৈতন্যোদয় হল মৃত্যু জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি, জন্মালে মরতে হয়, তার কোন কালাকাল নেই।

তৎক্ষণাৎ সে পুত্রের শব শ্মশানে ফেলে দিয়ে বুদ্ধের চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করল। বুদ্ধ তাকে উপদেশে সত্যের সন্ধান দিয়ে ভিক্ষুণী করে নিলেন।

একদিন ভিক্ষুণী কিশা জীবন-মৃত্যুর স্রোতে জীবের আবর্তনের বিষয় ভাবতে ভাবতে ধ্যানমগ্না হলেন, তখন বুদ্ধ তাঁকে উপলক্ষ্য করে উপদেশচ্ছলে বললেন—অমৃতের সন্ধান না পেয়ে শত বৎসর বাঁচার চেয়ে অমৃত পদ উপলব্ধি করে একদিন বাঁচাও শ্রেয়।

উনিশ

সমৃদ্ধা বৈশালীর একান্তে ছিল একটি বিস্তীর্ণ আম্রবন। তার বিরাট তোরণদ্বার পেরিয়েই একটি প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন পথ সমান্তরালভাবে চলেছে মধ্যস্থ মনোরম কুঞ্জের দিকে। পথের দুই ধারে ফুলের সারি। তার পাশে পাশে সবুজ ঘাসে ঢাকা ভূতল ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ছে অনন্ত জলকণা শুভ্র পাষাণ নির্মিত ফোয়ারাগুলো থেকে। বাগানের মাঝে মাঝে সুন্দর পুষ্করিণীগুলোর স্বচ্ছ জলে ক্রীড়ারত হংসদল দৃষ্টি আকর্ষণ করে পথিকের। আম্রবনের কেন্দ্রস্থ কুঞ্জের মাথার ওপরে দেখা যায় কারুকার্যখচিত প্রাসাদ চূড়া শরতের শুভ্র খণ্ড মেঘের মত। তার শিল্প-শোভা লোককে বিস্ময়াভিভূত করে। কাননঘেরা সৌন্দর্যপূর্ণ বিশাল প্রাসাদকে রাজার প্রমোদোদ্যান বলেই মনে হয়। প্রমোদোদ্যান কথাটি এর পক্ষে অতিশয়োক্তি নয়। কারণ, এখানে প্রমোদ বিহারে আসেন রাজা রাজড়ারা ও ধনী বণিকেরা। এ হল তাঁদের নন্দন কানন। একটি নারীর প্রসাদকণা লাভের জন্য এখানে সহস্র সহস্র মুদ্রা এক একটি বৈঠকে উজাড় করে দেন তাঁরা। অসামান্য রূপলাবণ্যবতী নৃত্যগীতকুশলা এ রমণী যেন মর্তের মূর্তিমতী উর্বশী। তার অনায়াসলব্ধ ধন দিয়ে গড়ে উঠেছে বলে তার নামেই এ রমণীয় প্রাসাদ কানন আম্রপালীর আম্রবন নামে পরিচিত।

পতিতা বলে সমাজের কাছে সমাদর পায়নি আম্রপালী বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হয়েও। কিন্তু এজন্য কোনও দুঃখ ছিল না তার। ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মধ্যে প্রমোদ বিলাসে তার দিনরাত্রি কেটে যেত নগরের সেরা ব্যক্তিদের সোহাগ আদরে। সমাজ জীবনের কথা ভাববার অবকাশ তার কোথায়? বৎসরের পর বৎসর এভাবে কাটিয়ে সে ত্রিশ উত্তীর্ণ হয়েছে বহুদিন। এক টানা আমোদ প্রমোদে মন যেন অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। মনের কোণে সঞ্চিত হচ্ছিল বিরক্তি। এজন্য কতবার ফিরে গেছে তার দ্বার থেকে কত প্রেমিক

ক্ষুণ্ণ মনে। তার মন কি চায় আম্রপালী নিজেই বুঝতে পারে না। সুখ-সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যেও তার মনে বেজে ওঠে হাহাকার। সুখ সৌভাগ্য ভোগ বিলাস তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। দিনের পর দিন এ হাহাকার মনকে ক্ষুব্ধ অশান্ত করে তোলে। সংসারের কিছুতেই তার মন বসে না। ডাঙায় তোলা মাছের মত তার মন ছটফট করতে থাকে।

রাজা রাজড়ারা আসেন তার কাছে আগের মত। কিন্তু তাঁরা পান না তার মন। মনহীন দেহের লীলাভিনয় কেমন যেন বেসুরো লাগে তাঁদের। কোন কোন দিন তাঁরা প্রত্যাখ্যাতও হন সামান্য অজুহাতে। আম্রপালীর এ পরিবর্তন অদ্ভুত ঠেকে তাঁদের। তার উদাস মন কি যেন খুঁজে বেড়ায়। তার কাছে জগৎ ছিল এতদিন শুধু ইন্দ্রিয়ের খেলা। এখনো ইন্দ্রিয়লোলুপেরাই তো তাকে ঘিরে আছে। আজ তাদের সঙ্গ তিক্ত বিষাক্ত মনে হয় তার। তাদের আবিল আবেষ্টনী থেকে ছাড়া পেতে চায় তার মন। এর বাইরের জগৎ যে তার অজ্ঞাত। সে ভোলেনি—সে যে বারবণিতা, তার কোথাও স্থান নেই। জগতে যাঁরা সাধু সজ্জন, তাঁরা থাকেন বহু দূরে তার অপবিত্র সংস্পর্শ থেকে। মনের মধ্যে চলে ভাবের দ্বন্দ।

গ্রীষ্মকাল আম্রপালীর, আম্রবনের সমীপস্থ প্রান্তর ধূ ধূ করছে শূন্যতায়। মধ্যাহ্নের খর তাপ উপেক্ষা করে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদল নিয়ে এসে পৌঁছলেন সেই আম্রবনে। তিনি চীবর পেতে বসে পড়লেন ঘন ছায়ায়। তাঁর শিষ্যেরাও বনের ছায়ায় ছায়ায় বিশ্রামরত হলেন। তাঁদের পীতবসনের আভায় চারিদিক যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মধ্যাহ্নের উদাস স্তব্ধতায় যেন নতুন সুর বাজতে লাগলো আম্রপালীর আম্র কাননে। বুদ্ধের আগমন সংবাদ পৌঁছল আম্রপালীর কানে। তার সর্বাঙ্গ পুলকে শিউরে উঠল। মনে হল তার সঞ্চিত পাপরাশি এক নিমিষে ধুয়ে মুছে গেল, তার বাসভূমি পরিণত হল পুণ্য তপোবনে। তখনি সে ছুটে গেল বুদ্ধের কাছে, নিবেদন করল ভূলুণ্ঠিত প্রণাম। সিক্ত হল ভূতল তার নীরব অশ্রুধারায়। সমাজ তাকে শ্রদ্ধা করে না, স্বীকার করে না তার অন্তরকে—সে শুধু পতিতা, চিরকালের ঘৃণার পাত্রী। আজ করুণাঘন এসেছেন তার দ্বারে তাকে পঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে।

বুদ্ধ শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে সুরু করলেন ধর্মোপদেশ। শুনতে শুনতে আম্রপালী মগ্ন হয়ে গেল। সেই অমৃতক্ষরা বাণী তার জীবনে নিয়ে এল মহাত্যাগের মহালগ্ন। সে খুঁজে পেল পথ। শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় তার অন্তর হল পরিপূর্ণ।

ধর্মকথার অবসানে সে আগামী কালের জন্ত নিমন্ত্রণ করল সশিষ্য বুদ্ধকে তার বাসভবনে। বুদ্ধ নীরবে সম্মতি জানালেন। এ নিমন্ত্রণের কথা বৈশালী নগরে ছড়িয়ে পড়ল—বুদ্ধ পাঁচশ শিষ্য নিয়ে আম্রপালীর বাসভবনে আহার গ্রহণ করবেন। এ নিয়ে নানাজন নানা কথা বলতে লাগলো। কেউ বলল—ছি ছি গণিকার গৃহে নিমন্ত্রণ, কেউ বলল—তিনি ভগবান, তাঁর কাছে রাজ-ভবন আর পতিতা-গৃহ দুই-ই সমান। কিন্তু লিচ্ছবি রাজগণ বললেন—রাজভবন থাকতে বৈশালীতে পতিতার গৃহে বুদ্ধের সেবা অসম্ভব। তাঁরা যানবাহন নিয়ে ছুটে গেলেন বুদ্ধের কাছে, অনুরোধ করলেন রাজ-ভবনে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে। বুদ্ধ বললেন—আমি আম্রপালীর গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি, তাই আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে পারলাম না। লিচ্ছবিরা আম্রপালীকে অনুরোধ জানালেন নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করতে। তাঁদের অনুগৃহীতা পতিতার কাছে রাজ-অভিমানকে আজ তাঁরা খর্ব করতে রাজী নন। তাঁরা তো জানেন না আম্রপালীর অন্তরের বিরাট পরিবর্তনের খবর। তাই তাঁরা অর্থের লোভ দেখিয়ে তাকে বললেন—আম্র, সহস্র মুদ্রা তোমায় দেবো, তুমি এ নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করো। আম্রপালী বলল—রাজন্, আপনাদের সমস্ত অর্থের বিনিময়েও আমি এ নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করতে পারিনা। তার কথা শুনে লিচ্ছবিরা রসিকতা করে বললেন—আজ আম্র আমাদের হারিয়ে দিল, আম্রের জয় হলো।

পরদিন পূর্বাহ্নে বুদ্ধ শিষ্যদের নিয়ে আম্রপালীর বাসভবনে উপস্থিত হলেন। অননুভূত আনন্দে আম্রপালীর মন প্রাণ ভরে উঠল। সে স্বহস্তে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উপাদেয় আহার্য পরিবেশন করল। আহারের পর সে বলল—প্রভু, আমার সামান্ত দক্ষিণা দেবার আছে। স্মিতমুখে বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন—কি দেবে? তখনি আম্রপালী ভৃঙ্গার হাতে নিয়ে প্রণিপাত করে বলল—এ প্রাসাদ, এ কানন, আমার যা কিছু সম্পদ আছে, সমস্তই উৎসর্গ করলাম বুদ্ধের উদ্দেশে, সঙ্ঘের উদ্দেশে। সব কিছু দিয়ে সব কিছু পাওয়ার অতৃপ্ত আনন্দে তার চোখ ভরে জল এল।

সমগ্র বৈশালীতে ছড়িয়ে পড়ল এ অদ্ভুত দানের কথা। পরশমণির ছোঁয়া লেগে কি ভাবে লোহা সোনা হয়ে যায় তা বলাবলি করতে লাগলো বৈশালীর লোকেরা। আর একদিন তারা দেখল তখন পতিতা আম্রপালীকে ভিক্ষুণীর বেশে। তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সংযমের ছাপ, চোখে মুখে ধ্যানের দীপ্তি। জীবনের এ রূপান্তর বিস্ময় ঠেকল তাদের কাছে। তাঁর

জীবনের মহান পরিণতির সম্মুখে মস্তক নত করল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই। জীবন সন্ধ্যায় তাঁর উদ্‌গীত ভাবসঙ্গীতে এখনও প্রাণবান ভাবুকের প্রাণে ভাবরসের সঞ্চার হয়, কবির কবিত্ব উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

কুড়ি

মগধরাজ বিম্বিসারের অন্যতমা রাণী হলেন ক্ষেমা। তিনি ছিলেন পরমা সুন্দরী। এজন্য তাঁর প্রতি ছিল রাজার স্বাভাবিক আকর্ষণ। তা তাঁর রূপের গর্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। রূপের মোহমদিরা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে তুলল। সারাদিন তিনি রূপ-চর্চায় মগ্ন হয়ে থাকতেন। নিজের সৌন্দর্যের প্রশংসা শোনার জন্য তিনি উৎকর্ণ হতেন। তিনি যখন শুনলেন তাঁর স্বামীর পরমারাধ্য বুদ্ধ রূপের দোষ বর্ণনা করেন, বুদ্ধের প্রতি তাঁর মন হয়ে উঠল বিরূপ। তখন রাজবাড়ীর সবাই বুদ্ধ-দর্শনে যেতেন, কিন্তু ক্ষেমা বুদ্ধের কথা শুনতেই পারতেন না। রাজা কতবার চেষ্টা করেছেন তাঁকে বুদ্ধের কাছে নিয়ে যেতে, কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এমন কি রাজবাড়ীতে বুদ্ধের আগমন হলেও ক্ষেমা আত্মগোপন করতেন। তাঁর এ আচরণ রাজার অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হত।

বুদ্ধের প্রতি রাজা বিম্বিসারের শ্রদ্ধা ছিল অটল। বুদ্ধ যে তাঁর বদান্যতায় প্রতিষ্ঠিত মনোরম বেনুবন বিহারে মাঝে মাঝে এসে অবস্থান করতেন, তাতে তাঁর আনন্দের সীমা থাকত না। বেনুবন বিহারে অবস্থানকালে যেদিন তিনি বুদ্ধোপদেশ শ্রবণে বঞ্চিত হতেন, সেদিনটি তাঁর ব্যর্থ মনে হত। বুদ্ধের প্রতি যাঁর এমন ভক্তি, তাঁর সহধর্মিণীর বুদ্ধ-বিমুখতা তাঁর মনকে পীড়া দিত। তাই তিনি প্রিয়তমা পত্নীর কাছে বুদ্ধের অনন্ত গুণমহিমা বর্ণনায় পঞ্চমুখ হতেন। ভক্ত স্বামীর কাছে ও অন্যান্য পাঁচ জনের মুখে বুদ্ধ-মহিমার কথা শুনে ক্ষেমার মনে বুদ্ধ-ভক্তির উদয় হয়েছিল বটে, তবে বুদ্ধ যে রূপের দোষ বর্ণনা করেন—এ ছিল তাঁর অসহ্য। এজন্য বুদ্ধের কাছে যেতে তাঁর সাহস হত না। বুদ্ধ-সাক্ষাৎকার তাঁর কাছে ছিল একটি বিভীষিকা। রাজা নাছোড়বান্দা হয়ে রাণীকে বুদ্ধ দর্শন করাবার জন্য একটি কৌশল উদ্ভাবন করলেন। তিনি কবিদের ডেকে বেনুবনের সৌন্দর্য বর্ণনা করে গান রচনা করালেন। সে গান গাওয়া হল রাণী ক্ষেমার সম্মুখে। রাণী মুগ্ধ হলেন, সংকল্প প্রকাশ করলেন বেনুবন দর্শনের। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন।

একদিন অপরাহ্ণে সুসজ্জিত রাজ-রথ এসে থামল বেনুবনের অদূরে। সেখান থেকে সহচরী-বৃন্দ পরিবৃত হয়ে রাণী ক্ষেমা পায়ে চলার পথ অতিক্রম করে বেনুবনের দ্বারে এসে পড়লেন। বেনুবনের সৌন্দর্যপূর্ণ শান্ত পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করল। তিনি অভিভূত মনে ফটক পেরিয়ে বিহারের শোভা দেখতে লাগলেন। চারিদিকে অজস্র বৃক্ষের মাঝখানে এ তপোকুঞ্জ তাঁর কাছে অপরূপ মনে হল। এখানে যেন অনবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছে। তার পরিচ্ছন্ন পথ গুলোতে চলতে বেশ লাগছিল। তিনি ঘুরে ঘুরে বেনুবনের শান্ত মহিমা অনুভব করতে লাগলেন। অবশেষে সহচরীরা বললেন—চলুন বুদ্ধের দর্শন লাভ করি, এতো রাজার হুকুম। রাণী দ্বিধাজড়িত পদে অগ্রসর হলেন বিহারের দিকে। বিহারে প্রবেশ করেই তিনি দেখতে পেলেন সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমের মত বিকশিত-যৌবনা সুকন্যা ব্যজনহস্তে বুদ্ধের পাশে দাঁড়িয়ে বুদ্ধকে বাতাস করছে। তার সর্বাঙ্গ ঘিরে বইছে যেন রূপের ঢেউ। একটি দেহে এত সৌন্দর্যরাশি কখনো রাণীর চোখে পড়েনি। তিনি পলকহীন চোখে চেয়ে রইলেন সে সুরূপার পানে। তার কাছে নিজেকে রাণীর মনে হল একরাশ ছাই। তাঁর এতদিনের রূপের গর্ব এক নিমেষে চূর্ণ হল। সকল ভুলে তাঁর মুগ্ধ নয়ন নিবদ্ধ রইল সে দিব্য রূপরাশির ওপর। কোন দিকে তাঁর খেয়াল নেই। মনে মনে তিনি ভাবেন—এত রূপ কোত্থেকে পেল এ সুভগা নারী। এ যে মহাযোগীর যোগ বিভূতির প্রকাশ, তা রাণী টের পেলেন না।

কতক্ষণ অতিবাহিত হল। দেখতে দেখতে রাণীর মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সেই রূপসীর যৌবনের জোয়ারে পড়ল একটু টান অর্থাৎ ষোল সতেরো বৎসরের যৌবন রূপান্তরিত হয়ে এল বিশের কোঠায়, এ ক্ষুদ্র পরিবর্তনে রাণীর মনে জাগলো বিরক্তি। তারপর বিশের কোঠা ছাড়িয়ে তার বয়স যখন ত্রিশে এসে দাঁড়াল, রাণীর বিরক্তি আরও ঘনিয়ে উঠল। দেখতে দেখতে সে রূপসী বিগত-যৌবনা হয়ে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হল। চারিদিকে যেন অন্ধকার নেমে এল। তিনি অপলক নয়নে দেহের পরিণতি দেখতে লাগলেন। ক্রমে তার প্রৌঢ়ত্বের ওপর বার্ধক্যের ছায়াপাত হল। ভ্রমরকৃষ্ণ চিকণ কুঞ্চিত কেশরাশিতে শুভ্রতা দেখা দিল, গাত্রের মসৃণতা অন্তর্হিত হল। পরে বার্ধক্যের নির্মম নিষ্পেষণে দেহ লতার মত নুয়ে পড়ল, চোখ কোটরগত হল। সে জরাজীর্ণা নারী দণ্ড ভর করে সেখানে দাঁড়াল। হঠাৎ তার দণ্ড হস্তচ্যুত হল। কম্পমান দুর্বল দেহ তখনি ছিন্নমূল বৃক্ষের মত ভূতলশায়ী হয়ে পঞ্চত্ব লাভ করল। এ দৃশ্য রাণীকে গভীরভাবে অভিভূত করল। তাঁর দৃষ্টি হতে যেন একটি পর্দা খসে পড়ল। তিনি

অনাবৃত দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন তাঁর দেহের পরিণতি। জরায় রূপ যৌবন জল বুদ্‌বুদের মত শূন্যে মিলিয়ে যাবে, মৃত্যুতে দেহও নিশ্চিহ্ন হবে—এ চিন্তা সংসারের সুখ-সম্ভোগের প্রতি তাঁর মনে বিরক্তি এনে দিল। তাঁর মুমুক্ষু মন চাইল পথ। তখনি বুদ্ধ উপদেশ-গাথায় বললেন—মাকড়সা যেমন আপনার সৃষ্ট জালে আপনাকে জড়িয়ে রাখে, তেমনি লোক ভোগাসক্ত হয়ে আপনারই তৃষ্ণা-জালে আপনি জড়িত হয়; কিন্তু অনাসক্ত জ্ঞানী ঋষিগণ এ তৃষ্ণা-জাল ছিন্ন করে সকল দুঃখ জ্বালার অতীত হন। এ উপদেশের মধ্যে বাণী খুঁজে পেলেন পথ। তিনি হলেন ভিক্ষুণী, সাধনায় মগ্ন হয়ে অল্পকালের মধ্যে লাভ করলেন চরম সিদ্ধি। উত্তরকালে তিনি বুদ্ধের প্রধানা শিষ্যার পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

একুশ

একদিন বুদ্ধ জেতবনে থাকবার সময় শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন। তখন একদল ভিক্ষু জেতবনে উপস্থিত হয়ে আনন্দকে বললেন—বন্ধু আনন্দ, বহুদিন হল আমরা ভগবানের মুখে ধর্মকথা শুনেছি, আশা করি আমরা তাঁর মুখে আবার ধর্মকথা শুনতে পাবো। আনন্দ বললেন—বন্ধুগণ, তবে আপনারা রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রমে উপস্থিত হবেন, সেখানে ভগবানের বাণী শোনার সুযোগ হতে পারে।

বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে জেতবনে ফিরে এলেন। আহারের পর তিনি আনন্দকে ডেকে বললেন—আনন্দ, চলো আমরা পূর্বারামে যাই, সেখানে দিবা যাপন করব। আনন্দ 'হাঁ ভদন্ত', বলে সায় দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে তাঁর অনুগামী হলেন। পূর্বারামে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধ নিরালায় আত্ম-সমাহিত হয়ে রইলেন। যখন অপরাহ্ণ বেলা সায়াহ্নের কোলে গড়িয়ে পড়ল, তখন তিনি আসন ত্যাগ করে আনন্দকে স্নানের আয়োজন করবার নির্দেশ দিলেন। আনন্দ ব্যবস্থা করলেন। যখন বুদ্ধ স্নান সেরে গা মুছতে লাগলেন, তখন আনন্দ তাঁকে বললেন—ভদন্ত, রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রম খুব কাছেই, আশ্রমটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, তার সৌন্দর্যময় পরিবেশ অতি মনোরম, যদি অনুগ্রহ করে সেখানে উপস্থিত হন, তবে ভাল হয়। বুদ্ধ নীরবে সম্মতি জানালেন। অতঃপর তিনি রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তখন সেখানে ভিক্ষুগণ বসে ধর্মালাপ করছিলেন। তিনি তাঁদের আলাপের অবসান অপেক্ষা করে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁদের আলাপ শেষ হবার সঙ্গে

সঙ্গেই তিনি কাশির আওয়াজ দিয়ে কড়া নাড়লেন। ভিক্ষুগণ দরজা খুলে দিলেন।

বুদ্ধ আশ্রমে প্রবেশ করে পাতানো আসনে বসলেন এবং সেই ভিক্ষুদের জিজ্ঞেস করলেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এতক্ষণ কি আলাপ হচ্ছিল? তাঁরা বললেন—ভদন্ত, আপনাকে উপলক্ষ্য করে আমাদের ধর্মালাপ চলছিল, তার পর আপনি এলেন। তিনি তাঁদের উৎসাহিত করে বললেন—সাধু। তোমাদের মত কুলপুত্র যারা গৃহত্যাগ করে শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত হয়েছে, তাদের এরকম ধর্মালাপ একান্ত সঙ্গত; যখন তোমরা সমবেত হবে, তখন ধর্মালাপে রত হবে অথবা সচ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে নীরব থাকবে।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে ভিক্ষুগণ, জগতে যে সন্ধান চলছে, তা দু-প্রকার—একটি আর্য বা অনাবিল সন্ধান এবং অপরটি অনার্য বা আবিল সন্ধান। কারো সন্ধান স্ত্রী-পুত্র দাসদাসী ভোগ সম্পদে সীমাবদ্ধ। এ হচ্ছে—জন্মজরাতুর ব্যাধিমৃত্যুগ্রস্ত শোকসংক্লেশধর্মী হয়ে জন্মজরাতুর ব্যাধিমৃত্যুগ্রস্ত শোকসংক্লেশ-ধর্মীকে সন্ধান করা। নিজে যেমন জন্ম জরা ব্যাধিমৃত্যু শোকসংক্লেশের অধীন তেমনি তার সঞ্চিত স্ত্রীপুত্রাদিও অনতীত। এতাদৃশ সন্ধানে মগ্ন হয়ে মাতাল হয়ে আসক্ত হয়ে লোক জন্ম-জরা, ব্যাধি-মৃত্যু ও শোকসংক্লেশের আবর্তে নিমজ্জিত হয়। একেই বলে অনার্য সন্ধান।

আবার কেউ জন্ম-জরা, ব্যাধি-মৃত্যু ও শোক-সংক্লেশের মধ্যে থেকে যখন এগুলোর পীড়ন অনুভব করে, তখন জন্ম-জরা, ব্যাধি-মৃত্যু ও শোক-সংক্লেশের অতীত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণের সন্ধান করে। একেই বলে আর্য সন্ধান। হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধি লাভের পূর্বে বোধিসত্ত্বাবস্থায় গার্হস্থ জীবনে আমিও অনার্য সন্ধানে রত ছিলাম অর্থাৎ পুত্র পরিবার ও ভোগসম্পদে মগ্ন ছিলাম। এ মগ্নভাবের অন্তরালে আমার মনে হয়েছিল—জন্ম-জরা, ব্যাধি-মৃত্যু ও শোক-সংক্লেশ আমায় ঘিরে আছে, এগুলোর কবলে পড়ে আমি বিপন্ন; আমার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণও এ দুর্দশার মধ্যে এবং ভোগসম্পদের পরিণতিও তাই। তখন আমি ভাবতে লাগলাম—আমি জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু পীড়িত হয়ে অন্য জন্মজরাতুর ব্যাধিমৃত্যু-ক্লিষ্টকেই সংসারের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি কেন, যেখানে জন্মের আবর্তন নেই জরার স্পর্শ নেই, ব্যাধির পীড়ন নেই এবং মৃত্যুর সংঘাত নেই, সেখানকার পথ খুঁজছিনা কেন? আমি অজর অব্যাধি অমৃত অসংক্লিষ্ট অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণের সন্ধান করবো। এ সংকল্প নিয়ে আমি তরুণ বয়সে ভদ্র যৌবনে রোরুদ্যমান মাতাপিতার নিষেধসত্ত্বেও কেশশ্মশ্রু বর্জন

করে কাষায়বাস পরিধান পূর্বক গৃহত্যাগী প্রব্রজিত হয়েছিলাম। এভাবে প্রব্রজিত হয়ে অন্তরে জিজ্ঞাসা নিয়ে অনুত্তর অমৃতপদের সন্ধানে ঋষি আড়ার কালামের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলাম। অচিরেই তাঁর শাস্ত্রে আমার বুৎপত্তি হয়েছিল। তখন আমার মনে হলো—এ শাস্ত্র আচার্য আড়ার কালাম শুধু অন্ধ বিশ্বাসে নয়, উপলব্ধির ভিতর দিয়ে আয়ত্ত করেছেন। সে উপলব্ধির জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে নির্দেশ গ্রহণ করলাম। আমার স্বভাবলব্ধ শ্রদ্ধা বীর্য স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞায় আমি শীঘ্রই অরূপ ধ্যানের তৃতীয় স্তরে উপনীত হলাম। আমার এ কৃতিত্বে আচার্য বিস্মিত হয়ে বললেন—তোমার মত লোক পাওয়া পরম সৌভাগ্য; আমি যা জানি, তুমিও তা জানো, আমি যা উপলব্ধি করেছি, তুমিও তা উপলব্ধি করেছো, তোমাতে আমাতে কোন তফাৎ নেই। এভাবে আড়ার কালাম আমার গুরু হয়ে আমাকে সমান আসন দান করলেন। সেদিন থেকে আমার সম্মান খ্যাতির খুব বেড়ে গেল।

তখন আমার মনে হতে লাগলো—এ উপলব্ধি অরূপ ধ্যানের তৃতীয় স্তর মাত্র। নির্বাণের উপলব্ধির জন্য এর সীমা অতিক্রম করে বহুদূর অগ্রসর হতে হবে। তাই উপলব্ধ স্তরে আত্মতুষ্ট না হয়ে ঋষি আড়ারের আশ্রম ত্যাগ করলাম। বিরাট জিজ্ঞাসা নিয়ে অনুত্তর অমৃতপদের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে ঋষি উদ্রক রামপুত্রের নিকট নতুন করে দীক্ষা নিলাম। তাঁর শাস্ত্রও অনায়াসে আয়ত্ত করে তাঁর নির্দিষ্ট সাধনায় আত্মনিয়োগ করলাম। অচিরেই সিদ্ধিলাভ হল। আমি অরূপ ধ্যানের চতুর্থ স্তরে উপনীত হলাম। আমার উপলব্ধিতে বিস্মিত হয়ে তিনিও আচার্য আড়ারের মত বললেন—আমার উপলব্ধি তোমার উপলব্ধি এক, আমাতে তোমাতে কোন তফাৎ নেই, চলো দুজনে এ শিষ্যসঙ্ঘের পরিচালনা করি। কিন্তু তাঁর উদার উক্তিতে আমার মন তৃপ্ত হল না। তাই তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম সে বিরাট জিজ্ঞাসা নিয়ে নির্বাণের সন্ধানে। নানা স্থান ঘুরে (দীর্ঘ দিনের কঠিন তপস্যার পর) আমি নৈরাঞ্জনার তীরে উরুবিল্ব সেনানী নিবাসে পৌঁছলাম, সেখানে দেখলাম রমনীয় ভূভাগ, মনোরম বন, স্বচ্ছসলিলা প্রবাহমানা নদী এবং চতুর্দিকের তরুলতাচ্ছন্ন গোচর গ্রাম।

এখানে এসে আমার মনে হল—এটি তপস্যার্থী কুলপুত্রের তপস্যার উপযুক্ত স্থানই বটে। তপস্যার উপযুক্ত জায়গা মনে করে আমি সেখানেই বসে পড়লাম। সেই আসনেই আমি জন্ম-জরা, ব্যাধি-মৃত্যু এবং শোক-সংক্লেশের দোষ প্রত্যক্ষ করে অজাত অজর অব্যাধি অমৃত অসংক্লিষ্ট অনুত্তর যোগক্ষেম

নির্বাণ উপলব্ধি করলাম। আমার জ্ঞান-রাজ্যের দ্বার খুলে গেল, দৃষ্টির আবরণ খসে পড়ল। চিত্তের বিমুক্তি হল সম্পূর্ণ, এ জন্ম আমার অন্তিম জন্ম, আমার পুনর্জন্ম নেই।

অতঃপর বুদ্ধ বর্ণনা করলেন নবোপলব্ধ ধর্মের প্রথম প্রচারের ইতিবৃত্ত। সমবেত ভিক্ষুগণ তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন। সে বর্ণনা শেষ করে তিনি ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন। হে ভিক্ষুগণ, চক্ষুগ্রাহ্য রূপ যা মনোরম কমনীয় লোভনীয় কামনাসিক্ত, কর্ণগ্রাহ্য শব্দ বা মধুবর্ষী প্রিয়ঙ্কর কামনাসিক্ত, ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধ যা মনোমুগ্ধকর প্রাণমাতানো কামনালিপ্ত, রসনাগ্রাহ্য রস যা সুস্বাদু মধুর কামনারঞ্জিত এবং কায়গ্রাহ্য স্পর্শ যা সুখকর মোহাবেশময়—এগুলো পঞ্চ কাম। যারা এ পঞ্চ কামে গ্রথিত মূর্ছিত মগ্ন হয়ে অন্ধভাবে রূপরসাদির অনুসরণ করে, তারা অরণ্যে পাশবদ্ধ মৃগের মত পাপী মারের কবলে পড়ে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত হয়। যারা পঞ্চ কামে অগ্রথিত অমূর্ছিত অনাসক্ত থেকে রূপরসাদির দোষদর্শী হয়ে চলে, তারা অরণ্যের মুক্ত মৃগের মত দুঃখদুর্দশা হতে মুক্ত থাকে। যেমন বন-মৃগ গভীর বনভূমিতে ব্যাধের অগোচরে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে চলে, বসে, শয়ন করে, তেমনি ভিক্ষু কাম ও কুপ্রবৃত্তি হতে বিবিক্ত হয়ে ধ্যানের প্রথম স্তর লাভ করে মারচক্ষুর অন্তরালে নির্বিঘ্নে অবস্থান করে। আবার ধ্যানের প্রথম স্তর অতিক্রম করে দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হয়। তখন প্রীতি, আনন্দ ও শান্তিতে সমস্ত চিত্ত প্লাবিত হয়ে যায়। এভাবে সে ক্রমশঃ ধ্যানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করে। জ্ঞানের আবরণ উন্মোচনে তার কাম ক্রোধাদি সকল রিপু সমূলে উৎপাটিত হয়। এই ভিক্ষু মারকে বধ করে মারচক্ষুর অগোচরে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে চলে, বসে ও শয়ন করে। কারণ, পাপী মারের রাজ্য অতিক্রম করে তার মন নির্বাণের গভীরে মগ্ন।

বাইশ

শ্রাবস্তীর ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি একদিন মধ্যাহ্নে শ্বেতাশ্বযুক্ত রজতময় রথে নগর ভ্রমণ করছিলেন। শুভ্রবসন পরিহিত ব্রাহ্মণের শুভ্রশোভা যেন রথের ভিতর থেকে ঠিকরে পড়ছিল। তিনি দূর থেকে পরিব্রাজক পিলোতিককে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—ভবৎ বাৎস্যায়ন, এ দিন দুপুরে কোত্থেকে আসছেন। উত্তরে পরিব্রাজক বললেন—শ্রমণ গৌতমের কাছ থেকে। ব্রাহ্মণ একবার বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে পরিব্রাজকের দিকে

তাকালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—ভবৎ বাৎস্যায়ন, শ্রমণ গৌতমের জ্ঞান পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আপনার মত কি? পরিব্রাজক আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—ভবৎ, আমি কে শ্রমণ গৌতমের জ্ঞান পাণ্ডিত্য বুঝব, যিনি শ্রমণ গৌতমের জ্ঞান পাণ্ডিত্য বুঝবেন, তিনিও তাঁর মত হবেন।

ব্রাহ্মণ—ভবৎ বাৎস্যায়ন, আপনি যে শ্রমণ গৌতমকে উদার উজ্জ্বল ভাষায় প্রশংসা করছেন।

পরিব্রাজক—ভবৎ, আমি কে তাঁর প্রশংসা করবার? তিনি প্রশংসিতের প্রশংসিত, তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

ব্রাহ্মণ—ভবৎ বাৎস্যায়ন, কি কারণে আপনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন?

পরিব্রাজক—যেমন দক্ষ হস্তীবিদ হস্তী-অধ্যুষিত বনে প্রবেশ করে আয়ত প্রশস্ত প্রশস্ত প্রকাণ্ড হস্তীপদাঙ্ক দেখে হস্তীর বিশালতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তেমনি আমি শ্রমণ গৌতমের অসাধারণতা লক্ষ্য করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। আমি অনেক পণ্ডিতদের দেখি যাঁরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন দিগ্বিজয়ী তার্কিক। তাঁরা যখন শোনেন শ্রমণ গৌতম অমুক গ্রামে কিংবা নিগমে আসবেন, তখন তাঁরা প্রশ্ন রচনা করেন এবং পরিকল্পনা করেন—শ্রমণ গৌতমকে এ প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করব; যদি তিনি এ উত্তর দেন, তবে এ ভাবে বাদারোপ করব; যদি এরও উত্তর দিতে সমর্থ হন, তবে এ ভাবে বাদারোপ করব; যদি এরও উত্তর দিতে সমর্থ হন, তবে অন্য-ভাবে জব্দ করব। কিন্তু যখন এ পণ্ডিতগণ শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হন, তিনি তাঁদের ধর্মালাপে অভিভূত করেন। তখন তাঁরা তাঁকে প্রশ্নই জিজ্ঞেস করেন না, বাদারোপের কথাই বা কি? আশ্চর্যের বিষয়, এ পণ্ডিতেরাই শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে—তিনি ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম সুপ্রকাশিত এবং তাঁর শিষ্য-সঙ্ঘ সৎপথে আছেন।

পরিব্রাজকের এ উক্তি শুনে ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি রথ থেকে নেমে উত্তরীয়ের একাংশ অনাবৃত করে কৃতাঞ্জলিপুটে উচ্ছ্বসিত আবেগে উচ্চারণ করলেন—সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার।

অতঃপর একদিন ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন, এবং সম্ভাষণ পূর্বক তাঁকে জানালেন পরিব্রাজকের সঙ্গে নিজের সে আলাপের কথা। বুদ্ধ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, এতে হস্তীপদের উপমা সম্পূর্ণ হয়নি; এ উপমা কিভাবে সম্পূর্ণ হয় তা শুনুন। তিনি বলতে লাগলেন।

হে ব্রাহ্মণ, যেমন হস্তীবিদ হস্তী-অধ্যুষিত বনে প্রবেশ করে আয়ত প্রশস্ত হস্তীপদাঙ্ক দেখে। যে দক্ষ হস্তীবিদ হয়ে, সে তা দেখা মাত্র হস্তীর বিশালতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না। তার কারণ, বনে 'কামনিকা' বলে যে হস্তিনীরা আছে, তাদের পদগুলো প্রকাণ্ড হয়, এ পদাঙ্ক তাদেরও হতে পারে। তা অনুসরণ করে সে আরও গভীর বনে প্রবেশ করে দেখতে পায় প্রকাণ্ড হস্তীপদাঙ্ক এবং হস্তীর উচ্চতার প্রমাণ। দক্ষ হস্তীবিদ তা দেখেও হস্তীর বিশালতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয় না। তার কারণ, বনে উচ্চ 'কালারিকা' বলে যে হস্তিনীরা আছে, তাদের পদগুলোও প্রকাণ্ড হয়। এ পদাঙ্ক তাদেরও হতে পারে। সে আরও অগ্রসর হয়ে দেখে প্রকাণ্ড হস্তীপদাঙ্ক, উচ্চতার প্রমাণ এবং উপরে দন্তের চিহ্ন। তাতেও দক্ষ হস্তীবিদ হস্তীর বিশালতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয় না। তার কারণ, বনের উচ্চ 'কনেরুকা' হস্তিনীদের পদগুলোও প্রকাণ্ড। এ পদচিহ্ন তাদের হওয়া বিচিত্র নয়। তাই সে আরও গভীর বনে অনুসন্ধান করতে করতে যখন দেখে প্রকাণ্ড হস্তীপদাঙ্ক, লক্ষ্য করে উচ্চতার প্রমাণ, উপরে দন্তের চিহ্ন, বৃক্ষশাখার ভাঙন এবং অবশেষে দেখতে পায় সেই প্রকাণ্ড হস্তীকে, তখন সে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—এটিই বিশালকায় হস্তী। ঠিক তেমনি লোক বুদ্ধকে দেখে তাঁর ধর্মকথা শুনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হয় এবং সেই শ্রদ্ধায় সত্যের সন্ধানে তাঁর কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। অতঃপর সে শীলপালনে সুসংযত যথালাভ তুষ্ট হয় এবং অন্তরে অনবদ্য আনন্দ অনুভব করে। সে ইন্দ্রিয়গুলোকে সুসংবৃত করে সদাজাগ্রত হয়ে অরণ্যে বৃক্ষতলে পর্বত কন্দরে গিরিগুহায় শ্মশানে উন্মুক্ত অবকাশে নির্জনচারী হয় এবং আহারান্তে আসনবদ্ধ হয়ে লোলুপতা ত্যাগ করে নির্লোলুপ হয়, বিদ্বেষ পরিহার করে বিদ্বেষহীন অনুকম্পাপরায়ণ হয়, আলস্য বিনোদন করে নিরলস হয়, মনের চাঞ্চল্য ত্যাগ করে শান্তচিত্ত হয়, সংশয় বিদূরিত করে সংশয়হীন হয়।

এভাবে সে ভিক্ষু মনের উপক্লেশগুলোকে দৌর্বল্যসমূহকে পরিহার করে কামনা ও কুপ্রবৃত্তির সীমা অতিক্রম করে ধ্যানের প্রথম স্তরে উপনীত হয়। তার সমস্ত সত্তা আনন্দে আপ্লুত হয়। হে ব্রাহ্মণ, একেও বলা হয় বুদ্ধপদাঙ্ক, বুদ্ধসেবিত, বুদ্ধানুসৃত, কিন্তু আর্যশ্রাবক এতে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না যে তিনি ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম সুপ্রকাশিত এবং তাঁর শিষ্যসঙ্ঘ সুপথারূঢ়।

অতঃপর সে ভিক্ষু সাধনার প্রভাবে ধ্যানের প্রথম স্তর উত্তীর্ণ হয়ে দ্বিতীয় স্তর লাভ করে। তখন প্রীতি, আনন্দ ও শান্তিতে সমস্ত চিত্ত প্লাবিত হয়ে যায়। হে ব্রাহ্মণ, একেও বলা হয় বুদ্ধপদাঙ্ক, বুদ্ধসেবিত, বুদ্ধানুসৃত, কিন্তু আর্যশ্রাবক এতেও সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না যে তিনি ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ তাঁর ধর্ম সুপ্রকাশিত এবং তাঁর শিষ্যসঙ্ঘ সুপথারূঢ়।

সে এভাবে ক্রমশঃ ধ্যানের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে উন্নীত হয়। তাঁর ধ্যান-সমৃদ্ধ মন যখন শান্ত শুদ্ধ নির্মল অচঞ্চল ও নমনীয় হয়, তখন সে আপনার মনকে ঋদ্ধির দিকে পরিচালিত করে এবং বিবিধ যোগবিভূতি প্রকাশে সক্ষম হয়—যথা, সে এক হয়ে আপনাকে বহুরূপে রূপায়িত করে এবং আপনার বহুরূপকে একীভূত করে; সে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়, প্রাচীর ও পাষাণের ভিতর দিয়ে অবাধে যাতায়াত করে, ভূগর্ভে প্রবেশ করে পুনরুত্থিত হয়, জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় এবং আকাশে শূন্য পথে বিচরণ করে। সে সাধনার প্রভাবে দিব্যকর্ণ লাভ করে দূরের নিকটের মানুষিক অতিমানুষিক সকল শব্দ শুনতে পায়। অতঃপর সে পরের চিত্ত উপলব্ধি করে, আপনার জন্মজন্মান্তর দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মত দেখতে পায় এবং জীবজগতের জন্ম-মৃত্যুর গোপন লীলা প্রত্যক্ষ করে। হে ব্রাহ্মণ, এগুলোকেও বলা হয় বুদ্ধপদাঙ্ক, বুদ্ধসেবিত, বুদ্ধানুসৃত। তবুও আর্যশ্রাবক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না যে তিনি ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম সুপ্রকাশিত এবং তাঁর শিষ্যসঙ্ঘ সুপথারূঢ়।

অবশেষে সে চারি আর্যসত্য উপলব্ধি করে অন্তরের সমস্ত রিপুদল নির্মূলিত করে বন্ধনহীন অর্হৎ হয়। তার পুনর্জন্মের অবসান ঘটে, আর কোন কর্তব্য থাকে না। হে ব্রাহ্মণ, একে বলা হয় বুদ্ধপদাঙ্ক, বুদ্ধসেবিত, বুদ্ধানুসৃত। এ অবস্থায় আর্যশ্রাবক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—তিনি একান্তই ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম সুপ্রকাশিত এবং শিষ্যসঙ্ঘ সুপথারূঢ়। হে ব্রাহ্মণ, এতেই হস্তীপদের উপমা সম্পূর্ণ হয়।

ব্রাহ্মণ ভগবানের বাণীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শরণাগত হলেন।

তেইশ

বুদ্ধ যখন জেতবনে অনাথপিণ্ডদের বিহারে বাস করতেন, তখন মৌলিয়-ফাল্গুন নামক জনৈক ভিক্ষু কতিপয় ভিক্ষুণীর সঙ্গে অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এত বেড়ে যায় যে, কোনো ভিক্ষু যদি

সেই ভিক্ষুণীদের নিন্দা করতেন, তাহলে ভিক্ষু মৌলিয় ফাল্গুন ক্ষোভে ক্রোধে অধীর হয়ে সে ভিক্ষুরই দোষারোপ করতেন। আবার যদি কোন ভিক্ষু সেই ভিক্ষুণীদের সম্মুখে মৌলিয় ফাল্গুনের নিন্দা করতেন, তাহলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে সে ভিক্ষুর প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করতেন। এরূপ আচরণ ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের অত্যন্ত অশোভন মনে হল। বিষয়টি বুদ্ধের কানে পৌঁছল। তিনি ডাকালেন সে ভিক্ষুকে। সকলের সম্মুখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—হে ফাল্গুন, সত্যি কি তুমি ভিক্ষুণীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাক; কেউ তাদের নিন্দে করলে, ক্রুদ্ধ হয়ে তার দোষারোপ কর? ফাল্গুন ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, হাঁ। বুদ্ধ—হে ফাল্গুন, তুমি কি কুলপুত্র হয়ে শ্রদ্ধায় গৃহ ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করনি?

ফাল্গুন—হাঁ, ভদন্ত।

বুদ্ধ—হে ফাল্গুন, তোমার মত শ্রদ্ধাপ্রব্রজিত কুলপুত্রের পক্ষে এ আচরণ কখনো সঙ্গত নয়। যদি তোমার সম্মুখে কেউ সেই ভিক্ষুণীদের নিন্দা করে, তা হলেও তুমি গার্হস্থ্য সংকল্প ত্যাগ করবে, শিক্ষানিবিষ্ট হয়ে মনে মনে ভাববে, এজন্য আমার মন চঞ্চল হবে না, দুর্বাক্য ব্যবহার করব না, সকলের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করে হিতানুকম্পী হয়ে অবিদ্বিষ্ট মনে থাকব। যদিও কেউ তোমার সম্মুখে সেই ভিক্ষুণীদের প্রহার করে আঘাত হানে, তা হলেও তুমি গার্হস্থ্য আলয় গার্হস্থ্য সংকল্প ত্যাগ করবে; শিক্ষানিবিষ্ট হয়ে মনে মনে ভাববে এ জন্য আমার মন চঞ্চল হবে না, আমি দুর্বাক্য ব্যবহার করব না, সকলের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করে হিতানুকম্পী হয়ে অবিদ্বিষ্ট মনে থাকবে।

হে ফাল্গুন, যদি কেউ তোমার নিন্দা করে, তখনও যেন তোমার মন বিচলিত না হয়, মুখে দুর্বাক্য না আসে; সকলের প্রতি তুমি মৈত্রীমানস প্রসারিত করে হিতানুকম্পী হয়ে বিদ্বেষ-শূন্য মনে বাস করবে। যদি কেউ তোমাকে প্রহার করে শস্ত্রাঘাত করে, তখনো যেন তোমার মন অবিচলিত থাকে, মুখে দুর্বাক্য না আসে, সকলের প্রতি মৈত্রীমানস প্রসারিত করে তুমি হিতানুকম্পী হয়ে বিদ্বেষশূন্য মন নিয়ে থাকবে।

অতঃপর বুদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন—হে ভিক্ষুগণ, এককালে ভিক্ষুরা আমার মন তৃপ্ত করেছিল তাদের আচরণে। তাদের অনুশাসন করবার কিছু ছিল না, শুধু উপদেশের ভিতর দিয়ে তাদের স্মরণ করিয়ে দিতাম করণীয়গুলো। হে ভিক্ষুগণ, যেমন রাস্তার মোড়ে সুভূমিতে সুশিক্ষিত অশ্বযুক্ত রথ প্রস্তুত থাকে, নিপুণ রথচালক তাকে ইচ্ছামত অনায়াসে

পরিচালিত করে, তেমনি সেই ভিক্ষুদের অনায়াসে উপদেশের ভিতর দিয়ে শুধু করণীয়গুলো স্মরণ করিয়ে পরিচালিত করতাম। তাই তোমরাও অকুশল বা পাপ ত্যাগ কর, কুশল ধর্ম সম্পাদনে বা সৎকার্যে রত হও। তাহলে এ ধর্মবিনয়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে, সমৃদ্ধিসম্পন্ন হবে। হে ভিক্ষুগণ, গ্রাম কিংবা নিগমের অনতিদূরে আগাছাপূর্ণ শালবনের আগাছাগুলো ফেলে দিয়ে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে যত্ন করলে তাতে সেই শালবন যেমন সুসমৃদ্ধ শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়, তেমনি তোমরাও পাপ ত্যাগ করে পুণ্যানুষ্ঠানে রত হলে এ ধর্মবিনয়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করবে সুসমৃদ্ধ হবে।

হে ভিক্ষুগণ, অতীত কালে এই শ্রাবস্তীতেই বৈদেহিকা নাম্নী এক গৃহিণী ছিল। তার শান্তভাব বিনীতভাব ও সুশীলতার প্রশংসা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৈদেহিকার কালী নাম্নী এক পরিচারিকা ছিল। সে ছিল দক্ষা অনলসা ও কর্মনিপুণা। একদিন কালী ভাবল—তাইতো আমার গৃহস্বামিণীর সবাই প্রশংসা করে, সত্যি কি তাঁর ভিতরে রাগ নেই, না নিজের রাগ তিনি প্রকাশ করেন না, অথবা আমার কর্ম-কুশলতার জন্য তাঁর রাগ দেখাতে হয় না? সে গৃহস্বামিণীকে পরীক্ষা করবার জন্য একদিন দেরী করে উঠল। বৈদেহিকা তাকে তাকে জিজ্ঞেস করল—ওরে কালী, আজকে উঠতে তোর এত দেরী হচ্ছে কেন? কালী উত্তর দিল—না, না, কিছুই নয়। 'না কিছু হয়নি, পাপী দাসী কোথাকার' এই বলে বৈদেহিকা ভ্রূকুঞ্চিত করল। তখন কালী মনে মনে ভাবতে লাগলো—আমার গৃহস্বামিণীর তো বেশ রাগ আছে, শুধু তিনি রাগ প্রকাশ করেন না, আমার কর্মকুশলতার জন্যই তাঁর রাগ দেখাতে হয় না, তাঁকে আর একটু পরীক্ষা করব। অতঃপর কালী আরও দেরী করে উঠল। বৈদেহিকা তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করল। তার পরের দিনও কালী সেইভাবে দেরী করে উঠল। গৃহস্বামিণী ক্রুদ্ধ বচনে কালীকে বলল—আজও তুই দেরী করে উঠলি। কালী উত্তর দিল—দেরী কোথায়? এ উত্তর শুনে গৃহস্বামিণীর ক্রোধ দ্বিগুণ জ্বলে উঠল। সে রাগে উন্মত্ত হয়ে অর্গল হাতে নিয়ে কালীর মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিল। মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো। পরিচারিকা আহত মস্তকে প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলে বেড়াতে লাগলো—আপনারা সবাই দেখুন, আপনাদের শান্তার কর্ম সুশীলার কর্ম। সকালে উঠতে দেরী হয়েছে বলে তিনি অর্গলের ঘা দিয়ে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন। এ দৃশ্য দেখে লোক শিশউরে উঠল। সেই

থেকে পাড়ায় বৈদেহিকার সুনাম আর রইল না। চারিদিকে তার দুর্নাম রটে গেল দুর্বিনীতা চণ্ডী বৈদেহিকা বলে।

হে ভিক্ষুগণ, এখানেও কোন কোন ভিক্ষু আছে বৈদেহিকার মত শান্ত সুশীল সুবিনীত, যতক্ষণ না অপ্রিয় বাক্য তাকে ব্যথিত করছে। অপ্রিয় বাক্যে যে চঞ্চল না হয়ে শান্ত সুশীল সুবিনীত থাকে, তাকেই আমি বলি শান্ত সুশীল সুবিনীত। যে ভিক্ষু অন্ন-বস্ত্রাদির জন্য বিনীত হয়, তাকে আমি বিনীত বলে স্বীকার করি না, তার কারণ অন্নবস্ত্রাদি না পেলে হতাশায় সে তখন অন্য মূর্তি ধারণ করে। যে ভিক্ষু ধর্মের প্রতি সম্মান গৌরব অন্তরে বহন করে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে বিনীত হয়, তাকেই আমি বলি বিনীত। তাই তোমাদের সংকল্পবদ্ধ হওয়া উচিত—আমরা ধর্মের প্রতি সম্মান গৌরব অন্তরে বহন করে বিনীত হবো।

হে ভিক্ষুগণ, লোক তোমাদের বলতে পারে সময়ে কিংবা অসময়ে সত্য, কথায় কিংবা অসত্য কথায়, মধুর ভাষায় কিংবা কর্কশ ভাষায়, অর্থপূর্ণ বচনে কিংবা অর্থহীন বচনে, মৈত্রীপূর্ণ ভাবে কিংবা ক্রুদ্ধভাবে, যে ভাবে বলুক না কেন তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত—আমাদের চিত্ত চঞ্চল হবে না, দুর্বাক্য ব্যবহার করব না, হিতাকাঙ্ক্ষী মৈত্রীচিন্তারত হয়ে অবিদ্বিষ্ট মনে থাকবো এবং সেই ব্যক্তির প্রতি মৈত্রীমানস প্রসারিত করে সমগ্র জগতকে বিপুল অফুরন্ত মৈত্রীধারায় প্লাবিত করে অবস্থান করবো।

হে ভিক্ষুগণ, ধরো কোন লোক কোদাল ও ঝুড়ি নিয়ে এসে বলে 'আমি এ পৃথিবীকে ধ্বংস করব' এবং এখানে সেখানে খনন করতে থাকে থুথু ফেলতে থাকে মূত্রত্যাগ করতে থাকে পৃথিবীর ধ্বংসের জন্য। তাতে কি এ পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়? ভিক্ষুগণ উত্তর করলেন—না, ভদন্ত, তাতে এ পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে না; তার কারণ, পৃথিবী গভীর অপ্রমেয় বিপুল; তাকে ঐ ভাবে ধ্বংস করা অসম্ভব, তাতে সেই লোকটিই শুধু দুঃখলাঞ্ছনার ভাগী হবে।

হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত—আমরা পৃথিবীর মত গভীর অপ্রমেয় বিপুল চিত্ত গড়ে তুলব মৈত্রী-ভাবনায়, যে পৃথিবীসম চিত্তকে কেউ কোনভাবে ক্ষুব্ধ চঞ্চল করতে পারবে না।

হে ভিক্ষুগণ, ধরো কোন লোক রঙ নিয়ে এসে বলে আমি এই আকাশে চিত্রাঙ্কন করব। সে লোকটি কি আকাশের ওপর রঙ ফলাতে পারবে? ভিক্ষুগণ উত্তর করলেন—না, ভদন্ত, কারণ আকাশ রূপহীন শূন্য, তাকে চিত্রিত করা অসম্ভব, তাতে সেই লোকটিই দুঃখ কষ্ট পাবে।

হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত—আমরা আকাশসম বিপুল মহদ্গত অপ্রমেয় মৈত্রীসমৃদ্ধ চিত্ত নিয়ে থাকবো, যার ওপর হিংসা বিদ্বেষের রঙ ফলানো কোন রকমে সম্ভব হবে না।

হে ভিক্ষুগণ, ধরো কোন লোক জ্বলন্ত তৃণমশাল নিয়ে এসে বলে 'আমি এই জ্বলন্ত মশালে গঙ্গার বারিধারাকে তপ্ত করব সন্তপ্ত করব।' সে লোকটি কি সেই জ্বলন্ত তৃণমশাল দিয়ে গঙ্গার বারিরাশিকে তপ্ত করতে পারবে? ভিক্ষুগণ উত্তর করলেন—না, ভদন্ত, কারণ গঙ্গানদীর জল গভীর অপ্রমেয়, তাকে ঐভাবে তপ্ত করা সম্ভব নয়, তাতে সে শুধু দুঃখাবসাদগ্রস্ত হবে।

হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত—আমরা গঙ্গাসম গভীর বিপুল অপ্রমেয় মৈত্রীমানস নিয়ে বাস করব যা অক্ষুব্ধ অতপ্ত থাকবে।

হে ভিক্ষুগণ, আততায়ী দস্যু যখন দীর্ঘ করাত দিয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ ছেদন করতে থাকে, তখনও যে মনকে দূষিত করে, সে সেজন্য আমার উপদেশ পালনকারী নয়। সেখানেও যেন তোমাদের মন বিচলিত না হয়, মুখে দুর্বাক্য না আসে, হিতাকাঙ্ক্ষী মৈত্রীচিন্তারত হয়ে অবিদ্বিষ্ট মনে থাকবে এবং সেই দস্যুর প্রতি মৈত্রীমানস প্রসারিত করে সমগ্র জগতকে বিপুল অপরিমেয় মৈত্রীধারায় প্লাবিত করে অবস্থান করবে।

হে ভিক্ষুগণ, তোমরা যদি এ উপদেশ সর্বক্ষণ মনে রাখ, তবে তোমরা কি এমন কোন বাক্য দেখতে পাও যা সহ্য করতে পারা যাবে না? ভিক্ষুগণ উত্তর উত্তর করলেন—না, ভদন্ত।

হে ভিক্ষুগণ, তা হলে তোমরা সর্বক্ষণ এ উপদেশ স্মরণ করবে। তা হবে তোমাদের চিরকালের জন্য হিতাবহ সুখাবহ।

চব্বিশ

বুদ্ধ বেরুলেন কোশল দেশ ভ্রমণে বিরাট একদল ভিক্ষু নিয়ে। এ ভ্রমণ বর্তমান যুগের ট্রেনে, বাসে, মোটরে কিংবা বিমানে ভ্রমণ নয়। এতে শুধু দেশের দৃশ্য ও দর্শনীয় বস্তুর সঙ্গে নয়, মানুষের সঙ্গে হতো মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচয়। তার প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের মিলন-বিচ্ছেদের জীবন্ত কাহিনীর মধ্য দিয়ে হতো নৈকট্যবোধ। তবে বুদ্ধের ভ্রমণ ছিল তাঁর ধর্মাভিযানের একটি বিশেষ পন্থা। এর ভিতর দিয়ে তিনি ব্যাপকভাবে মানুষের অত্যন্ত কাছে আসতেন এবং জন-সমাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়তা করতেন।

এই ভ্রমণে বেরিয়ে বহু গ্রাম, নগর, নিগম, অতিক্রম করে তিনি পৌছলেন

কেশপুত্র নিগমে। এ নিগমটি ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ। এখানে কালাম নামে সে যুগের এক ক্ষত্রিয় জাতি বাস করতেন। তাঁরা শুনেছিলেন শাক্য সন্তান শ্রমণ গৌতম এক অসাধারণ মহাপুরুষ, চারিদিকে তাঁর নাম রটেছে বিদ্যাচারসম্পন্ন লোকবিদ্ লোকগুরু অর্হৎ ভগবান সুগত সম্যক সম্বুদ্ধ বলে। তাঁরা যখন খবর পেলেন—এই মহাপুরুষ তাঁদের নিগমে এসেছেন, তাঁরা দলে দলে গেলেন তাঁর কাছে। কেউ তাঁকে প্রণাম করলেন, কেউ সম্ভাষণ করলেন, কেউ নমস্কার জানালেন দূর থেকে, কেউ শুধু নিজের নিজের নাম গোত্র শোনালেন, আবার কেউ নীরবে একান্তে আসন গ্রহণ করলেন। তাঁরা বুদ্ধকে বললেন—ভদন্ত, আমাদের এখানে যে সব সাধু সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবিদগণ আসেন, তাঁরা সবাই নিজেদের মতবাদকে বড় করে দেখান, ফলাও করে বলেন এবং পরধর্মকে নিন্দা করেন, সমালোচনা করে উড়িয়ে দেন; তাতে শুধু আমাদের মন সংশয়াচ্ছন্ন হয়। কার কথা সত্য কার কথা মিথ্যা আমরা বুঝতে পারি না, কোন মতটি গ্রহণীয় কোন মতটি পরিত্যাজ্য জানতে পারি না, শুধু আমরা বিভ্রান্ত হই। বুদ্ধ বললেন—বিভ্রান্ত হবারই কথা, এতে সন্দেহ আসা বিচিত্র নয়।

তিনি বলতে লাগলেন—হে কালামগণ, জনশ্রুতিতে কোন মতবাদ গ্রহণ করবেন না, পুরুষপরম্পরাগত বলে বিশ্বাস করবেন না, এটি এ রকম বলে অন্ধ বিশ্বাসে বিভ্রান্ত হবেন না, শাস্ত্রোক্তি বলে মেনে নেবেন না, তর্কপ্রসূত মতে আস্থা স্থাপন করবেন না, ন্যায়সিদ্ধ বলে গ্রহণ করবেন না, নিজের মতের সঙ্গে সঙ্গতি আছে বলে সত্য বলে ধরবেন না, সাধু সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভূত হয়ে মতবাদে দীক্ষিত হবেন না। যখন আপনারা নিজেরাই জানবেন যে এ ধর্মগুলো অকুশল মলিন বিজ্ঞ-নিন্দিত এবং এগুলো অনুসরণ করলে অহিতাবহ দুঃখাবহ হবে, তখন আপনারা এগুলোকে বর্জন করবেন।

বুদ্ধ—হে কালামগণ, লোভ যে মানুষের অন্তরে উদিত হয়, তা কি হিত সাধন করে, না অহিত সাধন করে।

কালামগণ—ভদন্ত, তা অহিত সাধন করে।

বুদ্ধ—লুব্ধ লোভাভিভূত ব্যক্তি লোভের বশীভূত হয়ে প্রাণঘাতী হয়, পরস্বাপহরণ করে, ব্যভিচারী হয়, অসত্য কথা বলে এবং পরকেও সেই অধর্মের পথে নেয় যা চিরকালের জন্য দুঃখ উৎপাদন করে, অহিত বিধান করে।

হে কালামগণ, মানুষের মনে যে দ্বেষ উৎপন্ন হয়, তা কি হিতাবহ না অহিতাবহ।

কালামগণ—ভদন্ত, তা অহিতাবহ।

বুদ্ধ—বিদ্বিষ্ট দ্বেষাভিভূত ব্যক্তি বিদ্বেষের বশীভূত হয়ে নানারকম অবৈধ কর্মে লিপ্ত হয়, যা চিরকালের জন্য দুঃখ উৎপাদন করে, অহিত বিধান করে। তেমনি মোহের বশীভূত হয়ে মোহগ্রস্ত লোক বিবিধ অপকর্মে রত হয়, যা হয় চিরকালের জন্য অহিতাবহ দুঃখাবহ।

হে কালামগণ, লোভ দ্বেষ মোহ এ ধর্মগুলো কি কুশল অমলিন বিজ্ঞ-প্রশংসিত অথবা এগুলো অকুশল মলিন বিজ্ঞ-নিন্দিত।

কালামগণ—ভদন্ত, এ ধর্মগুলো অকুশল মলিন বিজ্ঞ-নিন্দিত।

বুদ্ধ—আপনাদের কি মনে হয়, এইগুলো অনুসরণ করলে কি অহিত দুঃখ উৎপন্ন হয় না?

কালামগণ—হাঁ ভদন্ত, এইগুলো অনুসরণ করলে অহিত সাধিত হয়, দুঃখ উৎপন্ন হয়।

বুদ্ধ—হে কালামগণ, তাই আপনাদের বলছিলাম জনশ্রুতি ইত্যাদির জন্য কোন মতবাদ গ্রহণ করবেন না। যখন আপনারা নিজেরাই জানবেন যে এ ধর্মগুলো অকুশল মলিন বিজ্ঞ-নিন্দিত এবং এগুলোর অনুসরণে দুঃখ উৎপন্ন হয়, অহিত সাধিত হয়, তখন আপনারা এইগুলোকে বর্জন করবেন।

আপনারা যখন নিজেরাই জানবেন যে এ ধর্মগুলো কুশল অনবদ্য বিজ্ঞ-প্রশংসিত এবং এইগুলোর অনুসরণে মঙ্গল সাধিত হবে, সুখ উৎপন্ন হবে, তখন আপনারা এইগুলো পালন করবেন, আয়ত্ত করবেন।

হে কালামগণ, মানুষের অন্তর যে লোভশূন্য হয়, তা কি হিত সাধন করে, না অহিত সাধন করে?

কামালগণ—ভদন্ত, তা হিত সাধন করে।

বুদ্ধ—অলুব্ধ লোভে অনভিভূত পুরুষ প্রাণঘাতী হয় না, পরস্বাপহরণ করে না, ব্যভিচারী হয় না, অসত্যভাষী হয় না এবং পরকেও আপনার মত নিষ্পাপ করে তুলতে প্রয়াসী হয়। এ অলুব্ধভাব দুঃখের কারণ হয় না, অহিতের উৎস হয় না।

হে কালামগণ, মানুষের অন্তর যে বিদ্বেষহীন হয়, তা কি হিতাবহ হয়, না অহিতাবহ হয়?

কালামগণ—ভদন্ত, তা হিতবহ হয়।

বুদ্ধ—অবিদ্বিষ্ট বিদ্বেষে অনভিভূত পুরুষ অবৈধ কর্মে লিপ্ত হয় না। এজন্য তার দুঃখের কারণ থাকে না, অহিতের উদ্ভব হয় না। তেমনি অমূঢ় মোহে অনভিভূত পুরুষ অপকর্ম করে না। মোহহীনতা দুঃখ উৎপাদন করে না, অহিত

সাধন করে না। হে কালামগণ, অলোভ অদ্বেষ অমোহ এ ধর্মগুলো কি অকুশল মলিন বিজ্ঞ-নিন্দিত অথবা কুশল অনবদ্য বিজ্ঞ-প্রশংসিত।

কালামগণ—ভদন্ত, এ ধর্মগুলো কুশল অনবদ্য বিজ্ঞ-প্রশংসিত।

বুদ্ধ—আপনাদের কি মনে হয়, এগুলো অনুসরণ করলে কি হিত সাধিত হয় না?

কালামগণ—হাঁ, ভদন্ত, এগুলো অনুসরণ করলে একান্তই হিত সাধিত হয়।

বুদ্ধ—হে কালামগণ, তাই আপনাদের বলছিলাম জনশ্রুতি ইত্যাদির জন্য কোন মতবাদ গ্রহণ করবেন না। যখন আপনারা জানবেন যে এ ধর্মগুলো কুশল অনবদ্য বিজ্ঞ-প্রশংসিত এবং এই গুলোর অনুসরণে মঙ্গল সাধিত হয়, সুখ উৎপন্ন হয়, তখন আপনারা এগুলো পালন করবেন অর্জন করবেন।

হে কালামগণ, এভাবে লোভহীন বিদ্বেষশূন্য বীতমোহ সেই আর্যশ্রাবক জ্ঞানসম্পন্ন স্মৃতিযুক্ত হয়ে মৈত্রীমানস প্রসারিত করে সমগ্র জগতকে বিপুল অপরিমেয় মৈত্রীধারায় প্লাবিত করে, করুণাচিত্ত প্রসারিত করে করুণাধারায় সমগ্র জগতকে বিধৌত করে, মুদিতা ও উপেক্ষার উদার ভাবনায় জগতকে স্পর্শ করে শান্ত স্নিগ্ধভাবে অবস্থান করে। এভাবে যখন আর্যশ্রাবক বৈরহীন বিদ্বেষহীন অসংক্লিষ্ট শুদ্ধচিত্ত হয়, তখন তার ইহজীবনেই আশ্বাস আসে, ভরসা হয়। সে ভাবে—যদি পরলোক থাকে, সুকর্ম দুষ্কর্মের ফল থাকে, তবে দেহ-ভঙ্গে মৃত্যুর পর আমি নিশ্চয়ই স্বর্গে সুখের রাজ্যে জন্ম গ্রহণ করব; যদি পরলোক না থাকে, সুকৃত দুষ্কৃত কর্মের ফল না থাকে, তা হলেও আমি ইহলোকে শত্রুতাশূন্য দ্বেষহীন উপদ্রবহীন আনন্দময় জীবন যাপন করছি, যদি পাপ করলে পাপ হয়, আমি তো পাপ চেতনাকে মনে স্থান দিই না, সুতরাং পাপকর্মের অভাবে দুঃখ আমায় কোত্থেকে স্পর্শ করবে; যদি কুকর্ম করলে পাপ না হয়, উভয়তঃ আমি শুদ্ধ জীবন যাপন করছি। হে কালামগণ, সেই আর্যশ্রাবক লোভহীন বিদ্বেষশূন্য বীতমোহ শুদ্ধচিত্ত হয়ে এইভাবে আশ্বাস লাভ করে, ভরসা পায়।

কেশপুত্রনিবাসী কালামগণ বুদ্ধের বিচিত্র উপদেশে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শরণগত হলেন।

পঁচিশ

প্রতিদিন অপরাহ্নে জেতবনের সভাগৃহে ভক্ত-সমাগম হত। বুদ্ধ আপনার নির্জন বাসকুটির হতে সেখানে উপস্থিত হয়ে দর্শন দান করতেন। তাঁর দর্শনার্থীদের মধ্যে সবাই তাঁর ভক্ত ছিলেন না। কেউ আসতেন তাঁর প্রতি

কৌতূহলী হয়ে, কেউ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য, কেউ পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য, আবার কেউ তাঁকে তর্কে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে। যে কোন সূত্রে লোক আসুক না কেন, সকল বিষয় নিয়ে তাঁর আলাপ-আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর ধর্ম-রসাপ্লুত হত। সেই আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে প্রাণবান ব্যক্তিমাত্রেরই মন অজানা উদার স্পর্শে অভিভূত হত।

একদিন অপরাহ্নে বুদ্ধ ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে সভাগৃহে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় দেশবিশ্রুত ব্রাহ্মণ জানুশ্রোণি এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বুদ্ধের সঙ্গে সম্ভাষণ করলেন এবং সন্তোষজনক স্মরণীয় আলাপ শেষ করে বললেন—ভবৎ গোতম, আপনার ধর্মে প্রব্রজিত ভদ্রসন্তানগণ আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, আপনি তাঁদের পুরোবর্তী নেতা এবং পরম হিতৈষী। বুদ্ধ ব্রাহ্মণের উক্তি অনুমোদন করলেন। সাধকগণের কঠিন তপশ্চর্যার কথা উল্লেখ ক'রে ব্রাহ্মণ আবার মন্তব্য করলেন—ভবৎ গোতম, বানপ্রস্থ অত্যন্ত কঠিন ব্রত, জনহীন অরণ্যে বাস দুষ্কর দুঃসহ; মনে হয় যেন অসংযত অসমাহিত ব্যক্তি ভয়াল নির্জন অরণ্যে ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়ে।

বুদ্ধ ব্রাহ্মণের কথায় সায় দিয়ে বলতে লাগলেন। তা ঠিক বলছেন। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে আমি যখন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলাম, গভীর বনে এককচারী ছিলাম, তখন ভাবতাম—যাদের কায়কর্ম, বাককর্ম ও মনোকর্ম শুদ্ধ নেই এবং যারা অপবিত্র জীবন যাপন করে, তারা কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অপবিত্রতার জন্য ভয়কে আহ্বান করে; আমি তো কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ পবিত্র। যে আর্য ঋষিগণ পাপ পরিহার করে শুদ্ধতায় পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে অরণ্যবাসী হন, আমি তাঁদের অন্যতম। একথা ভাবতেই আমার মন থেকে ভয় মুছে যেত, সাহসে বক্ষ স্ফীত হত, উৎসাহে মন ভরে উঠত।

হে ব্রাহ্মণ, লোভাতুর, কামাসক্ত, হিংসুক, অলস, ক্ষুব্ধচিত্ত সংশয়ী প্রভৃতি লোকের কাছে বানপ্রস্থ একান্ত ভীতিপূর্ণ। আমি যখন নিজের অন্তরে লোভ কামনা হিংসা আলস্য সংশয় ইত্যাদি দোষ খুঁজে পেতাম না, তখন আমি ভাবতাম আমার ভয়ের কারণ কোথায়, আমার মনে ভয় জাগবে কেন? পরন্তু আমার কাছে বানপ্রস্থ আনন্দময় হয়ে উঠত। অতঃপর আমি ভয়ের কারণ অনুসন্ধানের জন্য ভীতিপ্রদ লোমহর্ষক স্থানগুলো খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। সেই জনহীন ভয়সঙ্কুল স্থানসমূহে অমাবস্যা চতুর্দশী ও কৃষ্ণা অষ্টমীর রাত্রিতে বাস করতে লাগলাম। তখন কখনো কখনো আমার সম্মুখে বন্যজন্তু এসে পড়ত, ময়ূরের

পদাঘাতে ওপর থেকে শুকনো কাঠ ভেঙে পড়ত অথবা দমকা হাওয়ায় বন কেঁপে উঠত। মনে হত যেন ভীতিপূর্ণ কিছু ঘটছে। আমি মনের মধ্যে সাহস সঞ্চয় ক'রে ভাবতাম—ভয়ের কারণ খুঁজবার জন্ত আমি এখানে এসেছি, ভীত হবো কেন ?

চলবার সময় যদি মনে ভয়ের সঞ্চার হত, চলতে চলতে সেই ভয় অপনোদন করতাম। যতক্ষণ তা মন থেকে নিশ্চিহ্ন হত না, ততক্ষণ চলা বন্ধ না ক'রেই ভয় অপনোদন করতাম। যদি দণ্ডায়মান অবস্থায় ভয় আসত, তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সেই ভয় অতিক্রম করতাম। যতক্ষণ তা মন থেকে মুছে যেত না, ততক্ষণ দাঁড়িয়েই ভয়াপনয়নে রত থাকতাম। যদি শয়ান অবস্থায় মনে ভয় আসত, তবে শুয়ে শুয়েই সেই ভয় দূর করতাম। যতক্ষণ না তা মন থেকে অপগত হত, ততক্ষণ শয্যা ত্যাগ না ক'রেই ভয় দূর করতাম। বসার সময় যদি মনে ভয় জাগত, তবে ব'সে ব'সে সেই ভয় অপনোদন করতাম। যতক্ষণ না তা মন থেকে অপনীত হত, ততক্ষণ আসন ত্যাগ করতাম না। এ ভাবে ভয় বিসর্জন দিয়ে মহত্তর ভাবে আপনাকে অনুপ্রাণিত করে সাধনায় মগ্ন হতাম।

অনবচ্ছিন্নভাবে বৃহত্তর সন্ধানে রত থাকায় আমার অন্তরে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপিত হল, গভীর শান্তিতে দেহমন স্নিগ্ধ হল, চিত্ত সমাহিত একাগ্র হয়ে উঠল। অচিরেই মন কামনা ও কুপ্রবৃত্তির সীমা অতিক্রম করে ধ্যানের প্রথম স্তরে উপনীত হল। আমার সমস্ত সত্তা উদার আনন্দে গভীর শান্তিতে মগ্ন হল। ক্রমশঃ ধ্যানের স্তর অতিক্রম করে চতুর্থ ধ্যান লাভ করলাম। আমার সমাহিত চিত্তের সম্মুখে জন্ম-জন্মান্তরেব যবনিকা উত্তোলিত হল অর্থাৎ আমি পূর্বানিবাসানুস্মৃতি বা জাতিস্মর জ্ঞান লাভ করলাম। সেই জ্ঞানের প্রভাবে জন্ম-জন্মান্তরের চিত্র আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠল। স্মৃতির পক্ষ বিস্তার করে সুদূর অতীত ঘুরে দেখতে লাগলাম কোন জন্মে কোথায় ছিলাম, কি রকম সুখ দুঃখ অনুভব করেছিলাম। নাম গোত্র, আকার অবয়ব ইত্যাদি সমস্তই স্মৃতিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার সমাহিত শুদ্ধ নির্মল চিত্তের সম্মুখে একটি আবরণ খসে পড়ল, প্রাণিজগতের জন্ম-মৃত্যুর গোপন লীলা অনাবৃত দৃষ্টিতে পরিস্ফুট হল। আমি দিব্য দৃষ্টি প্রসারিত করে প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম প্রাণিগণের উত্থান-পতনের বিচিত্র লীলাভিনয়। কেউ পাপকর্মে রত হয়ে নিজেকে কলুষিত অপবিত্র করে নিম্নগামী হয়েছে, কেউ পাপ পরিহার করে সুকর্ম সম্পাদন করে নিজেকে সুন্দর উজ্জ্বল করে উর্দ্ধগামী হয়েছে। এ ভাবে

দিব্যচক্ষে দেখতে লাগলাম হীন-উত্তম সুগত-দুর্গত যথাকর্মানুগ প্রাণীদের জন্ম মৃত্যুর স্রোতে ভেসে চলতে।

অতঃপর আমার সমাহিত শুদ্ধ নির্মল চিত্ত আস্রবক্ষয়ের দিকে অভিনত হল। দুঃখকে যথাযথভাবে জানলাম, দুঃখের উৎসকে নিখুঁতভাবে প্রত্যক্ষ করলাম, দুঃখনিরোধকে স্পষ্টভাবে অবগত হলাম, দুঃখনিরোধের পন্থাকে পরিষ্কারভাবে দেখলাম। তেমনি কামাদি আস্রব, আস্রবের উদয়, আস্রবের নিরোধ এবং আস্রব-নিরোধের পন্থা আমার কাছে স্পষ্ট হল। এই ভাবে জেনে দেখে কামাস্রব থেকে আমার চিত্ত মুক্ত হল, ভবাস্রব থেকে আমার চিত্ত মুক্ত হল, অবিদ্যাস্রব থেকে আমার চিত্ত মুক্ত হল। বিমুক্তিতে চিত্ত বিমুক্ত বলে জ্ঞানোদয় হল। সকল কর্তব্যের সমাপ্তি ঘটল। এক কথায় আমি হলাম মুক্ত বন্ধনহীন।

হে ব্রাহ্মণ, হয়ত আপনি ভাবতে পারেন—আমি মোক্ষলাভের আশায় বনে বনান্তরে বাস করি। কিন্তু, তা নয়, আমি এ জীবনে নির্জন বাসের আনন্দ লাভের জন্য এবং আমার অনুবর্তীদের সম্মুখে আদর্শ স্থাপনের জন্য আমি বানপ্রস্থে রত হই।

বুদ্ধের অতীত সাধনার বিচিত্র কাহিনী শুনতে শুনতে ব্রাহ্মণ তন্ময় হয়ে গেলেন।

ছাব্বিশ

অনিরুদ্ধ, আনন্দ প্রভৃতি যে শাক্য কুমারগণ মল্লরাজ্যের অনুপিয় আম্র কাননে এক সঙ্গে ভিক্ষু হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন দেবদত্ত। তিনি দীক্ষার অব্যবহিত পরেই যোগাভ্যাস করে ঋদ্ধি আয়ত্ত করেছিলেন। ঋদ্ধিলাভ যোগীর চরম লক্ষ্য নয়। তা যোগসাধনার পথে অনেক সময় অন্তরায় সৃষ্টি করে। যোগী যখন অননুভূত শক্তিলাভে আত্মাভিমানে স্ফীত হয়ে নিজেকে সিদ্ধ বলে মনে করেন এবং সে শক্তির লীলাভিনয়ে রত হন, তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী। দেবদত্তের তাই হয়েছিল। তিনি প্রাথমিক যোগ শক্তিকে সাধনার শেষ মনে করেছিলেন। সাধনার পথে তাঁর অগ্রগতি সেখানেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি কৌশাম্বীতে বাস করতেন। একদিন নিরালায় বসে তিনি যখন আপনার যোগ বিভূতির কথা ভাবছিলেন, তখন তাঁর মনে হল তিনি শক্তিধর পুরুষ, ইচ্ছা করলে তার প্রভাবে নিজেকে প্রতিপত্তিশালী করতে পারেন। এ চিন্তা তাঁর অন্তরে প্রভাব প্রতিপত্তির

আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর করে তুলল। সে আকাঙ্ক্ষায় মাতাল হয়ে তিনি তার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর মনে পড়ল যুবরাজ অজাতশত্রুর কথা। বিম্বিসার-পুত্র অজাতশত্রু নির্ভীক তেজস্বী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি বর্ধিষ্ণু শক্তিশালী মগধ রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর। দেবদত্ত ভাবলেন—এ তরুণ রাজকুমারের হৃদয় জয় করতে হবে। রাজকুমারকে বশে আনতে পারলে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির পথে যে কোন অন্তরায় থাকবে না, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি সংকল্পবদ্ধ হয়ে কৌশাম্বী ত্যাগ করে রাজগৃহে গেলেন।

কুমার অজাত-শত্রু যেমনি ছিলেন বিদ্যা বুদ্ধিতে অসাধারণ তেমনি ছিলেন রণকৌশলে সুনিপুণ। শারীরিক শক্তির সঙ্গে রূপ-যৌবনের সমাবেশে তিনি ছিলেন রাজগৃহের একটি বিরাট আকর্ষণ। কিন্তু তাঁর জননীর তাঁর জন্মাবধি অশান্তির সীমা ছিল না। কারণ, দৈবজ্ঞগণ তাঁর জন্মের পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—এ সন্তান পিতৃঘাতী হয়ে সিংহাসন অরোহণ করবে। এ দারুণ ভবিষ্যদ্বাণী পতিপ্রাণা মহিষীর প্রাণে শেল হেনেছিল। তাই পতি-প্রেমে অন্ধ হয়ে সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হবার আগেই বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তা দৈবক্রমে সম্ভব হয় নি। ধর্মপরায়ণ ভক্ত বিম্বিসার নিয়তির বিধান অলঙ্ঘ্য জেনে অনেকটা অবিচলিতভাবে তাঁর দিন গুণছিলেন। এদিকে কুমার অজাত-শত্রু পিতৃস্নেহের নিবিড় নীড়ে সুখে স্বচ্ছন্দে আরাম বিলাসে বড় হচ্ছিলেন। শৈশব হতে তিনি একগুঁয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু পিতার প্রতি ছিল না তাঁর কোন বিদ্বেষ। তাঁর হাত দিয়ে এত বড় হৃদয়-বিদারক ঘটনা ঘটতে পারে তা তাঁর স্বপ্নেরও অতীত ছিল। নিয়তির রহস্যময় বিধান মানুষ কতটুকু বুঝতে পারে? সে দিন ঘনিয়ে এল দেবদত্তের রাজগৃহে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে। একদিন অজাতশত্রু প্রাসাদের বারান্দায় বসে কি যেন ভাবছিলেন, হঠাৎ এক কমনীয় কিশোর আকাশ হতে তাঁর কোলে এসে পড়ল—কিশোরের মস্তকে স্কন্ধে কটিতে সর্পসমূহে ফণা বিস্তার করে আছে। যুবরাজ ভয়ে শিউরে উঠলেন, কম্পমান স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে? গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর হল—মা ভৈঃ, আমি দেবদত্ত। যুবরাজ মিনতির সুরে বললেন—প্রভু, আপনি নিজবেশ ধারণ করুন,। তখনি যুবরাজের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে সর্পপরিবেষ্টিত কমনীয় কিশোরের রূপান্তর হল চীবর-পরিহিত দেবদত্তেতে। যুবরাজ দেবদত্তের এ যোগবিভূতি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর চরণে মস্তক লুটিয়ে দিলেন, ভাবলেন—এ অতুলনীয় মহাপুরুষ কৃপাপরবশ হয়ে তাঁকে দর্শন দান করতে এসেছেন। সুচতুর দেবদত্ত হস্ত উত্তোলন করে

আশীর্বাদ করলেন—যুবরাজের সকল মনস্কামনা পূর্ণ হোক। সেই থেকে যুবরাজ হলেন দেবদত্তের একনিষ্ঠ ভক্ত।

রাজগৃহে দেবদত্তের আশ্রম গড়ে উঠল। সেখানে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের সমারোহ চলল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্যসংখ্যাও বাড়তে লাগলো। অজাতশত্রু প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তাঁর কাছে যেতেন। লাভ যশ সম্মান তাঁর বেড়ে গেল। একথা বুদ্ধের কানে পৌঁছল। বুদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন—ভিক্ষুগণ, দেবদত্তের ধ্বংসের জন্যই লাভ যশ সম্মান হয়েছে, তার আত্মবিনাশের বীজ রয়েছে এর মধ্যে; কদলীবৃক্ষ যেমন ফলশালী হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, বাঁশ যেমন পুষ্পিত হয়ে নষ্ট হয়, অশ্বতরী যেমন সন্তানবতী হয়ে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তেমনি কুলোক লাভ যশ সম্মান লাভে বিনষ্ট হয়ে যায়; সুতরাং তোমরা সম্মান প্রতিপত্তিকে বড় করে দেখবে না, এতে অভিভূত হবে না।

একদিন বুদ্ধ ধর্মসভায় সমবেত জনতাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। রাজা বিম্বিসার ও রাজগৃহের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। ধর্মকথার অবসানে দেবদত্ত সভায় দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বুদ্ধকে বললেন—ভদন্ত, আপনি এখন বৃদ্ধ; কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম গ্রহণ করুন এবং সঙ্ঘ পরিচালনার ভার আমার ওপর অর্পণ করুন। দেবদত্তের এ অসংগত উক্তি শুনে সভা স্তব্ধ হল। বুদ্ধ শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—দেবদত্ত, এরকম অন্যায় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো না। বাধা পেয়েও দেবদত্ত ক্ষান্ত হলেন না। বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। তখন তাঁকে নিরস্ত করবার জন্যে বুদ্ধ বললেন—দেবদত্ত, শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের মত আমার সুযোগ্য অগ্র-শিষ্যদ্বয়ের হাতেও সঙ্ঘকে সমর্পণ করতে পারি না, তোমার মত অযোগ্য ব্যক্তির কথাই বা কি? এ ভর্ৎসনাবাক্য শুনে দেবদত্ত যেন বজ্রাহত হলেন। সমবেত জনতার সম্মুখে এ অপমান তাঁর দুঃসহ হয়ে উঠল। তিনি ক্ষোভে অপমানে সভাস্থল ত্যাগ করে প্রস্থান করলেন। বুদ্ধ তাঁর ভাবগতিক দেখে ভিক্ষুসঙ্ঘকে আদেশ দিলেন—ভিক্ষুগণ, রাজগৃহে ঘোষণা করে দাও যে দেবদত্তের কার্যকলাপ সঙ্ঘবহির্ভূত; তার কার্যের জন্য সে দায়ী, বুদ্ধ কিংবা সঙ্ঘ তজ্জন্য দায়ী নন।

এদিকে দেবদত্ত সে দারুণ অপমানের প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজছিলেন। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন—রাজশক্তির সহায়তায় এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। একদিন তিনি গোপনে সাক্ষাত করলেন অজাতশত্রুর সঙ্গে এবং তাঁকে বললেন—যুবরাজ, এখন মানুষ স্বল্পায়ু, প্রাচীন যুগের মানুষের মতো দীর্ঘায়ু লাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটে না; রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে যদি

রাজ্যলাভ না হয়, তবে সে জন্মের সার্থকতা কোথায়, আপনার পিতা কি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে কণ্টকস্বরূপ নন? দেবদত্তের বাক্‌চাতুর্যে অজাতশত্রুর মনের মধ্যে দুরাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। তা তাঁর বুদ্ধিবিবেক অভিভূত করে দিল। তিনি ভাবতে লাগলেন—আমার পিতা তো এখনও সুস্থ সবল, তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত হবার আগেই আমার যৌবন গত হবে, এমন কি মৃত্যুও ঘটতে পারে, তবে আমার ভাগ্যে রাজ্যসুখ কোথায়? নানা কথা ভাবতে ভাবতে যুবরাজের মন অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠল। সিংহাসনের স্বপ্ন তাঁকে মাতাল করে তুলল। মনের সকল সুকুমারবৃত্তি মুছে গেল। তাঁর এ রূপান্তর তাঁর সহধর্মিণীর দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি যেন সে অজাতশত্রু নন। সহধর্মিণী নানাভাবে চেষ্টা করেও মনের কথা বের করতে পারলেন না। একদিন স্তব্ধ মধ্যাহ্নে তিনি ত্রস্তপদে ক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। তাঁর ভাবভঙ্গী রাজার উপচর অমাত্যবর্গের মনে সন্দেহ জাগাল। তৎক্ষণাৎ তাঁরা তাঁকে ধরে ফেল্লেন। তল্লাশের পর তাঁর উরুতে বদ্ধ শানিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হল। তাঁরা তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলেন। তিনি স্বীকার করলেন দেবদত্তের প্ররোচনায় পিতৃহত্যায় উদ্যত হয়েছেন। স্বীকারোক্তি শুনে উপচর অমাত্যদের মধ্যে কেউ বললেন যুবরাজ সহ দেবদত্ত ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে হত্যা করা হোক, কেউ বললেন ভিক্ষুসঙ্ঘকে হত্যা করার কোন যুক্তি নেই—যুবরাজ ও দেবদত্তকে হত্যা করা হোক, আবার কেউ মন্তব্য করলেন কাকেও হত্যা না করে সমস্ত বিষয় রাজাকে জানানো হোক, তিনি যা ভাল বিবেচনা করবেন তাই হবে। অতঃপর অমাত্যগণ যুবরাজকে নিয়ে রাজার কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন। দৈবজ্ঞের সে ভবিষ্যৎ-বাণী রাজার মনে পড়ল। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন, যুবরাজকে জিজ্ঞেস করলেন—বৎস, কেন তুমি আমাকে মারতে উদ্যত হয়েছ? যুবরাজ উত্তরে বললেন,—পিতঃ, রাজ্যলোভে আমার এ দুর্মতি জেগেছে, আমায় ক্ষমা করুন। ধর্মপরায়ণ দয়াসম্পন্ন রাজা অবিচলিত কণ্ঠে বললেন—আমি ক্ষমা করছি তোমাকে, ক্ষমা করছি তোমার গুরু দেবদত্তকে; তুমি রাজ্যলোভাতুর, রাজ্যভার গ্রহণ করো, আমি তোমার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করছি, তবে অন্যায় আচরণ করো না। তখনি যুবরাজকে মুক্তি দেওয়া হল।

অজাতশত্রু রাজ্যাভিষিক্ত হলেন। সিংহাসন-লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মিটল। কিন্তু মনের অস্বস্তি-ভাব ঘুচল না। পিতার প্রতি তাঁর অন্তর সন্দেহে আচ্ছন্ন হল। পিতাই যেন তাঁর পথের কণ্টক। যতদিন পিতা বেঁচে থাকবেন ততদিন

তাঁর নিরঙ্কুশ রাজ্যভোগ হবে না—এ ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হল। তাই তিনি প্রথমে পিতাকে বন্দী করে কারাগারে পাঠালেন। তাতেও তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হল না। ঘৃতসিক্ত অগ্নির মতো মনের হিংস্রভাব দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। অবশেষে একদিন অজাতশত্রুর হস্তে বিম্বিসার নিহত হলেন। এ ভয়াল পিতৃনিধনের কথা দাবাগ্নির মতো সমগ্র আর্যাবর্তে ছড়িয়ে পড়ল। এ অভূতপূর্ব নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সর্বত্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। প্রজাবৎসল ধার্মিক রাজার শোচনীয় মৃত্যুতে শোকমগ্ন হল সমগ্র মগধরাজ্য। রাজা অজাতশত্রু রক্তের ভিতর দিয়ে আপনাকে পূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত করলেন মগধের সিংহাসনে। তাঁর নির্মম শাসন অনুভূত হল সমগ্র রাজ্যে।

অতঃপর দেবদত্ত রাজা অজাতশত্রুর কাছে গিয়ে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন। তিনি নতমস্তকে আশীর্বাদ গ্রহণ করে বললেন—ভদন্ত, আপনার উপদেশে আমার সকল আশা সফল হয়েছে, আপনার জন্যে কি করতে হবে বলুন। দেবদত্ত গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করলেন—রাজাধিরাজ মগধেশ্বর, আমি চাই বুদ্ধের আসনে অধিষ্ঠিত হতে—এ আমার অন্তরের একমাত্র কামনা, তবে বুদ্ধকে হত্যা না করলে এ কামনা সিদ্ধ হবার কোন পথ নেই, আমার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আপনার সাহায্য আমি চাই। রাজা ভূতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রথমে নীরব রইলেন। তিনি জানতেন বুদ্ধের প্রভাব শুধু মগধে নয়, কাশী কোশল কুরু অবন্তী উজ্জয়িনী প্রভৃতি দেশসমূহেও বিস্তৃতি লাভ করেছে, বুদ্ধহত্যার পরিণাম সহজ হবে না। পরে তিনি নীরবতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞেস করলেন—ভদন্ত, কি করে তাঁকে হত্যা করবেন। দেবদত্ত বললেন—আমি চাই শুধু বত্রিশ জন তীরন্দাজ। রাজা নত মস্তকে সম্মতি জানিয়ে বত্রিশ জন তীরন্দাজ দেবদত্তের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের একজনকে গোপনে ডেকে নিয়ে দেবদত্ত হুকুম করলেন—বৎস, গৃধ্রকূট পর্বতে এখন বুদ্ধ থাকেন, তাঁর কুটিরের কাছে লুকিয়ে থাকবে, যখনি সুযোগ পাবে তীর ছুড়ে তাঁকে মেরে ফেলবে এবং ঐ পথ দিয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে। যে পথ দিয়ে এ তীরন্দাজকে ফিরে আসতে দেবদত্ত হুকুম করলেন, সে পথে অপর দুইজন তীরন্দাজ দাঁড় করে রাখলেন এবং তাদের নির্দেশ দিলেন তারা যেন সে প্রত্যাবর্তনকারী তীরন্দাজকে অতর্কিত আক্রমণে হত্যা করে অমুক পথ দিয়ে ফিরে আসে। সেই নির্দিষ্ট পথে অপর চারিজন তীরন্দাজ নিযুক্ত করে তিনি হুকুম করলেন—এ পথ দিয়ে যখন দুইজন তীরন্দাজ ফিরবে, তখনি শরনিক্ষেপে তাদের নিহত করে ঐ পথ ধরে ফিরে আসবে। এভাবে, বত্রিশজন তীরন্দাজকে নির্দেশ দিয়ে তিনি

স্বস্থানে উঠে বসে শুয়ে চঞ্চলভাবে সংবাদের জন্ম উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। কারো পদশব্দ শুনলেই তিনি বেরিয়ে দেখেন—কোন তীরন্দাজ ফিরেছে কিনা। তখন অন্য পথচারীকে দেখে ক্ষুণ্ণ মনে আশ্রমে প্রবেশ করেন। এভাবে অধীর অপেক্ষায় দিবস-রজনী অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু কেউ ফিরল না।

যে প্রথম তীরন্দাজ ধনুতে তীর সংযোগ ক'রে বুদ্ধের বাসস্থানের সমীপে লুকিয়েছিল, ক্ষমা ও মৈত্রীর মূর্ত অবতার বুদ্ধকে দেখামাত্রই সে অভিভূত হল। মারণাস্ত্র তার হস্তচ্যুত হয়ে ভূতলে পড়ে গেল। তখনি সে বুদ্ধের চরণে লুটে পড়ে ক্ষমা চাইল। বুদ্ধ তাকে ক্ষমা করলেন এবং দেবদত্তের নির্দিষ্ট পথ বর্জন করে বাড়ী ফিরতে পরামর্শ দিলেন। বুদ্ধ আপনার প্রেমজাল বিস্তার করে অপর তীন্দাজদেরও শরণে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এভাবে দেবদত্তের প্রথম ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হলেন না। তিনি আর একটি নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন। বুদ্ধের গৃধ্রকুট পর্বতে অবস্থান কালে পর্বতের সানুদেশে তরুলতাবেষ্টিত নিভৃত স্থানে বুদ্ধ ধ্যাননিবিষ্ট মনে পায়চারি করতেন। তৎসংলগ্ন শিখরে দেবদত্ত লুকিয়ে রইলেন। যখন বুদ্ধ প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে আত্মসমাহিতভাবে পদচারণ স্থানে উপস্থিত হলেন, তখনি দেবদত্ত ওপর থেকে বৃহৎ শিলাখণ্ড বুদ্ধের দিকে গড়িয়ে ফেল্লেন। শিলাটি গড়িয়ে তাঁর কাছে পৌছবার পূর্বেই হঠাৎ এক জায়গায় বাধা পেয়ে আটকে গেল। কিন্তু তার একটি ক্ষুদ্র খণ্ড ভেঙে পড়ে বুদ্ধের পদাঙ্গুষ্ঠ বিক্ষত করল। পদতল রক্তাক্ত হল। তীব্রবেদনা অনুভূত হওয়ায় তিনি চীবর পেতে সিংহের মতো দক্ষিণ পার্শ্ব ভর করে শয্যা গ্রহণ করলেন। তাঁর প্রশান্ত মুখে উদ্বেগের কোন চিহ্ন প্রকাশ পেল না। সমাহিত অচঞ্চল হয়ে তিনি দুঃসহ যন্ত্রনা সহ্য করতে লাগলেন। দুরারোহ পর্বত শিখরে দর্শনার্থী ভক্তদের যাতায়াতের অসুবিধা হওয়ায় তাঁকে শিবিকায় করে নিয়ে যাওয়া হল মদ্রকুক্ষি মৃগদায়ে। সেখান থেকে ভিক্ষুরা আবার তাঁকে নিয়ে গেলেন জীবকাম্রবন বিহারে। মহাভিষক জীবক সংবাদ পেয়েই সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করলেন। তিনি জীবকের চিকিৎসানৈপুণ্যের অচিরেই সুস্থ হলেন।

দেবদত্ত শিলানিক্ষেপেও বুদ্ধহত্যায় অকৃতকার্য হয়ে আর একটি উপায় আবিষ্কার করলেন। একদিন যখন বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে রাজগৃহের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ করছিলেন, তখন দেবদত্ত তাঁর সম্মুখে ছাড়িয়ে দেওয়ালেন দুর্দান্ত মত্ত রাজহস্তী নালগিরিকে। নালগিরি শুণ্ড উত্তোলন

করে কর্ণ সঞ্চালন করতে করতে বেগে ধাবিত হল বুদ্ধের দিকে। ভয়ার্ত লোক প্রাসাদের গবাক্ষে গৃহছাদে ও বৃক্ষশাখায় দাঁড়িয়ে নালগিরির নিষ্ঠুর লীলা দেখতে লাগলো। দুর্দান্ত নালগিরি সমীপবর্তী হলে তিনি আপনার গভীর প্রেমে তাকে অভিভূত করলেন। হঠাৎ যেন সে বাধা পেয়ে স্তব্ধ নিশ্চল রইল। তার শুণ্ড অবনত হল। বুদ্ধ তার মাথায় আপনার করুণাস্নিগ্ধ হস্ত স্থাপন করলেন। তাঁর প্রেমমধুর স্পর্শে নালগিরির জীবন যেন বদলে গেল। সেদিন থেকে তার দুর্দান্তভাব আর রইল না। এ অভূতপূর্ব ঘটনা সর্বত্র প্রচারিত হল। দেবদত্ত ক্রমশঃ আপনার সম্মান প্রতিপত্তি হারাতে লাগলেন। তিনি বার বার অকৃতকার্য হয়ে ভাবলেন—ভিক্ষুসংঘের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে তিনি সঙ্ঘগুরু হবেন। এ সংকল্প কার্যে পরিণত করবার জন্যে তিনি কোকালিক প্রভৃতি বিশিষ্ট শিষ্যদের নিয়ে সঙ্ঘমধ্যে বিরুদ্ধ মত প্রচার করতে লাগলেন। বহুসংখ্যক নবদীক্ষিত ভিক্ষু তাঁর মতবাদে আস্থাবান হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। তিনি তাদের নিয়ে গয়াশীর্ষে গেলেন এবং বুদ্ধের অনুকরণে তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন। তখন শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন এইবিভ্রান্ত ভিক্ষুদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সেখানে গেলেন। তাঁদের দূর থেকে দেখতে পেয়ে দেবদত্ত শিষ্যদের সম্বোধন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, দ্যাখো আমার ধর্মের মহিমা, আমার বাণীতে মুগ্ধ হয়ে গৌতমের প্রধান শিষ্যদ্বয় আসছেন আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে। তখন কোকালিক ব'লে উঠলেন—এঁদের বিশ্বাস নেই, এঁরা অত্যন্ত ধূর্ত, নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধি নিয়ে এখানে আসছেন। দেবদত্ত বললেন—না, না, তা নয়, এঁরা আমার মত অনুমোদন করেন। বলতে বলতেই তিনি শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়নকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। তাঁদের সম্মুখে অধিক রাত্রি পর্যন্ত বক্তৃতা দান করে শারীপুত্রকে সম্বোধন করে বললেন—বন্ধু শারীপুত্র, আমি এখন ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম করব, ততক্ষণ আপনি এদের উপদেশ দান করুন। শারীপুত্রের ওপর ধর্মভাষণের ভার অর্পণ করে দেবদত্ত বুদ্ধের অনুকরণে সিংহশয্যা গ্রহণ করলেন। কিন্তু স্মৃতিধ্যানের অভাবে মুহূর্তকালের মধ্যেই তিনি গভীর নিদ্রাভিভূত হয়ে গেলেন। শারীপুত্রের বিচিত্র মধুর ধর্মভাষণে সমবেত ভিক্ষুগণ আলোর স্পর্শ অনুভব করলেন এবং নিজেদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হলেন। শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন এ ভিক্ষুদের নিয়ে প্রস্থান করলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর দেবদত্ত গাত্রোত্থান করে দেখলেন—তাঁর

চারিদিক জনশূন্য, শুধু কোকালিকই অধোবদনে বসে রয়েছেন। কোকালিকের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে গভীর দুঃখে তিনি মাটিতে উপুর হয়ে রইলেন।

বহুদিন কেটে গেছে। দেবদত্তের সে মান যশ প্রতিপত্তি আর নেই। তাঁর আশ্রম জনশূন্য। রাজা অজাতশত্রু তাঁর প্রতি বিরূপ। কোথাও তাঁর ঠাঁই নেই। দুঃখে দুশ্চিন্তায় অশান্তিতে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি তাঁকে আক্রমণ করল। তখন তাঁর মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং বুদ্ধের প্রতি শত্রুতাচরণের জন্য অনুতপ্ত হলেন। বুদ্ধের নিকট ক্ষমা ভিক্ষার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি যখন মনের এ গোপন বাসনা ব্যক্ত করলেন, তাঁর বন্ধুগণ তাঁকে শুধালেন—তুমি এতদিন বুদ্ধের প্রতি শত্রুতাচরণ করেছ, এখন কি করে তাঁর কাছে যাবে? উত্তরে তিনি বললেন—বুদ্ধ করুণাসিন্ধু প্রেমাবতার সমদর্শী; নিজপুত্র রাহুল, ঘাতক দেবদত্ত ও দস্যু অঙ্গুলিমাল তাঁর দৃষ্টিতে অভিন্ন; তিনি আমাকে বর্জন করবেন না, তোমরা নিয়ে চলো আমায় তাঁর কাছে, আমার জীবনের অবসান মুহূর্তে তাঁর পদধূলি নিয়ে ধন্য হবো; আমার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা তোমরা পূর্ণ করো। তাঁর কাতর প্রার্থনায় বন্ধুগণ বিগলিত হলেন। অবশেষে তাঁরা শিবিকায় তাঁকে নিয়ে রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তীর অভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন বুদ্ধ সেখানে জেতবন বিহারে অবস্থান করতেন। দূর পথ অতিক্রম করে তাঁরা যখন শ্রাবস্তীর সীমানায় পৌঁছলেন, তখন দেবদত্তের রোগ ভয়ানক বৃদ্ধি পেল। তিনি মৃত্যুযন্ত্রনায় আর্তনাদ করতে লাগলেন, জল চাইলেন। পুষ্করিণী থেকে তাঁকে জল আনিয়ে দেওয়া হল। জল পান করে তিনি দুর্বল হস্তদ্বয় কপালে ঠেকিয়ে বুদ্ধের উদ্দেশে প্রণাম করে উচ্চারণ করলেন—হে পুরুষোত্তম নরনায়ক, এ কঙ্কাল নিয়ে আজ তোমার শরণ নিলাম। বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে এল। বাক্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন।

সাতাশ

অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করে রক্তের ভিতর দিয়ে মগধের সিংহাসন আরোহণ করলেন। তাঁর রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ সর্বত্র অনুভূত হল। কিন্তু তাঁর অন্তরে যে উদ্বেগ ও অশান্তির ঝড় উঠেছিল পিতার রক্তপাতের সময়, তার বেগ কমল না। দিনের পর দিন তা বর্ধিত হতে

লাগলো। বিষাদের কালো মেঘ তাঁর অন্তরে যেন জমাট বাঁধল। রাজোদ্যানে প্রমোদভবনে রাজসভায় কোথাও তিনি স্বস্তি বোধ করতে পারলেন না। দিবা-রাত্রি দুশ্চিন্তার দংশন জ্বালা দুঃসহ হয়ে উঠল। নিদ্রাভিভূত হয়েও তিনি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের নিপীড়ন অনুভব করতে লাগলেন। তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্যে রাজকোষ উন্মুক্ত হল, কিন্তু কোন ফল হল না। অবশেষে তিনি রাজগৃহে সাধু সন্ন্যাসীদের আখড়ায় আখড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যেখানে কোন সন্ন্যাসীর শুভাগমন হত, সেখানে তিনি উপস্থিত হতেন। সাধুসঙ্গ যেন তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়ালো। এভাবে তিনি পূরণ কাশ্যপ, ক্রকুধ কাত্যায়ন, সঞ্জয় প্রভৃতি দেশবিশ্রুত সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তাঁদের ধর্মালাপ শুনলেন। কিন্তু কোথাও তিনি কোন মন্তব্য প্রকাশ করলেন না।

বুদ্ধ তখন সমগ্র আর্যাবর্তে অর্হৎ সর্বজ্ঞ সুগত সম্যক সম্বুদ্ধ বলে সুপরিচিত। তাঁর যশোগানে চারিদিক মুখরিত। তাঁর শিষ্য-সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত। রাজা অজাতশত্রুর বাসনা জাগলো বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার। দেবদত্তের বুদ্ধদ্রোহে সহায়তার কথা যখন মনে পড়ল, তখন বুদ্ধদর্শনে তাঁর সাহস হল না। অধিকন্তু বুদ্ধোপাসক পিতার জীবনান্ত ঘটিয়ে সেই পথ তাঁর রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবুও তিনি বুদ্ধ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারলেন না। তাঁর মনে হতে লাগলো—একমাত্র বুদ্ধেরই চরণসেবায় তিনি শান্তি লাভ করতে পারবেন। তাই বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভের চিন্তা তাঁর অন্তর জুড়ে রইল।

পূর্ণিমার রাত্রি। স্বচ্ছ আকাশের কোল বেয়ে জ্যোৎস্নার অফুরন্ত ধারা ধরণীতলকে প্লাবিত করেছিল। তরুলতাচ্ছন্ন রাজোদ্যানের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে যেন স্বপ্নলোক মেতেছিল। মৃদু মন্দ বাতাসে ফুলের সৌরভ বিকীর্ণ হয়ে নিঃশ্বাস আকুল করে তুলছিল। রাজা অজাতশত্রু আপনার মন্ত্রীবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসলেন। অদূরে ছিলেন মহাভিষক জীবক। রাজা আকাশের পানে চেয়ে বলে উঠলেন—আহা! কি সুন্দর রাত্রি, কি রমণীয় পৃথিবীর রূপ, কি মধুর জ্যোৎস্নার ধারা! অতঃপর তিনি মন্ত্রীবর্গকে সম্বোধন করে বললেন—এমন সুন্দর রাতে কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণের সঙ্গ লাভ করা যায়, যিনি সমস্ত অন্তরকে এই জ্যোৎস্নাস্নাত ধরণীর মত শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দর করে দিতে পারেন? রাজার কথা শুনে একজন মন্ত্রী যুক্তকরে গুরু পূরণ কাশ্যপের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে বললেন—মহারাজ! যদি ইচ্ছা করেন, গুরু পূরণ কাশ্যপের সমীপে একবার যেতে পারেন; তিনি ত্রিকালদর্শী, সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ অর্হৎ, তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভে নিশ্চয় আপনার অনাবিল শান্তিলাভ হবে।

মন্ত্রীর প্রস্তাব শুনে রাজা কোন বাক্যালাপ করলেন না। তখন আর একজন মন্ত্রী নিজগুরু ক্রকুধ কাত্যায়নের নামোল্লেখ করে জানালেন—মহারাজ! এ শুভ মুহূর্তে শুধু তাঁরই সেবায় আপনার মনে গভীর আনন্দ জাগবে, প্রাণে বিপুল শান্তি আসবে। এ প্রস্তাবেও রাজা নিরুত্তর রইলেন। অন্যান্য মন্ত্রিগণও নিজ নিজ গুরুর মহিমা কীর্তন করে রাজাকে আকৃষ্ট করতে চাইলেন। রাজার ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে তাঁরা সবাই নীরব হলেন। রাজা তখন অদূরে উপবিষ্ট জীবককে সম্বোধন করে বললেন—হে মহাভিষক, আপনি আজ এত গম্ভীর কেন? আপনার মুখে যে বাক্যস্ফূর্তি নেই। আপনি তো আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রিয়পাত্র, ঐশ্বর্যে ধনকুবের, আপনার অভাব কিসের, তবে কেন আপনি নির্বাক? তখন জীবক বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বললেন—মুক্তিপথ-প্রদর্শক ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ আমারই আম্র-কানন বিহারে তাঁর বহু শিষ্য নিয়ে আছেন, যদি তাঁর দর্শনলাভের বাসনা হয়, আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি। রাজা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন।

রাজার হুকুমে যানবাহনের আয়োজন ও অন্যান্য ব্যবস্থা অল্পক্ষণের মধ্যেই সম্পন্ন হল। রাজা মহাপরিষদ পরিবৃত হয়ে যাত্রা করলেন জীবকাম্রবনের অভিমুখে। জ্যোৎস্নার আলোয় নিষ্প্রভ মশালগুলো ক্ষীণ আলো বিকীর্ণ করে যাত্রীদের সম্মুখে ও দুপাশে চলল। যাত্রাপথের বুকে রথের অবিশ্রান্ত শব্দ নৈশ প্রকৃতির নীরবতা ভঙ্গ করে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। লোকালয়ের সীমা ছাড়িয়ে যান চলাচলের পথের বাইরে এসে তাঁরা যখন পদব্রজে যাত্রা সুরু করলেন, তখন নিস্তব্ধতা নিবিড় হয়ে উঠল। আম্রকুঞ্জের সংকীর্ণ পথে চলতে চলতে রাজা বার বার সশঙ্ক দৃষ্টিতে জীবকের মুখের পানে তাকালেন। তিনি মনে মনে ভাবছিলেন—জীবকের মনে কোন দুরভিসন্ধি নেই তো?

অবশেষে তাঁরা বিহার-প্রাঙ্গণের সমীপে এসে পৌঁছলেন। তখন জীবক অঙ্গুলি নির্দেশ করে মৃদুস্বরে বললেন—মহারাজ! এটিই আম্রকানন বিহার, এখানেই ভগবান সম্বুদ্ধ শিষ্যবৃন্দ পরিবৃত হয়ে আছেন। একথা শুনেই রাজা ভয়বিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—হে মহাভিষক! আপনি আমাকে এই নিরালায় শত্রুহস্তে সমর্পণ করছেন কেন, যেখানে বহু লোকের বাসের কথা বলছেন, সেখানে যে কোন সাড়া শব্দ নেই—এ কি সম্ভব? রাজার শঙ্কাকুল কাতর প্রশ্নে জীবক মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন, বললেন—মহারাজ! আপনি অনর্থক ভীত হবেন না, আপনাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করার দুরভিসন্ধি আমার নেই, আপনি নির্ভয়ে অগ্রসর হোন।

বিহার অলিন্দে পদার্পণ করেই রাজা থতমত খেয়ে গেলেন এবং অবান্তর প্রশ্ন করলেন—ভগবান কোথায় ? জীবক বললেন—মহারাজ ! তিনি আপনার সম্মুখেই। বুদ্ধ তখন উচ্চ বেদীতে উপবিষ্ট। তাঁর ডানে বামে এবং সম্মুখে, তাঁর দিকে মুখ করে ভিক্ষুদল বসে আছেন। সমস্ত গৃহ দীপের আলোয় উজ্জ্বল। বুদ্ধের উদ্ভাসিত প্রশান্ত মুখমণ্ডল দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি স্তব্ধ মৌন ভিক্ষু-সঙ্ঘের পানে চেয়ে আবেগে বলে ফেললেন—মহাভিষক, আমার পুত্র যদি ভিক্ষু-সঙ্ঘের এ অপরূপ শান্ত সংযত ভাবে অভিষিক্ত হত, আমি বড়ই সুখী হতাম। জীবক বাধা দিয়ে বললেন—মহারাজ ! অপত্যস্নেহ প্রকাশের উপযুক্ত স্থান কাল এ নয়, আপনি আসন গ্রহণ করুন। রাজা বুদ্ধের চরণে প্রণাম নিবেদন করে একান্তে বসলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসার পর প্রশ্ন করলেন—ভদন্ত, গৃহবাসী সংসারী লোক বিবিধ কাজকর্মে নিযুক্ত হয়ে নিজের শ্রমার্জিত অর্থে নিজে সুখী হয়, স্ত্রীপুত্রকে সুখী করে এবং বন্ধু-বান্ধব ও অতিথি-অভ্যাগতকে আপ্যায়িত করে অর্থাৎ নিজের শ্রমের ফল এ জীবনেই ভোগ করে ; ঠিক তেমনি প্রব্রজিত সন্ন্যাসীরা কি সন্ন্যাসের ফল এ জীবনে পেতে পারেন না, শুধু অনাগতের আশায় কি তাঁরা বসে থাকবেন ?

বুদ্ধ তাঁকে প্রশ্ন করলেন—মহারাজ ! আপনার তো অনেক ভৃত্য আছে, যারা আপনার আজ্ঞাবহ আপনার সেবারত এবং আপনার পরিচর্যায় ত্রুটির ভয়ে সতত সন্ত্রস্ত, তাদের একজন যদি গৃহবাসে বীতস্পৃহ হয়ে সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে এবং প্রব্রজিতের সমস্ত ব্রত অবলম্বন করে, তবে আপনি কি তাকে সে অবস্থায় দেখে বলবেন 'হে আমার অনুগত ভৃত্য ! তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করে এখনি আমার সেবায় নিযুক্ত হও' ? রাজা উত্তর করলেন—না, ভদন্ত এমন বাক্য কখনো মুখে আনতে পারব না, বরং তাঁকে দেখে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করব, তাঁর সেবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে চেষ্টা করব।

বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন—এ কি সন্ন্যাস ধর্মের প্রত্যক্ষ ফল নয় ?

রাজা উত্তর দিলেন—হাঁ।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন—মহারাজ ! মনে করুন কোন ব্যক্তি পবিত্রাত্মা মহাপুরুষের বাণী শুনে ভাবে—সংসারজীবন বাধাসঙ্কুল সঙ্কটময় কামনার আবিল প্রবাহে পঙ্কিল, সংসারে থেকে পবিত্র শুদ্ধ জীবন যাপন সহজ নয়, কিন্তু ভিক্ষু জীবন বায়ুর মতো মুক্ত স্বচ্ছন্দ। এই ভেবে সে ভিক্ষুর সমস্ত ব্রত পালনে আত্মসংযত আত্মস্থ ও যথালাভতুষ্ট হয়। তখন সে বন, প্রান্তর, তরুমূল পর্বতগুহা ইত্যাদি নির্জন স্থান আশ্রয় করে অধ্যাত্ম সাধনারত হয় এবং সাধনার

প্রভাবে কাম ক্রোধাদি দমন করে মনকে অনাবিল করে ও মনের সংশয় গ্লানি মুছে ফেলে। এ অবস্থায় মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, দেহ স্বস্তি বোধ করে এবং গভীর শান্তিতে চিত্ত সমাহিত হয়ে যায়। তার সমাহিত মন কামনা ও কুচিন্তার সীমা অতিক্রম করে ধ্যানের প্রথম স্তরে উপনীত হয়। তার সমগ্র সত্তা আনন্দে আপ্লুত হয়। এটি সন্ন্যাস-জীবনের আরো শ্রেয়তর প্রত্যক্ষ ফল।

অতঃপর সেই ভিক্ষু সাধনার প্রভাবে ধ্যানের প্রথম স্তর অতিক্রম করে দ্বিতীয় স্তর লাভ করে। তখন প্রীতিতে আনন্দে ও শান্তিতে সমস্ত চিত্ত প্লাবিত হয়ে যায়। এও সন্ন্যাস-জীবনের প্রত্যক্ষ ফল যা পূর্বপেক্ষা শ্রেয়তর। এ ভাবে সে ক্রমশঃ ধ্যানের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে উপনীত হয়ে সন্ন্যাসের আরো বৃহত্তর ফল লাভ করে। যখন তার ধ্যানসমৃদ্ধ মন শান্ত শুদ্ধ নির্মল অচঞ্চল ও নমনীয় হয়, তখন সে আপনার মনকে ঋদ্ধির দিকে অগ্রসর করিয়ে দেয় এবং নানাপ্রকার ঋদ্ধিবিভূতি প্রকাশে সমর্থ হয়—যথা এক হয়ে সে বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ করে এবং নিজের বহুমূর্তিকে একীভূত করে; সে চোখের পলকে দৃশ্য ও অদৃশ্য হয়ে যায়. প্রাচীর ও পাষাণের মধ্য দিয়ে অবাধে যাতায়াত করে, ভূগর্ভে প্রবেশ করে পুনরুত্থিত হয়, জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে এবং আকাশ-পথে ভ্রমণ করে। এও সন্ন্যাস-জীবনের প্রণীততর প্রত্যক্ষ ফল। পুনশ্চ সে সাধনার প্রভাবে দিব্যকর্ণ লাভ করে দূর ও আসন্ন, মানুষিক ও অতিমানুষিক সকল প্রকার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পায়। এও সন্ন্যাস-জীবনের প্রত্যক্ষ ফল। অতঃপর সে পরের চিত্ত উপলব্ধি করে, নিজের জন্ম-জন্মান্তর দেখতে পায় এবং জীবজগতের জন্মমৃত্যুর গোপন লীলা প্রত্যক্ষ করে। এইগুলোও সন্ন্যাস-জীবনের শ্রেয়তর প্রত্যক্ষ ফল। অবশেষে সে চারি আর্যসত্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করে অন্তরের সমস্ত রিপুদল নির্মূলিত করে বন্ধনহীন অর্হৎ হয়, তার পুনর্জন্ম রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সকল কর্তব্যের অবসান ঘটে। এটিই সন্ন্যাসধর্মের শ্রেষ্ঠতম প্রত্যক্ষ ফল।

বুদ্ধের বিচিত্র কথায় রাজার মনপ্রাণ অভিষিক্ত হয়ে গেল, অন্তর উদ্বুদ্ধ হল। তিনি বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে বললেন—ভদন্ত, আপনি আমার অন্ধকারে আলো দান করেছেন, আমি পথ খুঁজে পেয়েছি, আজ থেকে আমি আপনারই শরণগত উপাসক; আমি রাজ্যলোভে দিগ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে আমার ধার্মিক পিতাকে হত্যা করে গুরুতর অপরাধ করেছি; আমার অপরাধের সীমা নেই, আমার চরণে স্থান দিন। বুদ্ধ বললেন—মহারাজ, অপরাধ-স্বীকৃতি

আর্যবিনয়ের প্রশস্ত পন্থা, আপনার অনুতাপ আপনাকে সংযমের পথেই অগ্রসর করে দেবে।

রাজা বুদ্ধকে অভিবাদন করে প্রস্থান করলেন। তাঁর প্রস্থানের পরেই বুদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন—ভিক্ষুগণ, রাজা অজাতশত্রু সত্যি সত্যিই অভিভূত; যদি পিতৃহত্যার গুরুতর অপরাধে তিনি অপরাধী না হতেন, তবে এই আসনে তাঁর ধর্মচক্ষু উন্মীলিত হত। কথাটি বলে বুদ্ধ নীরব হলেন।

আঠাশ

পূর্বাকাশে লোহিতাভ রশ্মিচ্ছটা ছড়িয়ে পড়েছে। পাখীর কল কূজনে মুখর হয়ে উঠেছে রাজগৃহের তরুলতাচ্ছন্ন প্রান্ত। তখনও পথ ঘাট জনবিরল। তরুণ শৃগালক সিক্ত বস্ত্রে সিক্ত কেশে ত্বরিত পদে নগরের ফটক পেরিয়ে এসে দাঁড়াল উন্মুক্ত স্থানে। তারপর সে কৃতাঞ্জলিপুটে একমনে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ উর্ধ্ব অধঃ প্রত্যেক দিক নমস্কার করতে লাগলো। বুদ্ধ অদূরে দাঁড়িয়ে দেখলেন যুবকের দিক-নমস্কার। অনুষ্ঠানের পর তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হল যুবকের। বুদ্ধ স্নেহমধুর বচনে তাকে জিজ্ঞেস করলেন—বৎস, এই ভোরে তুমি সিক্ত বস্ত্রে সিক্ত কেশে দিক নমস্কার করছ কেন? যুবক বলল—ভদন্ত, আমার স্বর্গীয় পিতা অন্তিম শয্যায় শুয়ে আমায় নির্দেশ দিয়েছিলেন ছয় দিক নমস্কার করার জন্যে, আমি সেই পিতৃনির্দেশ পালনে প্রতিদিন ভোরে সিক্ত বসনে সিক্ত কেশে নগরের বাইরে এসে এমনি ভাবে দিক নমস্কার করি।

বুদ্ধ—বৎস, ঋষিবচনে দিক নমস্কার এমনি ভাবে হয় না।

যুবক—ভদন্ত, ঋষিবচনে কি ভাবে দিক নমস্কার হয়, তা আমায় বলুন।

বুদ্ধ—তবে মন দিয়ে শোন, আমি বলবো।

যুবক—হাঁ, ভদন্ত।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। বৎস, যখন আর্যশ্রাবকের চারি কর্মক্লেদ পরিত্যক্ত হয়, চারিদিক দিয়ে সে পাপ করে না, তার সম্পদ হানির ছয় দ্বার রুদ্ধ হয়, তখন সে এই চৌদ্দ পাপের কবল থেকে মুক্ত হয়ে সকল দিক রক্ষা করে উভয় জগৎ জয়ে অগ্রসর হয়—ইহলোকে তার সমৃদ্ধি আসে এবং মৃত্যুর পর সুগতি লাভ হয়।

কোন চার কর্মক্লেদ পরিত্যক্ত হয়? বৎস, প্রাণিহত্যা কর্মক্লেদ অদত্তগ্রহণ বা পরস্বাপহরণ কর্মক্লেদ, ব্যাভিচার কর্মক্লেদ, অসত্যবাদিতা কর্মক্লেদ—এই চারি কর্মক্লেদ পরিত্যক্ত হয়।

কোন চারিদিক দিয়ে সে পাপ করে না? কারো প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য সে পাপকর্মে রত হয় না, কারো প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ অন্যায় কর্ম করে না, ভয় দুর্বলতার জন্যে কুকর্মে রত হয় না এবং মোহাচ্ছন্ন হয়ে অন্যায় আচরণ করে না —এই চারিদিক দিয়ে পাপ করে না।

সম্পদহানির কোন ছয়টি দ্বার রুদ্ধ হয়? সুরাপান মাদক দ্রব্য সেবন সম্পদহানির একটি দ্বার, রাত্রিতে অলিগলিতে ভ্রমণ সম্পদহানির আর একটি দ্বার, আমোদ প্রমোদে মত্ত হওয়া সম্পদ হানির তৃতীয় দ্বার, জুয়ায় মেতে থাকা চতুর্থ দ্বার, কুলোকের সাহচর্য পঞ্চম দ্বার, আলস্যযুক্ত হওয়া ষষ্ঠ দ্বার, সম্পদহানির এই ছয়টি দ্বার রুদ্ধ হয়।

বৎস, সুরামাদক দ্রব্য সেবনের ছয়টি দোষ—বর্তমান ধনহানি, কলহবৃদ্ধি, রোগ বৃদ্ধি, নিন্দালাভ, নির্লজ্জতা ও বুদ্ধিলোপ।

বৎস, রাত্রিতে অলিগলি ভ্রমণের ছয়টি দোষ—আত্মরক্ষার অভাব, স্ত্রীপুত্রের নিরাপত্তার অভাব, সম্পদ রক্ষার গাফিলতি, কুস্থানে যাতায়াতের সন্দেহে, পরের কুকর্মের জন্য অযথা দোষারূপের সম্ভাবনা, নানা ভাবে দুঃখ লাঞ্ছনা ভোগ।

বৎস, আমোদ প্রমোদে মত্ত হওয়ার ছয়টি দোষ—কোথায় নাচ, কোথায় গান, কোথায় বাদ্য, কোথায় আখ্যান, কোথায় করতালি, কোথায় কুম্ভক্রীড়া তা খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।

বৎস, জুয়ায় মেতে থাকার ছয়টি দোষ—জয় হলে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, পরাজয় হলে অর্থের অনুশোচনা আসে, বর্তমান ধনহানি; সমাজে জুয়াড়ীর কথার দাম নেই, বন্ধু-বান্ধবের কাছে সে হেয় এবং বিবাহের ক্ষেত্রে অযোগ্য হয় স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণের অক্ষমতার জন্য।

বৎস, কুলোকের সাহচর্যের ছয়টি দোষ—যারা জুয়াড়ী, যারা মাতাল, যারা প্রমদাসক্ত, যারা শঠ, যারা, প্রবঞ্চক, যারা ডাকাত, তাদের সঙ্গে হয় তার বন্ধুত্ব।

বৎস, আলস্যযুক্ত হওয়ার ছয়টি দোষ—অলস ব্যক্তি শীতকালে খুব শীত বলে কাজ করে না, গ্রীষ্মকালে খুব গরম বলে কাজ করে না, সন্ধ্যায় সন্ধ্যা হয়েছে বলে কর্মবিরত হয়, সকালে অতি সকাল বলে কাজ সুরু করে না, ক্ষুধায় অতি ক্ষুধার্ত বলে কর্ম ত্যাগ করে, ক্লান্ত বলে কর্ম ত্যাগ করে। এভাবে কর্মবিমুখ হওয়ার জন্যে অলস ব্যক্তির অলব্ধ সম্পদ আয়ত্ত হয় না এবং লব্ধ সম্পদ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

বৎস, এ চারি জন মিত্ররূপীকে অমিত্র বলে জানবে—স্বার্থপর অমিত্র মিত্র-রূপী, বাকসর্বস্ব অমিত্র মিত্ররূপী, মিষ্টভাষী অমিত্র মিত্ররূপী, পাপ পথের সহায় অমিত্র মিত্ররূপী।

বৎস, স্বার্থপর অমিত্রকে চারি কারণে মিত্ররূপী বা কপট বন্ধু বলে জানবে—সে শুধু নেবার জন্য প্রস্তুত থাকে, অল্পের বিনিময়ে বেশী চায়, নিজের বিপদ মুক্তির জন্য দাসানুদাস হয়ে থাকে এবং নিজের স্বার্থোদ্ধারের জন্য বন্ধুর কার্য করে।

বৎস, বাকসর্বস্ব অমিত্রকে চারি কারণে মিত্ররূপী বলে জানবে—অতীত নিয়ে আপ্যায়িত করে অর্থাৎ 'গত কল্য তোমার অপেক্ষায় ছিলাম, তোমার জন্যে এত প্রচুর ব্যবস্থা করেছিলাম তুমি যে এলে না' এই বলে খুশী করতে থাকে, অনাগত নিয়ে আপ্যায়িত করে অর্থাৎ 'আমার যখন লাভ হবে, তখন তোমায় অনেক দেব' এই বলে আশান্বিত করে, অনর্থক তোষামোদ করে এবং প্রয়োজন-কালে অজুহাত দেখিয়ে সাহায্য দানে অক্ষমতা প্রকাশ করে।

বৎস, মিষ্টভাষী অমিত্রকে চারি কারণে মিত্ররূপী বলে জানবে—সে কুপরামর্শ দান করে, সৎপরামর্শ দেয় না, সম্মুখে প্রশংসা করে এবং পেছনে নিন্দা করে।

বৎস, পাপপথের সহায় অমিত্রকে চারি কারণে মিত্ররূপী বলে জানবে—সে সুরা ও মাদক দ্রব্য সেবন প্রভৃতিতে আসক্ত করতে সহায়তা করে, অলি-গলিতে নৈশ ভ্রমণে সাহায্য করে, আমোদ প্রমোদে যেতে থাকতে সাহায্য করে এবং জুয়া খেলায় সহায়ক হয়।

বৎস, এ চারিজন মিত্রকে সুহৃদ বলে জানবে—উপকারী মিত্র সুহৃদ, সম-সুখদুঃখী মিত্র সুহৃদ, সৎ পরামর্শদাতা মিত্র সুহৃদ, অনুকম্পাকারী মিত্র সুহৃদ।

বৎস, উপকারী মিত্রকে চারি কারণে সুহৃদ বলে জানবে—সে প্রমত্ত অবস্থায় বন্ধুকে রক্ষা করে, বন্ধুর সম্পদ রক্ষা করে, ভয়ে বন্ধুর আশ্রয় হয়, বন্ধুর কর্মে বিশেষ সহায়তা করে।

বৎস, সমসুখদুঃখী মিত্রকে চারি কারণে সুহৃদ বলে জানবে—সে বন্ধুকে গোপনীয় বিষয় বলে, বন্ধুর গোপনীয় বিষয়কে গোপন করে, বিপদে তাকে ত্যাগ করে না, তার জন্য এমন কি জীবন উৎসর্গ করে।

বৎস, সৎপরামর্শদাতা মিত্রকে চারি কারণে সুহৃদ বলে জানবে—সে বন্ধুকে পাপকর্ম হতে নিবৃত্ত করে, সৎকর্মে নিয়োগ করে, অশ্রুত বিষয় শোনায়, সুগতির পথ প্রকাশ করে।

বৎস, অনুকম্পাকারী মিত্রকে চারি কারণে সুহৃদ বলে জানবে—সে বন্ধুর দুর্ভাগ্যে খুশী হয় না, সৌভাগ্যেই খুশী হয়, বন্ধুর নিন্দায় বাধা দেয়, প্রশংসায় উৎসাহ প্রকাশ করে।

বৎস, আর্যশ্রাবক কি ভাবে ছয় দিক রক্ষা করে? মাতাপিতাকে পূর্ব দিক বলে জানবে, আচার্যগণকে দক্ষিণ দিক বলে জানবে, স্ত্রী পুত্রকে পশ্চিম দিক বলে জানবে, বন্ধু-বান্ধবকে উত্তর দিক বলে জানবে, দাসকর্মচারীকে অধোদিক বলে জানবে এবং সাধুগণকে উর্দ্ধ দিক বলে জানবে।

বৎস, পাঁচ রকমে পূর্ব দিক মাতাপিতার সেবা করা উচিত—মাতাপিতা আমাকে লালন পালন করেছিলেন, সুতরাং তাঁদের ভরণপোষণ করব, সেবা করব, বংশ রক্ষা করবো, উত্তরাধিকার লাভ করবো, তাঁদের পরলোকগমনে দক্ষিণার ব্যবস্থা করব। মাতাপিতা পাঁচরকমে পুত্রের উপকার করেন—পাপ থেকে পুত্রকে নিবৃত্ত করেন, সৎকর্মে নিযুক্ত করেন, শিল্পাদি শিক্ষায় শিক্ষিত করেন, উপযুক্ত বিবাহের ব্যবস্থা করেন, যথাসময়ে ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন। এ ভাবে পূর্বদিক রক্ষিত হয়, নিরাপদ হয়।

বৎস, পাঁচ রকমে শিষ্যের 'দক্ষিণ দিক' আচার্যগণের সেবা কর্তব্য। সম্মান প্রদর্শনে, সেবায়, মনোযোগের সহিত উপদেশ শ্রবণে,' পরিচর্যায়, সুচারুরূপে শিল্পাদি শিক্ষায়। সেবায় সন্তুষ্ট আচার্যগণ পাঁচ রকমে শিষ্যকে অনুগৃহীত করেন—সুশিক্ষা দানে, সুচারুরূপে বিষয় ব্যাখ্যায়, শিল্পাদির গূঢ় বিষয় প্রকাশে, বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে সুখ্যাতি প্রচারে, দিক্‌বিজয়ের ব্যবস্থায়। এই ভাবে 'দক্ষিণ দিক' রক্ষিত হয়, নিরাপদ হয়।

বৎস, পাঁচ রকমে স্বামীর 'পশ্চিম দিক' পত্নীর প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করা উচিত—উপযুক্ত সম্মান প্রদানে, অনবমাননায়, অনতিচর্যায়, কর্ত্রীত্বের অধিকার দানে, অলঙ্কার দানে। সমাদৃতা পত্নী পাঁচ রকমে স্বামীর মন তুষ্ট করে—সুষ্ঠু গৃহকর্ম সম্পাদনে, পরিজনের সেবায়, অনতিচারিণী হয়ে, সঞ্চিত ধন রক্ষায়, সকল কর্মে দক্ষতায়, অনলসতায়।

বৎস, পাঁচরকমে 'উত্তর দিক' বন্ধুবান্ধবের সেবা করা উচিত—দানে, মধুর ভাষণে, উপকার সম্পাদনে, একাত্মতায়, অবিবাদে। সেবাতুষ্ট বন্ধুবান্ধবেরা পাঁচ রকমে তাকে অনুগৃহীত করে—প্রমত্ত অবস্থায় তাকে তারা রক্ষা করে, তার সম্পদ রক্ষা করে, ভয়ে তার আশ্রয় হয়, বিপদে তাকে ত্যাগ করে না, অপর লোকেরাও তাকে সম্মান করে।

বৎস, পাঁচ রকমে 'অধোদিক' দাস কর্মচারীর প্রতি কর্তব্য সম্পাদন

করা উচিত—যোগ্যতানুরূপ কার্যভার অর্পণে, আহার বেতন প্রদানে, রোগের সময় পরিচর্যায়, সুস্বাদু আহার্য বণ্টনে, সময়ানুরূপ অবসর দানে। মালিকের অনুগৃহীত দাস কর্মচারী পাঁচ রকমে মালিককে সন্তুষ্ট করে—তারা আগেই করণীয় কর্মে উপস্থিত হয়, বিলম্বে অবসর গ্রহণ করে, সততা অবলম্বন করে, করণীয় কর্ম সুষ্ঠু সম্পাদন করে এবং সর্বত্র মালিকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

বৎস, পাঁচ রকমে 'ঊর্ধ্ব দিক' সাধুসজ্জনের সেবা করা উচিত—মৈত্রীপূর্ণ কায়কর্মে, মৈত্রীপূর্ণ বাক্‌কর্মে, মৈত্রীপূর্ণ মনোকর্মে, গৃহদ্বার উন্মুক্ত রেখে, নৈবেদ্য অর্পণে। সেবাতুষ্ট সাধুসজ্জনগণ ছয় রকমে সেবককে অনুগৃহীত করেন—পাপ থেকে তাকে নিবৃত্ত করেন, সৎকর্মে নিযুক্ত করেন, কল্যাণচিত্তে অনুকম্পা করেন, অশ্রুত বিষয় শোনান, শ্রুত বিশোধন করেন এবং স্বর্গের পথ প্রদর্শন করেন।

বুদ্ধের বিচিত্র উপদেশ শুনে যুবক মুগ্ধ হল এবং তাঁর চরণে প্রণত হয়ে বলল—আমি আপনার শরণ নিলাম, আপনার প্রবর্তিত ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণগত হলাম, আজ থেকে আমাকে আপনার উপাসক রূপে গ্রহণ করুন।

•

ঊনত্রিংশ

পূর্ণিমার রাত্রি। জ্যোৎস্নায় চারিদিক উজ্জ্বল। তরুলতাচ্ছন্ন 'পূর্বারাম' শ্রাবস্তীর প্রান্তে যোগমগ্ন তপস্বীর মত স্তব্ধ। তার চত্বরে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত বুদ্ধ। রাত্রির প্রথম যাম যখন অতিবাহিত হল, ভিক্ষু আনন্দ আসন ত্যাগ করে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়ালেন সভায়, সেই নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন—ভদন্ত, সুন্দর রাত্রি, অনেকক্ষণ ধরে ভিক্ষুসঙ্ঘ বসে আছেন, অনুগ্রহ করে প্রাতিমোক্ষ শুনিয়ে দিন তাঁদের। বুদ্ধ নীরব রইলেন। দ্বিতীয় যাম যখন অতিক্রান্ত হল, আবার ভিক্ষু আনন্দ আসন ত্যাগ করে উঠলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—ভদন্ত, সুন্দর রাত্রি, ভিক্ষুসঙ্ঘ অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন, এবার তাঁদের প্রাতিমোক্ষ শুনিয়ে দিন। বুদ্ধ কিছু না বলে তেমনি বসেই রইলেন। সভা আবার স্তব্ধতামগ্ন হল। রাত্রির শেষ প্রহরে ভিক্ষু আনন্দ তৃতীয় বার বুদ্ধের কাছে সেই অনুরোধ পেশ করলেন। বুদ্ধ শুধু বললেন—পরিষদ অশুদ্ধ।

মৌদ্‌গল্যায়ন ভাবতে লাগলেন—কোন ব্যক্তির জন্য ভগবান এই পরিষদকে অশুদ্ধ বলে বলছেন। তিনি দিব্য দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে পেলেন ভিক্ষু-সঙ্ঘের মধ্যে উপবিষ্ট সেই দুঃশীল পাপধর্মী অপবিত্র অন্তর্মলিন গুপ্তকর্মা ভণ্ড

ভিক্ষুকে। তখনি তিনি সেই ভণ্ড ভিক্ষুর কাছে গিয়ে বললেন—বন্ধু, ওঠ, ভগবান তোমায় দেখে ফেলেছেন, তোমার সঙ্গে ভিক্ষুদের সংসর্গ হতে পারে না। এ কথা শুনে সে ব্যক্তি নীরবে বসে রইল। মৌদ্‌গল্যায়ন আবার বললেন—বন্ধু, ওঠ, ভগবান তোমায় দেখে ফেলেছেন, তোমার সঙ্গে ভিক্ষুদের সংসর্গ হতে পারে না। পুনর্বার বলা সত্বেও সে তেমনি নীরব হয়ে বসে রইল। মৌদ্‌গল্যায়ন তৃতীয় বার তাকে পরিষদ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। তাতেও কোন ফল না হওয়ায় তিনি সে ব্যক্তিকে হাত ধরে ফটকের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফটক বন্ধ করে দিলেন। তার পর তিনি বুদ্ধের কাছে এসে বললেন—ভদন্ত, সেই ব্যক্তিকে বের করে দিয়ে এলাম, এখন পরিষদ শুদ্ধ, অনুগ্রহ করে প্রতিমোক্ষ শুনিয়ে দিন। বুদ্ধ বললেন—আশ্চর্য! লোকটিকে হাত ধরে বের করে না দেওয়া পর্যন্ত বসেই রইল।

অতঃপর বুদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন—হে ভিক্ষুগণ, মহাসাগরের আটটি আশ্চর্য স্বাভাবিক নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। মহাসাগর ক্রমশঃ নিম্ন, ক্রমশঃ প্রবণ, ক্রমশঃ গভীর—তটের কিনারা থেকে গভীর নয়, মহাসাগর স্থিতিশীল, বেলা অতিক্রম করে না। মহাসাগর মরা পচাকে রাখে না, শীঘ্রই তরঙ্গাঘাতে তীরে তুলে দেয়। গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভু, মহী প্রভৃতি মহানদীসমূহ যখন মহাসমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তারা পূর্ব নাম গোত্র হারিয়ে মহাসমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে যায়। যে সব স্রোতস্বিনী জনপদ ও পর্বত-প্রান্তর বেয়ে মহাসমুদ্রে পড়ে তাদের প্রবাহে এবং আকাশ হতে বারিবর্ষণে মহাসমুদ্রের ঊনতা কিংবা পূর্ণতা দেখা যায় না। মহাসমুদ্রের জলের একই লবণাক্ত স্বাদ। মহাসমুদ্রে বহু রত্ন, যথা—মুক্তা, মণি, বৈদুর্য, শঙ্খ, প্রবাল, স্বর্ণ, রজত, লোহিতাঙ্ক ইত্যাদি। পুনশ্চ মহাসমুদ্র অতিকায় জীবের আবাস ভূমি—তিমি, হাঙ্গর, নাগ প্রভৃতি সেখানে অবস্থান করেন।

হে ভিক্ষুগণ, মহাসাগরের যেমন এই আটটি আশ্চর্য স্বাভাবিক নিয়ম পরিলক্ষিত হয়, তেমনি এই ধর্মবিনয়েরও আটটি আশ্চর্য গুণ দেখা যায়। মহাসাগর যেমন ক্রমশঃ নিম্ন, ক্রমশঃ প্রবণ, ক্রমশঃ গভীর—তটের কিনারা থেকে গভীর নয়, তেমনি এই ধর্মবিনয়ে ক্রমিক শিক্ষা ক্রমিক ক্রিয়া ক্রমিক প্রতিপদা—গোড়াতেই উপলব্ধি নয়। মহাসাগর যেমন স্থিতিশীল, বেলা অতিক্রম করে না, তেমনি সঙ্ঘের সদস্যবর্গ জীবনের জন্যও বিনয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করে না, মহাসাগর যেমন মরা পচাকে রাখে না, শীঘ্রই তীরে তুলে দেয়, তেমনি সঙ্ঘ দুঃশীল পাপধর্মী অপবিত্র অন্তর্মলিন গুপ্তকর্মা ভণ্ড ভিক্ষুকে

রাখে না, শীঘ্রই তাকে পরিষ্কৃত করে—সঙ্ঘের মাঝখানে উপবিষ্ট হলেও সে সঙ্ঘ থেকে দূরে, সঙ্ঘের সঙ্গে তার সংসর্গ হতে পারে না। গঙ্গা যমুনাদি মহানদীসমূহ যেমন মহাসাগরের সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ব নাম গোত্র হারিয়ে মহাসাগরের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তেমনি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণের লোকেরা এই ধর্মবিনয়ে দীক্ষিত হয়ে পূর্ব নাম গোত্র হারিয়ে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ নাম নিয়ে সঙ্ঘে এক হয়ে যায়। যেমনি স্রোতস্বিনীসমূহের প্রবাহিত জলে ও আকাশের বর্ষণধারায় মহাসমুদ্রের ঊণতা কিংবা পূর্ণতা দেখা যায় না, তেমনি যদিও বহু বহু ভিক্ষু নির্বাণ লাভ করে, তবুও সঙ্ঘের ঊণতা কিংবা পূর্ণতা দেখা যাবে না। মহাসমুদ্রের জলের যেমন একমাত্র লবনাক্ত স্বাদ, তেমনি এই ধর্মবিনয়েরও একমাত্র স্বাদ—বিমুক্তি স্বাদ। মহাসমুদ্রে যেমন বহু রত্ন বিদ্যমান, যথা—মুক্তা, মণি, বৈদূর্য, শঙ্খ, প্রবাল, স্বর্ণ, রজত, লোহিতাঙ্ক ইত্যাদি, তেমনি এই ধর্মবিনয়েও বহু রত্ন বিদ্যমান, যথা চারি স্মৃত্যোপস্থান, চারি সম্যক্ প্রচেষ্টা, চারি ঋদ্ধিপাদ, শ্রদ্ধা ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ? মহাসমুদ্র যেমন অতিকায় জীবের আবাসভূমি—তিমি হাঙ্গর নাগ প্রভৃতি সেখানে অবস্থান করে, তেমনি এই ধর্মবিনয়ও মহামানবের আবাসভূমি, এখানে আছে স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তি ফল লাভের জন্য পথারূঢ, সকৃদাগামী, সকৃদাগামী ফললাভের জন্য পথারূঢ, অনাগামী, অনাগামী ফললাভের জন্য পথারূঢ়, অহৎ অর্হত্ব ফললাভের জন্য পথারূঢ।

অতঃপর বুদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, আমি যে পক্ষের অষ্টমী চতুর্দশী ও পঞ্চদশীতে তোমাদের উপোসথানুষ্ঠানে যোগদান করে প্রতিমোক্ষ শুনিয়ে দিতাম. আজ থেকে তা আর করব না, কারণ, সম্মেলন শুচি শুদ্ধ না হলে, আমার পক্ষে প্রাতিমোক্ষ শোনানো সম্ভব, এখন থেকে তোমরা নিজেই প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করবে। সেই থেকে ভিক্ষুদের উপোসথানুষ্ঠানে বুদ্ধ যোগদান করেননি।

ত্রিশ

রাজা প্রসেনজিতের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন ব্রাহ্মণ তোদেয়। শ্রাবস্তীর অনতিদূরে অবস্থিত তুদিত গ্রামের অধিপতি বলে তাঁর এই নাম হয়েছিল। তিনি ছিলেন অতুল বৈভবের অধিকারী। বৈভবের প্রতি তাঁর মায়া ছিল অপরিসীম। সম্পদ-রক্ষার চিন্তা সর্বক্ষণ তাঁর মন জুড়ে থাকত। মৌমাছি যেমনি মধু সঞ্চয় করে, বল্মীক যেমনি ঢিবিকে বাড়াতে থাকে, তেমনি সঞ্চয়

করতে হবে রাশি রাশি ধন, বাড়াতে হবে সম্পদ—এই ছিল ব্রাহ্মণ তোদেয়ের লক্ষণ। তিনি ছিলেন দানে কুণ্ঠহস্ত। কেউ কোনদিন দেখেনি তাঁকে একমুষ্টি অন্ন প্রার্থীকে দিতে। দান করলে ক্ষয় হবে, ফুরিয়ে যাবে—এই ছিল তাঁর ভয়।

মহাপ্লাবন যেমন ঘুমন্ত লোককে হঠাৎ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি মোহাচ্ছন্ন মত্ত তোদেয়কে একদিন ছিনিয়ে নিয়ে গেল মৃত্যু। পড়ে রইল পেছনে তাঁর বিশাল সম্পদ, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি। তাঁর সুদর্শন তরুণ পুত্র শুভ পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে মালিক হল সেই বৈভবের। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সম্পদ পেলেও পিতার কৃপণতা পায়নি শুভ। অন্ততঃ ভোগের ব্যাপারে তার ব্যয়-কুণ্ঠতা ছিল না। সে একটি কুকুর পুষল। কুকুরটির প্রতি তার আদর যত্নের সীমা ছিল না। সে স্বহস্তে কুকুরটিকে সুখাদ্য খাওয়াত, সুকোমল শয্যায় শোওয়াত।

একদিন শুভ যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল, তখন বুদ্ধ একাকী ভিক্ষাপাত্র হস্তে প্রবেশ করলেন তার গৃহপ্রাঙ্গণে। কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল বুদ্ধের সামনে। তিনি শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কুকুরের পানে চেয়ে বললেন—তোদেয়, তুমি যখন এগৃহের অধিপতি ছিলে, তখনও সারাজীবন লোক তাড়িয়েছ, আজও কুকুর হয়ে আমায় তাড়াচ্ছ, তোমার স্থান কোথায়? কুকুর তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ চাহনি সহ্য করতে পারল না, মস্তক নত করে উনুনের ধারে গিয়ে শুয়ে পড়ল। বুদ্ধ বেরিয়ে গেলেন।

শুভ বাড়ী ফিরে এসে দেখল তার প্রিয় কুকুর উনুনের পাশে শুয়ে আছে। তার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, মুখে সাড়া শব্দ নেই। শুভ বাড়ীর লোকজনকে জিজ্ঞেস করল তার কারণ। তারা জানাল সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত। ঘটনা শুনে শুভ হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—আমার বাবা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েছেন, কে বলে তিনি কুকুর হয়ে জন্মেছেন, যা মুখে আসে শ্রমণ গৌতম তাই বলে, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি তার কাছে, এ মিথ্যা আমি সহ্য করব না। রাগে গর গর করতে করতে জেতবনের দিকে চলল শুভ। সেখানে গিয়েই সে বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করল—আপনি না কি বলেছেন আমার বাবা কুকুর হয়ে জন্মেছেন আমাদের বাড়ীতে, এ কি সত্য? বুদ্ধ দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করলেন—'হাঁ'।

শুভ—তার প্রমাণ কি?

বুদ্ধ—হে তরুণ, তোমার বাবার গুপ্ত ধন কিছু আছে কি যা তুমি পাওনি।

শুভ—হাঁ। আমাদের সোনার মালা, সোনার পাদুকা, ও সোনার পাত্র এখনো পাইনি।

বুদ্ধ—তবে তোমার কুকুরকে তোয়াজ করে সেগুলি উদ্ধারের চেষ্টা করো। তখনি জানতে পারবে—এ তোমার পিতা কি না।

শুভ মনে মনে খুশী হয়ে ভাবল—যদি কথা সত্যি হয়, তবে গুপ্ত সম্পদ উদ্ধার হবে, যদি মিথ্যা হয় শ্রমণকে দেখে নেব। বুদ্ধের নির্দেশ মত সে কুকুরকে খুব তোয়াজ করতে লাগল। অতঃপর কুকুর যেখানে এ গুপ্ত সম্পদ পোতা ছিল, সেখানে গিয়ে পায়ে মাটী আঁচড়াতে লাগলো। শুভ মাটী খুঁড়িয়ে দেখল সে সম্পদ, তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। বুদ্ধের প্রতি তার ক্রোধ ভক্তিতে রূপান্তরিত হল।

সেই থেকে কর্মের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মের কথা শুভের মন তোলপাড় করতে লাগলো। যে মানুষ ধনে মানে অর্থে যশে সমাজে উচ্চ আসন পায়, কর্মের সূক্ষ্ম বিধি অনুসরণে সেও কুকুর জন্মে অবনমিত হয়। কর্মের বিচিত্র লীলা দুর্বোধ্য। শুভ অনেক ভাবে, কোন সমাধান খুঁজে পায় না। একদিন সে জেতবনে গিয়ে বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করল—ভবৎ গোতম, মানুষের মধ্যে এত ভেদ কেন, কেউ অল্পায়ু, কেউ দীর্ঘায়ু, কেউ রুগ্ন কেউ স্বাস্থ্যবান, কেউ ক্ষমতাসম্পন্ন, কেউ অক্ষম, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ বুদ্ধিমান কেউ নির্বোধ—মানুষের মধ্যে এই ভেদের কারণ কি? উত্তরে বুদ্ধ বললেন—হে তরুণ, প্রাণিগণ কর্ম-সর্বস্ব কর্মের উত্তরাধিকারী, কর্মানুসারী, কর্ম তাদের বন্ধু, কর্ম তাদের শরণ—কর্মই তাদের বিভক্ত করে উচ্চনীচতায়। শুভ বলল—ভবৎ গোতম, আপনার এই সংক্ষিপ্ত কথার মর্ম বিশদভাবে বুঝতে পারলাম না, একটু পরিষ্কার করে বলুন যাতে বুঝতে পারি। বুদ্ধ বললেন—বৎস, তবে শোন, বলছি, তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর ভাষণ।

হে তরুণ, ইহলোকে কোন কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষ প্রাণঘাতী রুদ্র রক্ত-লোলুপ হয়, হত্যায় লিপ্ত থাকে এবং প্রাণীদের প্রতি দয়াশূন্য হয়। সে মৃত্যুর পর সেই কর্মের ফলে নরক গমন করে। যদিও সে নরক গমন না করে, যেখানে সে মনুষ্য হয়ে জন্মায়, সেখানে সে অল্পায়ু হয়। প্রাণীহত্যা অল্পায়ু হবার পন্থা।

হে তরুণ, ইহলোকে কোন কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষ প্রাণীহত্যা থেকে বিরত হয়, কারো বিরুদ্ধে দণ্ড গ্রহণ করে না, মঙ্গল কামনা করে। সে মৃত্যুর পর সেই কর্মের ফলে সুখময় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। যদিও স্বর্গলাভ না হয়, যেখানে সে মনুষ্য হয়ে জন্মায়, সেখানে সে দীর্ঘায়ু হয়। প্রাণীহত্যা ত্যাগ করে জীবের কল্যাণ-কামনা দীর্ঘায়ু হবার পন্থা।

হে তরুণ, ইহলোকে কোন কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষ জীবকে পীড়া দেয়

হস্তে লোষ্ট্রে দণ্ডে অথবা শস্ত্রে সে মৃত্যুর পর সেই কর্মের ফলে নরক গমন করে। যদিও নরক গমন থেকে রক্ষা পায়, যেখানে সে মনুষ্য হয়ে জন্মায়, সেখানে সে চিররুগ্ন রোগ বহুল হয়। পরপীড়ন রোগবহুলতার পথ।

হে তরুণ, ইহলোকে কোন কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষ পরকে পীড়া দেয় না, অহিংসার পথ অবলম্বন করে। সে মৃত্যুর পর সেই কর্মের ফলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। যদিও স্বর্গলাভ না হয়, যেখানে সে মানুষ হয়ে জন্মায়, সেখানে সে স্বাস্থ্যবান সুস্থ সবল হয়। পরপীড়ন থেকে বিরত থাকা অহিংস হওয়া স্বাস্থ্য লাভের পন্থা।

হে তরুণ, ইহলোকে কোন কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষ ক্রোধপ্রবণ ক্ষোভবহুল হয়, সামান্য কারণে রেগে ওঠে উত্যক্ত হয়, অসন্তোষ প্রকাশ করে। সে মৃত্যুর পর সেই কর্মের ফলে নরক গমন করে। যদিও নরক গমন থেকে রক্ষা পায়, যেখানে সে মানুষ হয়ে জন্মায়, সেখানে সে কুৎসিত শ্রীহীন হয়। ক্রোধপ্রবণতা কুৎসিত বিশ্রী হবার পন্থা।

হে তরুণ, ইহলোকে কোন কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষ অক্রোধন শান্ত হয়, বহু বলা সত্বেও রাগে না, উত্যক্ত হয় না, অসন্তোষ প্রকাশ করে না। সে মৃত্যুর পর সেই কর্মের ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। যদিও স্বর্গ লাভ করে না, মনুষ্য লোকে যেখানে জন্মায়, সেখানে সে প্রিয়দর্শন হয়। অক্রোধিতা শান্তস্বভাব প্রিয়দর্শন হবার পন্থা।

হে তরুণ, ইহলোকে কোন কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ পরশ্রীকাতর হয়। সে মৃত্যুর পর সেই কর্মের ফলে নরক গমন করে। যদি ও সে নরক গমন না করে, মনুষ্যলোকে যেখানে জন্মায়, সে অক্ষম দুর্বল হয়। ঈর্ষা পরশ্রীকাতরতা অক্ষম দুর্বল হবার পন্থা।

হে তরুণ, ইহজগতে কোন কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষ ঈর্ষাহীন উদারচেতা হয়। সে মৃত্যুর পর সেই কর্মের ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। যদিও স্বর্গলাভ না হয় মনুষ্যলোকে যেখানে জন্মায়, সেখানে সে ক্ষমতাশালী শক্তিমান হয়। ঈর্ষাহীনতা ক্ষমতাবান হবার পন্থা।

হে তরুণ, ইহজগতে কোন কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষ দানবিরত হয়, দান করে না। সে মৃত্যুর পর সেই কর্মের ফলে নরকগামী হয়। যদিও সে নরক গমন থেকে রক্ষা পায়, মনুষ্যলোকে যেখানে সে জন্মায়, সেখানে সে বিত্ত-হীন দরিদ্র হয়। দানে কুণ্ঠহস্ত হওয়া দারিদ্র্যের বিত্তহীনতার পন্থা।

হে তরুণ, ইহজগতে কোন কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষ দানশীল হয়। সে মৃত্যুর পর সেই কর্মের ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। যদিও স্বর্গ লাভ না হয়,

মনুষ্যলোকে যেখানে জন্মায়, সেখানে সে বিত্তশালী ধনবান হয়। দানশীলতা ধনবান হবার পন্থা।

হে তরুণ, ইহজগতে কোন কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষ দাম্ভিক অহঙ্কারী হয়, প্রণম্যকে প্রণাম করে না, মান্যকে সম্মান করে না, পূজনীয়কে পূজা করে না। সে মৃত্যুর পর সেই কর্মের ফলে নরকগামী হয়। যদিও নরক গমন না হয়, মনুষ্যলোকে যেখানে সে জন্মায়, সেখানে সে নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করে। দাম্ভিকতা অহঙ্কার, সেখানে সে নীচ কুলে জন্মলাভের কারণ।

হে তরুণ, ইহজগতে কোন কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষ দম্ভহীন নিরহঙ্কার হয়, প্রণম্যকে প্রণাম করে, মান্যকে সম্মান করে, পূজ্যের পূজা করে। সে মৃত্যুর পর সেই কর্মের ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। যদিও স্বর্গ লাভ না হয়, মনুষ্য-লোকে যেখানে জন্মায়, সেখানে সে উচ্চ কুলে জন্মগ্রহণ করে। দম্ভহীনতা নিরহঙ্কারিতা উচ্চ কুলে জন্মলাভের কারণ।

হে তরুণ, ইহজগতে কোন কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষ পুণ্য-অপুণ্য, সদোষ-নির্দোষ, হিতকর-অহিতকর বিষয় জানার আকাঙ্ক্ষায় সাধু সজ্জনের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসু হয় না, পরজন্মে তার জ্ঞানের উন্মেষ হয় না, নির্বোধ হয়ে সে জীবন কাটায়। জ্ঞানস্পৃহার অভাব মূর্খতার পথ।

হে তরুণ, ইহজগতে কোন কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষ সাধু সজ্জনের নিকট উপস্থিত হয়ে জানতে চায় পুণ্য-অপুণ্য, সদোষ-নির্দোষ, হিতকর-অহিতকর বিষয় সম্বন্ধে। পরজন্মে সে মহাজ্ঞানী হয়। জ্ঞান-স্পৃহা মহাজ্ঞানী হবার পন্থা।

হে তরুণ, এভাবে অল্পায়ু হবার পন্থা অল্পায়ুতায় উপনীত করে, দীর্ঘায়ুতার পন্থা দীর্ঘায়ুতায় উপনীত করে, রোগবহুলতার পন্থা রোগবহুল করে তোলে, নীরোগতার পন্থা নীরোগ করে তোলে, শ্রীহীনতার পন্থা শ্রীহীন করে দেয়, প্রিয়দর্শনতার পন্থা প্রিয়দর্শন করে তোলে, অক্ষমতার পন্থা ক্ষমতাহীন করে, ক্ষমতার পন্থা ক্ষমতাবান করে, দারিদ্র্যের পন্থা দারিদ্র দান করে, ধনীত্বের পন্থা ধনী করে তোলে, নীচকুলীনতার পন্থা নীচ কুলে নিয়ে যায়। উচ্চ কুলীনতার পন্থা উচ্চকুল প্রাপ্ত করায়, অজ্ঞতার পন্থা অজ্ঞ করে এবং জ্ঞানের পন্থা জ্ঞানী করে তোলে। হে তরুণ, প্রাণিগণ কর্মসর্বস্ব, কর্মের উত্তরাধিকারী, কর্মানুসারী, কর্ম তাদের বন্ধু, কর্ম তাদের শরণ—কর্মই তাদের বিভক্ত করে উচ্চনীচতায়।

তরুণ শুভ কর্মচক্রে আবর্তিত জীব জগতের জটিল রহস্যের বিচিত্র বর্ণনা শুনে মুগ্ধ হয়ে বলল—আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন, আমি আপনার শরণগত হলাম এবং আপনার প্রবর্তিত ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ নিলাম।

একত্রিশ

পূর্বাহ্নে ভিক্ষাগ্রহণের সময় আসন্ন জেনে বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হস্তে বেরিয়ে পড়লেন। ক্রমে তিনি নির্জন প্রান্তর ছাড়িয়ে প্রবেশ করলেন শ্রাবস্তীতে এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে রত হলেন। গৃহের পর গৃহ অতিক্রম করে তিনি উপস্থিত হলেন আগ্নিক ভরদ্বাজের গৃহ-প্রাঙ্গণে। তখন ভরদ্বাজের বাসভবনে হোমাগ্নি জ্বলছিল। তার ধূম শিখায় আচ্ছন্ন হয়েছিল প্রশস্ত কক্ষটি। ব্রাহ্মণ নিজেই ঘৃতাহুতি দিচ্ছিলেন। বিনানুমতিতে নিঃসঙ্কোচে বুদ্ধকে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেখেই তাঁর আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। তিনি গর্জন করে বললেন —ন্যাড়া, দাঁড়াও ওখানে, সন্ন্যাসী বেটা ফিরো। নীচ বৃষল এসোনা এখানে। ব্রাহ্মণের এ রূঢ় শালীনতাশূন্য সম্ভাষণে বিচলিত হলেন না বুদ্ধ। তিনি শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন—হে ব্রাহ্মণ, আপনি কি জানেন বৃষল কে এবং কি কারণে বৃষল হয়? বুদ্ধের শান্ত সৌম্য ভাব লক্ষ্য করে ভরদ্বাজের ক্রোধ প্রশমিত হয়ে এল। তিনি বুদ্ধের প্রশান্ত মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন—না, শ্রমণ, তা আমি জানি না, সে সম্বন্ধে আপনিই বলুন।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। যে লোক ক্রোধপরায়ণ বিদ্বেষী হয়, উপকারীর উপকার স্বীকার করে না, গুণীর গুণের সমাদর করে না, ভ্রান্ত মতাবলম্বী শঠ হয়, তাকেই বৃষল বলে জানবেন।

যে প্রাণিহিংসায় রত এবং যার জীবের প্রতি দয়ামমতা নেই, তাকেও বৃষল বলে জানবেন।

যে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে গ্রামে নিগমে লুটতরাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে, সেও বৃষল।

যে গ্রামে, বনে অথবা যে কোন জায়গায় পরদ্রব্য অপহরণে রত হয়, সেও বৃষল।

যে লোকের কাছে ঋণ গ্রহণ করে ঋণের কথা অস্বীকার করে অথবা ঋণ-শোধের ভয়ে অন্যত্র পলায়ন করে……।

যে বিত্তলাভের আশায় পথচারীকে হত্যা করে বিত্ত গ্রহণ করে।

যে ব্যক্তি নিজের জন্য পরের জন্য অথবা অর্থলোভে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করে……।

যে আত্মীয়তা ও বন্ধুতার সুযোগ নিয়ে অবৈধ প্রণয়ে অথবা বলপূর্বক পরদার লঙ্ঘন করে……।

যে গতযৌবন জরাজীর্ণ মাতাপিতাকে সামর্থ্যবান হয়েও ভরণ পোষণ করে না……।

যে মাতাপিতাকে ভাই বোনকে তিরস্কার করে অথবা প্রহার করে।

যে সৎপরামর্শ চইলে অসৎ পরামর্শ দেয় এবং গুপ্ত মন্ত্রণা দান করে।

যে পাপকর্ম করে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে পাপ গোপন করে।

যে পরের বাড়ীতে গিয়ে সুস্বাদু ভোজন করে এবং সেই আতিথ্যদানকারীকে নিজের বাড়ীতে এনে প্রতিদানে তুষ্ট করে না।

যে শ্রমন ব্রাহ্মণ অথবা অন্য প্রার্থীকে মিথ্যা বলে বঞ্চনা করে।

যে আহারের সময় শ্রমণ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হলে দুর্বাক্যে তাড়িয়ে দেয়, কিছুই দান করে না।

যে মোহাচ্ছন্ন হয়ে লোভের আশায় অসজ্জনের প্রশংসা করে……।

যে নিজের প্রশংসা করে, পরকে অবজ্ঞা করে এবং অহঙ্কারে দীনাত্ম হয়……।

ভর্ৎসনাকারী, কৃপণ, হীনচেতা, মৎসর, শঠ ও পাপে লজ্জাভয়হীন ব্যক্তিও বৃষল।

যে অর্হৎ বা সিদ্ধপুরুষ না হয়ে নিজেকে সিদ্ধপুরুষ বলে প্রচার করে, সে জগতে মহাচোর এবং নিকৃষ্টতম বৃষল।

হে ব্রাহ্মণ, পূর্বোক্ত দুক্রিয়াগুলিই মানুষকে বৃষল করে। কেউ জন্মের কারণে ব্রাহ্মণ কিংবা বৃষল হয় না, কর্মই মানুষকে বৃষল করে এবং কর্মই মানুষকে ব্রাহ্মণ করে। চণ্ডালপুত্র মাতঙ্গ ঋষিই তার প্রমাণ। বহু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এই ঋষির পদানত। তিনি আপনার সাধনার প্রভাবে কামনা বাসনা জয় করে ব্রহ্মত্ব লাভ করেছেন। তাঁর চণ্ডাল কুলে জন্ম তাঁর সাধনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি। মন্ত্রগায়ক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেও যে বক্তি দুক্রিয়ারত পাপাসক্ত হয়, সেই ব্যক্তি ইহলোকে নিন্দিত, পরলোকেও তার দুর্গতি। তার বংশ তাকে নিন্দা ও দুর্গতির কবল থেকে রক্ষা করতে পারে না। কেউ জন্মের কারণে ব্রাহ্মণ কিংবা বৃষল হয় না, কর্মই মানুষকে বৃষল করে এবং কর্মই মানুষকে ব্রাহ্মণ করে।

বুদ্ধের বিচিত্র বাণী শুনে আগ্নিক ভরদ্বাজ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি ভাবে গদ্‌গদ হয়ে বললেন—কি সুন্দর কথা। কি সুন্দর ভাব! আপনি সত্যকে আমার কাছে অনাবৃত করলেন, আমায় পথের সন্ধান দিলেন, আলো দানে আমায় অন্ধকার দূর করলেন ; আমি আপনার শরণ নিলাম, আপনার প্রবর্তিত ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হলাম, আজ থেকে আমি আপনারই উপাসক।

বত্রিশ

শীতের প্রভাত। সুন্দরীর শীর্ণধারা বয়ে চলেছে গঙ্গার বিপুল বারিরাশির পানে। নদীর তীরে যে ব্রাহ্মণকে প্রায় হোমাগ্নি জ্বেলে হোম করতে দেখা যেত, সেদিনও সে ব্রাহ্মণ সেখানে অগ্নিহোত্র সম্পাদন করছিলেন। বুদ্ধ অদূরেই এক বৃক্ষতলে আপাদমস্তক আবৃত করে বসেছিলেন। হোমকৃত্য সমাপ্ত করে ব্রাহ্মণ আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন কাকে এ হব্যাবশেষ দেবেন। তখনি তাঁর দৃষ্টি পড়ল অদূরে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আপাদমস্তকাবৃত মানবমূর্তির উপর। তিনি বাম হাতে কমণ্ডলু ডান হাতে প্রসাদের থালা নিয়ে অগ্রসর হলেন সেদিকে।

বুদ্ধ কাছে পদশব্দ শুনে মস্তক অনাবৃত করে দেখলেন ব্রাহ্মণকে থালা কমণ্ডলু হাতে আসতে। তিনি নীরবে বসে রইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁর মস্তক মুণ্ডিত দেখে অবজ্ঞাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করলেন এবং ফিরবার জন্য উদ্যত হলেন। আবার কি ভেবে তিনি দাঁড়ালেন। ধীর পদক্ষেপে বুদ্ধের সমীপে গিয়ে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি জাত? উত্তরে বুদ্ধ বললেন—জাতের কথা জিজ্ঞেস করে কি লাভ হবে, আচারের কথাই জিজ্ঞেস করুন ; কাঠ থেকে যেমন আগুন জ্বলে ওঠে, তেমনি নীচ কুলে জন্ম নিলেও সত্য সংযম ও ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত ধৃতিমান মুনির অন্তরে জ্ঞানের দীপ জ্বলে ওঠে ; এমন মহান ব্যক্তিই আহুতির উপযুক্ত পাত্র এবং দক্ষিণার্হ।

অপরিচিত মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ মুগ্ধ হয়ে ভাবতে লাগলেন—ইনি তো সাধারণ লোক নন, এ হব্যাবশেষ এঁকেই দেব, এতে আমি কৃতার্থ হব। অতঃপর তিনি ভাবাবেগে বললেন—কি সুপ্রভাত! আপনার মত মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের দর্শন পেলাম। অনুগ্রহপূর্বক এ হব্যাবশেষ গ্রহণ করে আমাকে বাধিত করুন। বুদ্ধ বললেন—ব্রাহ্মণ, উপদেশ দানে লব্ধ আহার্য আমার গ্রহণীয় নয়। এ তো আমি ভোগ করতে পারি না ; যদি আপনার একান্ত ইচ্ছা হয়, তবে অন্য দ্রব্য দিয়ে সেবা করতে পারেন। ব্রাহ্মণ দ্বিরুক্তি

না করে অভিভূতভাবে জলের ধারে গিয়ে সেই হব্যাবশেষ জলে ফেলে দিলেন। তারপর তিনি বুদ্ধের সমীপে এসে অনুরোধ জানালেন তাঁর বাণী শোনাতে।

বুদ্ধ ব্রাহ্মণের ঐকান্তিকতা দেখে বলতে লাগলেন। হে ব্রাহ্মণ, শুধু কাষ্ঠ দাহ করে অন্তরের শুদ্ধি লাভ হয় না। এ সমস্ত বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র। তাই আমি এ রকম কাষ্ঠ দাহ পরিত্যাগ করে নিজের অন্তরে অগ্নি জ্বেলে রেখেছি। আমার সমাহিত মন সেই প্রোজ্জ্বল আলোয় উদ্‌ভাসিত এবং আমি অনুত্তর ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্য, সংযম, ধর্ম এবং ব্রহ্মচর্যের ভিতর দিয়েই ব্রহ্মত্ব লাভ হয়।

উপদেশ শুনে ব্রাহ্মণ একান্তভাবে অভিভূত হলেন। তাঁর উদ্বুদ্ধ মন চাইল সেই উপদেশকে জীবনে প্রতিফলিত করে গভীরতর উপলব্ধিতে জীবন সার্থক করতে। তিনি বুঝলেন গৃহবাসের শত বন্ধনের মধ্যে তা সম্ভব হবে না। তাই তিনি সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধের চরণাশ্রয়ে প্রব্রজ্যার উন্মুক্ত অবকাশে সাধনায় মগ্ন হলেন। পূর্বজন্মার্জিত অনাবিল শুভ্র সংস্কারের প্রভাবে এবং উপযুক্ত নির্দেশ লাভে অচিরেই তিনি আলোর স্পর্শ অনুভব করলেন। তারপর তিনি উপলব্ধির বিভিন্ন স্তর উত্তীর্ণ হয়ে চির আকাঙ্ক্ষিত অর্হত্ব লাভে ধন্য হলেন।

শ্রাবস্তীতে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল সঙ্গারব। তিনি ছিলেন উদার সরল ও শান্ত প্রকৃতির লোক। তিনি শ্রাবস্তীর জনসমাজে 'উদক শুদ্ধিক' নামে পরিচিত। প্রত্যহ দুইবার নদীর ঘাটে জলে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে তিনি একাগ্র মনে মন্ত্র উচ্চারণ করতেন এবং মাঝে মাঝে ডুব দিতেন। তাঁর মতে জল পাপ ক্ষালন করে মানুষকে শুচি শুদ্ধ করে তুলতে পারে। তাই অবগাহন ছিল তাঁর প্রাত্যাহিক ব্রত।

একদিন বুদ্ধ অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হলেন সঙ্গারবের বাড়ীতে। বুদ্ধের আকস্মিক আগমনে তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। তিনি বুদ্ধকে অভ্যর্থনা করে বসালেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপে রত হলেন। কথা প্রসঙ্গে বুদ্ধ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি জলকে শুদ্ধির উপায় মনে করেন কেন এবং প্রত্যহ দুইবার জলে অবতরণের বিশেষ কোন ফল লাভ হয় কি? উত্তরে ব্রাহ্মণ বললেন—শ্রমণ গৌতম, আমি দিবসে যে পাপ সঞ্চয় করি, আমার সান্ধ্য স্নানে তা ধৌত হয়ে যায়। এবং রাত্রির সঞ্চিত পাপ প্রাতঃ-

স্নানে ক্ষালিত হয়। বুদ্ধ বললেন—ব্রাহ্মণ, এ স্নান আপনার দেহের মলিনতা দূর করতে পারে, কিন্তু অন্তরের মলিনতা দূর করবার শক্তি এর নেই, মনের মল প্রক্ষালনের জন্য আপনাকে নামতে হবে ধর্মের নির্মল হ্রদে, নৈতিক চরিত্র অনুশীলনই এর সোপান, এই ধর্মের অনাবিল হ্রদে অবগাহন করে বেদজ্ঞ ঋষিগণ অসিক্ত দেহে দুস্তর ভবসমুদ্রের পারগত হন।

বুদ্ধের কথায় সঙ্গারব যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন। তিনি বুঝলেন—যে পথ তিনি অনুসরণ করে চলেছেন, সে পথ সত্যের পথ নয়, দেহের স্নানে অন্তর শুদ্ধ হয় না, অন্তরের শুদ্ধতা লাভের জন্য স্নান করতে হবে অন্যত্র অন্যভাবে। তিনি বুদ্ধের শরণাগত হলেন।

৩

শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণ পল্লীতে এমন একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন যিনি আত্মমর্যদা-বোধে মাতাপিতাকে প্রণাম করতেন না, আচার্যকে প্রণাম করতেন না, বংশের বয়োজ্যেষ্ঠগণকে সম্মান প্রদর্শন করতেন না, এক কথায় কোথাও মাথা নোয়াতেন না। তিনি অত্যন্ত গর্বোদ্ধত ছিলেন বলে লোক তাঁর নাম দিয়েছিল মানস্ফীত।

একদিন মানস্ফীত জেতবনের সমীপে গিয়ে দেখলেন—জেতবনের প্রাঙ্গণে বিরাট জনসভায় বুদ্ধ ধর্মোপদেশ বর্ষণ করছেন, মুগ্ধ জনতা তদ্‌গত চিত্তে তা শুনছে। ব্রাহ্মণের কৌতূহল জাগল সভায় উপস্থিত হয়ে শোনবার জন্য। তিনি ধীরে ধীরে সেখানে গিয়ে একান্তে দাঁড়ালেন এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন—যদি শ্রমণ গৌতম আমার সঙ্গে আলাপ করেন, তবে আলাপ করব। যদি আমার সঙ্গে আলাপ না করেন, তবে আমিও তাঁর সঙ্গে আলাপ করব না। তিনি যেমনি স্ফীত বক্ষে সেখানে নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বুদ্ধ যখন তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন না, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন শ্রমণ গৌতম কিছুই জানে না। এই ভেবে তিনি ফিরে যেতে উদ্যত হলেন—সেই মুহূর্তেই বুদ্ধে কণ্ঠে বাণী উদ্‌গত হল—

"হে ব্রাহ্মণ, মান (অহঙ্কার) কারো পক্ষে ভাল নয়। যে কারণে এখানে আগমন হয়েছে, তার সাফল্য সম্পাদনে কৃতার্থ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

কথাগুলো শুনে মানস্ফীত মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর মত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। 'শ্রমণ গৌতম তো আমার মনের কথা জেনে ফেলেছেন' এই ভেবে তিনি অভিভূত হলেন। অতঃপর তিনি বুদ্ধের চরণতলে নিপতিত হয়ে তাঁর পদদ্বয় চুম্বন করতে লাগলেন, নাম শোনাতে লাগলেন—প্রভু, আমি মানস্ফীত।

এ দৃশ্য দেখে সভাস্থ জনতা অবাক হলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন—যে মানস্ফীত মাতাপিতাকে প্রণাম করেন না, আচার্যকে প্রণাম করেন না, বংশের বয়োজ্যেষ্ঠগণকে সম্মান প্রদর্শন করেন না, তিনি আজ বুদ্ধের চরণতলে নিপতিত হয়ে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখালেন, একি আশ্চর্য। বুদ্ধ তাঁকে বললেন—হে ব্রাহ্মণ, ওঠ, আসন গ্রহণ কর, আমার প্রতি তোমার চিত্ত প্রসন্ন। মানস্ফীত একান্তে বসলেন এবং বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন—ভদন্ত, কাদের কাছে গর্ব প্রকাশ করা উচিত নয়, কাদের সম্মান করা উচিত, কারা অর্চিত সুপূজিত হওয়া উচিত। বুদ্ধ উত্তরে বললেন—মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং আচার্যের সম্মুখে গর্বপ্রকাশ সঙ্গত নয়। তাঁদের সম্মান করা উচিত, পূজা করা উচিত এবং শুদ্ধাত্ম প্রশান্ত অর্হৎ মুনিদের দেখেই মান বর্জন করে অনুদ্ধত চিত্তে সেই পরমপুরুষদের প্রণাম করবে।

সেই থেকে মানস্ফীত বুদ্ধের শরণগত উপাসক হলেন।

৪

একদিন পূর্বাহ্নে বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হস্তে ব্রাহ্মণ উদয়ের গৃহে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণ বুদ্ধের পাত্র অন্নে ভর্তি করে দিলেন। দ্বিতীয় দিনও তিনি উদয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়ালেন পাত্র হাতে নিয়ে। উদয় পাত্র পূর্ণ করে দিলেন পূর্বদিনের মত। তৃতীয় দিনও বুদ্ধ ভিক্ষান্নের জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। উদয় তাঁর পাত্র পূর্ণ করে মন্তব্য করলেন—এই শ্রমণ গৌতম স্বাদ পেয়ে বার বার আসছেন। তখনি বুদ্ধকণ্ঠে বাণী ধ্বনিত হল—

মেঘ বার বার বর্ষণধারায় স্নিগ্ধ করে ধরণীতলকে,
কৃষক বার বার কর্ষণ করে, বার বার বীজ বুনে
বার বার ধান্যে ভরে যায় দেশ।
বার বার প্রার্থীরা চায়, বার বার দানপতি দেয়,
বার বার দান করে দানপতি স্বর্গলাভ করে।
বার বার দুগ্ধ দোহন হয়, বার বার বাছুর ধায় মায়ের পানে,
বার বার ক্লান্ত হয় ছটফট করে, বার বার গর্ভশায়ী হয়।
বার বার জন্ম চলে, মৃত্যু হয়, বার বার নীত হয় শ্মশানে,
শুধু অমৃতের পথ পেয়ে মহাজ্ঞানী মহাজন
বার বার জন্মগ্রহণ করেন না।

ব্রাহ্মণ উদয় এ অশ্রুতপূর্ব বাণী শুনে শুদ্ধ হয়ে বুদ্ধের চরণে আত্মনিবেদন করলেন।

৫

শ্রাবস্তীতে জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন। লোকে যা বলত, তার উল্টো বলা ছিল তাঁর অভ্যাস। কুতর্কে সিদ্ধহস্ত হওয়ায় কেউ তাঁর সঙ্গে পেরে উঠত না। তিনি সংকল্প করলেন বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হবেন এবং তিনি যা বলবেন তা কূট তর্কে উড়িয়ে দেবেন। একদিন যখন বুদ্ধ উন্মুক্ত চত্বরে নিবিষ্ট মনে পায়চারি করছিলেন, তখন এই ব্রাহ্মণ তাঁর পশ্চাদনুসরণ করে পায়চারি করতে করতে বললেন—শ্রমণ, ধর্মকথা বলুন। তখন বুদ্ধ উচ্চারণ করলেন—

কূটতার্কিক কলুষিত চিত্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বাদে ধর্ম জানা তো সম্ভব নয়। যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা বিনোদন করে চিত্তের অপ্রসন্নতা দূর করে অবৈর শান্ত মনে শ্রবণ করেন, তিনিই ধর্মের গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন।

একথা শুনে কূটতার্কিক ব্রাহ্মণের মুখে আর বাক্যস্ফূর্তি হল না। তিনি বুদ্ধের শরণাগত হলেন।

৬

জনৈক ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ জেতবনে এসে বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে বুদ্ধকে বললেন—ভবৎ গৌতম, আপনি যেমন ভিক্ষাব্রতী তেমনি আমিও ভিক্ষাব্রতী। আমাদের উভয়ের পার্থক্য কোথায়? বুদ্ধ বললেন—

পরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা গ্রহণ করলে ভিক্ষাব্রতী হওয়া যায় না, অকুশল ও অশোভন আচারে কলঙ্কিত ব্যক্তি শুধু ভিক্ষাব্রত গ্রহণে ভিক্ষু হয় না।

যিনি ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পাপপুণ্যকে অতিক্রম করেন এবং সর্ব বিষয়ে সজ্ঞান থাকেন, তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু।

তেত্রিশ

জেতবনে ধর্মসভার অধিবেশন চলছে। ভক্ত ও নবাগতের সমাবেশে সভা পরিপূর্ণ। বুদ্ধ ধর্মোপদেশ বর্ষণে জনহৃদয় মথিত করে চলেছেন। এমন সময় এক জরাজীর্ণ ব্রাহ্মণ একান্তে এসে বসে পড়লেন। তাঁর পরনে শতছিন্ন মলিন বস্ত্র। দেহে অপরিচ্ছন্নতার ছাপ, মুখে বিষন্নতার ভার, দৃষ্টিতে অন্তহীন হতাশা। অনাহারে অর্ধাহারে শীর্ণ দেহখানিকে কোনমতে টেনে তিনি এসেছেন এমন একজনের কাছে, যিনি মানুষের দরদী বন্ধু এবং মানুষের ব্যথা বেদনাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন, মানুষকে কাছে টানেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মানুষের কাছে পেয়েছেন শুধু লাঞ্ছনা আর অপমান। তাই তিনি

মানুষকে এড়িয়ে চলতে চান। তবুও মানুষের মধ্যে যে দরদী, তাঁর খোঁজে ক্লান্ত হয়নি তাঁর মন। একজন্যই জেতবনে আগমন।

সভা ভঙ্গের পর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বুদ্ধের কাছে গিয়ে বসলেন। দুইজনের মধ্যে হল সন্তোষজনক স্মরণীয় আলাপ সম্ভাষণ। অতঃপর বুদ্ধ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি তো এই শ্রাবস্তীর অন্যতম ধনাঢ্য বিত্তসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, আপনার এ অবস্থা কেন? ব্রাহ্মণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—ভগৎ গৌতম, আমার দুঃখের কথা আর কি বলব, আমার চারি ছেলে বৌদের কথায় আমাকে করেছে পথের ভিখারী; যতদিন সম্পত্তি রেখেছিলাম নিজের হাতে, তারা করেছিল আমায় সেবা যত্ন, রেখেছিল আমায় পরম আদরে; তাদের সম্পত্তি বন্টন করে দিয়েই আমার এ বিপদ। বুদ্ধ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ব্রাহ্মণ, আপনি ভাববেন না, আমার কাছ থেকে এই শ্লোকগুলি শিখে নিয়ে যেখানে জনসমাবেশ হয় ও আপনার ছেলেরা উপস্থিত থাকে সেখানে আবৃত্তি করুন—

> যাদের পেয়ে আনন্দের সীমা ছিল না, যাদের অহরহ কল্যাণ কামনা করেছি আজ তারা পত্নীর বশগত হয়ে আমায় তাড়ায় যেমনি কুকুর তাড়া করে শূয়োরকে।
>
> হীনাত্ম অসৎ পুত্ররূপী রাক্ষসগুলো যারা 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাকত আজ বৃদ্ধকালে ত্যাগ করেছে আমাকে।
>
> অব্যবহার্য জীর্ণ অশ্ব যেমন খাদ্য থেকে অপনীত হয়, তেমনি বালকদের স্থবির পিতা অন্নবস্ত্রহীন হয়ে পরের দ্বারে ভিক্ষা করছে।
>
> অকৃতজ্ঞ অবাধ্য পুত্রগণের চেয়ে আমার এই লাঠি ঢের ভাল, যা দুষ্ট গরু দুষ্ট কুকুরকে বাধা দেয়, অন্ধকারে আগে চলে, গভীরে ঠাঁই খোঁজে। এই লাঠির জোরে পিছলে গিয়েও দাঁড়ানো যায়।

ব্রাহ্মণ শিখে নিলেন শ্লোকগুলো বুদ্ধের কাছ থেকে। প্রত্যেকটি কথা তাঁর মনের মতো হল। ব্রাহ্মণ পথ চলেন আর মনে মনে আবৃত্তি করতে থাকেন সেইগুলো। দিনের পর দিন ভিক্ষায় বেরিয়ে গাছতলায় বসে সরাইতে শুয়ে ঐ শ্লোকগুলিই মন্ত্রের মতো তিনি মনে মনে উচ্চারণ করতে লাগলেন। এ ভাবে কণ্ঠস্থ হয়ে গেল ছন্দোবদ্ধ কথাগুলো।

একদিন শ্রাবস্তীর সভাগৃহে বিপুল জনাসমাগম হল। জীর্ণ শীর্ণ বেশে ব্রাহ্মণ পথে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন দলে দলে লোকের আগমন। তাঁর পুত্রগণও নিজের নিজের সুসজ্জিত রথে সেদিকে চলল। বাবাকে ঐভাবে দাঁড়াতে দেখে তারা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। ব্রাহ্মণও আস্তে আস্তে তাদের

অনুসরণ করলেন। যথারীতি সভা আরম্ভ হল। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা চলতে লাগলো। সুযোগ পেয়ে ব্রাহ্মণ হঠাৎ বক্তৃতামঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর জীর্ণ অপরিচ্ছন্ন বেশ, অনশনক্লিষ্ট মুখ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় অনর্গল বলে গেলেন সেই শ্লোকগুলো। সভা স্তব্ধ হয়ে শুনল। অদূরে উপবিষ্ট তাঁর পুত্রগণ অধোবদন হয়ে রইল। তাদের গা যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে লাগলো। পরিচিত লোকেরা তাদের অবস্থা দেখে কেউ মুখ টিপে হাসল, কেউ গম্ভীর হয়ে রইল কেউ ধিক্কার দিতে লাগলো।

সভা যখন ভাঙল, পুত্রগণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে নিয়ে গেল বাড়ীতে, তাকে স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরিয়ে দিল। সেই থেকে তাঁর সেবা যত্ন আবার সুরু হল। ব্রাহ্মণ স্মরণ করলেন সেই দিনগুলো যখন একমুষ্টি অন্নের জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন এবং ক্লান্ত শীর্ণ শরীরে গাছতলায় পথের সরাই এ জলাশয়ের ধারে শুয়েছেন। তখন মানুষের কাছে অপমান লাঞ্ছনা পেয়ে তিনি মানুষকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলেন। শুধু একজন তাঁকে সেই দুর্দিনে কাছে টেনে নিয়ে শ্লোক গুলো শিখিয়েছিলেন, উপায় বলে দিয়েছিলেন। সেই দরদী মানুষের করুণাস্নিগ্ধ শান্ত সুন্দর মুখখানি তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠল। ভাবে ভক্তিতে কৃতজ্ঞতায় ব্রাহ্মণের হৃদয় পরিপূর্ণ হল। তিনি পর দিনই গেলেন জেতবনে, বুদ্ধকে প্রণাম করে বললেন—আমরা ব্রাহ্মণ, দক্ষিণা দান আমাদের চিরাচরিত প্রথা, এই বস্ত্রযুগল গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন, আমি আপনার শরণগত হলাম, আপনার প্রবর্তিত ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ নিলাম।

২

কোশলরাজ্যের সীমান্তে বনভূমির কোলে একটি গ্রাম। এক কালে গ্রামটির যে সমৃদ্ধি ছিল, তার পরিচয় রয়েছে পরিত্যক্ত জীর্ণ প্রাসাদে, ভগ্ন দেউলে। সেই গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবার অতীত কীর্তির ধ্বংসাবশেষের মত তখনও বিদ্যমান ছিল।

সুখসমৃদ্ধির নীড়কে তছনছ করে দুর্ভাগ্যের ঝড় ঝঞ্ঝা যখন বয়ে চলে, তখন যে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাই হয়েছিল সেই ব্রাহ্মণ পরিবারটির। ব্রাহ্মণের শস্য খেতে রৌদ্রের খরতাপে শস্য জ্বলে গিয়েছে, যেটুকু অবশেষ ছিল, তাতে পোকা লেগেছে, তাঁর শূন্য গোলায় মূষিকের তাণ্ডব নৃত্য চলেছে। তাঁর অভাবের সংসারে কন্যারা বিধবা হয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছে

দু একটি সন্তান সহ আশ্রয় নিয়েছে। প্রতিদিন ভোর হতে না হতে উত্তমর্ণরা এসে হানা দেয় তাঁর বাড়ীতে 'টাকা দাও' 'টাকা দাও' বলে। তাঁর গতযৌবনা হতশ্রী পত্নী সংসারের অন্তহীন তিক্ততায় শালীনতা বোধ হারিয়ে স্বামীকে প্রত্যহ জাগায় পায়ে ঠেলে।

ব্রাহ্মণের যে চৌদ্দটি গরু বনে চরতে গিয়েছিল, সেইগুলি তিন চারি দিন ধরে গোয়ালে ফিরে নি। পত্নীর সরোষ বাক্যে অতিষ্ঠ হয়ে ব্রাহ্মণ বেরিয়ে পড়লেন গরুগুলির খোঁজে। তিনি সম্ভাব্য স্থান সমূহে খোঁজ করতে করতে বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বনপথ ধরে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই তিনি দেখলেন বনগুল্মের আড়ালে ছায়াচ্ছন্ন ভূমিতলে এক সন্ন্যাসী পদ্মাসনে বসে আছেন। কোনদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই, তাঁর চাহনি শান্ত, চোখে মুখে অপূর্ব ধ্যানের দীপ্তি, সংসারের দুঃখ দুর্ভাবনা যেন তাঁর কাছে পরাভূত। ব্রাহ্মণ থমকে দাঁড়ালেন, চোখ ফিরাতে পারলেন না। তাঁর মন প্রাণ যেন এক অজানা স্পর্শে অভিভূত হতে লাগলো। তাঁর সংসার তাপ-দগ্ধ মনের রুদ্ধ আবেগ যেন তার মধ্যে ভাষা খুঁজে পেল। তিনি অভিভূত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—

আহা এই শ্রমণ কত সুখী! গরু হারানোর দুশ্চিন্তার জ্বালা এঁর নেই।

আহা এই শ্রমণ কত সুখী! তিল ক্ষেত নষ্ট হবার দুর্ভাবনা এঁর নেই।

আহা এই শ্রমণ কত সুখী! এঁর শূন্য গোলায় মূষিকের তাণ্ডব নৃত্য নেই।

আহা এই শ্রমণ কত সুখী! পুত্রবতী বিধবা কন্যারা এঁকে ভারগ্রস্ত করেনি।

আহা এই শ্রমণ কত সুখী! গত-যৌবনা হতশ্রী পত্নী এঁকে জাগায় না ঘুম থেকে পদাঘাতে।

আহা এই শ্রমণ কত সুখী! ভোরে ঋণদাতারা এঁকে 'টাকা দাও' 'টাকা দাও' বলে তিক্ত বিরক্ত করে না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরই কথার প্রতিধ্বনি করে বললেন—

হে ব্রাহ্মণ, গরু হারানোর দুশ্চিন্তার জ্বালা আমার নেই। তাই আমি সুখী।

হে ব্রাহ্মণ, তিল ক্ষেত নষ্ট হবার দুর্ভাবনা আমায় পীড়িত করে না, তাই আমি সুখী।

হে ব্রাহ্মণ, আমার শূন্য গোলায় মূষিকের তাণ্ডব নৃত্য নেই, তাই আমি সুখী।

হে ব্রাহ্মণ, পুত্রবতী বিধবা কন্যাদের পালনের প্রশ্ন আমার নেই, তাই আমি সুখী।

হে ব্রাহ্মণ, গতযৌবনা হতশ্রী পত্নী পদাঘাতে আমায় জাগায় না। তাই আমি সুখী।

হে ব্রাহ্মণ, ভোরে আমার ওপর ঋণদাতাদের উপদ্রব নেই, তাই আমি সুখী।

বুদ্ধের কথাগুলো ব্রাহ্মণের কাণে গিয়ে প্রাণে বাজল। প্রাণ উতলা করে তুলল তার মাধুর্য। তিনি অভিভূত হয়ে বুদ্ধের চরণে আশ্রয় চাইলেন। বুদ্ধ তাঁকে ভিক্ষুত্বে বরণ করে নিলেন। ভিক্ষুর কঠিন সাধন অবলম্বন করলেন তিনি অকুণ্ঠিত মনে। অচিরেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ হল। তিনি সকল কামনা বাসনা জয় করে শুদ্ধ মুক্ত অর্হৎ হলেন।

দ্বিতীয় পর্ব

উৎসর্গ

স্বর্গত সুহৃদ

অধ্যক্ষ ৺দেবজ্যোতি বর্মণ

স্মরণে—

নগরের বাইরে চণ্ডালপল্লী। সেখানে লোকের অত্যন্ত ঘনবসতি। তার কোথাও ধনৈশ্বর্যের আড়ম্বর নেই। গলিগুলো যেমনি সংকীর্ণ, তেমনি অপরিচ্ছন্ন। দুর্গন্ধে প্রাণ যেন বেরিয়ে আসতে চায়। সেখানে উচ্চবর্ণের লোকদের যাতায়াত নেই বললে অত্যুক্তি হয় না। এই পল্লীর একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র কুটিরে একটি শিশুর জন্ম হয়। তার বয়স যখন চারিমাস, তখন তার পিতার মৃত্যু ঘটে। তার মাতা স্বামীর শোকে পাগলির মত বিচরণ করে। শিশুটির পিতৃব্য তার পালনের ভার গ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় সোপাক। পিতৃব্যের আদর যত্নে সোপাক বাড়তে থাকে। তার মুখে যখন আধো আধো বুলি ফোটে, তখন থেকেই তার আশ্চর্য বুদ্ধিশক্তির বিকাশ হতে থাকে। তাতে মায়ের মন গর্বে ভরে ওঠে, পিতৃব্যও তৃপ্তি অনুভব করে। পাড়ার বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বলে—এতো সোনার চাঁদ ছেলে, এ বড় হয়ে মানুষের মত মানুষ হবে, একে চণ্ডালের ঘরে মানায় না।

অতঃপর পিতৃব্য বিয়ে করে নতুন বৌ ঘরে আনল। বিয়ের পর থেকে সোপাকের আদর যত্নে একটু ভাটা পড়ল। কারণ, পিতৃব্যপত্নী গোড়া থেকেই তার প্রতি বিরূপভাবাপন্না। সে অল্পকাল পরেই সন্তানসম্ভবা হল এবং যথাকালে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। এর পর যেটুকু সোপাকের আদর যত্ন ছিল, সেটুকুও নিঃশেষে অন্তর্হিত হল। তার মা তাকে নিয়ে বিপদে পড়ল। ছেলেকে মানুষ করার চিন্তা তার অন্তর জুড়ে রইল।

বৎসরের পর বৎসর পার হয়ে সোপাক ও তার খুড়তুত ভাই যখন কিশোর বয়সে উপনীত হল, তখন দুজনে একসঙ্গে খেলত, চলাফেরা করত। একদিন খেলতে খেলতে দুভায়ের মধ্যে ঝগড়া হল। ঝগড়া হাতাহাতিতে এসে দাঁড়াল। সোপাক বয়সে বড় এবং তার গায়েও ছিল জোর। সুতরাং হাতাহাতিতে তারই জয় হল। ছোট ভাই অপমানে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী গিয়ে মার কাছে সোপাকের বিরুদ্ধে নালিশ করল। এতে পিতৃব্যপত্নী অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে বলল—ওগো, দ্যাখো তোমার আদরের দুলালের কাণ্ড, তুমি যে দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষছ, তাতো তুমি বুঝতে পারছো না; আজ তো সে আমার যাদুকে মেরেই ফেলতো; না, না, তোমার ঐ শয়তান ভাইপোর সঙ্গে আমি থাকতে পারবো না, দুচোখ যেদিকে যায় সেদিকে আমি চলে যাবো। পত্নীর উত্তেজনাবাক্যে সোপাকের পিতৃব্য ক্রোধোন্মত্ত হয়ে জ্ঞান হারাল। সে ছুটে চলে গেল সেখানে যেখানে সোপাক অন্যান্য বালকদের

সঙ্গে খেলছিল। সে সোপাককে দূরে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ প্রহার করল। নির্মম প্রহারে বালক অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তখনো পিতৃব্যের ক্রোধ প্রশমিত হল না। সে অচেতন বালককে শ্মশানে টেনে নিয়ে গিয়ে একটি মৃতদেহের সঙ্গে তাকে বেঁধে রেখে প্রস্থান করল। এ শ্মশানকে সে যুগে বলা হত আমশ্মশান যেখানে মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হত। রাতে শৃগাল দিনে কুকুর ও শকুনির দল এখানকার মৃতদেহ সংকারে কার্পণ্য করত না।

কিছুক্ষণ পরেই সোপাকের জ্ঞান ফিরে এল। সে চোখ মেলে দেখল মৃতদেহের সঙ্গে সে আবদ্ধ, বুঝতে পারল তার পরিণতি। সে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পথপানে জনমানবের আগমন প্রতীক্ষায়। কিন্তু জনমানবের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল। কুকুর ও শকুনির দল শ্মশান থেকে অদৃশ্য হল। সঙ্গে সঙ্গে শৃগালগুলো এসে পড়ল হুক্কা হুয়া শব্দে চারিদিক মুখরিত করে। সোপাকও বিলাপ করে বলতে লাগল—আজ আমার কি গতি হবে, এ অসহায়ের সহায় কে হবে, কে ত্রাণ করবে এ অভাগারে। তার আর্ত বিলাপ করুণাঘন বুদ্ধের দিব্যকর্ণে পৌঁছল। তিনি করুণার্দ্রচিত্তে ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় সেই শ্মশানে উপস্থিত হয়ে বিলাপরত বালকের সম্মুখে দাঁড়ালেন এবং তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—বৎস সোপাক, ভয় করো না, তথাগতকে দর্শন করো, এখনি তোমায় মুক্ত করব। বালক আশ্বস্ত হয়ে জ্যোতিপুঞ্জের মত দেদীপ্যমান বুদ্ধের মুখপানে তাকালো। সর্বাঙ্গ পুলকে শিউরে উঠল। তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

বুদ্ধ বালককে বন্ধনমুক্ত করে বিহারে নিয়ে গেলেন। বালকের মাতা এদিকে নিখোঁজ পুত্রের সন্ধানে ব্যর্থভাবে নানাদিকে ঘুরতে লাগলো। অবশেষে সে কোথাও পুত্রের সন্ধান না পেয়ে পাগলিনীপ্রায় হয়ে জেতবনে এসে উপস্থিত হল এবং বুদ্ধের সমীপে মস্তক লুটিয়ে বলল—প্রভু, এ অভাগিনীর একমাত্র ছেলে হারিয়ে গেছে; তুমি কৃপা কর, অভাগিনীরে আমার বাছার সন্ধান দাও; যদি তাকে ফিরিয়ে না পাই প্রাণ রাখবো না। বুদ্ধ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে উপদেশ বচনে বললেন—ভগিনি, অধীর হয়ো না; জগতে ছেলে বাবা মা কেউ কারু নয়, তাদের কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না, মৃত্যু ছুটে আসছে, তার কবল থেকে রক্ষা নেই। বুদ্ধের করুণাস্নিগ্ধ নয়নের দিকে তাকিয়ে তাঁর বচন শুনে সোপাকের মার সংবিৎ ফিরে এল। সে বচন তার অন্তর স্পর্শ করল। সে আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল—প্রভু, আমায় ঠাঁই দাও তোমার চরণে। সেই মুহূর্তে তার কিশোর পুত্র সোপাক পীতবাস-পরিহিত

মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণোদ্দেশরূপে তার সম্মুখে আবির্ভূত হল। অপ্রত্যাশিতভাবে নিখোঁজ পুত্রকে দেখে তার দুনয়ন থেকে নীরব অশ্রুধারা অনর্গল ঝরতে লাগলো।

বুদ্ধের সান্নিধ্যলাভে কৃতপুণ্য কিশোর সোপাকের জীবন সম্পূর্ণ বদলে গেল। অল্পকালের মধ্যেই সাধনায় পরম সিদ্ধিলাভ করে তিনি অর্হৎ হলেন। অতঃপর একদিন বুদ্ধ আপনার গন্ধকুটিরের ছায়ায় পায়চারি করছিলেন। সোপাকও তাঁর অনুবর্তী হয়ে সংযত পদক্ষেপে পায়চারি করতে সুরু করলেন। বুদ্ধ সস্নেহ বচনে তাঁকে পর পর দশটি গভীর তত্ত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। সোপাকও নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ বালকের উত্তরের মধ্যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হলেন। বুদ্ধ এ আলোকসম্পন্ন কৃতী কিশোরকে উপসম্পদাদানের নির্দেশ দিয়ে প্রতিভার সম্মান করলেন। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বিনয়বিধি অনুসারে বিশ বৎসর বয়সের পূর্বে উপসম্পদা বা ভিক্ষুত্ব দান করা হয় না। শুধু জ্ঞানবৃদ্ধ কিশোর সোপাকের উপসম্পদায় এর একমাত্র ব্যতিক্রম। এ উপসম্পদা প্রশ্নোত্তর উপসম্পদা নামে অভিহিত। জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন দশটি 'কুমার প্রশ্ন' নামে বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে আছে।

দুই

সেকালের বংশগত নৃত্যশিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করে তরুণ তালপুট অতি অল্প বয়সে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর নৃত্যকলা এত চিত্তাকর্ষক ছিল যে, তিনি যে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হতেন, সেখানে জনতার ভিড় দুর্বার হয়ে উঠত। তিনি একটা প্রকাণ্ড নৃত্যশিল্প-সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। বহু সংখ্যক নিপুণা নর্তকী তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দেশের সর্বত্র ছিল তাঁর সম্মান আদর। তিনি নটগ্রামণী নামে সর্বত্র পরিচিত।

এক সময় নটগ্রামণী তালপুট রাজগৃহবাসীর আমন্ত্রণে নৃত্যকলা প্রদর্শনের জন্য সদলবলে রাজগৃহে উপস্থিত হন। দিন কয়েক ধরে চলল তাঁর নৃত্য সমারোহ। সমগ্র নগর মেতে উঠল। এ সময় বুদ্ধ রাজগৃহের বেনুবনে শিষ্য-সঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে অবস্থান করতেন। বুদ্ধের গুণমহিমার কথা আগে থেকেই শুনেছিলেন তালপুট। তাঁর বাসনা ছিল বুদ্ধ-সাক্ষাৎকারের। তার সুযোগ এল এখানে। নৃত্যাভিনয়ের অবসানে তিনি বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। প্রথম দর্শনেই তিনি অত্যন্ত অভিভূত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন—ভদন্ত, আমাদের

প্রাচীন নটাচার্যগণের মতে যাঁরা সত্যমিথ্যার অভিনয়ে জনতাকে আমোদ-প্রমোদে মেতে রাখেন আনন্দ দান করেন, তাঁরা ইহলীলা সংবরণের পর প্রহাস নামক স্বর্গে জন্মলাভে ধন্য হন, এ কথা কি সত্যি ? বুদ্ধ তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—গ্রামণি, এ প্রশ্ন আমায় জিজ্ঞেস করো না। তালপুট আবার তাঁকে এ প্রশ্নই জিজ্ঞেস করলেন। বুদ্ধও আবার বাধা দিলেন। তালপুট যখন তৃতীয় বারের প্রশ্নেরও জবাব পেলেন না, তখন তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ করে এ প্রশ্নেরই উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলেন। বুদ্ধ তখন শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—গ্রামণি, স্বভাবতঃ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা লোভাতুর দ্বেষপর মোহাবিষ্ট, তারা বহুরূপভাবে অভিনয়ের ভিতর দিয়ে জনসাধারণকে লোভদ্বেষ-মোহমূলক বিষয়ে মগ্ন করে রাখে মেতে তোলে, তাতে তাদের জীবনাবসানে সুগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় ; তবুও যদি তারা মনে করে যে অভিনয় প্রদর্শনে স্বর্গলাভ হয়, তবে তাদের ভ্রান্ত ধারণামাত্র, এ ভ্রান্ত ধারণাও পরলোকে দুর্গতির কারণ হয়। বুদ্ধের মন্তব্য শুনে তালপুট নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। তাঁর দুগণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। অন্তরে অনুতাপের ঝড় বইতে লাগলো। বুদ্ধ বললেন—বৎস, আমি প্রথমেই তোমাকে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে বারণ করেছি। তালপুট বললেন—ভদন্ত, সেজন্য আমি রোদন করছি না, আমি ভাবছি কিভাবে প্রাচীন নটাচার্যগণ আমায় প্রবঞ্চনা করেছেন।

তালপুট বুদ্ধকে দেখেই অনুভব করেছিলেন—এ মহাপুরুষ মহাশান্তির মহা আনন্দের মূর্ত প্রকাশ এবং তাঁর সমগ্র সত্তা অধ্যাত্মরসাপ্লুত। তিনি ভাবতে লাগলেন "অর্থ যশ সম্মানের উচ্চতম শিখরে অধিরোহন করেছি, আমোদ-প্রমোদের রসবিলাসে ডুবে আছি, তবুও আমার মনে অতৃপ্তির হাহাকার, অজস্র চিন্তা, উদ্বেগ ও অশান্তি। এ মহাপুরুষের কোথাও উদ্বেগ অশান্তির চিহ্নমাত্র নেই, তাঁর নির্বিকার মন দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার ও অতৃপ্তির বহু উর্ধ্বে। কেমন করে এমন মন তৈরী করা যায় ?" তালপুটের মনে নতুন চিন্তাস্রোত বইতে লাগলো। বুদ্ধের কথায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ইন্দ্রিয়-পরিচর্যা আমোদ-প্রমোদের মোহাবেশ কল্যাণের পথ নয়, এতে শুধু দেহমনকে আবিল পঙ্কিল করে তোলা হয়, জীবনের প্রকৃত কল্যাণ আসে না। তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল জীবনের সত্যকে জানার জন্য। তিনি ফিরে গেলেন নিজের দেশে নিজের বাসভবনে একটি উদাস বিবাগী মন নিয়ে। তাঁর উন্মনাভব কারুর দৃষ্টি এড়াল না। তিনি তাঁর গড়া নৃত্য-সংস্থার কার্যে মোটেই মন দিতে পারলেন না। তাঁর কোথাও যেন মন নেই। সকল সময় সকল অবস্থায় তাঁর মনে পড়তে

লাগলো বুদ্ধের শান্ত সুন্দর মূর্তি ও তাঁর প্রেমমধুর আলাপ। অবশেষে একদিন তালপুট গৃহ ত্যাগ করে বুদ্ধের চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধ তাঁকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দান করলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর থেকেই অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধির জন্য তিনি ব্যাকুল হলেন। তাঁর এ ব্যাকুলতা তাঁর উদ্‌গীত গাথায় পরিস্ফুট। তিনি বলতেন—

"কদানুহং পব্বত কন্দরাসু
একাকিয়ে অদুতিয়ো বিহস্‌সং
অনিচ্চতো সব্ব ভবে বিপস্‌সং
তং মে ইদং নু কদা ভবিস্‌সতি?"

অর্থাৎ কবে আমি জনহীন পর্বত কন্দরে জগতের অনিত্যতার বিষয় ধ্যান করতে করতে একা বাস করব? কবে আমার এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে?

"কদানুহং ভিন্নপটধরো মুনি
কাসাববত্থো অমমো নিরাসো
রাগঞ্চ দোসঞ্চ তথেব মোহং
হন্ত্বা সুখী পবনগতো বিহস্‌সং?

অর্থাৎ ছিন্নভিন্ন কাষায় বস্ত্রে অঙ্গ আবৃত করে কবে আমি রাগ-দ্বেষ-মোহাতীত অনাসক্ত মমত্বশূন্য হয়ে গভীর বনভূমিতে আনন্দে বাস করবো?

এ ব্যাকুলতা অচিরেই তাঁর সাধনায় সাফল্য বহন করে এনেছিল। তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনায় রত হয়ে অর্হত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর উদ্‌গীত বহু গাথা থেরগাথা নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলো প্রাণবান ব্যক্তি-মাত্রকে এখনো অনুপ্রাণিত করে।

তিন

বুদ্ধের সৎভাই নন্দ ভিক্ষু হয়েছিলেন শুধু বাক্যরক্ষার জন্য অর্থাৎ বুদ্ধ যখন নন্দকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'নন্দ, তুমি ভিক্ষু হবে কি?' নন্দ বুদ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'হাঁ' বলেছিলেন। তাই নন্দকে ভিক্ষু হতে হয়েছিল। তাঁর মনে বৈরাগ্যের লেশমাত্র ছিল না, পরন্তু তিনি ছিলেন তখন রূপসী জনপদকল্যাণীর প্রণয়াসক্ত। রাজ্যসুখের স্বপ্নে তাঁর মন ছিল বিভোর। কিন্তু ভিক্ষু হওয়ায় মনের সাধ মিটাবার পথে যেন বাধা পড়ল। রুদ্ধ জলস্রোত যেমন বর্ধিত বেগে বাঁধ ভেঙে বইতে চায়, তেমনি নন্দের অন্তরের রুদ্ধ কামনা ও উদ্দাম হয়ে তাঁকে অভিভূত

করল। তিনি ভিক্ষুর কাষায় বসন ত্যাগ করে সংসারে ফিরে যাবার সংকল্প প্রকাশ করলেন। ভিক্ষুরা একথা বুদ্ধকে জানালেন। বুদ্ধ নন্দকে ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলেন—নন্দ, তুমি সত্যিই কি ব্রহ্মচর্য পালনে অক্ষম হয়ে গৃহি জীবনে ফিরে যেতে সংকল্প করেছ ?

নন্দ—হাঁ, ভদন্ত।

বুদ্ধ—নন্দ, কেন তোমার এ অবস্থা হল ?

নন্দ—ভদন্ত, আমি যখন আপনার পাত্র হাতে নিয়ে গৃহ ত্যাগ করে আসছিলাম, তখন জনপদকল্যাণী আলুলায়িত কেশে কাতর নয়নে আমার পানে চেয়ে বলেছিল 'আর্যপুত্র, শিগগির ফিরে এসো'। আমি তার সে মূর্তি সে কথা স্মরণ ক'রে নিজেকে সংযত করতে পারছিনা। আমি যেমনি অনিচ্ছায় ভিক্ষু হয়েছিলাম, তেমনি অনভিরতভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করছি। আমি মন বসাতে পারছি না। তাই আমি সংকল্প করেছি সন্ন্যাস ত্যাগ করে সংসারী হতে।

বুদ্ধ বাক্যব্যয় না করে নন্দের বাহু ধরলেন এবং অলৌকিক ঋদ্ধিবলে চলতে লাগলেন। গ্রাম-প্রান্তর, পাহাড়-নদী অতিক্রম করে তাঁরা এসে পড়লেন এমন একটি জায়গায় যেখানে মাঠের শস্য জ্বলে গেছে। মাঠের একান্তে একটি পত্রপল্লবহীন বৃক্ষের শাখায় বসেছিল নাককানকাটা লেজকাটা জীর্ণা বানরী। বুদ্ধ সেই বাননরীকে দেখিয়ে নন্দকে জিজ্ঞেস করলেন—নন্দ তোমার প্রাণবল্লভা জনপদক্যাণী এর চেয়ে সুন্দরী? উত্তরে নন্দ আবেগোত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—ভদন্ত, কি বলেন, কোথায় রূপসী সুযৌবনা জনপদকল্যাণী আর কোথায় এ নাককানকাটা জীর্ণা বানরী, তার সঙ্গে কি তুলনা হয় ? অতঃপর বুদ্ধ নন্দকে নিয়ে চলে গেলেন ত্রয়োত্রিংশৎ দেবলোকে। সেখানে অপ্সরাদের দেখে নন্দ বিস্ময়বিমূঢ় নয়নে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল রূপের হাট বসেছে। এ অপরূপ রূপরাশি কখনো তাঁর চোখে পড়েনি।

নন্দের তন্ময়তা লক্ষ্য করে বুদ্ধ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা নন্দ, এবার বলো, তোমার জনপদকল্যাণী কি এ অপ্সরাদের চেয়ে সুন্দরী ? উত্তরে নন্দ বললেন—ভদন্ত, জনপদকল্যাণীর সঙ্গে যেমন নাককানকাটা জীর্ণা বানরীর তুলনা হয় না, তেমনি অপ্সরাদের রূপের তুলনায় জনপদকল্যাণীর রূপ কিছুই নয়। বুদ্ধ আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি এ অপ্সরাদের সাহচর্য লাভ করতে চাও না ? নন্দ লজ্জাবত বদনে নিরুত্তর

রইলেন। বুদ্ধ বললেন—তুমি যদি দেহান্তে দীর্ঘকাল পাঁচশ অপ্সরার সাহচর্যে ভোগবিলাসে মগ্ন হতে চাও; তাহলে তুমি ব্রহ্মচর্য পালন কর; তোমায় এই দিব্য ভোগসম্পদের জন্য আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম, তুমি শুধু ব্রহ্মচর্য পালনে আত্মসংযত হও। নন্দ মৌন সম্মতি প্রকাশ করলেন।

অপ্সরাদের দেখার পর থেকে জনপদকল্যাণীর প্রতি নন্দের অনুরাগ শিথিল হয়ে এল। জনপদকল্যাণীর স্মৃতি তাঁর মন থেকে মুছে যেতে লাগলো। অপ্সরাগণ পরিবৃত দিব্য আরামবিলাসের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি ব্রহ্মচর্য পালনে বদ্ধপরিকর হলেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে শীল পালন সুরু করলেন। শীলপালনে তাঁর অন্তরে এল পবিত্রতা ও শান্তির পুলকময় স্পর্শ। তিনি যেন নতুন জীবন লাভ করলেন। ভিক্ষুরা অপ্সরার জন্য নন্দের ব্রহ্মচর্য পালনের কথা শুনে তাঁকে উপহাস করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে এ ক্ষুদ্র লক্ষ্যের কথা স্মরণ করে তাঁর মনেও ধিক্কার এল। শান্ত পবিত্র মন নিয়ে তিনি গুরুর নির্দেশ অনুসরণে গভীর সাধনায় মগ্ন হলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁর সমাহিত মন আলোর স্পর্শ অনুভব করল। সেই দিব্য অনুভূতির মধ্যে তিনি সকল বন্ধন ছিন্ন করে শুদ্ধ মুক্ত অর্হৎ হলেন। যে রাত্রিতে তাঁর জীবনের এই মহান পরিণতি এল, সে রাত্রির অবসানে তিনি বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর চরণ বন্দনা করে বললেন—ভগবন, আপনাকে দায়মুক্ত করলাম, আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে প্রতিশ্রুতি থেকে আপনাকে অব্যাহতি দিলাম। বুদ্ধ তাঁর উক্তিকে অনুমোদন করে বললেন—নন্দ, তোমার জীবনের এ মহান্ পরিণতির কথা আমার প্রতিভাত হয়েছিল, তুমি ধন্য, তোমার সাধনা সার্থক। অতঃপর তিনি প্রীতিগাথা উচ্চারণ করলেন—

যিনি কামের পঙ্কিল আবর্ত থেকে নিজেকে উদ্ধার করেছেন, কামকণ্টক দমিত করেছেন এবং মোহের মূলোৎপাটন করেছেন, তিনি সর্বদাই সুখদুঃখে অবিকম্পিত।

একদিন কতিপয় ভিক্ষু নন্দকে জিজ্ঞেস করলেন—বন্ধু নন্দ, তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করবে বলেছিলে; এখনো তো তুমি রয়েছ, করে সংসারে ফিরে যাচ্ছ? নন্দ উত্তরে বললেন—বন্ধু, আর আমি সংসারী হব না, আমার গৃহবাসে ইচ্ছা নেই। তাঁর উত্তর শুনে ভিক্ষুরা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর পানে তাকালেন, ভাবলেন—যে নন্দ কিছুদিন আগে সন্ন্যাস ত্যাগের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিল, সে আজ অন্য কথা বলছে, নিশ্চয়ই নিজের দুর্বলতা ঢাকবার জন্য সত্যের

অপলাপ করছে। তাঁরা একথা বুদ্ধকে জানালেন। বুদ্ধ তাঁদের বুঝিয়ে বললেন—নন্দের অতীত দিনের সাধনহীন জীবন ছিল দুরাচ্ছাদিত গৃহতুল্য, এখন তার সাধনপূত জীবন সু-আচ্ছাদিত গৃহের মতো; সে বিন্দুমাত্র মিথ্যা বলেনি। ভিক্ষুরা এই মন্তব্য শুনে স্তম্ভিত হলেন। তখনি বুদ্ধকণ্ঠে গাথা উদ্‌গীত হল:—

"দুরাচ্ছাদিত গৃহ যেমনি বর্ষণধারায় উপদ্রুত হয়, তেমনি সমাধি-ভাবনাহীন দীন চিত্ত কামনায় অভিভূত হয়। কিন্তু সমাধিভাবনা-সমৃদ্ধ চিত্তে কামনা সু-আচ্ছাদিত গৃহে বৃষ্টির মত প্রবেশপথ খুঁজে পায় না।"

ভিক্ষুগণ শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে তার বাণী শুনে মুগ্ধ হলেন।

চার

বুদ্ধের পিসতুত ভাই তিষ্য বৃদ্ধ বয়সেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্থূলকায় ছিলেন। এজন্য সবাই তাঁকে স্থূলতিষ্য বলে জানত। তিনি যেমনি ছিলেন জাত্যাভিমানী, তেমনি বুদ্ধভ্রাতা বলে ছিল তাঁর দম্ভ। ভিক্ষুর করণীয় ব্রত ইত্যাদির ধার ধারতেন না তিনি। সুস্বাদু খাদ্য পানীয়ের প্রতি তাঁর নজর ছিল খুব বেশী। তিনি প্রায়ই সুমার্জিত সুপরিচ্ছন্ন চীবর পরিধান করে জেতবনের অতিথিশালায় বসে থাকতেন। তখন ভিক্ষুরা দূর দেশ-দেশান্তর থেকে বুদ্ধ দর্শনের জন্য এসে সেই অতিথিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করতেন। স্থূলতিষ্যকে গম্ভীরভাবে বসে থাকতে দেখে কোন বিজ্ঞ মহাস্থবির হবেন মনে করে আগন্তুক ভিক্ষুগণ তাঁর সেবার জন্য পাদমর্দনের অনুমতি চাইতেন। তিষ্য নিরুত্তর হয়ে বসে থাকতেন।

একদিন জনৈক তরুণ ভিক্ষু তিষ্যের ভাবগতিক দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার দীক্ষার বয়স কত? উত্তরে তিষ্য বললেন—আমি বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি, আমার দীক্ষার কোন বয়স নেই। তরুণ ভিক্ষু তখন উত্তেজিত করে বললেন—বন্ধু বৃদ্ধ, আপনার সাধারণ জ্ঞান পর্যন্ত নেই; গুণী-জ্ঞানী মহাস্থবির দেখে আপনি এতটুকু সৌজন্য প্রকাশ করেন না এবং আপনার সেবায় পাদমর্দনের অনুমতি চাইলে চুপ করে থাকেন; আপনার সামান্য সঙ্কোচমাত্র নেই। এ উক্তি তিষ্যের আত্মাভিমানে আঘাত করল। তিনি ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বলে উঠলেন—আপনারা কার কাছে এসেছেন?

তরুণ—আমরা এসেছি আমাদের ভগবান শাস্তার কাছে।

তিষ্য—আপনারা জানেন আমি কে? আমি এখনি আপনাদের মূলোচ্ছেদ করব।

তিষ্য রাগে অভিমানে রোদন করতে করতে বুদ্ধের কাছে গেলেন। বুদ্ধ তাঁকে বিষণ্ণ রোদনপর দেখে জিজ্ঞেস করলেন—তিষ্য, কেন তুমি বিষণ্ণ মলিন বদনে কাঁদতে কাঁদতে এসেছ? তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুগণও গিয়ে বুদ্ধকে বন্দনা করে একান্তে বসলেন। তিষ্য সেই ভিক্ষুদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ বললেন—ভদন্ত এই ভিক্ষুরা আমায় তিরস্কার করেছে।

বুদ্ধ তিষ্য, তুমি কোথায় ছিলে?

তিষ্য—ভদন্ত, আমি অতিথিশালায় বসেছিলাম।

বুদ্ধ—তুমি এই ভিক্ষুদের আসতে দেখেছ কি?

তিষ্য- হাঁ, ভদন্ত।

বুদ্ধ তুমি উঠে গিয়ে ওদের আগুবাড়িয়ে এনেছ কি?

তিষ্য—না, ভদন্ত!

বুদ্ধ—তাদের পাত্রচীবর গ্রহণের অনুমতি চেয়েছিলে কি?

তিষ্য—না, ভদন্ত।

বুদ্ধ—জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের আসন দিয়ে পাদমর্দন করেছ কি?

তিষ্য—না, ভদন্ত।

বুদ্ধ—তিষ্য, বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষুদের সম্মানপ্রদর্শনের জন্য এসব ব্রত পালন করা উচিত। এ সমস্ত ব্রত যারা পালন করে না, তাদের বিহারে থাকা উচিত নয়। সুতরাং ব্রতভঙ্গের জন্য তোমারই অপরাধ হয়েছে। তুমি এদের কাছে ক্ষমা চাও।

তিষ্য ভেবেছিলেন পিসতুত ভাই হিসেবে বুদ্ধ তাঁকে সমর্থন করে সেই ভিক্ষুদের তিরস্কার করবেন। কিন্তু এ অপ্রত্যাশিত আদেশ শুনে তাঁর মাথায় যেন বাজ পড়ল। তিনি মস্তক নত করে বললেন—ভদন্ত, এরা আমায় তিরস্কার করেছে, এদের কাছে আমি ক্ষমা চাইতে পারি না।

বুদ্ধ—তিষ্য, এমন করো না, তোমারই দোষ। তুমি ক্ষমা চাও।

তিষ্য—না, ভদন্ত, আমি ক্ষমা চাইব না।

বুদ্ধের সস্নেহ নির্দেশ অমান্য করে তিষ্য দাঁড়িয়ে রইলেন। ভিক্ষুরা মন্তব্য করলেন—ভদন্ত, তিষ্য অত্যন্ত অবাধ্য। বুদ্ধ বললেন—ভিক্ষুগণ, শুধু এজন্মে নয়, গত জন্মেও সে অবাধ্য ছিল। বুদ্ধ তার অবাধ্যতার অতীত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে উপদেশচ্ছলে বললেন—

"আমায় তিরস্কার করল, আমায় প্রহার করল, আমায় হারিয়ে দিল কিংবা আমার সম্পদ হরণ করল—যারা মনে অনুক্ষণ এ চিন্তা পোষণ করে, তাদের কখনো শত্রুতার উপশম হয় না।"

"আমায় তিরস্কার করল, আমায় প্রহার করল, আমায় হারিয়ে দিল কিংবা আমার সম্পদ হরণ করল—যারা এ চিন্তা মনে পোষণ করে না, শত্রুতা তাদের মনে স্থান পায় না।" এ উপদেশ শুনে তিস্য নিজের অবাধ্যতার জন্য অনুতপ্ত হলেন এবং ভিক্ষুদের কাছে ক্ষমা চাইলেন।

পাঁচ

শ্বেতব্যবাসী দুই সহোদর পণ্য সংগ্রহের জন্য পাঁচশ শকট নিয়ে শ্রাবস্তীতে এসে পৌঁছলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মহাকাল এবং কনিষ্ঠের নাম চুলকাল। পৌঢ় মহাকাল ছিলেন স্বভাবতই ভক্ত ও ধর্মপরায়ণ। একদিন অপরাহ্নে তিনি দেখলেন লোক দলে দলে কোথায় চলেছে। তাদের দেখে তাঁর কৌতূহল জাগলো। তিনি একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন—ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে জেতবন বিহারে থাকেন, তাঁর উপদেশ শোনার জন্য এই জনতা সেদিকে চলেছে। একথা শোনামাত্র মহাকাল উন্মনা হয়ে ফিরে গেলেন শিবিরে, ভ্রাতাকে বললেন—আমি মহাসন্ন্যাসীর তপোবনে যাচ্ছি। আমার ফিরতে দেরী হবে, তুমি সাবধানে থেকো। চুলকাল তাঁর দাদার এই অভ্যাসের সঙ্গে চিরপরিচিত। বিভিন্ন নগর উপনগরে বাণিজ্যে গিয়ে মহাকাল যখনি কোন সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধান পেতেন, তখনি সেখানে তাঁদের সঙ্গলাভের জন্য উৎসুক হতেন। কনিষ্ঠ কোনদিন জ্যেষ্ঠের ধর্মকর্মে বাধা দিতেন না। তাই আজও চুলকাল নীরবে সম্মতি জানালেন।

মহাকাল যখন জেতবনে পৌঁছলেন, তখন সন্ধ্যা আসন্ন, দূর কুটিরগুলোতে আলো জ্বলতে সুরু করেছে। ধর্মসভায় বিপুল জনতা উচ্চবেদীর ওপর উপবিষ্ট বুদ্ধের উপদেশশ্রবণরত। সভার একান্তে বসে মহাকাল প্রণাম নিবেদন করলেন বুদ্ধকে। তাঁর উজ্জ্বল প্রশান্ত মূর্তি দেখে মহাকাল অভিভূত হলেন। তাঁর প্রতিটি কথা যেন মহাকালের প্রাণ গিয়ে পৌঁছল। মহাকালের মনে গভীর বৈরাগ্যের উদয় হল। সকল বন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাসের মুক্ত অবকাশে আত্মসন্ধানে মগ্ন হতে চাইল তাঁর মন। সভাভঙ্গের পর তিনি ধীরে ধীরে উপস্থিত হলেন বুদ্ধের সমীপে এবং তাঁর চরণ বন্দনা করে ব্যক্ত করলেন নিজের অভিপ্রায়। বুদ্ধ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—বৎস তোমার কি কারো

মতামতের দরকার নেই? উত্তরে তিনি বললেন—ভদন্ত, এখানে আমার ভাই আছে।

বুদ্ধ—তবে তাকে জিজ্ঞেস কর।

মহাকাল—হাঁ, ভদন্ত।

বুদ্ধের কাছে বিদায় নিয়ে মহাকাল নির্জন পথ ধরে ফিরে গেলেন শ্রাবস্তীতে। চুলকাল দাদার জন্য অধীর অপেক্ষায় বসেছিলেন। দূর থেকে তাঁকে আসতে দেখে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু তিনি দেখলেন অন্যদিনের মত দাদার মুখ হাস্যোজ্জ্বল নয়, অত্যন্ত গম্ভীর। তিনি উৎকণ্ঠিত-ভাবে জিজ্ঞেস করলেন—দাদা, তোমার শরীর কি খারাপ? উত্তরে মহাকাল বললেন—না, ভাই, আমার শরীর খারাপ নয়, তবে তোমাকে কিছু বলবার আছে। চুলকাল জিজ্ঞাসু নয়নে তাঁর মুখের পানে তাকালেন। মহাকাল বলতে লাগলেন—ভাই, আমাদের যা কিছু আছে, সব তোমার, তুমি সেগুলোর ভার গ্রহণ কর।

চুলকাল—দাদা, কেন একথা বলছ?

মহাকাল—ভাই, আমার আর সংসার করার ইচ্ছা নেই। আমি সন্ন্যাসী হয়ে প্রভু বুদ্ধের চরণে থাকবো।

চুলকাল—দাদা তুমি বল কি? হঠাৎ তোমার এ রকম মতি হল কেন?

মহাকাল—প্রভু বুদ্ধ আমায় পথের সন্ধান দিয়েছেন। আমি তাঁর চরণাশ্রয় করব।

চুলকাল—দাদা, এ সংকল্প ত্যাগ কর। আমাদের অভাব কিসের? সংসারে থেকে দানধর্ম কর। এতে তোমার ইহকাল পরকাল দুই রক্ষা হবে।

এভাবে দুই ভায়ের মধ্যে যুক্তিতর্ক চলতে লাগলো। অবশেষে চুলকাল জ্যেষ্ঠকে সংকল্পচ্যুত করতে না পেরে তাঁর গৃহত্যাগে মত দিলেন।

মহাকাল বুদ্ধের চরণাশ্রয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। চুলকাল দাদার অভাবে সমস্ত অন্ধকার দেখলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন—দাদাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, তাঁকে ফিরিয়ে না আনলে ব্যবসা বাণিজ্য সব নষ্ট হয়ে যাবে। দাদাকে ফিরিয়ে আনার সংকল্প নিয়ে চুলকালও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর মন সন্ন্যাসাশ্রমে হাঁপিয়ে উঠল। তিনি উঠতে বসতে শুতে ভাবতে লাগলেন আপনার ঘরসংসারের কথা, ব্যবসাবাণিজ্যের কথা। দাদার প্রতি তাঁর বিরক্তির সীমা রইল না, যেহেতু দাদা এভাবে

সন্ন্যাস নিয়ে তাঁদের সংসারকে ডুবিয়ে দিতে বসেছেন। এজন্য দুর্ভাবনা তাঁর অন্তর জুড়ে রইল।

আশ্রমের পবিত্র পরিবেশে মহাকালের নতুন জীবন সুরু হল। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ভিক্ষুর সমস্ত ব্রত পালন করতে লাগলেন। গুরুর কাছে সাধনার নির্দেশ নিয়ে শ্মশানিক ব্রত গ্রহণ করলেন। গভীর রাতের স্তব্ধতার মধ্যে তিনি শ্মশানে গিয়ে সাধনায় মগ্ন থাকতেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে বিহারে ফিরে আসতেন। সে শ্মশানে ছিল কালী নাম্নী এক শবদাহিকা। লোক প্রায়ই মৃতদেহ-সৎকারের ভার তাকে দিত। সে কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে শবদাহ করত। শ্মশানে গভীর রাত্রে পদশব্দ শুনে সে ভাবল—কোন সাধুসন্ন্যাসী নিশ্চয়ই এখানে আসে। এক রাত্রিতে সে শ্মশানচারীকে জানবার জন্যে জেগে রইল। যখন রাত্রির মধ্যযামে ভিক্ষু মহাকাল শ্মশান কুটিরে প্রবেশ করলেন তখন কালী তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল—ভদন্ত, আপনি কি এখানে থাকেন?

ভিক্ষু হাঁ, ভগ্নি।

কালী—শ্মশানে থাকতে হলে শ্মশানচারীর নিয়ম পালন করতে হয়।

ভিক্ষু—সে নিয়ম কি?

কালী—মঠের অধ্যক্ষ, গ্রামের মোড়ল এবং শ্মশান পালকে জানিয়ে রাখতে হয় নিজের বাসের কথা।

ভিক্ষু—তার কারণ?

কালী—গভীর রাত্রে চোর ডাকাতেরা আবশ্যক হলে এখানে আশ্রয় নেয়। কোন কোন সময় সামলাতে না পেরে চুরি ডাকাতির জিনিষপত্র এখানে ফেলে দিয়ে যায়। তখন লোক শ্মশানচারী সাধু-সন্ন্যাসীকে চোর মনে করে লাঞ্ছনা দেয়।

ভিক্ষু—ভগ্নি, তা আমি জানাব। আরও কোন নিয়ম আছে কি?

কালী—শ্মশানবাসীর আমিষাহার নিষিদ্ধ। দিবানিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাজ্য।

আমি এখানে মৃতদেহ সৎকার করি। যদি আপনার সাধনার জন্য দেহসৎকার দেখতে চান, আমি আপনাকে দেখাব।

ভিক্ষু—ভগ্নি, সুরূপ মৃতদেহ সৎকারের সময় আমাকে খবর দিও।

কয়েকদিন পরেই এক রাত্রিতে একদল লোক কাঁধে নিয়ে এল এক সুরূপা কুমারী কন্যার মৃতদেহ। সদ্যমৃতা সৌষ্ঠবসম্পন্না তরুণীর গাত্রকান্তি তখনও

অম্লান। কালী দাহক্রিয়ার পূর্ব মুহূর্তে ভিক্ষু মহাকালকে খবর দিল। ভিক্ষু তখনি সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে কালী তাতে অগ্নিসংযোগ করল। অগ্নির লেলিহান শিখা অল্পক্ষণের মধ্যেই সে সুন্দর সুগৌর দেহখানিকে বিদীর্ণ বিকৃত করে দিল। মহাকাল নির্নিমেষ নয়নে দেখলেন ক্ষণভঙ্গুর রূপের পরিণতি। তিনি চিন্তামগ্নভাবে আপনার কুটিরে প্রবেশ করলেন। রূপের অনিত্যতার বিষয় ভাবতে ভাবতে তাঁর চিত্ত গভীর ধ্যানে নিবিষ্ট হল। সেই আসনেই তিনি চরম সিদ্ধি অর্হত্ব লাভ করলেন। তাঁর চিত্ত হল মুক্ত বন্ধনহীন।

এর অব্যবহিত পরে বুদ্ধ সফরে বেরুলেন সদলবলে। সেই ভিক্ষুদলের মধ্যে চূলকাল মহাকাল দুই সহোদরও ছিলেন। নানা জনপদ ভ্রমণের পর বুদ্ধ যখন শেতব্যে পৌঁছলেন, তখন কালের বাড়ীতে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘ নিমন্ত্রিত হলেন। অপরিচিত জায়গায় তাঁদের নিমন্ত্রণ হলে আসন পাতার জন্য একজন ভিক্ষু পাঠানো হত। বুদ্ধের আসন পড়ত মাঝখানে, তাঁর ডানে শারীপত্র ও বাঁয়ে মৌদগল্যায়নের আসন পড়ত, দুই পাশে থাকত অন্যান্য ভিক্ষুদের আসন। সেদিন চূলকালকে পাঠানো হল আসন পাতার জন্য। তাঁকে দেখেই তাঁর সহ-ধর্মিনীদ্বয় উপহাস করতে লাগলেন এবং তাঁর সন্ন্যাসীর বেশ কেড়ে নিয়ে গৃহীর পোষাক পরিয়ে দিলেন। আসন পাতা শেষ হলে তিনি সেই বেশে চলে গেলেন আশ্রমে। দীর্ঘদিন সন্ন্যাসাশ্রমে না থাকায় বেশ পরিবর্তনের জন্য তাঁর লজ্জাবোধ হল না। তিনি নিঃসঙ্কোচে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বাড়ী নিয়ে এলেন।

আহারের পর মহাকালের ভার্যাগণ তাঁর মুখে ধর্মকথা শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বুদ্ধ মহাকালকে ধর্মোপদেশ দেবার নির্দেশ দিয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘ-সহ প্রস্থান করলেন। ভিক্ষুরা গৃহ-প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এসেই বলাবলি করতে লাগলেন—আমাদের শাস্তা আজ কি করলেন, এ জেনে করলেন কি না জেনে করলেন, গতকাল চূলকালকে একা পেয়ে তাঁর সহধর্মিনীদ্বয় জোর করে তাঁকে সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়েছেন, আজ আটজন ভার্যার কবলে পড়ে শীলবান ধার্মিক মহা-কালের কি দশা হয় কে জানে? ভিক্ষুদের মন্তব্য শুনে বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কি মহাকালকে চূলকালের মত দুর্বল মনে কর? উত্তরে ভিক্ষুরা মন্তব্য করলেন—ভদন্ত, চূলকালের মাত্র দুইজন ভার্যা যাঁদের কাছে তাকে হার মানতে হল, মহাকালের না কি আটজন ভার্যা, তাঁরা ঘিরে দাঁড়ালে তিনি কি করবেন? বুদ্ধ বলতে লাগলেন—ভিক্ষুগণ তোমরা একথা বলো না,

চুলকাল উঠতে বসতে সংসারের ভাবনায় মশগুল, সে প্রপাততটের ক্ষীণমূল বৃক্ষের মত দুর্বল, কিন্তু আমার পুত্র জিতেন্দ্রিয় ধ্যানপর মহাকাল শৈলময় পর্বতের মত অচল অটল। একথা বলেই তিনি গাথায় উচ্চারণ করলেন।

"ভোগাসক্ত ইন্দ্রিয়পর অমিতাহারী অলস হীনবীর্য ব্যক্তি অন্তরের রিপুদলের দ্বারা বাত্যাহত দুর্বল বৃক্ষের মত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।"

"যিনি দেহকে অশুচিপূর্ণ জেনে দেহের প্রতি অনুরাগহীন সংযতেন্দ্রিয় মিতাহারী শ্রদ্ধাসম্পন্ন বীর্যবান, তিনি সুদৃঢ় শৈলময় পর্বতের মত অটল হয়ে রিপুদলের প্রভাব অতিক্রম করেন।"

গাথা উচ্চারণ শেষ হবার পূর্বেই ভিক্ষু মহাকাল ঋদ্ধি বলে ভার্যাদের ব্যূহ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করলেন ভগবানের পদতলে; ভিক্ষুরা চেয়ে রইলেন অবাক বিস্ময়ে।

ছয়

শ্রাবস্তীর অন্যতম ধনী বণিকের পুত্র রাজদত্ত অতি অল্প বয়সেই পৈতৃক ব্যবসার ভারপ্রাপ্ত হন এবং অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে তাঁদের ব্যাপক ব্যবসা পরিচালনা করেন। পণ্য-সম্ভার নিয়ে বিদেশ যাত্রার জন্য তাঁর ছিল পাঁচশ শকট। এ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ছিল তাঁর অভ্যাসগত। সুদক্ষ বণিকরূপে বণিক সমাজে তাঁর ছিল বিশেষ খ্যাতির। একবার তিনি পাঁচশ শকটে বিবিধ পণ্যদ্রব্য বোঝাই করে রাজগৃহে গেলেন। সেখানে পণ্য বিক্রয়ে তাঁর প্রচুর অর্থোপার্জন হতে লাগলো। অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরে ভোগবাসনাও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি রাজগৃহের এক রূপসী নৃত্যগীতকুশলা বারাঙ্গনার কাছে যাতায়াত করতে লাগলেন। সে রমণী তাঁকে অত্যন্ত বিমোহিত করে ফেলল। তার প্রণয়াসক্ত হয়ে তরুণ বণিক অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন এবং নিজে ব্যবসার বিষয়েও অমনোযোগী হয়ে পড়লেন। ফলে অল্পকালের মধ্যেই তিনি সর্বস্ব হারিয়ে দারিদ্র্যগ্রস্ত হলেন।

রাজদত্ত ঐশ্বর্যের আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদ থেকে নির্যাসিত হয়ে এলেন পথে। যে সকল বন্ধু-পরিজনে তিনি পরিবৃত থাকতেন, তাঁরা সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ করলেন। যে রমণীর জন্য তিনি আজ সর্বহারা, তার দ্বারও তাঁরা জন্য রুদ্ধ হল। সমস্ত সংসারের ওপর তাঁর মন তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠল। তিনি বাড়ী ফেরার কথা মনেও আনতে পারলেন না। তাঁর

অন্তরে অশান্তির দাবানল জ্বলতে লাগলো। মনে অনুতাপের কাঁটা বিঁধতে লাগলো। তখন বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবন বিহারে বাস করতেন। একদিন রাজদত্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে বুদ্ধের প্রাত্যহিক ধর্মসভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর শান্ত সুন্দর মূর্তি রাজদত্তের অন্তরে গভীর রেখাপাত করল। তিনি ব্যাকুল নয়নে বার বার বুদ্ধের পানে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন—আহা কি গভীর প্রশান্তি এ মহাপুরুষের চোখেমুখে! কোথাও তার অশান্তির চিহ্নমাত্র নেই। তাঁর মনে হল—ইনি তাঁর অন্তরের দাবানল এক নিমেষে নিবিয়ে দিতে পারেন। রাজদত্ত যখন এমনিভাবে চিন্তামগ্ন রইলেন, তখন বুদ্ধ জলদগম্ভীর স্বরে প্রেমমধুর বচনে তাঁর অমৃতময় উপদেশ বর্ষণ করতে লাগলেন। জনতা একাগ্রমনে শুনতে লাগলো সে উপদেশ। রাজদত্ত ও শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলেন। তাঁর মন এক ভাবলোকে উত্তীর্ণ হল। এতদিন যে তাঁর অন্তরে অশান্তির ঝড় বইতেছিল, তা যেন কিসের মায়ামন্ত্রে নিশ্চিহ্ন হল। তিনি যেন আজ নতুন দৃষ্টি লাভ করলেন। ধর্মকথার অবসানে তিনি বুদ্ধের চরণে মাথা লুটিয়ে দিয়ে বললেন—প্রভু, আমায় আপনার চরণে স্থান দিন। বুদ্ধ তাঁকে আশ্বাস দিলেন। তাঁর সমস্ত গ্লানি যেন নিমেষে মুছে গেল। অতঃপর রাজদত্ত ভিক্ষু হলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কঠিন ব্রতসমূহ গ্রহণ করলেন। তিনি ধ্যানসাধনার জন্য শ্মশানে বাস করতে লাগলেন।

এ সময় রাজদত্তের পূর্ব-প্রণয়িনী অন্য একজন ধনী তরুণকে বশীভূত করেছিল। তার অঙ্গসজ্জার মহার্ঘ মণিরত্ন দেখে রমণীর লোভ হল। সে কৌশলে যুবককে হত্যা করে তার মণিরত্ন লুণ্ঠন করল। এদিকে সে যুবকের অনুচরবৃন্দ তা টের পেয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল। তারা নিযুক্ত করল কয়েক দুর্বৃত্তকে তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। দুর্বৃত্তগণ এক রাত্রিতে সে রমণীর প্রণয় প্রার্থনার ছলে তার গৃহে প্রবেশ করল। গভীর রাত্রিতে আসর যখন জমে উঠল, তখন তারা হঠাৎ তাকে গলা টিপে মেরে ফেলল এবং আমশ্মশানে ফেলে দিয়ে উন্মত্ত উল্লাসে প্রস্থান করল।

শ্মশানচারী ভিক্ষু রাজদত্ত শব অবলম্বনে ধ্যানে রত হবার জন্য সেই সদ্য নিক্ষিপ্ত শবের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন তাঁর পূর্বপ্রণয়িনীর দেহের সঙ্গে রয়েছে এর সাদৃশ্য। তিনি একটু উৎসুক হয়ে ঠাউরে দেখে চিনে ফেল্লেন সে মৃতাকে। তাঁর ধ্যানচিত্ত অভিভূত করে জেগে উঠল পূর্বস্মৃতি। অন্তর কেঁপে গেল। তিনি অভিভূতের মত কতক্ষণ বসে থেকে আত্মস্থ হয়ে

ভাবলেন—তিনি বুদ্ধপুত্র। এ চিন্তা তাঁর পক্ষে অসঙ্গত। তিনি স্মরণ করলেন বুদ্ধকে। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের উপদেশবাণী তাঁর স্মৃতিপথে উদিত হতে লাগলো। তাঁর মন সকল আবিলতা পরিহার করে ধ্যানগত হল। ক্রমশঃ ধ্যান গভীর হতে গভীরতর হয়ে তাঁর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করল অমৃতলোকের দ্বার। সেই ধ্যানাসনেই তিনি অর্হত্ব লাভ করলেন। জীবন সায়াহ্নে এ বিষয়ে তিনি যে স্মারকগাথা উচ্চারণ করেছিলেন, তা এখনো পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করে।

সাত

অভ্যন্ত সফরে বেরিয়ে বুদ্ধ পৌঁছলেন আলবিনগরে। আলবির অধিবাসীরা তাঁর যথোচিত সংবর্ধনা করলেন। তিনি সমবেত জনতাকে উপদেশ প্রসঙ্গে বললেন—আমাদের জীবন পদ্মপাত্রে জলবিন্দুর মত চঞ্চল, যে কোন মুহূর্তে তার অবসান হতে পারে; জীবন এমনি অনিশ্চিত বটে, মৃত্যু নিশ্চিত; মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবার কোন পথ নেই, মৃত্যু আসবেই জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি-রূপে, আপনারা সেই মৃত্যু দিবসের কথা সর্বদা চিন্তা করুন, স্মরণ করুন। সেদিন তিনি দিয়েছিলেন মরণানুস্মৃতি বা মৃত্যুভাবনার উপদেশ। যাঁরা মৃত্যু ভাবনা অভ্যাস করেন, মনে মৃত্যুর চিন্তা জাগরূক রাখেন, ধন জন-যৌবন-মদে তাঁরা মত্ত হতে পারেন না। তাঁদের মন পাপের পঙ্কিল পথ পরিহার করে পুণ্য কর্ম সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হয়। ফলতঃ মৃত্যুকালে মৃত্যুভীতি তাঁদের মনকে অভিভূত করতে পারে না, তাঁরা অনাচ্ছন্ন মনে শান্তভাবে মৃত্যুবরণ করেন। বুদ্ধের সেদিনকার উপদেশ শুনেছিল আলবির সহস্র সহস্র নরনারী। মুহূর্তের জন্য তারা এর মর্ম উপলব্ধি করেছিল বটে, তবে তাদের বিষয় বাসনাদিগ্ধ মনে তা স্থায়ী হয় নি। সংসারের শত কর্মে তারা ভুলেছিল সে কথা। সেই সমবেত জনতার মধ্যে ছিল এক তাঁতীর ষোড়শী কন্যা। বুদ্ধের শ্রীমুখ নিঃসৃত কথাগুলো তার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে ব্যস্ত থাকত তাঁতবোনা ও গৃহস্থালীর কাজে। বিশ্রামের বালাই ছিলনা তার। তবু সকল কর্মের ফাঁকে তার মন মগ্ন থাকত বুদ্ধোপদিষ্ট মৃত্যুচিন্তায়। সেই চিন্তার ভিতর দিয়ে এল তার আলোর অনুভূতি। তাই দিনের পর দিন ঘনিয়ে উঠল তার মগ্নভাব।

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে বুদ্ধ আবার গেলেন আলবিতে তাঁর পাঁচশ শিষ্য নিয়ে। সমগ্র নগরী মেতে উঠল তাঁদের সংবর্ধনায়। সে তাঁতী কন্যার কানেও পৌঁছল বুদ্ধের আগমন-সংবাদ। তার মন ব্যাকুল হল বুদ্ধকে দেখার

জন্য। কিন্তু সে তো স্বাধীন নয় ইচ্ছামত চলাফেরা করবে। তার ওপর তার কাজের যে চাপ তাতে কোথাও নড়বার উপায় ছিল না। অথচ সে মনে মনে ভাবতে লাগলো বুদ্ধকে দেখার জন্য ও তাঁর কথামৃত শোনার জন্য। তখন তার পিতা তাকে ডেকে বলল—মা, আমি বেরুচ্ছি কারখানায়, আজ একটি কাপড় বুনে দেব বলে কথা দিয়েছি, সামান্য বাকী আছে, তা শেষ করে কারখানায় আমাকে দিয়ে যেও। এ অবশ্যকরণীয় কাজের কথা শুনে মেয়েটির মন মোটেই খুশী হল না। তার মন পড়ে আছে বুদ্ধের ধর্মসভায়। তবুও পিতার আদেশ অমান্য করে ধর্মসভায় যাওয়ার কথা সে ভাবতেই পারল না। কারণ সে জানত নিজের পিতাকে। একবার রাগলে সহজে রাগ পড়ত না তার, কিল, চড়, ঘুষি অবারিতভাবে পড়ত মেয়ের গায়ে। তাই সে লেগে গেল কাপড়ের বাকী অংশটা শেষ করতে এবং মনে মনে ভাবতে লাগলো যদি ভাগ্যে থাকে, বুদ্ধ-দর্শন হবে। তার হাত দ্রুত চলতে লাগলো।

আলবির নরনারী দলে দলে সমবেত হল বুদ্ধের সম্মুখে। তারা তাঁর উপদেশ শুনবার জন্য উৎসুক নয়নে চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। বুদ্ধ নীরব, সভাও নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতা সমবেত সকলের কানে যেন বাজতে লাগলো। এদিকে তাঁতী কন্যা পিতার নির্দেশ মত কাপড় বোনা শেষ করে ঝুড়িতে নিয়ে চললো পিতার কাছে; দ্রুত পদে সে চলতে লাগলো পথ। কিছুক্ষণ চলার পর সহরের প্রান্তে এসে সে দেখল বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বিরাট জনসমাবেশ। সভার মধ্যস্থানে মঞ্চে উপবিষ্ট বুদ্ধের ওপর তার দৃষ্টি পড়ল। সমস্ত মনপ্রাণ তার অভিভূত হয়ে গেল। বুদ্ধও চোখ তুলে করুণাস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন তার পানে। সে ঝুড়ি নামিয়ে রেখে এগিয়ে গেল বুদ্ধের কাছে এবং তাঁর চরণ বন্দনা করে দাঁড়ালো একান্তে। সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বুদ্ধ তাকে সস্নেহ বচনে জিজ্ঞেস করলেন—মা, তুমি আসছ কোত্থেকে? যুবতী উত্তর করল—ভদন্ত, তা তো জানি না। বুদ্ধ আবার জিজ্ঞেস করলেন—মা, কোথায় যাবে?

"ভদন্ত, তাও জানি না।"

"জানো-না?

"ভদন্ত, জানি?"

"জানো?"

"ভদন্ত, জানি।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন চারিটি প্রশ্ন। অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল তাঁতী কন্যা। কিন্তু ত র উত্তর প্রগল্‌ভ উদ্ধত বাক্যের মত শোনাল জনতার কানে। সভাস্থলে উঠল মৃদু গুঞ্জনধ্বনি নিন্দার। লোক বলতে লাগলো—দ্যাখো তাঁতী মেয়ের দুঃসাহস, যা মুখে এল তাই বলে গেল মহাপুরুষের প্রশ্নের উত্তরে। বৃদ্ধ সভাকে শান্ত করে আবার মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন—মা, কোত্থেকে আসছ জিজ্ঞেস করায় জানি না বললে কেন? উত্তরে মেয়েটি বলল—ভদন্ত, আপনি তো জানেন যে আমি তাঁতীর ঘর থেকেই আসছি, এতো আপনার জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন নয়, তাই উত্তর করলাম কোত্থেকে এসে তাঁতীর ঘরে জন্ম নিয়েছি, তা আমি জানি না। বৃদ্ধ তার বুদ্ধির জন্য সাধুবাদ দিয়ে বললেন—মা, তুমি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছ, আমি সে উত্তরই চেয়েছিলাম। বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞেস করলেন—মা. কোথায় যাবে জিজ্ঞেস করায় তাও জানি না বললে কেন?

"ভদন্ত, আমি কাপড় আর সূতোর ঝুড়ি নিয়ে কোথায় চলেছি সে তো আপনার জিজ্ঞাস্য হতে পারে না, তাই বললাম—এখান থেকে বিদায় নিয়ে কোথায় জন্মাব তা আমার জানা নেই।"

"সাধু! সাধু! মা, তুমি আমার প্রশ্নের ঠিক জবাবই দিয়েছ।"

বৃদ্ধ—মা, আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম 'জানো না?' তখন তুমি জানি বললে কেন?

যুবতী—এ পৃথিবীর বুক থেকে একদিন যে বিদায় নিতে হবে অর্থাৎ মরতে হবে তা জানি, তাই সে কথাই জানি বললাম।

বৃদ্ধ—এ কথাই তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমিও ঠিক উত্তর দিয়েছ। আচ্ছা মা, আমার 'জানো?' প্রশ্নের উত্তরে জানি না বললে কেন?

যুবতী—ভদন্ত, মৃত্যু আসবে ঠিকই, তবে কবে কখন কোন মুহূর্তে আসবে তা আমার জানা নেই তাই বললাম—জানি না।

যুবতীর আলাপের মধ্যে পরিপক্ক জ্ঞানের আভাস পেয়ে সভাস্থ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্তম্ভিত হলেন। দুবেলার অন্নসংস্থানের জন্য সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে পরিশ্রম করে, তার চিন্তার গভীরতা আশ্চর্যের বিষয় তো বটেই। সভাস্থ জনতা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার পানে তাকাতে লাগলো। তখন বৃদ্ধ মন্তব্য করলেন—জ্ঞানচক্ষুই আসল চক্ষু! যাদের সে চক্ষু নেই, তারা অন্ধ। আবার তিনি উপদেশ-গাথায় বললেন—এ জগৎ তমসাচ্ছন্ন, দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের সংখ্যা জালমুক্ত বিহঙ্গের মতই অল্প; তাঁরাই সুগতি লাভ করেন। এ

উপদেশের মধ্যে যুবতী খুঁজে পেল জীবনের গভীর সত্য। তার চোখ খুলে গেল। সভাস্থ জনতাও উপকৃত হল।

সভা ভঙ্গের পর প্রান্তর জনশূন্য হল। যুবতী চলল ঝুড়ি নিয়ে পিতার কাছে। বুদ্ধের উপদেশে তার অন্তর ভরে গিয়েছিল। সেই মগ্নভাবের মধ্যে তার অভ্যস্ত মৃত্যুভাবনা নিবিড় হতে নিবিড়তর হল। সে অনন্যমনে সংসারের অনিত্যতার কথা ভাবতে ভাবতে গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌছল। তখন তার পিতা কারখানায় কাপড় বুনতে বুনতে আসনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে পিতাকে না জাগিয়ে সন্তর্পণে ঝুড়ি রাখতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল কলের ওপর। তার পড়ার শব্দে জেগে ওঠে তার পিতা আড়ষ্ট চোখে অভ্যস্তভাবে কলে মারল টান। মাকু গিয়ে সজোরে বিঁধল কন্যার বুকে। ক্ষতস্থান হতে ফিনকি দিয়ে রক্ত ওঠে প্লাবিত করল সে স্থান অল্পক্ষণের মধ্যেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। কিন্তু বেদনার কোন চিহ্ন নেই তার মুখে। তখনও তার বদনমণ্ডল গভীর প্রশান্তিতে উজ্জ্বল।

নিজের হাতে কন্যার শোচনীয় মৃত্যুর মর্মন্তুদ দৃশ্য সহ্য করতে পারল না পিতা। সে শোক বেদনা তাকে উন্মত্তপ্রায় করে তুললো। অবশেষে সে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হল। বুদ্ধ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—এ আদিহীন সংসারে অনন্তকাল ধরে আসা যাওয়ায় শুধু কন্যাবিয়োগে যে অশ্রুপাত করেছ, তার পরিমাণ মহাসমুদ্রের বারিরাশির চেয়েও বেশী। এই বলে তিনি এ সম্পর্কে দিলেন অমূল্য উপদেশ। তা তার অন্তর স্পর্শ করল। সে বুদ্ধের চরণে আশ্রয় ভিক্ষা চাইল। বুদ্ধ তাকে ভিক্ষু করে নিলেন। এ ভিক্ষুর সাধনা পূত জীবন উত্তরকালে অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে সার্থক হয়েছিল। পিতা-পুত্রীর আদর্শনিষ্ঠার এ সংগীত প্রাণবান ব্যক্তিমাত্রকেই মুগ্ধ করে।

আট

সেদিন ভোর না হতেই পূর্ণ স্ত্রীকে জাগিয়ে দিয়ে বলল—ওগো, মাঠে অনেকখানি জমির চাষ এখনো বাকী, আজ যে কোন রকমে তা শেষ করতে হবে। খাবার সময় আজ বাড়ী আসব না, তুমি আমার খাবার নিয়ে মাঠে যেয়ো। অতিরিক্ত খাটুনীতে খিদেও বেশী হতে পারে, খাবার কিছু বেশী নেবে।' স্ত্রীকে নির্দেশ দিয়ে কৃষক চলে গেল রাজগৃহের দূরপ্রান্তের মাঠে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার কানে ভেসে এল উৎসবের বাদ্য-বাজনা। তখন তার মনে হতে লাগলো—আজ থেকে সাতদিন ধরে চলবে নক্ষত্রোৎসব, এ আনন্দের দিনেও পেটের দায়ে আনন্দ ভুলে গরুর

পেছনে ছুটতে হচ্ছে আমাকে। গরীবের কোন উৎসব আমোদ নেই। এমন সময় সে দেখতে পেল অদূরে জলাশয়ের ধারে ঝোপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁড়িয়ে আছেন চীবরধারী ভিক্ষু। তাঁর শান্ত সমাহিত মূর্তি তাকে অভিভূত করল। সে লাঙল থামিয়ে এগিয়ে গেল ভিক্ষুর কাছে, ভক্তি-ভরে প্রণাম করে তাঁর হাতে তুলে দিল দাঁতন এবং পাত্র ভর্তি করে দিল জল। তিনি আশীর্বাদ করলেন। পূর্ণের হৃদয় আনন্দে কানায় কানায় ভরল। সে উৎফুল্ল চিত্তে আবার লেগে গেল আপনার কাজে।

ভিক্ষু শারীপুত্র সাতদিন নিরোধ ধ্যানে মগ্ন থাকার পর ধ্যান ভঙ্গ করে চাষী পূর্ণের দেওয়া দাঁতন দিয়ে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে নিলেন। সাতদিনের পর আজ তিনি আহার গ্রহণ করবেন। কথিত আছে নিরোধ সমাধির পর সমাহিত পুরুষ যার হাতে প্রথম অন্ন গ্রহণ করেন, তার ভক্তিপ্রদত্ত অন্নদান প্রত্যক্ষ ফল দেয়। শারীপুত্র জনহীন প্রান্তরে বিশ্রামের পর আহারের সময় পাত্র নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন সহরের দিকে। তখন পূর্ণের স্ত্রী স্বামীর জন্য ভাত তরকারীর থালা নিয়ে সে-পথ ধরে চলছিল। শারীপুত্রকে দেখেই সে থমকে দাঁড়ালো এবং মনে মনে বলতে লাগলো "এ মহাপুরুষকে যখন দেখি তখন হাতে থাকে না কিছু দেবার, আবার হাতে যখন থাকে, এ মহাপুরুষকে দেখতে পাই না। আমার পরম সৌভাগ্য আজ মহাপুরুষকে ও দেখতে পাচ্ছি, দেবার জিনিষও হাতে আছে।' সে একান্ত ভক্তিভরে শারীপুত্রের পাত্রে ভাত তরকারী ঢেলে দিতে লাগলো। ঢালতে ঢালতে যখন থালায় অর্ধেক ভাত তরকারী অবশেষ রইল, তখন তিনি হাত দিয়ে আর দিতে বারণ করলেন। নারী বলল—প্রভু, এ একজনের আহার মাত্র, সমস্তটুকু নিঃশেষে গ্রহণ করে দাসীকে অনুগৃহীত করুন। শারীপুত্র বাধা দিলেন না।

পূর্ণের পত্নী শূন্য থালা নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। বাড়ীতে গিয়ে সে আবার চাল সংগ্রহ করে স্বামীর জন্য রাঁধতে লাগলো। এদিকে পূর্ণ বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লাঙল চষে খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গরু ছেড়ে দিয়ে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল এবং পত্নীর পথপানে চেয়ে রইল। তার বিলম্বের জন্য পূর্ণ বিপদের কথা চিন্তা করে উৎকণ্ঠিত হল। কিন্তু তার ক্লান্ত দেহ এক পদও অগ্রসর হতে চাইল না। এমন সময় দূর থেকে দেখা গেল পত্নীকে আসতে। পত্নী ভাবতে লাগলো "না জানি আমার স্বামী খিদের জ্বালায় আজ আমার বিলম্বের জন্য কি করে বসে!" সে দূর থেকেই অনুনয়ের

সুরে বলল—"প্রাণনাথ আজ আমায় ক্ষমা কর, তোমার অন্ন দিয়ে আজ মহাপুরুষ শারীপুত্রের সেবা করেছি, তাই এত দেরী হল।" পূর্ণ পত্নীর কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে জিজ্ঞেস করল—কি বললে প্রিয়ে, আমার অন্ন দিয়ে ভিক্ষু শারীপুত্রের সেবা করেছ ?

"হাঁ, প্রাণনাথ।"

"এ সৌভাগ্য কি করে হল ? আমিও আজ সকালে দাঁতন ও মুখ ধোওয়ার জল দিয়ে তাঁকে সেবা করেছি।" এ-প্রসঙ্গ নিয়ে বাক্যালাপ করতে করতে পূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে আহার করল। আহারান্তে তার শ্রান্ত দেহ ঘুমে ঢলে পড়ল।

পুরুষের ভাগ্য-পরিবর্তনের বিষয় দেবতারাও টের পান না, মানুষ কি করে জানবে ? পরের জমি চাষ করে যে অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেছিল, আশাতীতভাবে তার ভাগ্য পরিবর্তন হবে—কে জানত ? চাষী পূর্ণের আর বেশী দিন লাঙ্গল ধরে গরুর পেছনে ছুটতে হল না। তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়ে সে শ্রেষ্ঠীছত্র লাভ করল। রাজগৃহের উপকণ্ঠে গড়ে উঠল তার কাননঘেরা বিশাল প্রাসাদ। নির্দিষ্ট শুভদিনে গৃহপ্রবেশ ও ছত্রলাভ উপলক্ষে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন হল। বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘ আমন্ত্রিত হয়ে অনুষ্ঠানকে পবিত্রীকৃত করলেন। সাতদিন ধরে দানসত্র মুক্ত রাখা হল অনাথ দরিদ্রদের জন্য। মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হল উৎসব।

শ্রেষ্ঠী পূর্ণ অল্পদিনের মধ্যেই দাতা ধার্মিক ও পরোপকারী রূপে পরিচিত হলেন রাজগৃহের জনসমাজে। তাঁর সম্মান প্রতিপত্তিও যথেষ্ট বাড়ল। তাঁর বিবাহযোগ্যা কন্যার সম্বন্ধ এল রাজগৃহের শ্রেষ্ঠী সুমনের পরিবার থেকে। একদিন এই পরিবারকে আশ্রয় করে তিনি যে জীবিকা-নির্বাহ করেছিলেন, তার স্মৃতি মন থেকে মুছে যায়নি। বিশেষভাবে এ অভিজাত শ্রেষ্ঠী-পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ লোভনীয় তো বটেই। কিন্তু তাঁর দয়াশীলা ভক্তিমতী কন্যা উত্তরার কথা ভেবে এ সম্বন্ধ শ্রেষ্ঠী পূর্ণের মনোপূত হল না। কারণ সে অভিজাত শ্রেষ্ঠী-পরিবার দান ধর্মে মোটেই বিশ্বাসী নয়। তবুও নানাদিক ভেবে বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে তিনি এ বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। যথাসময়ে মহাসমারোহে বিবাহ সুসম্পন্ন হল।

উত্তরা বধু হয়ে এল মহাশ্রেষ্ঠীর পরিবারে। অল্পদিনের মধ্যেই নিজের গুণে সে সকলের ভালবাসা অর্জন করল। কিন্তু এ পরিবারের দান-ধর্মহীন ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ভোগবিলাসের আয়োজন তার মোটেই ভাল লাগলো না। সে চেয়েছিল স্বামীর সাধ্বী পত্নী হয়ে থাকতে—নর্মসহচরী নয়। একটানা

আমোদ-প্রমোদের আবিল আবহাওয়ার মধ্যে তার ধর্মপর মন হাঁফিয়ে উঠল। সে পিতাকে জানাল এ অননুকূল অবস্থার কথা। তার পিতা একমাত্র কন্যার দুর্দশার কথা শুনে বিচলিত হলেন। তিনি কন্যাকে আশ্বাস দিয়ে বলে পাঠালেন—তার দানধর্মে যত অর্থ লাগে তিনি দেবেন। উত্তরা নগরের রূপসী নর্তকী সিরিমাকে অর্ধমাসের জন্য নিযুক্ত করল স্বামীর পরিচর্যার জন্য দৈনিক সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে। সে তাকে স্বামীর কাছে নিয়ে গিয়ে বলল—প্রাণনাথ, কাল থেকে অর্ধমাস আমি দান-ধর্মে রত হব, এই সময় আমার এ সখী তোমার সেবা করতে থাকবে। তার স্বামী রূপসী নর্তকীর সাহচর্যের লোভে খুশী হয়েই তাকে অনুমতি দিল।

এখন ভিক্ষুদের বর্ষাব্রত শেষ হতে পনের দিন মাত্র বাকী। আশ্বিনী পূর্ণিমাই ব্রত সমাপনের দিন। এ উপলক্ষে প্রবারণা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করল তার গৃহে এ অর্ধমাস ভিক্ষাগ্রহণের জন্য। তার ঐকান্তিক ভক্তি ও নিষ্ঠার জন্য বুদ্ধ নীরবে সম্মতি জানালেন। পিতার প্রদত্ত অর্থে বিরাট দানযজ্ঞের অর্ধমাসব্যাপী অনুষ্ঠান চলতে লাগলো উত্তরার। শুদ্ধাত্ম যতিগণের পবিত্র সান্নিধ্য ও ভাবমধুর উপদেশ তার মনপ্রাণকে স্নিগ্ধ শান্ত করে তুললো। সে নিজ হস্তে তাঁদের প্রাণ ঢালা সেবা করতে লাগলো। সেবার আনন্দে বিভোর হয়ে সে একদিন রন্ধনশালায় ব্যস্ত ছিল। তখন প্রাসাদের জানালার ফাঁক দিয়ে তার স্বামী তার ব্যস্ততা দেখে ফিক করে হেসে ফেললো। সিরিমা এ কয়দিনে সুরম্য প্রাসাদে ঐশ্বর্যের জাঁক-জমকের মধ্যে ধনী যুবকের সাহচর্যে প্রায় ভুলেই গেল—সে যে এ গৃহের কুলবধূ নয়, পনের দিনের জন্য এসেছে যুবকের পার্শ্বচারিণীরূপে। তাই সে যুবককে ঐভাবে হাসতে দেখে সন্দিগ্ধ মনে গেল জানালার ধারে। নীচে রন্ধনশালায় উত্তরাকে দেখে সেই হাসির কথা ভাবতে ভাবতে ঈর্ষায় সিরিমার অন্তর জ্বলে উঠল। সে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গেল সেখানে এবং উনানের কটাহ থেকে তপ্ত ঘৃত হাতায় নিয়ে ছুঁড়ে মারল উত্তরার মস্তক লক্ষ্য করে। তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আবার যখন সে তপ্ত ঘৃত নিতে গেল, তখন উত্তেজিত দাসীর দল কেশাকর্ষণে তাকে ধরাশায়ী করে বুকের ওপর বসে কিল, চড়, ঘুষি মারতে লাগলো। উত্তরা তাকে দাসীদের কবল থেকে মুক্ত করে সস্নেহ সম্বোধনে সান্ত্বনা দিয়ে তার পরিচর্যা করতে লাগলো। উত্তরার প্রেমমধুর আলাপ ও সরল অমায়িক ব্যবহারে গলে গেল সিরিমার হৃদয়। সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হল এবং ভাবতে লাগলো—এ মহীয়সীর

কাছে যদি ক্ষমা না চাই, কোথাও আমার ঠাঁই নেই। তখন সে উত্তরার সম্মুখে নতজানু হয়ে যুক্ত করে বলল—দিদি, আমায় ক্ষমা করো, জ্ঞানহীনা অজ্ঞার অপরাধ মার্জনা করো। উত্তরা স্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বলল—বোন, আমার কাছে কি ক্ষমা চাইবে। ক্ষমা চাও আমার পরম পিতার কাছে।

"তিনি কে?"

"তিনি অনন্ত মৈত্রীর অনন্ত করুণার সাগর—সম্যক সম্বুদ্ধ।"

"আমি যে পাপীয়সী নারী, আমার সমস্ত জীবন কলঙ্কভরা, কি করে যাব তাঁর কাছে?"

"বোন, ভয় কিসের? তিনি যে এসেছেন পৃথিবীর পাপ ক্ষালন করতে। সবার বেদনা তাঁর প্রাণে বাজে। তিনি কি কাউকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন?"

পরদিন যখন বুদ্ধ সশিষ্যে এলেন উত্তরার গৃহে, তখন সে সিরিমাকে নিয়ে গেল তাঁর কাছে আহার্য পরিবেশন করতে। উত্তরা ভক্তিভরে নিপুণ হস্তে বুদ্ধ ও ভিক্ষুগণের পাত্রে আহার্য পরিবেশন করতে লাগলো। সিরিমা সেখানে কাঠের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। আহারের পর সে বুদ্ধের পদতলে মস্তক লুটিয়ে দিয়ে বলল—প্রভু, আমায় ক্ষমা করুন।

বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন—তোমার অপরাধ কি? সে ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল—"প্রভু, আমি মূর্খা নারী, অকারণে ক্রোধান্ধা হয়ে আমার এ বোনের মাথায় তপ্ত ঘৃত ছুঁড়ে মেরেছিলাম। এজন্য দাসীরা যখন ক্ষুধিত শার্দুল-দলের মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন এ বোন আমার গুরুতর অপরাধের কথা ভুলে আমাকে দাসীদের কবল থেকে রক্ষা করেছিল। আমি তার মহত্ত্ব অনুভব করে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলাম। সে নির্দেশ দিয়েছে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এ অপরাধের জন্য। তাই আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

বুদ্ধ তাকে শান্ত কণ্ঠে আশ্বাস দিয়ে উত্তরাকে সম্বোধন করে বললেন—উত্তরা, তুমি যে তোমাকে আক্রমণের সময় নিজেকে শান্ত রেখেছ এবং আক্রমণকারিণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করেছ তাতে তোমারই প্রকৃত জয় হয়েছে। এ কথা বলেই তিনি আবার উপদেশ বচনে বললেন—অক্রোধের দ্বারা ক্রুদ্ধকে জয় করবে, অশিষ্টকে শিষ্টতায়, কৃপণকে দানে এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যে জয় করবে।

বুদ্ধের উপদেশে সিরিমার দৃষ্টি খুলে গেল। সে যেন নতুন জন্মলাভ করল। সেই থেকে রূপোপজীবিনী সিরিমা হল বুদ্ধের অন্যতমা ভক্তিমতী উপাসিকা।

নয়

জেতবন বিহার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ ধার্মিক দানবীর বলে আর্যাবর্তের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। শ্রাবস্তীর আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁর গুণকীর্তন করত। তাঁর দর্শনলাভও শুভ বিবেচিত হত। এতাদৃশ গুণান্বিত জনপ্রিয় শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের কৃপালাভের ধন্য হয়েও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এ দুশ্চিন্তা তাঁর পুত্র কালকে নিয়ে। সে ছিল অত্যন্ত দুরন্ত দুরাচার। তার দৌরাত্ম্যে প্রতিবেশীরা অতিষ্ঠ হয়ে শ্রেষ্ঠীর কাছে নালিশ জানাত। পুত্রের অসংগত আচরণে তিনি ক্ষোভে অপমানে ম্রিয়মাণ হতেন বটে, কিন্তু পুত্রকে শাসন করা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। এজন্য তাঁর শান্তি বিঘ্নিত হত। এক কথায় বলতে গেলে তিনি পুত্রটিকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। বিপথগামী পুত্রের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনায় বুদ্ধের আশীর্বাদ লাভের সংকল্প তাঁর মনে জাগলো।

তখন জেতবন বিহারে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় এবং কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ভক্তেরা অধ্যাত্মরসের স্বাদলাভের আশায় অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালনে সদাচার-সম্পন্ন হতেন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাবলম্বনে শুদ্ধ জীবন যাপন করতেন। এই শীলের আটটি অঙ্গ হচ্ছে প্রাণিহত্যা ত্যাগ, অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরতি ব্রহ্মচর্য পালন, সত্যবাদিতা, সুরা মাদক দ্রব্য বর্জন, বৈকাল আহার থেকে বিরতি, নাচ গান বাদ্য উৎসব কৌতুক থেকে বিরতি এবং আরাম বিলাসের শয়নাসন ত্যাগ। একে বলা হয় উপোসথশীল পালন। মঠের পবিত্র আবহাওয়ায় শুদ্ধ জীবন যাপনের প্রথা বহু ভক্তকে আকৃষ্ট করেছিল। উপোসথশীল পালনকারীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অনাথপিণ্ডদ মনে মনে ভাবতে লাগলেন পুত্রকে কি করে উপোসথশীল পালনে প্রবৃত্ত করা যায়। তাহলে মহতের সংস্পর্শে তার জীবন বদলে যাবে. চরিত্র উন্নত হবে।

কালের অর্থের প্রতি ছিল তীব্র লালসা। অনাথপিণ্ডদ তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—বাছা, তুই ভক্তদের সঙ্গে উপোসথশীল নিয়ে জেতবনে উপোসথ দিনে থাকতে পারবি? উত্তরে সে বলল—না বাবা, তোমার ঐ শীল টীল আমাকে দিয়ে হবে না, ওসব আমি পারব না। শ্রেষ্ঠী আবার

বললেন—তোকে আমি কহাপন (কাহন) দেব। কাল উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করল--বাবা, সত্যি কি তুমি আমায় কাহন দেবে ?

শ্রেষ্ঠী—হাঁ, তোকে কাহন দেব।

কাল—কয় কাহন দেবে ?

শ্রেষ্ঠী—একশ কাহন দেব।

কাল—সত্যি একশ কাহন দেবে ?

শ্রেষ্ঠী—হাঁ, একশ কাহন দেব।

কাল—তাহলে আমি পারব।

কাহনের লোভে কাল পরবর্তী উপোসথ দিনে চলে গেল জেতবন বিহারে। যখন উপাসকগণ আনুষ্ঠানিকভাবে উপোসথশীল গ্রহণ করছিলেন, তখন কাল ও তাঁদের সঙ্গে নামে মাত্র শীল গ্রহণ করল। তার মন ছিল কাহনে। সে ধর্মোপদেশ শোনার জন্য ধর্মসভায় না গিয়ে বিহারের এক নিভৃত কোণে সারারাত্রি ঘুমিয়ে কাটাল। পরদিন প্রভাতে বাড়ী গিয়েই দৌরাত্ম্য সুরু করে দিল। জননী তাকে খাবার এনে দিলেন। সে খাবারের থালা ছুঁড়ে ফেলে বলল—আমার কাহন কৈ ? মা তাকে বুঝিয়ে বললেন—বাবা এসে কাহন দেবেন, আগে খেয়ে নে, পাগলামী করিস্ নে। সে নাছোড়বান্দা হয়ে বলল—আগে আমার কাহন দাও। তখনি শ্রেষ্ঠী এসে সিন্দুক খুলে একশ কাহন তার হাতে দিল। সে কাহন পেয়ে ভারী খুশী হল। পরবর্তী উপোসথ দিনে সে বাবার কাছে এসে শীল গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল। শ্রেষ্ঠী তার অভিপ্রায় লক্ষ্য করে বললেন—তুই যদি ভগবানের পদতলে বসে একটি উপদেশ যথাযথভাবে শিখে আসতে পারিস, তাহলে তোকে আমি সহস্র কাহন দেব। সহস্র কাহনের কথা শুনে কাল অধীর হয়ে উঠল। সে সরাসরি বলল—বাবা, আমি পারব।

কাল চলে গেল জেতবনে বুদ্ধের উপদেশ সভায়। সভার একান্তে বসে সে উপদেশ শোনার জন্য কান পেতে রইল। সে একাগ্র মনে উপদেশ লাগলো। বুদ্ধ যেন তার মন ছুঁয়ে কথাগুলো বলতে লাগলেন। যতই শোনে, ততই তার শুনতে ইচ্ছা হয়। শুনতে শুনতে তার মন ডুবে গেল গভীরে। বুদ্ধের প্রতি তার জাগলো অকুণ্ঠ ভক্তি। সে যেন লাভ করল নতুন জীবন। কাহনের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে তার মন কুণ্ঠিত হতে লাগলো। পরদিন বুদ্ধ প্রমুখ সঙ্ঘ যখন অনাথপিণ্ডদের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য উপস্থিত হলেন, তাঁদের অনুগামী হয়ে কালও এল। অনাথপিণ্ডদ বার

বার পুত্রের পানে তাকাতে লাগলেন। তার চঞ্চলতা চপলতা যেন কিসের যাদুমন্ত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পুত্রের রূপান্তর লক্ষ্য করে তিনি অবাক হলেন। এদিকে কাল মনে মনে ভাবতে লাগলো—আমার পিতা যেন বুদ্ধের সম্মুখে কাহনের প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত না করেন। ভিক্ষুসঙ্ঘের আহারের পর অদূরে উপবিষ্ট পুত্রের সম্মুখে গিয়ে শ্রেষ্ঠী বললেন এই নাও, বাবা, তোমার সহস্র কাহন। এই বলে তিনি কাহনের তোড়া তার সম্মুখে রাখলেন। কাল লজ্জায় মাথা হেট করে রইল। সে স্পর্শ করল না সে কাহনের তোড়া। তখন বুদ্ধ বললেন—শেঠজী, এ কাহনের তোড়া কেন, তোমার সমস্ত সম্পদও সে আজ চায় না, পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব ও তার কাছে তুচ্ছ, সে ধর্মের স্রোতে স্নাত। অতঃপর বুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাসে গাথায় বললেন—

"পৃথিবীর একছত্র রাজত্ব, স্বর্গীয় সুখ এবং সমগ্র ত্রিভুবনের আধিপত্যের চেয়ে ধর্মস্রোতে অবগাহন শ্রেষ্ঠ।"

বুদ্ধ-মুখে পুত্রের এ রূপান্তরের কথা শুনে শ্রেষ্ঠীর আনন্দাশ্রু উদ্‌গত হল। তিনি ভাবতে লাগলেন—পরশমণির ছোঁয়ায় লোহা সোনা হয়ে যায় এবং তাঁর পুত্রও আজ হয়েছে তাই।

দশ

শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের জেতবন বিহার প্রতিষ্ঠার পর থেকে বুদ্ধ শিষ্যবৃন্দ পরিবৃত হয়ে বাস করতে এলেন শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে। এখানে তাঁর দীর্ঘকাল বাসের ফলে শ্রাবস্তীর জনগণ বুদ্ধানুরাগী হয়ে উঠল। যেমনি জেতবন ছিল বিশাল সঙ্ঘরাম, তেমনি তার অধিবাসী ভিক্ষুদের সংখ্যাও ছিল বিরাট। বুদ্ধের দর্শনার্থী দূরাগত আগন্তুক ভিক্ষুগণের সমাবেশে অতিথিশালাসমূহও সর্বদাই জনাকীর্ণ থাকত। ভক্তদের বদান্যতায় এ বিরাট ভিক্ষুবাহিনীর আহার-পানাদির কোন অসুবিধা হত না। এখানকার খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয়ের সমারোহ ছিল বিস্ময়াবহ। জনগণের বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ-প্রীতি অত্যধিক হওয়ায় শ্রাবস্তীর অন্যান্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়-সমূহের আশ্রমগুলোর ভক্তসংখ্যা হ্রাস পেতে লাগলো। ক্রমশঃ তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব দেখা দিল। এতে তাদের কেউ কেউ বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন হলেন। কারণ, তাঁরা জানতেন জনগণের ওপর বুদ্ধের অসামান্য প্রভাব প্রতিপত্তিই তাঁদের এ দুর্দশার একমাত্র কারণ। স্বতঃই বুদ্ধ-বিদ্বেষ তাঁদের অন্তরে দিনের পর দিন ঘনীভূত হতে লাগলো। অবশেষে তা একটি কুৎসিত ঘটনায় আত্মপ্রকাশ করল।

তখন চিঞ্চা নাম্নী এক সুচতুরা রূপসী তরুণী সেই বুদ্ধবিদ্বেষী সন্ন্যাসীদের আশ্রমে যাতায়াত করত। তার দুর্বল চরিত্র ও চঞ্চল চপল স্বভাবের সুযোগ নিয়ে তাঁরা তাকে বললেন—ভগ্নি, যদি ও আমরা তোমাকে আমাদের আশ্রমের বড় ভক্তা বলে জানি, তবুও আশ্রমের প্রতি আজকাল তোমার তেমন দরদ দেখা যায় না। চিঞ্চা উত্তেজিত হয়ে বলল—কেন প্রভু, আপনারা একথা বলছেন?

পরিব্রাজকগণ—ভগিনী, তুমি দেখছ না আশ্রম এখন কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। আজ কেউ তেমন আমাদের খোঁজ-খবর রাখে না। আমাদের খাওয়া পরা পর্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। শ্রমণ গৌতম আমাদের এ দুর্দশার সৃষ্টি করেছেন। তিনি লোকবশীকরণের যাদুমন্ত্র জানেন। সবাই আজ তাঁর কাছেই যায়। যে যায় সে তো একবার আমাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। আমাদের এ দুর্দশা দেখে তোমার কি একটু ও মায়া হয় না!

চিঞ্চা—প্রভু, আমি অবলা নারী কি করতে পারি?

পরিব্রাজকগণ—ভগিনী, কে তোমায় বলে অবলা? তুমি মহাবলধারিণী। তুমি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারো? আমাদের এ দুর্দশার অবসান ঘটানো এমন কি অসাধ্য কার্য তোমার কাছে?

চিঞ্চা—প্রভু, আপনাদের এ-সব কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

পরিব্রাজকগণ—হাঁ, ভগিনী, এ আবার তোমাকে বোঝাতে হবে। তুমি যদি আমাদের বাঁচাতে চাও, আমাদের আশ্রমের শ্রীফিরাতে চাও। তাহলে শ্রমণ গৌতমের সুনামে একটু কালিমা লাগিয়ে দাও। দেখবে সমগ্র শ্রাবস্তী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। আমাদের কি এ দুর্দশা থাকবে?

চিঞ্চা—প্রভু, বুঝতে পেরেছি। আপনারা ভাববেন না। শুধু অপেক্ষা করুন।

চিঞ্চা আশ্বাসবাক্যে সেই পরিব্রাজকদের সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করল। তাঁদের স্তোকবাক্য তার অন্তরে দুরাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলল। সে ভাবতে লাগলো তার গোপন শক্তির কথা। তার মনে হল—ইচ্ছা করলে সে এ ব্যাপারে অসাধ্য সাধন করতে পারে। নিজের কৃতিত্বের কথা কল্পনা করে সে স্বপ্নের মায়াজাল বুনতে লাগলো। সে ভাবল—সে হাসি ফুটিয়ে তুলবে গুরুর মুখে এবং প্রধানা শিষ্যারূপে যথেষ্ট সম্মান খাতির পাবে।

এরপর চঞ্চলা চিঞ্চা প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভক্তদের প্রত্যাবর্তনের সময় জেতবন লক্ষ্য করে চলতে সুরু করল। তার সাজ-পোষাক ভাবভঙ্গী স্বতঃই লোকের

মনে কৌতূহল উদ্রেক করল। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে জেতবনে তার রাত্রিবাসের ইঙ্গিত দিত। জেতবনের সমীপবর্তী কোন স্থানে রাত্রি যাপন করে সে প্রাতে ভক্তদের আগমনের পথে আবার বাড়ী ফিরত। তার সন্দেহজনক গতিবিধি কেউ কেউ লক্ষ্য করত। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর সে অন্তঃসত্ত্বার ভাণ করল। সে প্রকাশ্যভাবে বেড়াতে লাগলো —বুদ্ধের গন্ধকুটিতে রাত্রিযাপন করে সে সন্তান-সম্ভবা হয়েছে। তার কথা শুনে অবিশ্বাসী জনসাধারণের মনে সন্দেহের উদয় হল। বিদ্রূপের হাসি হেসে তারা অশোভন মন্তব্য করতে লাগলো। আর যাঁরা বুদ্ধের গুণমহিমায় অটল বিশ্বাসী, তাঁরা জিভ কেটে বলতেন—এ অসম্ভব, আকাশের চাঁদের প্রতি কুকুরের ব্যর্থ চীৎকারের মত হীনচেতাদের প্ররোচিত এ অপবাদের অসত্যতা একদিন প্রমাণিত হবে, নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধকে কলঙ্ক কখনো স্পর্শ করবে না।

এদিকে নবম মাস গণনা করে চিঞ্চা কাপড়ের নীচে পেটের ওপর একটা কাঠের চাপ বেঁধে আসন্নপ্রসবার ভাণ করে ধর্মসভায় মিলিত ভক্তগণের সম্মুখে বুদ্ধের কাছে এসে দাঁড়াল, বিদ্রূপের হাসি হেসে তাঁকে বলল—তুমি তো বেশ আছ, লোককে উপদেশ দিয়ে বেড়াও, কিন্তু এখন আমার অবস্থা কি? সে আরও বলতে লাগলো যে ঘরে তোমার সঙ্গে রাত্রিবাস করতাম, তা প্রসবের উপযুক্ত নয়, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র টাকাকড়ি ও আমার নেই; তোমার তো রাজা-মহারাজা শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি বড় বড় ভক্তরা আছেন, তাঁদের বলে আমার কোন ব্যবস্থা করো। কথাগুলো বলল সে অতিপরিচিতার মত। বিমূঢ় বিস্ময়ে সভাস্থ জনতা তার পানে চেয়ে রইল। উত্তরে বুদ্ধ সে রমণীকে শুধু বললেন—ভগিনি, তোমার কথা সত্য কি কি মিথ্যা তা তুমিও জান এবং আমিও জানি। সে তখন অসংযত ভাষায় বুদ্ধকে মিথ্যাচারী ধর্মধ্বজী বলে বিদ্রোপের কশাঘাত করতে লাগলো। ঠিক সেই মুহূর্তে কাশতে গিয়ে চিঞ্চার পেটে বাঁধা সুতা হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কাঠের চাপ পেট থেকে খসে মাটিতে পড়ল, সমস্ত প্রতারণা প্রকাশ হয়ে গেল। তার গর্হিত আচরণে ক্ষুব্ধ জনতা তাকে প্রহার করতে লাগলো। বুদ্ধ তাদের শান্ত করে আবার ধর্মালাপ সুরু করলেন। চিঞ্চা প্রথম চোটে কীল, চড়, লাথি খেয়ে প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে জেতবনের ফটক পেরিয়ে অদৃশ্য হল।

এগার

বিস্তীর্ণ কুরুরাজ্যে এমন কোন তরুণ ছিল না সে যুগে, যে মাগন্দিয়ার নাম শোনেনি। অসাধারণ প্রতিভা কিংবা বীরত্বের জন্য তার নাম নয়। সে ছিল কুরুরাজ্যের অন্তর্গত একটি নিগমের ব্রাহ্মণ-কন্যা। তাদের ধনসম্পদ ছিল বটে, কিন্তু তা বিশেষত্বব্যঞ্জক নয়। তবে মাগন্দিয়ার বিশেষত্ব ছিল। তা তার অসামান্য রূপলাবণ্য। সে ছিল যেন মানুষের ঘরে শাপভ্রষ্টা অপ্সরা লাবণ্যপুঞ্জ। তাকে দেখে কেউ চোখ ফিরাতে পারত না। যেমনি ছিল তার রূপ, তেমনি ছিল তার রূপের গর্ব। সে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিল—তার সঙ্গে যাকে মানাবে, তাকেই সে বরণ করবে, বাঁদরের গলায় মালা দেবে না। এ পরমা রূপসীর পাণিপ্রার্থী হয়ে কত বিত্তবান, কত বিদ্যাসম্পন্ন, কত গুণী ব্যর্থ হয়ে ফিরেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। কন্দর্পের মত রূপবান বরের খোঁজে তার বৃদ্ধ পিতা বহু গ্রাম নগর জনপদ ঘুরেও এমন একজন দেখতে পেলেন না যার হাতে কন্যাকে সমর্পণ করা যায়। তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন।

একদিন বুদ্ধ মাগন্দিয়ার জন্মভূমির বাইরে জনহীন স্থানে একটি বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। মাগন্দিয়ার পিতা সে পথ ধরে বাড়ী ফিরবার সময় তাঁকে দেখতে পেলেন। এমন অনিন্দ্য সুন্দর জ্যোতির্ময় পুরুষ কখনো ব্রাহ্মণের চোখে পড়েনি। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল এ দিব্য রূপরাশির তুলনা কোথায়? তিনি ভাবতে লাগলেন—এ তরুণের চেহারার মধ্যে রয়েছে একটি অপূর্ব স্বর্গীয় ব্যঞ্জনা, তার হাতে যদি আমার কন্যাকে সমর্পণ করতে পারতাম, তাহলে মেয়ের সোনার সংসার হত। তিনি ধীরে ধীরে গেলেন তাঁর কাছে এবং স্থান কাল পাত্র বিচার না করেই বললেন—হে সন্ন্যাসী, তুমি যেমন রূপবান পুরুষ, তেমনি আমার কন্যাও পরমা রূপসী, তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করে তাকে নিয়ে সুখে সংসার করো, সন্ন্যাসের কণ্টকময় পথে বৃথা কষ্ট করছ কেন? বুদ্ধ কোন মন্তব্য না করে নীরব রইলেন।

ব্রাহ্মণ বাড়ী চলে গেলেন এবং নিজের পত্নীকে জানালেন পরম সুন্দর সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত। তাঁর পত্নীরও কৌতূহল জাগলো সেই সন্ন্যাসীকে দেখার। মাগন্দিয়া উৎকর্ণ হয়ে শুনল সকল কথা। তার সর্বাঙ্গ পুলকে শিউরে উঠল। সে ভাবতে লাগলো—তবে কি এতদিন পরে তার অজানা প্রাণসখা সন্ন্যাসীর বেশে তার দ্বারে এসে পৌঁছেচে, কেমন করে তাকে বরণ করবে! কল্পনার রঙীন নেশায় মেতে উঠল তার মন! মাতার নির্দেশে সে নব বস্ত্রালঙ্কার পরে নতুন সাজ নিল। তারপর মাতাপিতার সঙ্গে যাত্রা করল অজানা সন্ন্যাসীর

বৎসরের পর বৎসর পার হয়ে স্ত্রীগন্ধহীন কুমার যৌবনে পদার্পণ করল। কিন্তু তার যৌবনোচিত কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না। তখনও সে নারীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে লাগলো। তার নারীবিমুখতা পিতামাতার ভাবনার বিষয় হল। কারণ সে যদি আজীবন নারী সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকে, তাহলে তাঁদের বংশরক্ষা হবে না। বংশলোপের ভয় দুঃস্বপ্নের মত তাঁদের সমস্ত মন অধিকার করে বসল। বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করে কোন লাভ হবেনা জেনেও নিরস্ত থাকা তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। একদিন তার জননী তাকে বললেন—বাছা, তোমার পিতৃ-পুরুষের সঞ্চিত সম্পদ বিরাট, সাত পুরুষ বসে খেলেও এর ক্ষয় নেই; আমাদের যদি বংশরক্ষা না হয়, তাহলে এর পরিণতি কি তা বুঝতে পারছ; অতএব বিয়ে-থা করে সংসারধর্ম পালন করো, তাতে আমাদের বংশরক্ষা হবে, ধন-সম্পদের উত্তরাধিকার ঠিক থাকবে। জননীর এ প্রস্তাব শুনে তার প্রাণ শিউরে উঠল। সে নম্রভাবে বলল—মা, এছাড়া তোমার অন্য সকল আদেশ পালন করব; বিয়ের কথা আমায় বলো না, বিয়ে করতে আমি পারব না, আমায় ক্ষমা করো। এ প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান অপ্রত্যাশিত নয়, তবুও জননী অত্যন্ত ক্ষুণ্ণা হলেন। আর একদিন তিনি সুযোগ বুঝে পুত্রের নিকট এ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তেমনি বিনীতভাবে পুত্র তা প্রত্যাখ্যান করল।

দ্বিতীয় বারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলেও জননী নিরস্ত হলেন না। তিনি বিয়ের সপক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়ে বার বার পুত্রকে বিয়েতে রাজী করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। পুত্র ও সেই যুক্তি খণ্ডন করে অবিবাহিত থাকার সংকল্পে অটল রইল। মাতাপুত্রের যুক্তিতর্কের এ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ যেন আর থামে না। অবশেষে এ অবাঞ্ছিত প্রস্তাবের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সে একটি নিপুণ শিল্প-সৌকর্যের নিদর্শন অতি মনোরম স্বর্ণ-প্রতিমা দেখিয়ে জননীকে বলল—মা, এ প্রতিমার মত সুন্দরী মেয়ে যদি পাওয়া যায়, তবে আমি বিয়ে করতে পারি। পুত্রের এ কথায় জননী যেন হাতে চাঁদ পেলেন। তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। তিনি ভাবলেন —আমার পুত্র সুবুদ্ধি-সম্পন্ন, তার উপযুক্তা এ অপরূপার সন্ধান নিশ্চয়ই মিলবে।

শুভ মুহূর্তে ইষ্টদেবতা নাম জপ করতে করতে একদল ঘটক বেরিয়ে পড়লেন স্ত্রীগন্ধহীন কুমারের কল্পিত কুমারীরত্নের সন্ধানে। তাঁরা নগরে উপনগরে ঘুরে ঘুরে সন্ধান করতে লাগলেন আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব-জড়িত

আনে। যার সন্ধান মিলে না, তার সন্ধান করার ধৈর্য সহজ নয়। দিনের পর দিন মাসের পর মাস অতিবাহিত হতে লাগলো। কিন্তু কোথাও অভীপ্সিতা পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। ঘটকগণের মনে হতাশার সঞ্চার হল। তাঁরা বৃথা কাল ব্যয় না করে বাড়ী ফিরতে উদ্যত হলেন। তাঁরা বুঝলেন পিতামাতার পীড়াপীড়ির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য স্ত্রীগন্ধহীন কুমারের এ একটি কৌশল মাত্র। শশক-বিষাণ সন্ধানের মত এ সন্ধান অর্থহীন। তখন তাঁরা এসেছিলেন মদ্ররাজ্যের সাগলনগরে। তাঁরা যখন ফিরবার উদ্যোগ করছিলেন, তখন এক পরিচারিকা তাঁদের স্বর্ণ প্রতিমাকে প্রভুকন্যা মনে করে মৃদু তিরস্কার করে বলল—দিদি, তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে? বলা সত্ত্বেও নিশ্চল নিরুত্তর দেখে সে প্রতিমার গায়ে হাত দিয়ে বুঝতে পারল নিজের ভ্রম। ঘটকগণ বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন—ওগো তোমার প্রভুকন্যা কি এ প্রতিমার মত সুন্দরী। সে সগর্বে উত্তর দিল—আমার দিদিমণির কাছে এ আবার কি? আমার দিদিমণি এর চেয়ে ঢের ঢের সুন্দরী। তার উত্তর শুনে ঘটকগণের মুখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাঁরা তার কাছ থেকে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করে উপস্থিত হলেন সে সুকন্যার পিতৃগৃহে। যথারীতি বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেল। ঘটকগণ তাদের অভীষ্ট সিদ্ধিতে উৎফুল্ল হয়ে ফিরে গেলেন শ্রাবস্তীতে এবং আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন সমস্ত বৃত্তান্ত স্ত্রীগন্ধহীন কুমারের মাতা-পিতার কাছে। তাঁদের সমগ্র ভবনে উঠল আনন্দের কলরোল।

সুরূপা সুকন্যার রূপের বর্ণনা শুনে স্ত্রীগন্ধহীন কুমার ও মুগ্ধ হয়ে গেল। ভাবী পত্নীকে কেন্দ্র করে তার চিন্তাস্রোত নতুনপথে বইতে লাগলো। রুদ্ধ জল যেমন বাঁধ ভাঙলে দুই কূল ছাপিয়ে বইতে থাকে, তেমনি তার সুপ্ত আবেগ আকাঙ্ক্ষা মনের রুদ্ধ কপাট খুলে উদ্দাম হয়ে উঠল। সে ভাবতে লাগলো সেদিনের কথা যখন সে পরমা রূপসী জীবন-সঙ্গিনী হয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াবে এবং সমস্ত গৃহকে উজ্জ্বল করে তুলবে। ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নে বিভোর হল তার মন।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন ঘনিয়ে এল। বরের বাড়ীতেই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। এজন্য কন্যাপক্ষ সুসজ্জিত যানে কনে নিয়ে যাত্রা করল শ্রাবস্তীর দিকে সাগল থেকে। যেদিন তাদের পৌঁছার কথা ছিল, সেদিন সকাল থেকে স্ত্রীগন্ধহীন কুমারের গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত করে বাজতে লাগলো সানাই নতুন রাগিণীতে। বধূবরণের সকল আয়োজন সম্পন্ন

হতে লাগলো। বর অধীর আগ্রহে চেয়ে রইল পথ পানে। তবে কি জানি কেন সানাই-এর রাগিণীতে অজানা বেদনা ভেসে এল তার প্রাণে। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সমাগমে বাড়ী গম গম করতে লাগলো। সকলে উৎকর্ণ হয়ে রইল শ্রাবস্তীর দ্বারে কন্যাপক্ষের বাদ্যধ্বনি শোনার জন্য। দূরপ্রান্তের সামান্য শব্দ ও মাঝে মাঝে তাদের ভ্রম সৃষ্টি করতে লাগল। এমন সময়ে সংবাদ এল—স্ত্রীগন্ধহীন কুমারের বাঞ্ছিতা ভাবী বধূ আকস্মিক ভাবে পথিমধ্যে প্রাণত্যাগ করেছে। এ নিদারুণ বার্তা বিবাহোৎসবকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। এক নিমিষে মুছে গেল সকল আমোদ আহ্লাদ। স্ত্রীগন্ধহীন কুমারের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সেই থেকে সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে শয্যা আশ্রয় করল। আত্মীয়-বন্ধু-জনেরা তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। তার অন্তরে হতাশার যে ঝড় বইছে, তা কি থামে সে সান্ত্বনাবাক্যে? তার দুরবস্থা দেখে মাতাপিতার মনে অনুতাপের কাঁটা বিঁধতে লাগলো। সে তো বিয়ে করতে চায়নি। অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেই তাকে বিয়ের প্রস্তাবে রাজী করা হয়েছিল। তখন কে জানত অঘটন ঘটবে। তাঁদের মনে হতে লাগলো—তাঁরাইডেকে এনেছেন এ বিপত্তি। এখন কি করে পুত্রের প্রাণরক্ষা হবে—এ চিন্তা তাঁদের অন্তর জুড়ে রইল।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে লাগলো, স্ত্রীগন্ধহীন কুমারের শোক সন্তাপের কোন উপশম দেখা গেল না। তার মাতাপিতার উৎকণ্ঠার সীমা রইল না। এই সময়ে একদিন পূর্বাহ্নে হঠাৎ উপস্থিত হলেন বুদ্ধ তাঁদের গৃহ-প্রাঙ্গণে। তাঁর আবির্ভাবে বিষণ্ণ গৃহ যেন মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সপত্নীক গৃহস্বামী যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন —গৃহপতি, তোমার পুত্র কোথায়? উত্তরে গৃহস্বামী বর্ণনা করলেন আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত পুত্র সম্বন্ধে। বুদ্ধ ডাকলেন তাকে নিজের কাছে। সে এসে প্রণাম করল তাঁকে। তিনি বললেন—বৎস, তুমি নাকি অত্যন্ত শোকার্ত এবং এজন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছ? "হাঁ ভদন্ত।"

"বৎস, তুমি এ শোকের কারণ জান কি?" স্ত্রীগন্ধহীন কুমার মস্তক নত করে নিরুত্তর রইল। বুদ্ধ বলতে লাগলেন—বৎস কামনা বা কাম্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণ তোমার মনকে অধিকার করেছে, বিচার বুদ্ধিকে লুপ্ত করেছে, তুমি আপনাকে বিকিয়ে দিয়েছ কামনার কাছে; কাম্য বস্তুর অপ্রাপ্তি তোমায় শোকগ্রস্ত করেছে, তোমার অন্তরে বেদনার উৎস খুলে দিয়েছে। দিয়েছে। তিনি আবার উপদেশ গাথায় বললেন—

"কামনা থেকে শোক উৎপন্ন হয়, ভয়ের সৃষ্টি হয়। সেই কামনার কবল থেকে যিনি মুক্ত, তাঁর শোক কিংবা ভয়ের কোন কারণ থাকে না।"

বুদ্ধের উপদেশ শুনতে শুনতে স্ত্রীগন্ধহীন কুমারের চোখ খুলে গেল। তার মন হালকা হয়ে উঠল। সে ভাবে গদগদ হয়ে বলল—ভদন্ত, আমায় চরণে স্থান দিন।

ভের

বৈশালীর লিচ্ছবিরা ছিলেন বুদ্ধ-যুগে এক শক্তিশালী জাতি। তাঁদের শৌর্য-বীর্য ও একতার আদর্শ এখনও বিস্ময় উদ্রেক করে। তাঁদের উন্নত শাসন প্রণালী ছিল বর্তমান সাধারণতন্ত্রের পূর্বাভাস। এঁরা গোড়া থেকেই ছিলেন বুদ্ধের ভক্ত। তাই বৈশালীতে বৌদ্ধ প্রভাব ছিল অসামান্য।

লিচ্ছবিদের মিলন-কেন্দ্র ছিল 'সন্থাগার'। যেখানে তাঁরা সমবেত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চালাতেন। একদিন সন্থাগারে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ কথা প্রসঙ্গে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে লাগলেন। তাঁদের আলোচনা গভীর হতে গভীরতর হয়ে চলল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বৈশালীর রণদক্ষ সেনাপতি সিংহ। তন্ময় হয়ে সে আলোচনা শুনতে শুনতে সেনাপতি ভাবতে লাগলেন—যেভাবে এঁরা বুদ্ধের মাহাত্ম্য কীর্তন করছেন, নিশ্চয়ই তিনি অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হবেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

অতঃপর সেনাপতি সিংহ নিজের গুরুর কাছে গিয়ে বললেন—ভদন্ত, আমি শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁর গুরু এ প্রস্তাব শুনে সুখী হতে পারলেন না। তিনি সেনাপতিকে নিরস্তর করবার জন্য বললেন—হে সেনাপতি, আপনি ক্রিয়াবাদী হয়ে অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে কিসের জন্য দেখা করবেন। গুরুর মন্তব্য শুনে সেনাপতি সিংহের বুদ্ধ দর্শনের উৎসাহ দমে গেল।

আর একদিন সেনাপতি সিংহ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লিচ্ছবিদের মুখে বুদ্ধের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উক্তি শুনলেন। তা শুনে আবার তাঁর মনে বুদ্ধ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগলো। তিনি গুরুর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের সংকল্প জানালেন। গুরু পূর্বে যেভাবে তাঁকে নিরস্ত করেছিলেন, এবারও ঠিক সেই ভাবে নিরস্ত করলেন। তৃতীয় বার যখন সেনাপতি বুদ্ধের গুণকীর্তন শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যাকুল হলেন, তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন—বুদ্ধ দর্শনের সংকল্পের কথা গুরুকে এবার জানাব না, তিনি তো শুধু বাধা দেবেন ; না জানলে তিনি আর

কি করবেন ? মনে মনে বিরক্ত হয়ে সেনাপতি এ বিষয় গুরুকে জানালেন না। তখন বুদ্ধ বৈশালীর মহাবনে কূটাগার-শালায় থাকতেন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে। একদিন সিংহ দিবাভাগে বহু রথ যোজনা করে সদলবলে যাত্রা করলেন বুদ্ধ দর্শনে। বৈশালীর প্রশস্ত রাজপথ মুখরিত হয়ে উঠল তাঁদের সারি সারি রথে। রাজপথের দু-ধারে কৌতুহলী জনতার নিঃশব্দ দৃষ্টি পড়ল তাদের ওপর। ক্রমে রথ সমূহ নগরের সীমানা ছাড়িয়ে এসে পড়ল প্রান্তর পথে। যে পর্যন্ত রথ চলাচলের পথ ছিল, ততদূর এসে তাঁরা রথ থেকে অবরোহন করে পায়ে হেঁটে চললেন মহাবনের দিকে। বৃক্ষলতা ঘেরা ছায়াচ্ছন্ন মহাবন স্থির মধ্যাহ্নে অনন্ত মৌনতার মধ্যে যেন তপোমগ্ন। মাঝে মাঝে পাখীর ডাক যেন বৃক্ষলতার মর্মর ধ্বনির সঙ্গে এক হয়ে তার নিবিড়তাকে আরও বাড়িয়ে দিতেছিল। সেনাপতি সিংহের কর্মমুখর জীবনের উদ্দাম চঞ্চলতার মধ্যে যেন শান্তির স্পর্শ নেমে এল এ পবিত্র পরিবেশে। তিনি তন্ময় হয়ে, সদলবলে মহাবনে প্রবেশ করলেন।

বুদ্ধকে দেখেই সিংহ মুগ্ধ হয়ে প্রণাম করলেন। তাঁর শান্ত সমাহিত মুখের পানে বার বার তাকিয়ে তাঁকে অক্রিয়াবাদী বলে সিংহের মন মানতে চাইল না। তাই তিনি প্রথমেই বললেন—ভদন্ত, আমি শুনেছি আপনি নাকি অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার কথাই প্রচার করেন এবং তাতে শিষ্যবৃন্দকে শিক্ষাদান করেন, একথা কি সত্যি না লোকে আপনার মিথ্যাপবাদ করে ; ভদন্ত, আমরা আপনার নিন্দা করতে চাই না, শোনা কথাটাই বললাম।

বুদ্ধ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর তিনি বলতে লাগলেন। হে সিংহ, আমাকে অক্রিয়াবাদী বলবার কারণ আছে, ক্রিয়াবাদী বলবার কারণ আছে, উচ্ছেদবাদী বলবার কারণ আছে, ঘৃণী বলবার কারণ আছে, বিনাশক বলবার কারণ আছে, তপস্বী বলবার কারণ আছে, অপগর্ভ বলবার কারণ আছে, আশ্বাসদাতা বলবার কারণও আছে। আমাকে অক্রিয়াবাদী বলবার যথাযথ কারণ এই—আমি কায়িক কুকর্ম না করার উপদেশ দিই, বাচনিক কুকর্ম না করার জন্য উপদেশ দিই, মানসিক দুক্রিয়া হতে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিই, আরও অনেক রকম পাপ করতে বারণ করি। আমাকে ক্রিয়াবাদী বলবার যথাযথ কারণ এই—আমি কায়িক সুকর্ম করবার জন্য উপদেশ দিই, বাচনিক সুকর্ম করবার জন্য উপদেশ দিই, মানসিক সুকর্ম করবার জন্য উপদেশ দিই, আরও অনেক রকম পুণ্য সম্পাদন করতে বলি। আমাকে উচ্ছেদবাদী বলবার যথাযথ কারণ এই—আমি রাগের মূলোচ্ছেদ করতে বলি, দ্বেষের মূলোচ্ছেদ করতে বলি, মোহের মূলোচ্ছেদ করতে বলি এবং আরও নানাপ্রকার

পাপের মূলোচ্ছেদ করতে বলি। আমাকে ঘৃণীবলবার যথাযথ কারণ এই—আমি ঘৃণা করি কায়িক দুশ্চরিত্রতা, বাচনিক দুশ্চরিত্রতাকে, মানসিক দুশ্চরিত্রতাকে, পাপানুষ্ঠানকে। আমাকে বিনাশক বলবার যথাযথ কারণ এই—আমি রাগ, দ্বেষ, মোহ বিনাশের জন্য ধর্ম দেশনা করি এবং সকল রকম পাপ বিনাশের জন্য উপদেশ দিই। আমাকে তপস্বী বলবার যথাযথ কারণ এই—কায়িক দুশ্চরিত্রতা, বাচনিক দুশ্চরিত্রতা ও মানসিক দুশ্চরিত্রতাকে আমি তপনীয় অশোভন পাপ ধর্ম বলে থাকি যাঁর এ সমস্ত অশোভন পাপধর্ম ছিন্নমূল বিনষ্ট পরিত্যক্ত উৎপত্তিহীন, তাঁকেই আমি তপস্বী বলি; হে সিংহ, সমস্ত অশোভন পাপধর্ম তথাগতের পরিত্যক্ত সমূলে বিনষ্ট নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত। আমাকে অপগর্ভ বলবার কারণ এই—যাঁর ভবিষ্যতে গর্ভবাস নেই, পুর্ণজন্ম পরিত্যক্ত সমূলে বিনষ্ট, তাঁকে আমি অপগর্ভ বলি। হে সিংহ তথাগতের আর গর্ভবাস নেই, পুর্ণজন্ম পরিত্যক্ত সমূলে বিনষ্ট। আমাকে আশ্বাসদাতা বলবার কারণ এই—আমি পরম আশ্বাস দান করি, সেই পরম আশ্বাস লাভের জন্য উপদেশ দিই।

সেনাপতি সিংহ বুদ্ধের কথা শুনে মুগ্ধ হলেন এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—কি সুন্দর কথা! কি সুন্দর ভাব! আপনি আমাকে অন্ধকারে আলো দেখালেন, পথের সন্ধান দিলেন, আমি আপনার শরণগত হলাম, আপনার প্রবর্তিত ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ নিলাম। আমাকে আজ থেকে আপনার শরণাগত উপাসক রূপে গ্রহণ করুন। বুদ্ধ বললেন—হে সিংহ, বিচার বিবেচনাপুর্বক করণীয় সম্পাদন করবেন অর্থাৎ অন্ধ বিশ্বাসে নয়, আপনাদের মত দেশবিশ্রুত ব্যক্তিদের পক্ষে এটিই শ্রেয়। একথায় সিংহ আরও অভিভূত হলেন এবং স্বতস্ফুর্ত আবেগে উচ্চারণ করলেন—ভদন্ত, আপনার এ নির্দেশে আমি মুগ্ধ হলাম। অন্য মতাবলম্বীরা আমাকে উপাসক পেলে সমগ্র বৈশালীতে পতাকা উত্তোলন করে বলবেন 'সিংহ আমাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে'। অথচ আপনি নির্দেশ দিচ্ছেন বিচার বিবেচনাপুর্বক করণীয় সম্পাদনের জন্য, এজন্য আমি আবার আপনার শরণাগত হলাম এবং আপনার প্রবর্তিত ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ নিলাম, আমাকে আজ থেকে চিরদিনের জন্য আপনার উপাসক রূপে গ্রহণ করুন।

বুদ্ধ বললেন—হে সিংহ, আপনার বাসভবন দীর্ঘকাল আপনার গুরুর ধর্মাশ্রিত সন্ন্যাসীদের মিলন কেন্দ্র, তাঁরা যখন আপনার কাছে উপস্থিত হবেন, তখন তাঁদের দানে বঞ্চিত করবেন না। সিংহ একথা শোনা মাত্রই উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলেন—বাঃ! বাঃ! আপনি আমার ভুল ভাঙলেন। আমি শুনেছিলাম

আপনি না কি বলেন "আমাকে দান দেয়া উচিত, আমার শিষ্যদের দান দেয়া উচিত, অন্য কাউকে নয়, আমাকে বা আমার শিষ্যদের দান দিলেই দানের মহৎ ফল লাভ হয়।" অথচ আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন অন্য ধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসীদের সেবা করতে দান দিতে, এতে আমি অত্যন্ত খুশী হলাম, আমি তৃতীয়বার আপনার শরণগত হলাম।

সেনাপতি সিংহকে অত্যন্ত অভিভূত তদ্গতচিত্ত দেখে বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁর উপদেশ শুনতে শুনতে সিংহ যখন মগ্ন হলেন, ভাবে ভক্তিতে হৃদয় যখন কানায় কানায় ভরল, তখন তিনি শোনালেন সিংহকে তার আর্য-সত্যের গভীর তত্ত্ব। তার অপূর্ব বর্ণনা সিংহের প্রাণ মন মথিত করে উদার পবিত্র ভাবলোক সৃষ্টি করল। সেই তন্ময়তার মধ্যে তাঁর চোখের আবরণ খসে পড়ল। দৃষ্টি সম্পূর্ণ বদলে গেল। তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্ট হল—যা জাত উৎপন্ন, তার তার ধ্বংস অনিবার্য, কিছুই স্থির নয়, সমস্তই ভঙ্গুর পরিবর্তনশীল। এই উপলব্ধিতে তাঁর সকল সংশয়ের নিরসন হল, ধর্মের গভীরে মন ডুবল।

চৌদ্দ

এক সময় বুদ্ধ কুরুরাজ্যে কর্মাসধর্ম নামক নিগমে জনৈক ভরদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের অগ্নিকুটিরে বাস করছিলেন। একদিন পূর্বাহ্নে সে নিগমে তিনি ভিক্ষা সংগ্রহ করে আহারের পর আসন্ন বনভূমিতে দিবাবিহারের জন্য গেলেন। সেখানে তিনি একটি গাছের ছায়ায় বসে রইলেন। তখন পরিব্রাজক মাগন্দিয় পায়চারি করতে করতে সে ভরদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের অগ্নিকুটিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে পরিব্রাজক মাগন্দিয় তৃণশয্যা দেখে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন—কার জন্য এ তৃণশয্যা পাতা হয়েছে—এ যে সন্ন্যাসীর উপযুক্ত শয্যা? ব্রাহ্মণ উত্তর করলেন—বন্ধু মাগন্দিয়, শাক্যবংশের সন্তান শ্রমণ গৌতম এসেছেন যিনি ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ বিদ্যাচারসম্পন্ন সুগত লোকবিদ অনুত্তর লোকগুরু বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরই এ শয্যা। মাগন্দিয় উত্তর শুনে বলে উঠলেন—হে ভরদ্বাজ, আজ দুর্দশকে দেখলাম, আমরা যে সে-ই ভ্রূণহা ভবৎ গৌতমের শয্যা দেখতে গেলাম। ভরদ্বাজ বল্লেন—হে মাগন্দিয়, এ বাক্য রাখো, এ বাক্য রাখো, সে শ্রমণ গৌতমের প্রতি বহু ক্ষত্রিয় পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গৃহপতি পণ্ডিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। মাগন্দিয় অবিচলিত কণ্ঠে বললেন—হে ভরদ্বাজ, সামনেও যদি ভবৎ গৌতমকে দেখতে

পাই, তখনো বলবো 'ভ্রূণহা শ্রমণ গৌতম', তার কারণ এ আমাদের শাস্ত্রের উক্তি।

হে মাগন্দিয়, একথা কি আমি তাঁকে জানাতে পারি?' জিজ্ঞেস করলেন ভরদ্বাজ।

'হাঁ, তুমি স্বচ্ছন্দে তা জানাতে পারো তাঁকে' বললেন মাগন্দিয়।

ভরদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজক মাগন্দিয়ের কথোপকথন দিব্য কর্ণে শুনলেন বুদ্ধ। বৃক্ষতলে মগ্নভাবে দিবাবিহারের পর ভরদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণের অগ্নিকুটিরে ফিরে গেলেন তিনি। ভরদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সম্ভাষণের পর একান্তে বসলেন। তখন বুদ্ধ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—হে ভরদ্বাজ, এ তৃণশয্যা নিয়ে পরিব্রাজক মাগন্দিয়ের সঙ্গে তোমার কোন কথাবার্তা হয়েছিল কি? এ প্রশ্ন শুনে স্তম্ভিত হলেন ভরদ্বাজগোত্র ব্রাহ্মণ। বল্লেন তিনি—একথাই আপনাকে জানাতে চেয়েছিলাম, অথচ আমার বলবার আগে আপনিই বলে ফেল্লেন। ঠিক এ সময়ে পরিব্রাজক মাগন্দিয় ও এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। তিনি বুদ্ধের সঙ্গে সম্ভাষণের পর একান্তে আসন গ্রহণ করলেন। বুদ্ধ তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—হে মাগন্দিয়, চক্ষু রূপমগ্ন, রূপারাম, রূপরত রূপামোদিত সে চক্ষু তথাগতের দান্ত রক্ষিত সংযত এবং তিনি চক্ষু সংযমের জন্য ধর্ম প্রচার করেন, একন্যই কি তুমি 'ভ্রূণহা শ্রমণ গৌতম' বলে বলেছিলে? পরিব্রাজক মাগন্দিয় উত্তর করলেন—হাঁ একন্যই একথাটি বলেছিলাম, এ আমাদের শাস্ত্রের উক্তি। বুদ্ধ আবার বললেন—হে মাগন্দিয়, কর্ণাদি অন্যান্য ইন্দিয় ও স্ব-স্ব বিষয় মগ্ন, স্ব-স্ব বিষয় রত স্ব-স্ব বিষয়ামোদিত, এ ইন্দ্রিয়গুলো তথাগতের দান্ত রক্ষিত সংযত এবং তিনি ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য ধর্ম প্রচার করেন, একন্যই কি তুমি 'ভ্রূণহা শ্রমণ গৌতম' বলে বলেছিলে? পরিব্রাজক মাগন্দিয় উত্তর করলেন—হাঁ, একন্যই আমাদের শাস্ত্রের উক্তি অনুসারে এ কথাটি বলেছিলাম।

বুদ্ধ বললেন—হে মাগন্দিয়, ধরো, কোন ব্যক্তি অভীপ্সিত কমনীয় মনোজ্ঞ লোভনীয় রূপ-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের সম্ভোগে মগ্ন হয় এবং পরবর্তীকালে এ রূপ-শব্দাদির উদয় বিলয় আস্বাদ দোষ ইত্যাদি যথাযথ ভাবে জেনে এগুলোর প্রতি আসক্তি ও দাহজ্বালা বিনোদন করে বীততৃষ্ণ শান্তচিত্ত হয়ে বাস করে, তখন একে কি বলা উচিত? পরিব্রাজক মাগন্দিয় উত্তর করলেন—ভবং গৌতম, কিছুই না। বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে মাগন্দিয়, আমি পূর্বে গার্হস্থ্য জীবনে অভীপ্সিত কমনীয় মনোজ্ঞ লোভনীয় রূপ-শব্দাদি

পঞ্চকামের সম্ভোগে মগ্ন ছিলাম। তখন ছিল আমার তিনটি প্রাসাদ—একটি বর্ষাকালের জন্য একটি হেমন্তকালের জন্য এবং অপরটি গ্রীষ্মযাপনের জন্য। যখন যে প্রাসাদে থাকতাম, তখন অন্তঃপুরিকাদের নৃত্য-গীত-বাদ্যে সে প্রাসাদে আমোদ-প্রমোদের ঢেউ বইত। পরে যখন আমি যথাযথভাবে দেখলাম কাম্য বস্তুর উদয় বিলয় দোষাদি, তখন কামাসক্তি বর্জন করে কামদাহ বিনোদন করে বীততৃষ্ণ শান্তচিত্ত হয়ে বাস করতে সুরু করলাম। আমি যখন কামাসক্ত কাম-তৃষ্ণা-পীড়িত কামদাহ দগ্ধ ব্যক্তিদের কাম সম্ভোগে রত হতে দেখি, আমি অস্বস্তি বোধ করি, কারণ কামনার অতীত কুপ্রবৃত্তির অতীত যে আনন্দনুভূতি হয়, তার কাছে স্বর্গীয় সুখ ও তুচ্ছ। সে আনন্দে মগ্ন হলে হীন কামসুখের প্রতি স্বতঃই ঘৃণা জাগে।

হে মাগন্দিয়, ধরো, কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তি ব্রণময় গাত্রের অসংখ্য পক্ব ব্রণের চুলকানি সহ্য করতে না পেরে নখ দিয়ে চুলকাতে চুলকাতে তপ্ত অঙ্গার পাত্রে দেহ তপ্ত করতে থাকে। সে যখন জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় উপযুক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসায় ব্যাধিমুক্ত হয় আরোগ্য লাভ করে, তখন অন্য কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্তকে তপ্ত অঙ্গার পাত্রে দেহ তপ্ত করতে দেখে তারও কি ইচ্ছা হয় তপ্ত অঙ্গার পাত্রে তেমনি দেহ তপ্ত করবার জন্য অথবা ভৈষজ্য সেবনের জন্য? পরিব্রাজক মাগন্দিয় উত্তর করলেন—ভবৎ গোতম, না, কারণ রোগ থাকলে ভৈষজ্যের দরকার হয়. রোগমুক্ত হলে ভৈষজ্যের দরকার কি? বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে মাগন্দিয়, ঠিক তেমনি আমি পূর্বে গার্হস্থ্য-জীবনে কামপরিচর্যায় মগ্ন ছিলাম। সে কামের দোষ ইত্যাদি যথাযথ ভাবে জেনে কামাসক্তি বর্জন করে কামদাহ বিনোদন করে বীততৃষ্ণ শান্তচিত্ত হয়ে এখন বাস করছি। আমি যখন কামাসক্ত, কামতৃষ্ণা পীড়িত কামদাহদগ্ধ ব্যক্তিদের কামসম্ভোগে রত হতে দেখি, আমি অস্বস্তি বোধ করি, কারণ কামনার অতীত কুপ্রবৃত্তির অতীত যে আনন্দানুভূতি আছে, তার কাছে স্বর্গীয় সুখও তুচ্ছ। সে আনন্দে মগ্ন হয়ে হীন কাম-সুখের কথা ভাবতেও শিউরে উঠি।

হে মাগন্দিয়, ধরো, কুষ্ঠ-ব্যাধিমুক্ত ব্যক্তিকে বলশালী পুরুষেরা দুই বাহু ধরে তপ্ত অঙ্গার রাশির দিকে টেনে নিয়ে যায় পূর্বের মত তাপ গ্রহণের জন্য; তখন কি সে স্বেচ্ছায় অঙ্গার রাশির দিকে যাবে না কি ছাড়া পাবার জন্য চেষ্টা করবে? পরিব্রাজক বল্লেন—ভবৎ গোতম, সে ছাড়া পাবার জন্যই চেষ্টা করবে, দুঃখকর জ্বালাময় আগুনের কাছে যেতে চাইবে কেন?

বুদ্ধ—হে মাগন্দিয়, আগুন কি শুধু এখনি দুঃখকর জ্বালাময়, না পূর্বেও ছিল ?

পরিব্রাজক—ভবৎ গৌতম, শুধু এখন নয়, পূর্বেও আগুন এরকম দুঃখকর জ্বালাময় ছিল, কিন্তু তখন কুষ্ঠ ব্যাধির বীজাণুর আক্রমণে অসংখ্য পক্ক ব্রণের অসহ্য চুলকানিতে আগুণের দুঃখকর তাপও সে ব্যক্তির কাছে আরামদায়ক বলে বিভ্রান্তি হত।

বুদ্ধ—হে মাগন্দিয়, ঠিক তেমনি কামসম্ভোগ অতীতেও দুঃখকর ও জ্বালাময় যন্ত্রণাদায়ক ছিল, ভবিষ্যতেও কামসম্ভোগ দুঃখকর জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক থাকবে, এখনো তাই, কিন্তু কামাসক্ত কামতৃষ্ণাপীড়িত, কামদাহ দগ্ধ ব্যক্তিদের এ কামসম্ভোগ সুখ বলে ভুল ধারণা জন্মে। হে মাগন্দিয়, কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন ব্রণময় গাত্রের কণ্ডুয়মান পক্ক ব্রণগুলোকে আগুনের উত্তাপ দিয়ে সামান্য আরাম অনুভব করে এবং ব্রণগুলোকে পুঁজ রক্তে অশুচিতর করে তোলে, ঠিক তেমনি কামাসক্ত কামতৃষ্ণাপীড়িত কামদাহ দগ্ধ ব্যক্তি কামসম্ভোগে রত হয়ে সামান্য সুখ পায় বটে, কিন্তু অন্তরের কামতৃষ্ণাকে আরও বাড়িয়ে তোলে দাহজ্বালাকে দ্বিগুণতর করে। • হে মাগন্দিয়, তুমি কি কখনো দেখেছ কোন রাজা কিংবা রাজমন্ত্রীকে ইন্দ্রিয় পরিচর্যায় রত হয়ে ইন্দ্রিয় সুখে আকণ্ঠ মগ্ন থেকে কাম পিপাসা পরিত্যাগ না করে কামদাহ বিনোদন না করে বীততৃষ্ণ শান্তচিত্ত হয়ে বাস করতে ?

পরিব্রাজক—ভবৎ গৌতম, না, কখনো দেখিনি।

বুদ্ধ—হে মাগন্দিয়, আমিও দেখিনি কোন রাজা কিংবা রাজমন্ত্রীকে ইন্দ্রিয় পরিচর্যায় রত হয়ে ইন্দ্রিয় সুখে আকণ্ঠ মগ্ন থেকে কামপিপাসা পরিত্যাগ না করে কামদাহ বিনোদন না করে বীততৃষ্ণ শান্তচিত্ত হতে। যে কোন শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ অতীতে বীততৃষ্ণ শান্তচিত্ত হয়ে বাস করেছিলেন কিংবা এখন বাস করছেন অথবা ভবিষ্যতে বাস করবেন, তাঁরা সকলেই কামের উদয় বিলয় দোষ ইত্যাদি যথাযথ ভাবে জেনে কামাসক্তি বর্জন করে কামদাহ বিনোদন করে বীততৃষ্ণ শান্তচিত্ত হয়েছিলেন হয়েছেন অথবা হবেন।

একথা বলতে বলতে বুদ্ধ মগ্নভাবে প্রীতিগাথা উচ্চারণ করলেন—

আরোগ্যপরমা লাভা নিব্বাণং পরমং সুখং
অট্‌ঠঙ্গিকো চ মগ গানং খেমং অমতগামিনং।

অর্থাৎ আরোগ্য পরম লাভ ; নির্বাণ পরম সুখ ; অষ্টাঙ্গ সমন্বিত আর্যমার্গই অমৃতাকাঙ্ক্ষীদের নিরাপদ পথ। এ প্রীতিগাথা শুনে পরিব্রাজক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—অতি আশ্চর্য। 'আরোগ্য পরম লাভ, নির্বাণ পরম সুখ'

কথা দুইটি অতি সুন্দর, আমাদের আচার্য প্রাচার্যদের মুখে একথা শুনেছি। আপনার বচন আমাদের শাস্ত্রোক্তির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন —হে মাগন্দিয়, তোমার আচার্য প্রাচার্যদের মুখে তুমি কোন আরোগ্য কোন নির্বাণের কথা শুনেছ? তখন পরিব্রাজক মাগন্দিয় নিজের গাত্র মার্জন করতে করতে বল্লেন—ভবৎ গৌতম, এ-ই আরোগ্য, এ-ই নির্বাণ, আমি এখন নীরোগ সুখী, আমার কোন অসুখ নেই। বুদ্ধ বল্লেন—হে মাগন্দিয়, জন্মান্ধ ব্যক্তি দেখতে পায় না সাদা, কালো, পীত, নীল ইত্যাদি, দেখতে পায় না, উঁচু, নীচু, দেখতে পায় না, চন্দ্র, তারা, সূর্যকে, সে লোক মুখে শুনে পরতে চায় অমলিন শুভ্র সুন্দর বস্ত্র, যদি কেউ তেলের ময়লাযুক্ত অশুচি বস্ত্র তার হাতে তুলে দিয়ে বলে এই নাও অমলিন শুভ্র সুন্দর বস্ত্র, সে সেখানি নিয়ে পরিধান করে আনন্দ প্রকাশ করে; হে মাগন্দিয় তাহলে সে জন্মান্ধ ব্যক্তির শুভ্র বস্ত্র পরিধানের আনন্দ প্রকাশ কি জেনে দেখে না পরের কথায় বিশ্বাস করে? পরিব্রাজক উত্তর করলেন—ভবৎ গৌতম, না দেখে না জেনেই সে অন্ধ ব্যক্তি আনন্দ প্রকাশ করেছে শুধু পরের কথায় বিশ্বাস করে।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে মাগন্দিয়, ঠিক তেমনি বহু পরিব্রাজক সন্ন্যাসী না দেখে না জেনে 'আরোগ্য পরম লাভ, নির্বাণ পরম সুখ' বলে থাকেন। এ তো সম্যক জ্ঞানীদের মহামন্ত্র, এখন সাধারণ মানুষের উক্তিতে দাঁড়িয়েছে। হে মাগন্দিয়, এ শরীর রোগ-ভাণ্ড ব্রণ বিশেষ দুঃখ-যন্ত্রণার আধার, তুমি সে শরীর নিয়েই বলছো 'এ-ই আরোগ্য, এই নির্বাণ, আমি নীরোগ সুখী, আমার কোন অসুখ নেই।' কারণ, তোমার সে দৃষ্টি নেই যাতে আরোগ্য জানবে নির্বাণ দেখবে। পরিব্রাজক ভাবে গদ্‌গদ হয়ে বল্লেন—আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধার উদয় হয়েছে, আপনি আমাকে উপদেশ দিন যাতে আমি আরোগ্য জানতে পারি, নির্বাণ দেখতে পারি। এ কথা বলে তিনি বুদ্ধকে বার বার একই ভাবে অনুরোধ করলেন।

পরিব্রাজকের ঐকান্তিকতা দেখে বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে মাগন্দিয়, তুমি সর্বদা সৎসঙ্গে থাকবে। তুমি যতই সৎসঙ্গ করবে, ততই সদুপদেশ শুনতে পাবে। যতই সদুপদেশ শুনবে, ততই তোমার মন নত হবে সদাচরণে দিকে অর্থাৎ সৎপথে থাকতে চাইবে। সৎপথ অবলম্বনে তুমি নিজেই দেখবে নিজেই জানবে "এ-ই রোগ এ-ই ব্রণ এ-ই দুঃখযন্ত্রনা এখানে এ সমস্ত নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয়। আসক্তি নিরোধে জন্মের বীজ নষ্ট হবে, জন্মের বীজ নষ্ট হলে জন্ম নিরুদ্ধ হবে। জন্ম-নিরোধ বা পুন-জন্ম না থাকায় জরামৃত্যু শোকবিলাপ

দুঃখ-ক্ষোভ-জ্বালা সমস্তই নিরুদ্ধ হবে, এভাবে সমগ্র দুঃখরাশির ক্ষয় হবে।" পরিব্রাজক তদ্‌গত চিত্তে বুদ্ধের উপদেশ শুনতে শুনতে ভাবাবেগে বলে উঠলেন— আপনি আমাকে পথের সন্ধান দিলেন, অন্ধকারে আলো দেখালেন, আমি আজ থেকে আপনার শরণগত হলাম, আমাকে দীক্ষা দিন, ভিক্ষু করে নিন। বুদ্ধ শান্ত কণ্ঠে বল্লেন—হে মাগন্দিয়, তোমার সংকল্প শুভ, তবে সঙ্ঘের একটি নিয়ম আছে—যারা ভিন্নমতের সন্ন্যাসী, ভিক্ষুত্ব গ্রহণের পূর্বে তাদের চারিমাস ব্রত যাপন করতে হয় এবং তাতে ভিক্ষুরা সন্তুষ্ট হলে ভিক্ষুত্বে বরণ করে।

পরিব্রাজক মাগন্দিয় আগ্রহ সহকারে সে ব্রত গ্রহণ করলেন এবং পরে ভিক্ষু হলেন। ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি অধ্যাত্ম-সাধনায় নিমগ্ন হয়ে অচিরেই সিদ্ধিলাভ করে অর্হৎ হলেন।

পনের

এক সময় বুদ্ধ চাতুমার আমলকী বনে বাস করছিলেন। তখন তাঁর দর্শন লাভের জন্য শারিপুত্র মৌদগল্যায়ন প্রমুখ পাঁচ'শ ভিক্ষু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সে ভিক্ষুগণের নতুন জায়গা নতুন পরিবেশ খুবই ভাল লাগলো। তাঁরা তথাকার অধিবাসী ভিক্ষুদের সঙ্গে উৎসাহে আনন্দে আলাপ পরিচয় করতে লাগলেন। তাঁদের আবেগোচ্চারিত কণ্ঠস্বর চারিদিক মুখরিত করে তুল্ল। আমলকীবনের ধ্যান-গম্ভীর পরিবেশ এক নিমেষে যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল। বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন—হে আনন্দ, জেলেদের মাছ ধরার হৈ হৈ-রৈ-রৈ শব্দের মত এত গোলমাল শোনা যাচ্ছে কেন? আনন্দ বিনীতভাবে বল্লেন—ভদন্ত, আপনার দর্শন লাভের জন্য শারিপুত্র মৌদগল্যায়ন-প্রমুখ পাঁচ'শ ভিক্ষু এখানে এসেছেন, তাঁরা অধিবাসী ভিক্ষুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করছেন এবং নিজেদের বিছানাপত্র গুছিয়ে রাখছেন; তাঁদের-ই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বুদ্ধ আদেশ দিলেন—আনন্দ, যাও তাদের ডেকে নিয়ে এসো আমার কাছে। হাঁ, ভদন্ত বলে আনন্দ গেলেন সে ভিক্ষুদের কাছে এবং তাঁদের জানালেন বুদ্ধের নির্দেশ। তাঁরা তখনি বুদ্ধেই সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে একান্তে বসলেন। বুদ্ধ তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা এত গোলমাল করছিলে কেন? তাঁদের একজন বিনম্রভাবে উত্তর করলেন—ভদন্ত, আপনার দর্শন লাভের জন্য শারিপুত্র মৌদগল্যায়ন-প্রমুখ আমরা এখানে এসেছি; অধিবাসী ভিক্ষুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে বিছানাপত্র গুছিয়ে নিতে আমাদের কথাবার্তার শব্দে গণ্ডগোল হয়েছে।

বুদ্ধ বললেন—হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের বহিষ্কার করছি, তোমাদের এখানে থাকা উচিত নয়। 'হাঁ ভদন্ত', বলে তাঁরা আসন ত্যাগ করে তাঁকে প্রণাম-প্রদক্ষিণ করে তখনি আমলকীবন ত্যাগ করে চললেন।

সে ভিক্ষুরা যে পথ ধরে ফিরে যাচ্ছিলেন, সে পথের অদূরে ছিল চাতুমার অধিবাসী শাক্যদের মন্ত্রনাগৃহ। তখন সেখানে চলছিল অধিবেশন। তথাকার সদস্যগণ বহু সংখ্যক ভিক্ষুকে একত্রে যেতে দেখে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—ভদন্তগণ, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? ভিক্ষুরা উত্তর করলেন—বন্ধুগণ, ভগবান আমাদের বহিষ্কৃত করেছেন, আমরা ফিরে যাচ্ছি। শাক্য সদস্যগণ বললেন—আপনারা এখানে একটু বসুন, হয়ত আমরা ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারব। 'হাঁ বন্ধুগণ' বলে ভিক্ষুরা সেখানে বসে রইলেন। শাক্য সদস্যগণ চলে গেলেন বুদ্ধের কাছে এবং তাঁকে প্রণাম করে বল্লেন—প্রভু, প্রসন্ন হোন, পূর্বে যেমন ভিক্ষুদের অনুগ্রহ করতেন, তেমনি এখনো ভিক্ষুদের অনুগ্রহ করুন। এ ভিক্ষুগণের অনেকেই অচির-দীক্ষিত নবাগত আপনার ধর্মশাসনে; আপনার দর্শন লাভে বঞ্চিত হয়ে এঁদের অন্যথা হতে পারে, অবনতি ঘটতে পারে; অতএব আপনি এঁদের প্রতি প্রসন্ন হোন, এঁদের অনুগ্রহ করুন।

বুদ্ধ প্রসন্ন হলেন, সে ভিক্ষুগণ ফিরে এলেন আমলকীবনে। তাঁরা যখন তাঁকে প্রণাম করে তাঁর সমীপে বসলেন, তখন শারীপুত্রকে সম্বোধন করে বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন—হে শারীপুত্র, ভিক্ষুসঙ্ঘকে যখন আমি বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন তোমার কি মনে হয়েছিল? শারীপুত্র উত্তর করলেন—ভদন্ত, তখন আমার মনে হয়েছিল "ভগবান এখন জনসঙ্গ পরিহার করে উদাসীন ভাবে চলতে চান, আমরাও তেমনি উদাসীনভাবে জনসঙ্গ পরিহার করে চলব।" বুদ্ধ বল্লেন—হে শারীপুত্র, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। এখন নয়। তিনি মৌদগল্যায়নকে জিজ্ঞেস করলেন—হে মৌদগল্যায়ন, তখন তোমার কি মনে হয়েছিল? উত্তরে মৌদগল্যায়ন বল্লেন—ভদন্ত, আমি ভেবেছিলাম "ভগবান এখন জনসঙ্গ পরিহার করে উদাসীনভাবে চলতে চান, এখন আয়ুষ্মান শারীপুত্র এবং আমি ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিচালনা করব।" বুদ্ধ তা অনুমোদন করে বল্লেন—সাধু! সাধু! ভিক্ষুসঙ্ঘের পরিচালনায় আমি অথবা তোমরা দুইজন।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে ভিক্ষুগণ, জলে অবতরণ করলে চারি রকমের ভয় হতে পারে—যথা, ঢেউয়ের ভয়, কুমীরের ভয়, ঘূর্ণিজলের ভয় এবং শুশুকের ভয়। তেমনি এ ধর্মশাসনে প্রব্রজিত কোন কোন ব্যক্তির চারি

রকমের ভয় আছে—যথা, ঢেউ-এর ভয়, কুমীরের ভয়, ঘূর্ণিজলের ভয় এবং শুশুকের ভয়। হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্য নিয়ে এ ধর্মশাসনে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে। যখন তাকে সহচর ভিক্ষুগণ উপদেশ দেয় অনুশাসন করে 'বন্ধু, এভাবে তাকাবে, এভাবে চলবে, এভাবে চীবর পরিধান করবে, এভাবে পাত্র হাতে নেবে।' তখন সে উপদেশ নির্দেশে বিরক্ত হয়ে ভাবে 'পূর্বে গার্হস্থ্য জীবনে আমরা অন্যকে হুকুম দিতাম, অনুশাসন করতাম, এখন আমাদের ছেলের বয়সী, নাতীর বয়সী এ লোকগুলো আমাদের নিরন্তর নির্দেশ দিতে সাহস করে।' সে তিক্ত বিরক্ত হয়ে সন্ন্যাস ছেড়ে গৃহিজীবনে ফিরে যায়। একে বলা চলে ঢেউ-এর ভয়ে সন্ন্যাসত্যাগী। হে ভিক্ষুগণ, ঢেউ-এর ভয় ক্রোধ ক্ষোভেরই নাম স্তর।

হে ভিক্ষুগণ, কোন কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধা বৈরাগ্য নিয়ে এ ধর্মশাসনে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে। যখন তাকে সহচর ভিক্ষুগণ নিয়ম প্রণালী জানিয়ে দিয়ে বলে 'বন্ধু, এ খাওয়া উচিত, এটি খাওয়া উচিত নয়, এ পান করা উচিত, এটি পান করা উচিত নয়, ভিক্ষুর উপযোগী খাদ্য পানীয় গ্রহণ করা উচিত অনুপযোগী খাদ্য পানীয় গ্রহণ করা উচিত নয়, যথা সময়ে খাওয়া উচিত, বিকালে খেতে নেই, তখন সে ভাবে 'পূর্বে গৃহিজীবনে আমরা যা খুশী খেতাম, যা খুশী পান করতাম, উপযোগী-অনুপযোগী অত সব বিচার করতাম না, কালে বিকালে ইচ্ছামত খেতাম, শ্রদ্ধাবান গৃহীরা বিকালে যে সব উপাদেয় খাদ্য ভোজ্য আমাদের দান করেন, তাও আমাদের খেতে দেওয়া হয় না।' খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে এত বিধিনিষেধ অসহ্য হওয়ায় সে আবার গৃহিজীবন অবলম্বন করে। একে বলা চলে কুমীরের ভয়ে সন্ন্যাসত্যাগী। হে ভিক্ষুগণ, কুমীরের ভয় উদরপরায়ণতার নামান্তর।

হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কোন কোন ব্যক্তি ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেও মনের দুর্বলতা পরিহার করতে পারে না। সে দুর্বল চিত্ত নিয়ে অসংযতেন্দ্রিয় হয়ে গ্রাম নগরে ভিক্ষা সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখতে পায় গৃহপতি কিংবা গৃহপতিপুত্রকে ইন্দ্রিয়সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হতে, তখন সে ভাবে 'আমরাও তো পূর্বে ইন্দ্রিয় সম্ভোগে রত ছিলাম, আমাদের ঘরেও রয়েছে যথেষ্ট ভোগসম্পদ, ভোগ করেও সো পুণ্য সঞ্চয় করা যায়।' অতঃপর সে সন্ন্যাস ত্যাগ করে গার্হস্থ্য অবলম্বন করে। একে বলা হয় ঘূর্ণিজলের ভয়ে সন্ন্যাস-ত্যাগী। ঘূর্ণিজলের ভয় সম্ভোগ-বাসনারই নামান্তর।

হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে কোন কোন

ব্যক্তি সংযম শিক্ষা করে না। সে অসংযত কায়বাক্ মনে গ্রামে নগরে ভিক্ষা সংগ্রহ করতে যায়। সেখানে অর্ধনগ্না অর্ধানাবৃতা অসংবৃতা নারী দেখে তার অন্তর কামনাদগ্ধ হয়। সেজন্য সে সন্ন্যাস ছেড়ে গৃহী হয়ে যায়। একে বলা চলে শুশুকের ভয়ে সন্ন্যাসত্যাগী। অসংবৃতা নারীই শুশুকভয়। এ ধর্মশাসনে প্রব্রজিত কোন কোন ব্যক্তির এ চারি রকম ভয় আছে।

বুদ্ধ বলে গেলেন এ কথাগুলো সে ভিক্ষুদের। তাঁরা পুলকিত মনে গ্রহণ করলেন এ ভাষণ।

ষোল

রাজগৃহ নগরের উপকণ্ঠে ছিল মহাভিষক জীবকের কাননঘেরা সুরম্য প্রাসাদ। তাকে বলা হত জীবকাম্রবন। বস্তুতঃ সারি সারি আম গাছ শাখা পল্লব মেলে বিস্তীর্ণ জায়গাটিকে একটি ছায়াচ্ছন্ন বন করে তুলেছিল। স্থানটি ছিল অত্যন্ত নির্জন। জীবক অবকাশ-যাপনের জন্য মাঝে মাঝে এখানে থাকতেন। বুদ্ধ এক সময় এ আম্রবনে এসে বাস করতে লাগলেন। জীবক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে একান্তে বসলেন। তখন জীবক বল্লেন—ভদন্ত, শুনতে পাই আপনার ভক্তগণ নাকি আপনার উদ্দেশে প্রাণী বধ করেন এবং আপনি জেনে শুনে সে মাংস আহার করেন; তা কি সত্যি না বিরুদ্ধ পক্ষ আপনাকে অপদস্থ করবার জন্য এ সব বলে থাকেন? বুদ্ধ উত্তরে বল্লেন—হে জীবক, তা সত্য নয়, তারা শুধু আমার মিথ্যাপবাদ করে; হে জীবক, আমাদের উদ্দেশে জীব হত্যা করে মাংস দেওয়া বলে জানলে দেখলে অথবা সন্দেহ হলে সে মাংস আমাদের গ্রহণীয় নয়, অন্যথা মাংস আহার্য বলে শিষ্যদের বলি।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে জীবক ধরো কোন ভিক্ষু গ্রাম কিংবা নগরে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে বাস করে। সে আপনার মৈত্রী-পূর্ণচিত্ত প্রসারিত করে উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে উর্ধ্ব দিকে, অধোদিকে। এভাবে তার বিপুল উদার অসীম মৈত্রীচিত্ত সর্বজগতের মঙ্গল চিন্তায় মগ্ন হয়। যদি কোন ভক্ত তাকে বাড়ীতে আহার গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করে, ইচ্ছা হলে সে ভিক্ষু ভক্তের বাড়ীতে যথাসময়ে উপস্থিত হয় এবং ভক্ত তাকে সুস্বাদু আহার্য দান করে। তখন তার মনে এরকম চিন্তার উদয় হয় না "এ ভক্ত আমাকে বেশ সুস্বাদু আহার পরিবেশনে পরিতৃপ্ত করছে। আহা, ভবিষ্যতেও যেন এরকম সুস্বাদু আহার আমার পাতে পড়ে।" এরকম চিন্তা তার অন্তরকে কলুষিত করে না। সে

অলুব্ধ অমূর্ছিত অনাসক্ত হয়ে অধ্যাত্মচিন্তায় মগ্ন থেকে আহার গ্রহণ করে। হে জীবক, তোমার কি মনে হয়—সে ভিক্ষু কি তখন নিজের কিংবা পরের নিপীড়নের চিন্তা করে?

জীবক—না, ভদন্ত।

বুদ্ধ—হে জীবক, সে ভিক্ষু কি তখন অনবদ্য আহার গ্রহণ করে না?

জীবক—হাঁ ভদন্ত! তিনি তখন অনবদ্য আহারই গ্রহণ করেন। ভদন্ত, শুনেছি "ব্রহ্মা মৈত্রীধ্যানে রত থাকেন।" তা প্রত্যক্ষ করেছি আপনার মধ্যে। আপনি মৈত্রীধ্যানে রত থাকেন।

বুদ্ধ—হে জীবক, যে রাগ দ্বেষ মোহে হিংসুক হয়, সে রাগ দ্বেষ মোহ তথাগতের ত্যক্ত উন্মূলিত উৎখাত বিধ্বস্ত। যদি এজন্যই মাংসাহারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে থাক, তবে এটিই উত্তর।

জীবক—হাঁ, ভদন্ত! এজন্যই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছি।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে জীবক, ধরো কোন ভিক্ষু গ্রাম কিংবা নগরে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে বাস করে। সে অপার করুণচিত্ত............মুদিতাচিত্ত ....উপেক্ষাচিত্ত প্রসারিত করে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে উর্ধ্বদিকে অধো দিকে। এভাবে তার বিপুল উদার অসীম উপেক্ষাচিত্ত সর্বজগতের প্রতি উপেক্ষা ভাবনায় মগ্ন হয়। যদি কোন ভক্ত তাকে বাড়ীতে আহার গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রন করে, ইচ্ছা হলে সে ভিক্ষু ভক্তের বাড়ীতে যথা সময়ে উপস্থিত হয় এবং ভক্ত তাকে সুস্বাদু আহার্য দান করে। তখন তার মনে এরকম চিন্তার উদয় হয় না "এ ভক্ত আমাকে অতি সুস্বাদু আহার পরিবেশনে পরিতৃপ্ত করছে। আহা! ভবিষ্যতেও যেন এরকম সুস্বাদু আহারলাভে বঞ্চিত না হই।" এ চিন্তা তার অন্তরকে কলুষিত করে না। সে অলুব্ধ অমূর্ছিত অনাসক্ত হয়ে অধ্যাত্ম-চিন্তায় মগ্ন থেকে আহার গ্রহণ করে, হে জীবক, তোমার কি মনে হয়—সে ভিক্ষু কি তখন নিজের কিংবা পরের নিপীড়নের চিন্তা করে?

জীবক—না, ভদন্ত।

বুদ্ধ—হে জীবক, সে ভিক্ষু কি তখন অনবদ্য আহার গ্রহণ করে না?

জীবক—হাঁ, ভদন্ত! তিনি তখন অনবদ্য আহারই গ্রহণ করেন। ভদন্ত, শুনেছি "ব্রহ্মা উপেক্ষা ধ্যানে রত থাকেন।" তা প্রত্যক্ষ করেছি আপনার মধ্যে। আপনি উপেক্ষা ধ্যানে রত থাকেন।

বুদ্ধ—হে জীবক, যে রাগ দ্বেষ মোহে হিংসুক হয়, সে রাগ দ্বেষ মোহ

তথাগতের ত্যক্ত উন্মুলিত উৎখাত বিধ্বস্ত। যদি এজন্যই মাংসাহারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে থাক, তবে এটিই উত্তর।

জীবক—হাঁ, ভদন্ত! এ জন্যই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছি।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে জীবক, যে ব্যক্তি তথাগত অথবা তথাগত-শিষ্যের উদ্দেশে প্রাণী বধ করে, সে পাঁচ কারণে অনেক অপুণ্য সঞ্চয় করে। সে যে বলে "যাও, অমুক প্রাণী নিয়ে এসে।" এটি অপুণ্য সঞ্চয়ের প্রথম কারণ। গলায় বেঁধে টেনে আনার সময় সে প্রাণী যখন দুঃখ বোধ করে, তখন অপুণ্য সঞ্চয়ের দ্বিতীয় কারণ দেখা দেয়। যখন সে হুকুম দেয় "এ প্রাণীটিকে হত্যা করো," তখন তৃতীয় কারণে অপুণ্য সঞ্চয় হয়। হত্যাকালে সে প্রাণী যে দুঃখ লাঞ্ছনা ভোগ করে, তাতে চতুর্থ কারণে অপুণ্য সঞ্চয় হয়, সে যে অননুকূল বস্তু দিয়ে তথাগত অথবা তথাগত-শিষ্যকে বিরক্ত করে, তাতে পঞ্চম কারণে অপুণ্য সঞ্চয় করে।

বুদ্ধের কথা শুনে জীবক উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলেন—আশ্চর্য! ভদন্ত, ভিক্ষুগণ একান্তই অনুকূল আহার গ্রহণ করেন, অনবদ্য আহারই গ্রহণ করেন।

সত্তের

এক সময় বুদ্ধ কোশলরাজ্যে নলকপানের পলাশবনে বাস করছিলেন। সেই সময় তাঁর চরণাশ্রয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ, আয়ুষ্মান ভদ্রিয়, আয়ুষ্মান কিম্বিল, আয়ুষ্মান ভৃগু, আয়ুষ্মান কুণ্ডিন্য আয়ুষ্মান রেবত, আয়ুষ্মান আনন্দ ও অন্যান্য বিখ্যাত কুলপুত্রগণ। তখন একদিন বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে মুক্ত আকাশতলে নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতার মধ্যে বসে রইলেন। হঠাৎ তিনি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে এঁদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করলেন—হে ভিক্ষুগণ, যে কুলপুত্রগণ আমার কাছে অধুনাগত, ব্রহ্মচর্য পালনে তাদের অস্বাচ্ছন্দ্য নেই তো? এ প্রশ্ন শুনে ভিক্ষুরা নীরব রইলেন। বুদ্ধ আবার জিজ্ঞেস করলেন—হে ভিক্ষুগণ, যে কুলপুত্রগণ আমার কাছে অধুনাগত, ব্রহ্মচর্য পালনে তাদের অস্বাচ্ছন্দ্য নেই তো? ভিক্ষুরা তেমনি নীরব রইলেন। রইলেন। তিনি তৃতীয়বার সেই কুলপুত্রদের একথা জিজ্ঞেস করতে সংকল্প করে অনিরুদ্ধকে সম্বোধন করে বল্লেন—হে অনিরুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য পালনে তোমাদের অস্বাচ্ছন্দ্য নেই তো? অনিরুদ্ধ বিনীতভাবে উত্তর করলেন—ভদন্ত, আমরা স্বচ্ছন্দে ব্রহ্মচর্য পালন করছি। বুদ্ধ বল্লেন—বেশ! বেশ! তোমাদের মত সশ্রদ্ধ কুলপুত্রদের এই তো চাই, হে অনিরুদ্ধ, যে তরুণ

বয়সে প্রথম যৌবনে লোক ভোগের নেশায় মাতাল হয়ে থাকে, সে বয়সেই তোমরা গৃহ ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেছ, তোমরা রাজার ভয়ে, ডাকাতের ভয়ে, ঋণের ভয়ে অথবা উদরের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করনি, কিন্তু জন্ম জরা-ব্যাধি মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তির জন্যই শ্রদ্ধায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে; তা নয় কি? অনিরুদ্ধ উত্তর করলেন—হাঁ ভদন্ত।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে অনিরুদ্ধ, কামনার ও দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যদি না মন আনন্দোজ্জ্বল শান্তিপূর্ণ হয়, তাহলে লোভ মনকে অভিভূত করে, বিদ্বেষও মনকে অভিভূত করে, মন জড়তাগ্রস্ত হয়, সংশয়াচ্ছন্ন হয় এবং নানা পাপচিন্তায় পূর্ণ থাকে মনে আনন্দ ও শান্তি নিশ্চিহ্ন হয়। মন যখন কামনা ও দুশ্চিন্তার কবল থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দোজ্জ্বল শান্তিপূর্ণ হয়, তখন মনে লোভ স্থান পায় না, বিদ্বেষ স্থান পায় না মনের জড়তা সংশয় ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হে অনিরুদ্ধ, আমাকে আচার নিয়ম পালন করতে দেখে তোমরা কি ভাবো অবিদ্যাতৃষ্ণাদি এখনো তথাগতের নির্মূল হয়নি, তাই তথাগত আচার-নিয়ম পালন করে থাকেন। অনিরুদ্ধ বল্লেন—না, ভদন্ত, একথা আমরা ভাবি না, আমরা ভাবি অবিদ্যাতৃষ্ণাদি তথাগতের নির্মূলিত, তাই আচার-নিয়ম তাঁর অভ্যস্ত। বুদ্ধ বল্লেন—তোমরা ঠিক ভেবেছ, হে অনিরুদ্ধ, আমি যে পরলোকগত শিষ্যদের গতি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করি, তা তোমরা কি মনে কর? অনিরুদ্ধ বল্লেন—ভদন্ত, ভগবানই ধর্মের উৎস ধর্মের মূল, ধর্মের আধার, ভগবানই বলুন এ বচনের অর্থ, ভগবানের কাছে শুনে ভিক্ষুরা গ্রহণ করবে, যা হবে চিরকালের জন্য হিতকর কল্যাণকর।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে অনিরুদ্ধ, যখন ভিক্ষু শোনে ভগবান অমুক পরলোকগত ভিক্ষুর সিদ্ধিলাভের কথা বর্ণনা করেছেন, তখন সে ভাবে 'আমি তো তাঁকে চিনতাম, তিনি এভাবে চলতেন, এভাবে সাধনারত হতেন। তার বিষয় ভাবতে ভাবতে সে ভিক্ষু তার শ্রদ্ধা শীল শ্রুতি ত্যাগ প্রজ্ঞার কথা স্মরণ করতে থাকে। তাতে সে ভিক্ষুর মন সে আদর্শ অনুসরণে রত হয়। হে অনিরুদ্ধ, পরলোকগত ভিক্ষুদের সম্বন্ধে উপলব্ধির বিভিন্ন স্তরলাভের কথা ভিক্ষুরা যখন আমার কাছে শোনে, তখন তারা ভাবে 'আমরা তো অমুক অমুক ভিক্ষুকে চিনতাম, অমুক অমুক ভিক্ষু এভাবে বাস করতেন, এভাবে সাধনারত থাকতেন।' এদের শ্রদ্ধাশীল শ্রুতি ত্যাগ প্রজ্ঞার কথা তাদের মনে পড়ে। এভাবে আদর্শের অনুধ্যানে তারা অনুপ্রাণিত

হয় এবং আদর্শ অনুসরণ করতে থাকে। তাতে তাদের কল্যাণ সাধিত হয়, মঙ্গল হয়।

হে অনিরুদ্ধ, যখন ভিক্ষুণীও শোনে 'ভগবান পরলোকগতা অমুক অমুক ভিক্ষুণীর উপলব্ধির সে সে স্তরলাভের কথা ব্যক্ত করেছেন', তখন সে ভাবে 'আমি তো অমুক অমুক ভিক্ষুণীকে চিনতাম, অমুক অমুক ভিক্ষুণীর জীবন-যাত্রা ছিল এরূপ, এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যাত্ম-সাধনায় রত হতেন।' এদের কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে এদের শ্রদ্ধা শীল শ্রুতি ত্যাগ প্রজ্ঞার আদর্শ। সে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে ভিক্ষুণীও ঐকান্তিকভাবে সাধনায় রত হয়। তা তার পক্ষে হয় একান্ত মঙ্গলকর হিতকর। পরলোকগত উপাসক-উপাসিকাদেরও গতি নির্দেশের এটিই লক্ষ্য।

হে অনিরুদ্ধ, তথাগত যে শিষ্য-শিষ্যার উপাসক-উপাসিকার পরলোক-প্রাপ্তিতে তাদের গতি ব্যক্ত করেন, তা লোক-বঞ্চনার জন্য নয়, লাভ, সম্মান যশ, প্রতিপত্তির জন্য ও নয়। তা শুনে শ্রদ্ধাসম্পন্ন প্রীতিমান পূতচরিত্র কুলপুত্রগণ অমৃতপদের উপলব্ধির জন্য আগ্রহশীল যত্নপর হবে—এটিই তথাগতের লক্ষ্য।

আঠার

অঙ্গুত্তরাপ প্রাচীন ভারতের একটি জনপদ। আপণ তার একটি উপনগর। এ উপনগরের অদূরেই সুন্দর বনভূমি। বুদ্ধ এ জনপদে থাকবার সময় একদিন পূর্বাহ্নে আপণে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে আহারের পর গেলেন সে বনভূমিতে দিবাযাপনের জন্য। একটি গাছের ছায়ায় তিনি বিশ্রামরত হলেন। আপণের সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থ পোতলিয় সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ পরে নতুন ছাতা মাথায় দিয়ে পায়চারি করতে করতে সে বনভূমিতে যেখানে বুদ্ধ বিশ্রাম করছিলেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে সম্ভাষণের পর পোতলিয় একান্তে লাঠি ভর করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুদ্ধ তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—হে গৃহপতি, এখানে আসন পাতা আছে বসো। বুদ্ধের 'গৃহপতি' সম্বোধন তাঁর মনোপূত হল না। তিনি গম্ভীর হলেন। বুদ্ধ আবার তাঁকে বললেন—হে গৃহপতি, আসন রয়েছে, বসো। এ সম্বোধনে তাঁর অসন্তোষ আরও ঘনিয়ে উঠল। যখন বুদ্ধ তাঁকে তৃতীয়বার গৃহপতি সম্বোধন করে বসতে অনুরোধ করলেন, তিনি মনের অসন্তোষ চেপে রাখতে পারলেন না, একটু রূঢ় ভাষায় বললেন—হে গৌতম, তুমি যে আমাকে গৃহপতি বলে সম্বোধন করছ, তা উচিত

নয়, সঙ্গত নয়। বুদ্ধ শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে মন্তব্য করলেন—হে গৃহপতি, তোমার যে গৃহপতির রূপ গৃহপতির বেশ গৃহপতির ভাব!

পোতলিয়—হে গৌতম, আমার গৃহপতির বেশ থাকলে কি হবে? আমি যে ছেড়ে দিয়েছি গৃহের সকল কাজ কর্ম, গৃহপতির সকল ব্যবহার আমার যে নিশ্চিহ্ন।

বুদ্ধ—সে কি রকম?

পোতলিয়—হে গৌতম, আমার যা ছিল ধন-সম্পদ, জায়গা জমি, সে সমস্ত বিষয় আশয় পুত্রদের দিয়ে দিয়েছি; এগুলোর আমি কোন খবর রাখি না, ধার ধারি না। পুত্রেরা শুধু আমায় খেতে পরতে দেয়, এ আমার যথেষ্ট। এভাবে আমি ছেড়ে দিয়েছি গৃহের সকল কাজ কর্ম, এভাবে আমার সকল গৃহপতি ব্যবহার নিশ্চিহ্ন।

বুদ্ধ—হে গৃহপতি, আর্যশাস্ত্রে একে কর্মত্যাগ বলা হয় না, ব্যবহারোচ্ছেদ ধরা হয় না।

পোতলিয়—তবে আর্যশাস্ত্রে কর্ম ত্যাগ কি রকম, ব্যবহারোচ্ছেদই বা কি রকম। আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

বুদ্ধ—তাহলে শোনো, মনোনিবেশ করো।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন—হে গৃহপতি, ব্যবহারোচ্ছেদের জন্য আর্যশাস্ত্রের নির্দেশ আটটি, যথা—প্রাণিহত্যা থেকে বিরত হয়ে প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করবে, দত্ত দ্রব্যই শুধু গ্রহণ করে অদত্ত গ্রহণ বা চুরি পরিত্যাগ করবে, সত্যবাদিতা আশ্রয় করে মিথ্যা পরিত্যাগ করবে, অবিরুদ্ধভাষী হয়ে বিরোধ-বাক্য পরিত্যাগ করবে, অলোলুপ হয়ে লোলুপতা পরিত্যাগ করবে, অনিন্দুক অরোষক হয়ে নিন্দারোষ পরিত্যাগ করবে, অক্রোধী অক্ষোভী হয়ে ক্রোধ ক্ষোভ পরিত্যাগ করবে, অনভিমানী হয়ে অভিমান পরিত্যাগ করবে, ব্যবহারোচ্ছেদের জন্য আর্যশাস্ত্রের এ আটটি বিধান।

বুদ্ধের উক্তি গৃহপতি পোতালিয়ের অন্তর স্পর্শ করল। তিনি আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—ভগবন, আপনি অতি সংক্ষেপে কথাগুলো বলেছেন, অনুগ্রহ করে বিস্তৃতভাবে বলুন। বুদ্ধ আবার বলতে লাগলেন—হে গৃহপতি, আর্যশ্রাবক মনে মনে ভাবে "যে বন্ধনের জন্য আমি প্রাণঘাতী হই, চুরি করি, মিথ্যা বলি, বিরোধবাক্য ব্যবহার করি, লোলুপ হই নিন্দারোষ করি, ক্রোধ ক্ষোভ প্রকাশ করি এবং অভিমানী হই, সেই বন্ধনচ্ছেদের পথ আমি অবলম্বন করেছি। যদি আমি এ সমস্ত দুষ্ক্রিয়ায় রত হই, তবে আমার নিজের কাছে আমি অপরাধী

হব, বিজ্ঞ সজ্জনের নিন্দার পাত্র হব এবং পরলোকে আমার দুর্গতি হবে প্রাণিহত্যার জন্য, চুরির জন্য, মিথ্যা কথার জন্য, বিরুদ্ধভাষিতার জন্য, লোলুপতার জন্য, অভিমানের জন্য—এগুলো এক একটি বন্ধন, প্রতিবন্ধক। প্রাণিহত্যা, চুরি ইত্যাদি দুষ্ক্রিয়াগুলোর জন্য মানুষের অন্তরে যে আসক্তি আসে, দুঃখ জ্বালা হয়, এ সমস্ত দুষ্ক্রিয়া ত্যাগ করলে সে আসক্তি, সে দুঃখ জ্বালা আসতে পারে না।" এ জন্যই বলা হয়েছে প্রাণিহত্যা থেকে বিরত হয়ে প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করবে ইত্যাদি। কিন্তু এতে সর্বতোভাবে সর্বপ্রকারে ব্যবহারোচ্ছেদ হয় না।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে গৃহপতি, ধরো একটি কুকুর আসে ক্ষুধার্ত কাতর দুর্বল এবং কসাই ফেলে দেয় তার সম্মুখে একটি মাংসহীন রক্তমাখা অস্থিকঙ্কাল। সে কুকুর ক্ষুধাবিনোদনের জন্য চিবোতে থাকে অস্থিকঙ্কালটিকে। তাতে কি সে কুকুরের ক্ষুধা মিটে যায়? পোতালিয় উত্তর করলেন "না প্রভু, মাংসহীন অস্থিকঙ্কাল দিয়ে ক্ষুধার্ত কুকুরের ক্ষুধা মিটতে পারে না, পরন্তু চিবোতে চিবোতে মুখ ক্ষত বিক্ষত করে তার ব্যথা বেদনাই হবে। বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে গৃহপতি, এমনিভাবে আর্যশ্রাবক মনে মনে ভাবে "ভগবান বলেছেন—কাম বা ইন্দ্রিয় পরিচর্যা অস্থি-কঙ্কালের মত বহু দুঃখপূর্ণ বহু ক্ষোভপূর্ণ নানা দোষযুক্ত।" সে এ বিষয় যথাযথভাবে সম্যকজ্ঞানে উপলব্ধি করে উপেক্ষা বা মনের সাম্যভাবের ধ্যানে রত হয়। হে গৃহপতি, ধরো—কাক বা শকুনি অথবা চিল মাংসখণ্ড মুখে নিয়ে উড়ে যায়, তখন কাকের দল শকুনির দল চিলের দল অনুধাবন করে তাকে অনবরত ঠোকরাতে থাকে। সে যদি তাড়াতাড়ি সে যদি তাড়াতাড়ি সে মাংসখণ্ড মুখ থেকে ফেলে না দেয়, তাহলে অসংখ্য ঠোকরে তার মৃত্যু অথবা মৃত্যুসম দুঃখ অনিবার্য হয়। হে গৃহপতি, এমনিভাবে আর্যশ্রাবক মনে মনে ভাবে "ভগবান বলেছেন—কাম বা ইন্দ্রিয়সেবা মাংসখণ্ডের মত বহু দুঃখদায়ক বহু মন্ত্রণাদায়ক, তার দোষ অনেক।" সে এ বিষয় যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে উপলব্ধি করে উপেক্ষা-ভাবনায় রত হয়।

হে গৃহপতি, ধরো—কোন ব্যক্তি প্রজ্বলিত তৃণমশাল হাতে নিয়ে বায়ুর প্রতিকূলে চলতে থাকে। যদি সে ব্যক্তি সে তৃণমশাল তাড়াতাড়ি হাত থেকে ফেলে না দেয়, তাহলে সে জ্বলন্ত তৃণমশাল তার হাত দগ্ধ করবে, বাহু দগ্ধ করবে অথবা অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দগ্ধ করবে। তাতে তার মৃত্যু কিংবা মৃত্যুসম দুঃখ হতে পারে। হে গৃহপতি, এমনিভাবে আর্যশ্রাবক মনে মনে ভাবে "ভগবান

বলেছেন—কাম তৃণমশালের মত দুঃখকর যন্ত্রনাকর, তার দোষ অনেক।" সে তা যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে উপলব্ধি করে উপেক্ষা-ভাবনায় রত হয়।

হে গৃহপতি ধরো—একটি জ্বলন্ত গভীর অঙ্গারকূপ। তার দিকে এগিয়ে আসে একটি লোক যে মরতে চায় না, বাঁচতে চায়, দুঃখ চায় না, সুখ চায়। তাকে শক্তিশালী পুরুষেরা তার দুই বাহুতে ধরে সে জ্বলন্ত অঙ্গার কূপের দিকে টেনে আনতে থাকে। তখন সে ইতস্ততঃ হাত পা ছুড়তে থাকে, তাদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য। কারণ, সে জানে সে অঙ্গারকূপে পড়ার পরিণাম। হে গৃহপতি, এমনিভাবে আর্যশ্রাবক মনে মনে ভাবে "ভগবান বলেছেন কাম জ্বলন্ত অঙ্গার কূপের মত দুঃখকর যন্ত্রনাকর দোষবহুল। সে…… উপেক্ষা-ভাবনায় রত হয়।

হে গৃহপতি, নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে কত রমণীয় স্থান, কত রমণীয় দেশ, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করে দেখে কোথাও কিছুই নেই। হে গৃহপতি, আর্যশ্রাবক এমনি মনে মনে ভাবে "ভগবান বলেছেন কাম স্বপ্নের মত অসার শুধু দুঃখজ্বালাময়। সে তা৹ যথাযথভাবে সম্যক জ্ঞানে উপলব্ধি করে উপেক্ষা-ভাবনায় রত হয়। হে গৃহপতি, এ উপেক্ষা-ভাবনার পরিপূর্ণতা লাভে আর্যশ্রাবকের দিব্য দৃষ্টি খুলে যায়, জাতিস্মর জ্ঞান আয়ত্ত হয়, অন্তরের কামনা বাসনা নির্মূল হওয়ায় বিমুক্তি লাভ হয়। হে গৃহপতি, তুমি কি মনে কর, এ রকম ব্যবহারোচ্ছেদ তোমার মধ্যে দেখতে পাও? পোতলিয় উত্তর করলেন —ভদন্ত, কোথায় আমি আর কোথায় আর্যশাস্ত্রের ব্যবহারোচ্ছেদ। অতঃপর তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগে বললেন—"ভদন্ত, আপনি আমাকে অন্ধকারে আলো দেখিয়েছেন, বিভ্রান্ত আমাকে পথের সন্ধান দিয়েছেন। আমাকে আপনার পায়ে স্থান দিন। আজ থেকে আমি আপনার শরণগত উপাসক হলাম।"

উনিশ

বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীর জেতবনে বাস করছিলেন, তখন বুদ্ধবিমাতা ভিক্ষুনী গোতমী বহুসংখ্যক ভিক্ষুনী-পরিবৃতা হয়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে বন্দনা করে একান্তে দাঁড়ালেন। তিনি বুদ্ধকে বললেন—ভদন্ত, ভিক্ষুনীদের উপদেশ দান করুন, অনুশাসন করুন, ধর্মালোচনায় তাদের উৎসাহিত করুন।

সেকালে স্থবির ভিক্ষুগণ পর্যায়ক্রমে ভিক্ষুনীদের উপদেশ দান করতেন। বুদ্ধ আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন—হে আনন্দ, আজ

ভিক্ষুনীদের উপদেশ দেবার ভার কার? উত্তরে আনন্দ বললেন—ভদন্ত, আজ আয়ুষ্মান নন্দকের উপদেশ দেবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি ভিক্ষুনীদের উপদেশ দিতে অনিচ্ছুক। তখন বুদ্ধ আয়ুষ্মান নন্দককে ডেকে বললেন—হে নন্দক, ভিক্ষুনীদের উপদেশ দাও, অনুশাসন কর, ধর্মকথা শোনাও। 'হাঁ, ভদন্ত' বলে তিনি সম্মতি জানালেন অভ্যন্ত ভিক্ষায় বেরিয়ে আহার সমাপ্ত করে তিনি অপরাহ্ন বেলায় ভিক্ষুনী-আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলেন। ভিক্ষুনীরা তাঁকে দূর থেকে আসতে দেখে আসন পাতলেন, পাদোদক রাখলেন। তিনি পদদ্বয় ধৌত করে আসন গ্রহণ করলেন এবং ভিক্ষুনীদের বললেন—ভগিনীগণ, আজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসাই হবে, কোন বিষয়ে আপনাদের সন্দেহ থাকলে দ্বিধা থাকলে আমায় জিজ্ঞেস করুন। এ উদার আহ্বানে ভিক্ষুনীরা সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

আয়ুষ্মান নন্দক সুরু করলেন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

—ভগিনীগণ, চক্ষু শ্রোত্র, ঘ্রাণেন্দ্রিয় জিহ্বা কায় মন কি নিত্য চিরস্থায়ী অথবা এগুলো অনিত্য অস্থায়ী?

—ভদন্ত, এগুলো অনিত্য অস্থায়ী।

—যা অনিত্য অস্থায়ী, তা কি দুঃখের না সুখের?

—ভদন্ত, তা দুঃখময়।

—ভগিনীগণ, যা অনিত্য দুঃখময় পরিবর্তনশীল তাকে 'আমি' বলে মনে করা 'আমার' বলে মনে করা কি সংগত যুক্তিযুক্ত?

—না, ভদন্ত।

—ভগিনীগণ, সম্যক জ্ঞানে, যথাযথভাবে দর্শন করলে চক্ষু-শ্রোত্রাদি ছয় আভ্যন্তরিক আয়তন অনিত্য অধ্রুব বলেই প্রতিভাত হয়।

—ভগিনীগণ, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ্য ও মনোগোচর বিষয় কি নিত্য চিরস্থায়ী অথবা এগুলো অনিত্য অস্থায়ী?

—ভদন্ত, এগুলো অনিত্য অস্থায়ী।

—যা অনিত্য অস্থায়ী, তা দুঃখের না সুখের?

—ভদন্ত, তা দুঃখময়।

—ভগিনীগণ, যেগুলো অনিত্য দুঃখময় পরিবর্তনশীল সেগুলোকে 'আমি' বলে মনে করা 'আমার' বলে মনে করা কি সংগত যুক্তিযুক্ত?

—না, ভদন্ত।

—ভগিনীগণ, সম্যকজ্ঞানে যথাযথভাবে দর্শন করলে রূপশব্দাদি বাহ্যিক

আয়তনের সংস্পর্শে যে চিত্তোৎপত্তি-সমূহ হয়, সেগুলো কি নিত্য চিরস্থায়ী অথবা অনিত্য অস্থায়ী ?

—ভদন্ত, সেগুলো অনিত্য অস্থায়ী।

—যা অনিত্য অস্থায়ী, তা দুঃখের না সুখের ?

—ভদন্ত, তা দুঃখময়।

—তাহলে তাকে 'আমি' 'আমার বলে' গ্রহণ করা কি উচিত ?

—না, ভদন্ত।

আয়ুষ্মান নন্দক উপমার পর উপমা আহরণ করে এ বিষয়টি পরিস্ফুট করলেন এবং আরও গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তাঁর সারগর্ভ উপদেশ শুনতে শুনতে ভিক্ষুণীরা মগ্ন হয়ে গেলেন। তিনি যখন ভাষণ শেষ করলেন, ভিক্ষুণীদের শোনার 'আকাঙ্ক্ষা তখনো মিটেনি। তাঁর প্রস্থানের পরেই তাঁরা বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে তা ব্যক্ত করলেন। বুদ্ধ তাঁদের বিদায় দিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু নন্দকের ধর্মালোচনায় ভিক্ষুণীরা খুবই সন্তুষ্ট, কিন্তু অতৃপ্ত। অতঃপর তিনি ভিক্ষু নন্দককে আবার পাঠিয়ে দিলেন ভিক্ষুণীদের উপদেশ দেবার জন্য। ভিক্ষু নন্দক অধ্যাত্ম তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে তাঁদের আবার উপদেশ দান করলেন। এ উপদেশ তাঁদের অন্তরে গভীর রেখাপাত করল। তাঁরা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন। এ-আলোচনাটি নন্দকোপদেশ নামে একটি সূত্রে পরিণত হয়।

কুড়ি

বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীর জেতবনে বাস করছিলেন, তখন আয়ুষ্মান পূর্ণ সন্ধ্যায় আপনার নির্জন আবাস থেকে বেরিয়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁর চরণযুগল বন্দনা করে বললেন—ভগবন, আমাকে সংক্ষেপে উপদেশ দান করুন যাতে আমি নির্জনে একা অপ্রমত্ত বীর্যবান আত্মসমাহিত হয়ে থাকতে পারি। বুদ্ধ বললেন—তাহলে শোন, বলছি। আয়ুষ্মান পূর্ণ সায় দিলেন—হাঁ, ভদন্ত। বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে পূর্ণ, আছে চক্ষুগোচর রূপ যা মনোরম কমনীয় প্রিয় কাম্য কামনাসিক্ত। যদি ভিক্ষু তাতে উৎফুল্ল হয় অভিভূত হয় মোহগ্রস্ত হয়, তাহলে জাগে তৃষ্ণা অনুরাগ। তৃষ্ণা বা অনুরাগের উদয়কে আমি দুঃখোৎপত্তি বলি। হে পূর্ণ, তেমনি আছে কর্ণগোচর শব্দ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গোচর গন্ধ, জিহ্বা গোচর রস, কায়গোচর স্পর্শ, মনোগোচর বিষয় যা রম্য কমনীয় প্রিয় কাম্য কামনাসিক্ত। যদি

ভিক্ষু এগুলোতে উৎফুল্ল হয়, অভিভূত হয়, মোহগ্রস্ত হয়, তাহলে জাগে তৃষ্ণা অনুরাগ। তৃষ্ণা বা অনুরাগের উদয়েই দুঃখোৎপত্তি।

হে পূর্ণ, যদি ভিক্ষু মনোরম কমনীয় প্রিয় কাম্য কামনানুরঞ্জিত রূপাদি বিষয়-সমূহে উৎফুল্ল অভিভূত মোহগ্রস্ত না হয়, তাহলে সে বিষয় গুলোর প্রতি তার তৃষ্ণা অনুরাগ নিরুদ্ধ হয়। তৃষ্ণা বা অনুরাগের নিরোধে দুঃখ নিরুদ্ধ হয়। হে পূর্ণ, আমার এই সংক্ষিপ্ত উপদেশ নিয়ে তুমি কোন্ জনপদে থাকবে? আয়ুষ্মান পূর্ণ উত্তর করলেন—ভদন্ত, আমি ভগবানের এ সংক্ষিপ্ত উপদেশ অন্তরে বহন করে সুনাপরন্ত নামক জনপদে গিয়ে থাকব।

বুদ্ধ—হে পূর্ণ, সুনাপরন্ত জনপদবাসী লোকেরা নাকি নিষ্ঠুর রূঢ়। যদি তারা তোমাকে তিরস্কার করে গালিগালাজ করে, তাহলে তোমার কি হবে?

পূর্ণ—ভদন্ত, তাহলে আমি ভাবব 'এ জনপদবাসীরা অত্যন্ত ভদ্র মার্জিত, যেহেতু তারা আমাকে চড় দেয়নি চপেটাঘাত করেনি।'

বুদ্ধ—হে পূর্ণ, যদি সে জনপদবাসীরা তোমাকে চপেটাঘাত করে, তখন কি হবে?

পূর্ণ—ভদন্ত, তখন আমি ভাবব 'তারা সভ্য ভদ্র, যেহেতু তারা আমাকে ঢিল ছুঁড়ে মারেনি।'

বুদ্ধ—হে পূর্ণ যদি তারা তোমাকে ঢিল ছুঁড়ে মারে. তাহলে কি করবে?

পূর্ণ—ভদন্ত, তাহলে আমি ভাবব 'সে লোকেরা সভ্য ভদ্র, যেহেতু তারা আমাকে দণ্ড দিয়ে প্রহার করেনি।'

বুদ্ধ—যদি দণ্ড দিয়ে তোমাকে প্রহার করে, তাহলে কি করবে?

পূর্ণ—ভদন্ত, তাহলে ভাবব 'তারা সভ্য ভদ্র, যেহেতু তারা আমার ওপর শস্ত্রাঘাত করেনি।'

বুদ্ধ—যদি শস্ত্রাঘাত করে, তবে কি হবে?

পূর্ণ—ভদন্ত, তবে ভাবব 'যেহেতু তারা তীক্ষ্ণ শস্ত্র দিয়ে আমার জীবনান্ত ঘটায় নি, তারা ভদ্র সভ্য।'

বুদ্ধ—যদি তীক্ষ্ণ শস্ত্র দিয়ে জীবনান্ত ঘটাতে আসে, তখন কি করবে?

পূর্ণ—ভদন্ত, তখন ভাবব 'ভগবানের এমন শিষ্যেরা আছেন, যাঁরা দেহ ও জীবনের ওপর বিরক্ত বিড়ম্বিত হয়ে শস্ত্রধারীকে অন্বেষণ করেন, আমি কিন্তু বিনা অন্বেষণে বিনা চেষ্টায় শস্ত্রধারীকে পেয়েছি।'

আয়ুষ্মান পূর্ণের উত্তর শুনে বুদ্ধ মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন—হে পূর্ণ, সাধু!

সাধু! তুমি এই সংযম ধৈর্য নিয়ে সুনাপরন্ত জনপদে থাকতে পারবে। পূর্ণ বুদ্ধের চরণ বন্দনা করে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

অতঃপর তিনি যাত্রা করলেন সুনাপরন্ত জনপদ লক্ষ্য করে। ক্রমান্বয়ে চলতে চলতে তিনি বহু গ্রাম নগর নদী প্রান্তর অতিক্রম করে পৌঁছলেন সে জনপদে। সেখানে তিনি বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে গভীর সাধনায় মগ্ন হলেন। তাঁর জীবনযাত্রা ও উপদেশে মুগ্ধ হয়ে তথাকার বহু নরনারী বুদ্ধের উপাসক ও উপাসিকা-রূপে শরণ গ্রহণ করলেন। তিনি অচিরেই অধ্যাত্ম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে অর্হৎ হলেন। অপর সময়ে সেখানেই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

তাঁর দেহত্যাগের সংবাদ যখন শ্রাবস্তীতে পৌঁছল, তখন একদল ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন দেহান্তে তাঁর গতির কথা। বুদ্ধ উত্তরে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, কুলপুত্র পূর্ণ জ্ঞানী ধর্মপরায়ণ, সে ধর্মের গভীরে অবগাহন করে শুদ্ধ মুক্ত অর্হৎ হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেছে। এ উক্তি শুনে ভিক্ষুরা আনন্দ প্রকাশ করলেন।

একুশ

মগধরাজ্যে সফরে বেরিয়ে বুদ্ধ এসে পড়লেন এক গ্রামে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। রাত্রিবাসের জন্য তিনি অদূরেই এক কুমোরশালা দেখতে পেলেন। এর মালিক কুমোর ভার্গবের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন—হে ভার্গব, যদি তোমার অসুবিধা না হয়, তাহলে তোমার কুমোরশালায় এ রাতটি থাকব। উত্তরে ভার্গব বললেন—প্রভু, আমার কোন অসুবিধা নেই, তবে জনৈক সন্ন্যাসী এখানে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁর যদি আপত্তি না হয়, আপনি খুশীমত থাকুন। সেখানে সেদিন প্রথম আশ্রয় নিয়েছিলেন পুক্কুসাতি নামক জনৈক ভিক্ষু। এ ভদ্রসন্তান শ্রদ্ধায় গৃহত্যাগ করে ভিক্ষু হয়েছিলেন। বুদ্ধ তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—হে ভিক্ষু, যদি তোমার অসুবিধা না হয়, এখানে রাত্রিবাস করব। বুদ্ধকে চিনতে না পেরে পুক্কুসাতি বললেন—বন্ধু, এ কুমোরশালায় যথেষ্ট জায়গা, আপনি এসে খুশীমত থাকুন।

বুদ্ধ কুমোরশালায় প্রবেশ করে একান্তে তৃণাসন পেতে আসনবদ্ধ হয়ে ধ্যানস্থ হলেন। অধিক রাত্রি পর্যন্ত তিনি এভাবে ধ্যানমগ্ন রইলেন। ভিক্ষু পুক্কুসাতিও ততক্ষণ তন্ময় হয়ে বসে কাটালেন। ধ্যানভঙ্গের পর বুদ্ধ চোখ মেলে তাঁর পানে তাকালেন। নবীন ভিক্ষুর ভাবভঙ্গী বুদ্ধের ভাল লাগলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কার উদ্দেশে সন্ন্যাস নিয়েছ, কে তোমার গুরু, কার ধর্ম তোমার

ভাল লাগে? ভিক্ষু উত্তর দিলেন—বন্ধু, শাক্যসন্তান ভগবান গৌতম বলে এক মহাপুরুষ আছেন যাঁর নাম রটেছে ভগবান অর্হৎ সুগত সম্যক সম্বুদ্ধ অনুত্তর শাস্তা বলে, তাঁর উদ্দেশে আমার প্রব্রজ্যা, তিনিই আমার গুরু, তাঁর ধর্মই আমার মনোপূত। বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন—তিনি এখন কোথায় আছেন?

ভিক্ষু—উত্তর জনপদে শ্রাবস্তী বলে এক নগর আছে; তার উপকণ্ঠে জেতবন আশ্রমে তিনি থাকেন।

বুদ্ধ—তুমি কি কখনো তাঁকে দেখেছ এবং দেখে চিনতে পারবে?

ভিক্ষু—না, তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি, দেখে কি করে চিনব?

বুদ্ধ তখন ভাবতে লাগলেন—এ ভদ্রসন্তান আমার উদ্দেশে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছে, তার অন্তরে আছে অনাবিল শ্রদ্ধা, তাকে একটু ধর্মকথা শোনানো যাক। তিনি ভিক্ষুটিকে বললেন—একটু ধর্মালোচনা করে তোমাকে শোনাব। ভিক্ষু অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে শুনতে বসে গেলেন। বুদ্ধ অধ্যাত্মতত্ত্ব নিয়ে সুরু করলেন ধর্মোপদেশ। আলোচনা গভীর থেকে গভীর হয়ে চলল, ভিক্ষুর অন্তর মথিত করে অপূর্ব আলোক-লোক সৃষ্টি করল। ভিক্ষু নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললেন, নতুন উদার আলোর স্পর্শ অনুভব করলেন। স্বতই তাঁর প্রতীতি জাগলো ইনিই সেই সুগত সম্যক সম্বুদ্ধ অনুত্তর শাস্তা ভগবান বুদ্ধ। তিনি আবেগে বলে ফেললেন—সুগত সম্যক সম্বুদ্ধই এখানে, অনুত্তর শাস্তাই এখানে। এই বলে ভিক্ষু পুক্কুসাতি আপনার মস্তক লুটিয়ে দিলেন বুদ্ধের চরণে, বললেন—প্রভু, আমি অজ্ঞতাবশত মোহবশত অপরাধ করে ফেলেছি, যেহেতু আপনাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেছি, আপনার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করেছি, শাস্তার সম্মান দিই নি; আমায় ক্ষমা করুন ভবিষ্যৎ সংযমের জন্য। বুদ্ধ তাঁর মস্তক স্পর্শ করে বললেন—হে ভিক্ষু, ওঠ, আমি তোমায় ক্ষমা করছি, তুমি না জেনে যে আচরণ করেছ, তার প্রতিকারের জন্য তোমার এ অনুতাপ আর্য বিনয়ে শ্রীবৃদ্ধির পথ।

অতঃপর পুক্কুসাতি বললেন—প্রভু, আপনার কাছে আমি উপসম্পদা বা ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করতে চাই, কৃপা করে আমায় উপসম্পদা দান করুন। বুদ্ধ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার পাত্র চীবর পরিপূর্ণ আছে কি?

—না, ভদন্ত।

—পাত্র চীবর পরিপূর্ণ না থাকলে উপসম্পদাদান তথাগত রীতি নয়।

আয়ুষ্মান পুক্কুসাতি রাত্রির অবসানে বুদ্ধকে অভিবাদন করে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। উপসম্পদালাভের আশায় পাত্র চীবরের সন্ধানে তিনি

বেরিয়ে পড়লেন। এমন সময় এক উদ্‌ভ্রান্ত গাভী ছুটে এসে গুঁতিয়ে তার জীবনান্ত ঘটাল। তখন একদল ভিক্ষু এ খবর বুদ্ধকে জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন — ভদন্ত, এ কুলপুত্র পুক্‌সাতির সদগতি হয়েছে কি? উত্তরে বুদ্ধ বললেন—হে ভিক্ষুগণ, পুক্‌সাতি জ্ঞানী-পুরুষ ধর্মপথারূঢ়; (কামাদি পঞ্চ) নিম্ন সংযোজন বা বন্ধনের ক্ষয়ে ঊর্ধ্বগামী নির্বাণোন্মুখ। এই বলে বুদ্ধ নীরব হলেন।

বাইশ

বুদ্ধ যখন রাজগৃহের বেণুবনে থাকতেন, তখন শ্রমণোদ্দেশ অচিরব্রত রাজগৃহের প্রান্তে অরণ্য কুটিরে বাস করতেন। একদিন রাজকুমার জয়সেন পায়চারি করতে করতে সেই অরণ্য কুটিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং শ্রমণোদ্দেশ অচিরব্রতের সঙ্গে আলাপ সম্ভাষণ করলেন। অতঃপর তিনি অচিরব্রতকে বললেন—আমি শুনেছি নাকি ভিক্ষু বীর্যবান অপ্রমত্ত নিষ্ঠাবান হলে চিত্তের একাগ্রতা লাভ করেন। অচিরব্রত উত্তর করলেন—হাঁ, রাজকুমার তাই।

জয়সেন—এ বিষয়ে আপনি যা জানেন আয়ত্ত করেছেন, তা আমায় বুঝিয়ে বলুন।

অচিরব্রত—আমার অধীত আয়ত্ত বিষয় আপনাকে বুঝিয়ে বলার মত আমার শক্তি নেই। যদি আমি তা করি এবং আপনি বুঝতে না পারেন, তাতে শুধু আমার কষ্টই হবে।

জয়সেন—না, আপনি বলুন, আমি বুঝে নেব।

অচিরব্রত যতই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেন, জয়সেন ততই অনুরোধ করতে থাকেন। অবশেষে অচিরব্রত নিজের সাধ্যানুসারে বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন। জয়সেন সমস্ত শুনে অভিমত প্রকাশ করলেন—ভিক্ষু যতই বীর্যবান অপ্রমত্ত নিষ্ঠাবান হোন না কেন, তাঁর পক্ষে চিত্তের একাগ্রতা লাভ করা অসম্ভব। এ কথা বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

রাজকুমার জয়সেনের এ মন্তব্য শুনে শ্রমণোদ্দেশ অচিরব্রত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি অব্যবহিত পরেই বুদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন করে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। বুদ্ধ শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—হে অচিরব্রত, যা নিষ্কাম বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে জানতে হয়, দেখতে হয়, হৃদয়ঙ্গম করতে হয়, উপলব্ধি করতে হয়, তা রাজকুমার জয়সেন বিষয়ভোগে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে কামনার দাহজ্বালার মধ্যে কি করে জানবে দেখবে বুঝবে, উপলব্ধি করবে, তা একেবারেই অসম্ভব।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন। হে অচিরব্রত, ধরো দুইটি সুদান্ত সুবিনীত নবীন হস্তী কিংবা নবীন অশ্ব অথবা নবীন ষাঁড় আর দুইটি অদমিত অবিনীত নবীন হস্তী কিংবা নবীন অশ্ব অথবা নবীন ষাঁড়। তোমার কি মনে হয়—সুদান্ত সুবিনীত ঐ জন্তুদ্বয় দান্ত বিনীত হয়ে সুষ্ঠুভাবে দমন কৌশল অনুসরণ করতে পারে কি দমন ভূমিতে উপনীত হতে পারে কি?

—হাঁ, ভদন্ত।

—ঐ অদমিত অবিনীত জন্তুদ্বয়ও কি সুদান্ত সুবিনীত জন্তুদ্বয়ের মত সুষ্ঠুভাবে দমনকৌশল অনুসরণ করতে পারে দমনভূমিতে উপনীত হতে পারে?

—না, ভদন্ত।

—হে অচিরব্রত, তেমনি যা নিষ্কাম বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে জানতে হয় দেখতে হয় হৃদয়ঙ্গম করতে হয় উপলব্ধি করতে হয়, তা রাজকুমার জয়সেন ইন্দ্রিয়ভোগে আকণ্ঠমগ্ন হয়ে কামনার দাহ জ্বালার মধ্যে কি করে জানবে দেখবে বুঝবে উপলব্ধি করবে, এ একেবারেই অসম্ভব।

ধরো, গ্রাম কিংবা নিগমের অনতিদূরে অবস্থিত প্রকাণ্ড পর্বতের পাদদেশে দুই বন্ধু উপস্থিত হয়। একজন পর্বত আরোহণ করে পাদদেশে দণ্ডায়মান বন্ধুটিকে বলে—আমি এখানে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকের রমণীয় উদ্যান রমণীয় বনভূমি রমণীয় ভূভাগ ও রমণীয় জলাশয় দেখতে পাচ্ছি। নিম্নদেশে-দণ্ডায়মান বন্ধুটি বলে ওঠে—আমি বিশ্বাস করি না তুমি যে রমণীয় উদ্যান রমণীয় বনভূমি রমণীয় ভূভাগ ও রমণীয় জলাশয় দেখতে পাচ্ছ, ওসব বাজে কথা। তখন উপরে দণ্ডায়মান ব্যক্তি পর্বত নীচে নেমে এসে সে বন্ধুটিকে বাহুতে ধরে পর্বতের ওপরে নিয়ে গিয়ে বলে—এখন কি দেখছ? উত্তরে সে বলে—তুমি যে রমণীয় দৃশ্যগুলোর কথা বলেছিলে, সেগুলোই দেখতে পাচ্ছি। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল—তবে কেন তুমি রমণীয় দৃশ্যগুলোর কথা বাজে বলে উড়িয়ে দিয়েছিলে? বন্ধুটি উত্তর করল—কারণ, এ প্রকাণ্ড পর্বত নীচে আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়েছিল, আমি দেখতে পাইনি এ দৃশ্যগুলোকে। হে অচিরব্রত এর চেয়েও প্রকাণ্ড অবিদ্যারাশি তমোরাশি রাজকুমার জয়সেনের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে ঢেকে আছে, সে ইন্দ্রিয়ভোগে আকণ্ঠমগ্ন হয়ে কি করে জানবে দেখবে বুঝবে উপলব্ধি করবে সে বিষয় যা নিষ্কাম বৈরাগ্যের ভিতর দিয়ে জানতে হয় দেখতে হয় হৃদয়ঙ্গম করতে হয় উপলব্ধি করতে হয়। হে অচিরব্রত, এ উপমা দুইটি দ্বারা যদি তুমি জয়সেনকে বোঝাতে, তাহলে সে সম্ভবত খুশী হত, আনন্দপ্রকাশ করত।

—ভদন্ত, এরকম সুন্দর উপমা কি করে আমার মাথায় আসবে ?

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে অচিরব্রত, ধরো অভিষিক্ত রাজার আদেশে হস্তী শিকারী রাজহস্তী আরোহণ করে গভীর বনে প্রবেশ করে বনহস্তীকে রাজহস্তীর সঙ্গে বেঁধে ফেলে। রাজহস্তী তাকে টেনে বনের বাইরে নিয়ে আসে। রাজা তখন দক্ষ হস্তীদমকের হাতে সে বনহস্তীর শিক্ষার ভার অর্পণ করে। হস্তীদমক নানা প্রকার দমন কৌশল অবলম্বন করে সে বনহস্তীকে এমনভাবে শিক্ষা দেয় যে, পরবর্তীকালে সে হস্তী আরোহণযোগ্য হয়, ক্রীড়া দেখাতে পারে এবং যুদ্ধক্ষম হয়। ঠিক তেমনি তথাগত যোগ্য প্রাকৃতজনকে উপদেশের দ্বারা সংসারের বাইরে এনে শীল সমাধি ও প্রজ্ঞানের শিক্ষায় সংযত সমাহিত আলোক-সম্পন্ন করে নির্বাণোপলব্ধিক্ষম নিষ্পাপ অর্হৎ করে তোলেন।

শ্রমণোদ্দেশ অচিরব্রত ভগবানের এ ভাষণ শুনতে শুনতে মগ্ন হয়ে গেলেন।

তেইশ

পূর্ণিমার রাত্রি। জ্যোৎস্নাস্নাত ধরণী অপরূপ সৌন্দর্যে মেতে উঠেছে। শ্রাবস্তীর তরুলতা ঘেরা পূর্বারামের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত আকাশতলে বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। কারো মুখে বাক্যালাপ নেই। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। বুদ্ধ নীরবতা ভঙ্গ করে ভিক্ষুদের জিজ্ঞেস করলেন—হে ভিক্ষুগণ, একজন অসৎ ব্যক্তি কি কখনো অন্য এক অসৎ ব্যক্তিকে অসৎ বলে জানতে পারে ? ভিক্ষুরা উত্তর করলেন—না, ভদন্ত। এ উত্তর অনুমোদন করে বুদ্ধ বললেন—ঠিক বলেছ, একজন অসৎ ব্যক্তির পক্ষে অন্য এক অসৎ ব্যক্তিকে অসৎ বলে জানা সম্ভব নয়। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন—হে ভিক্ষুগণ, অসৎ ব্যক্তি কি কখনো সৎ ব্যক্তিকে সৎ লোক বলে জানতে পারে ? ভিক্ষুরা উত্তর করলেন—না, ভদন্ত। বুদ্ধ বললেন—ঠিক বলেছ, একজন অসৎ ব্যক্তির পক্ষে সৎ ব্যক্তিকেও সৎ বলে জানা সম্ভব নয়। তিনি বলতে লাগলেন।

হে ভিক্ষুগণ, অসৎ ব্যক্তি হয় অসৎ ধর্মসমন্বিত অসৎ ভক্ত অসৎচিন্তারত অসৎমন্ত্রনারত অসৎবাক্যভাষী অসৎকর্মরত অসৎ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং অসৎদানরত।

হে ভিক্ষুগণ, অসৎ ব্যক্তি হয় শ্রদ্ধাহীন নির্লজ্জ অপাপভীরু শ্রুতিহীন অলস ভ্রান্ত এবং দুর্বুদ্ধিপরায়ণ। এ ভাবে সে অসৎ ধর্মসমন্বিত হয়। যে শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধাহীন নির্লজ্জ পাপভয়শূন্য শ্রুতিজ্ঞানহীন অলস ভ্রান্ত ও দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন তারাই হয় অসৎ ব্যক্তির মিত্র ও সহায়ক। একে বলা হয় অসৎ ভক্তি। অসৎ ব্যক্তি যে নিজের ক্ষতিকর বিষয় চিন্তা করে, পরের ক্ষতিকর

বিষয় চিন্তা করে এবং উভয়ের ক্ষতিকর বিষয় চিন্তা করে, তা হয় তার অসচ্চিন্তা। আত্মক্ষতিকর পরক্ষতিকর মন্ত্রণাই অসৎমন্ত্রণা। অসৎ ব্যক্তি যে মিথ্যা বলে, পিশুন বাক্য ব্যবহার করে, রূঢ়ভাষী হয় এবং নিরর্থক বাক্য বলে, তাতে সে হয় অসৎবাক্যভাষী। অসৎ ব্যক্তি যে প্রাণীহত্যা করে, চুরি করে ও ব্যভিচারী হয়, তা তার অসৎ কর্ম। অসৎ ব্যক্তির ধারণা জন্মে দান নেই, যাগযজ্ঞ নেই, সুকৃত দুষ্কৃত কর্মের ফল নেই, ইহলোক নেই, পরলোক নেই, মাতাপিতা নেই, সত্যিকার সাধুসজ্জন নেই, যাঁরা অতীন্দ্রিয় বিষয় উপলব্ধি করেছেন। এ-রকম ধারণাই অসৎ ব্যক্তির অসৎ দৃষ্টি। অসৎ ব্যক্তি অসুষ্ঠু-ভাবে দান করে, অবহেলার সঙ্গে অবজ্ঞার সঙ্গে দেয় এবং দানের ফলে তার বিশ্বাস থাকে না। এ-রকম দানই অসৎ দান।

অসৎ ধর্ম-সমন্বিত অসচ্চিন্তারত অসৎ মন্ত্রণারত অসৎ বাক্যভাষী অসৎ কর্মরত অসৎ দৃষ্টিসম্পন্ন ও অসৎ দানরত অসৎ ব্যক্তি মৃত্যুর পর অসদ্গতিই প্রাপ্ত হয়—নরক অথবা তির্যগযোনি।

বুদ্ধ পুন ভিক্ষুদের জিজ্ঞেস করলেন—হে ভিক্ষুগণ, সৎ ব্যক্তি কি অন্য এক সৎ ব্যক্তিকে সৎ ব্যক্তি বলে জানতে পারে? ভিক্ষুরা উত্তর করলেন—হাঁ ভদন্ত। বুদ্ধ বললেন—ঠিক কথা, একজন সৎ ব্যক্তির পক্ষে অন্য একজন সৎ ব্যক্তিকে জানা সম্ভব। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন—সৎ ব্যক্তি বলে জানতে পারে? ভিক্ষুরা উত্তর করলেন—হাঁ, ভদন্ত। বুদ্ধ বললেন ঠিক কথা, একজন সৎ ব্যক্তির পক্ষে অসৎ ব্যক্তিকেও জানা সম্ভব। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন—সৎ ব্যক্তি কি অসৎ ব্যক্তিকে অসৎ ব্যক্তি বলে জানতে পারে? ভিক্ষুরা উত্তর করলেন, হাঁ ভদন্ত। বুদ্ধ বললেন ঠিক কথা, সৎ ব্যক্তির পক্ষে অসৎ ব্যক্তিকেও জানা সম্ভব। তিনি বলতে লাগলেন—হে ভিক্ষুগণ, সৎ ব্যক্তি হয় সৎ ধর্ম সমন্বিত সৎ ভক্ত সচ্চিন্তারত সৎ মন্ত্রণারত সৎ বাক্যভাষী সৎ কর্মরত সৎ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সৎ দানরত।

হে ভিক্ষুগণ, সৎ ব্যক্তি হয় শ্রদ্ধাবান পাপে লজ্জাশীল পাপভীরু বহুশ্রুত আরব্ধবীর্য স্মৃতিমান এবং প্রজ্ঞাবান। এ-ভাবে সৎ ব্যক্তি সৎ ধর্মসমন্বিত হয়। যে শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধাবান পাপলজ্জী পাপভীরু বহুশ্রুত আরব্ধবীর্য স্মৃতিমান সপ্রজ্ঞ, তাঁরা হন সৎ ব্যক্তির মিত্র ও সহায়। একে বলা হয় সৎভক্তি। সৎ ব্যক্তির চিন্তা নিজের পক্ষেও অহিতকর অমঙ্গলকর নয়, পরের পক্ষেও অহিতকর অমঙ্গলকর নয়। এটিই সচ্চিন্তা। আত্মহিতকর মন্ত্রণাই সৎমন্ত্রণা। সৎ ব্যক্তি হন সত্যবাদী অপিশুনবাদী মৃদুভাষী ও মিতভাষী। এভাবে তিনি সৎ

বাক্যভাষী হন। সৎ ব্যক্তির কর্মে হত্যা, চুরি ও ব্যভিচারের কলঙ্ক থাকে না, সৎ ব্যক্তির মতে দান আছে, যাগযজ্ঞ আছে, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফল আছে, ইহলোক আছে, পরলোক আছে, মাতাপিতা আছেন, সত্যিকার সাধুসজ্জন আছেন, যাঁরা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি সম্পন্ন এরকম ধারণাই সৎ ব্যক্তির সংদৃষ্টি। সংব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে দান করেন, স্বহস্তে দান করেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে একাগ্র মনে দান করেন এবং দানের ফলে বিশ্বাস করেন। এরকম দানই সংদান।

সৎ ধর্মসমন্বিত সংভক্ত সচ্চিন্তারত সৎ মন্ত্রণারত সৎ বাক্যভাষী সৎ কর্মরত সৎ দৃষ্টিসম্পন্ন ও সৎ দানরত সৎ ব্যক্তি দেহান্তে মৃত্যুর পর সদ্‌গতিই প্রাপ্ত হয়—দেবমহত্ব অথবা মানবমহত্ব। এই বলে বুদ্ধ নীরব হলেন।

(জেতবন শ্রাবস্তী)

একদিন বুদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, সৎপুরুষের ভাব প্রকৃতি এবং অসৎপুরুষের ভাব প্রকৃতি তোমাদের বলছি, তোমরা শোন। ভিক্ষুরা, 'হাঁ, ভদন্ত' বলে সায় দিয়ে শুনতে বসে গেলেন। তিনি বলতে লাগলেন। হে ভিক্ষুগণ, অসৎ ব্যক্তি যদি উচ্চবর্ণ থেকে প্রব্রজিত হয় অথবা অভিজাত বংশ থেকে আসে, সে ভাবে—আমি উচ্চবর্ণ থেকে সন্ন্যাসের পথে এসেছি অথবা অভিজাত বংশ থেকে এসেছি। অন্য ভিক্ষুরা আমার মত উচ্চবর্ণ থেকে আসেনি কিংবা অভিজাত বংশ থেকেও আসেনি। এভাবে সে নিজের বর্ণ নিয়ে কিংবা আভিজাত্য নিয়ে নিজেকে বড় বলে ভাবে এবং পরকে ছোট করে দেখে। অসৎ ব্যক্তি যদি যশ সম্মান সৌভাগ্যের অধিকারী হয়, তাহলে সে ভাবে—আমি যশস্বী সম্মানিত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। অন্য ভিক্ষুরা যশ সম্মান সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। এই ভেবে সে অহঙ্কারে স্ফীত হয়। অসৎ ব্যক্তি যদি বিদ্বান বহুশ্রুত হয়, তাহলে সে ভাবে—আমি বিদ্বান বহুশ্রুত আর এই ভিক্ষুরা বিদ্যাহীন অর্ধশিক্ষিত। এভাবে সে নিজের পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের বড়াই করে। যদি অসৎ ব্যক্তি বাগ্মী সুবক্তা হয়, তাহলে সে নিজের বাকশক্তি বাগ্মিতা নিয়ে গর্ববোধ করে। অসৎ ব্যক্তি যদি কোন ব্রত পালন করে, তাহলে সে নিজের ব্রত নিয়ে গর্ববোধ করে এবং অপরকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। অসৎ ব্যক্তি যদি ধ্যানের কোন স্তর লাভ করে, তখনো সে নিজেকে ধ্যানী বলে ভাবে এবং পরকে ধ্যানহীন মনে করে। এগুলো অসৎপুরুষের ভাব প্রকৃতি।

হে ভিক্ষুগণ, সংব্যক্তি যদিও উচ্চবর্ণ থেকে প্রব্রজিত হয় অথবা অভিজাত

বংশ থেকে আসে, তাহলে সে ভাবে—উচ্চবর্ণের জন্ত অথবা আভিজাত্যের জন্ত অন্তরের লোভ দ্বেষ মোহ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না বিগত হবে না, উচ্চবর্ণের না হয়েও অভিজাত বংশের না হয়েও যে প্রব্রজিত ধর্মপরায়ণ কর্মচারী, তিনিই প্রশংসার্হ পূজ্য। এই ভেবে সে নিজের বর্ণ কিংবা আভিজাত্য নিয়ে নিজেকে বড় বলে ভাবে না, পরকে ছোট করে দেখে না। ধর্মকে ধর্মচর্চাকে আদর্শ মনে করে। সংব্যক্তি যদি যশ সম্মান সৌভাগ্যের অধিকারী হয়, শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান হয় কিংবা বাগ্মী সুবক্তা হয়, তাহলে সে ভাবে—যশ সম্মান সৌভাগ্য, বিদ্যা কিংবা বাগ্মিতা মানুষের অন্তরের লোভ দ্বেষ মোহকে ক্ষয় করে না। যিনি এ সমস্তের অধিকারী না হয়েও ধর্মের পথে আছেন সাধনার পথে সত্যের সন্ধানে মগ্ন, তিনিই প্রশংসার্হ পূজ্য। এরকম চিন্তায় সে যশ সম্মান সৌভাগ্যের জন্ত বিদ্যার জন্ত কিংবা বাগ্মিতার জন্ত গর্ববোধ করে না এবং পরকে অবজ্ঞা করে না, ধর্মকে সাধনাকে আদর্শ ভাবে। সংব্যক্তি যখন কোন ব্রত পালন করে, তখন তার মনে হয় না যে সে ব্রতবান ব্রতধারী এবং অন্য ভিক্ষুরা ব্রতহীন দুঃশীল। অধিকন্তু সে ভাবে—কেবল এ ব্রতপালনে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না, যাঁরা লক্ষ্যের পথে এগিয়ে চলেছেন তারাই প্রশংসার্হ পূজ্য। সং ব্যক্তি যদিও ধ্যানের বিশেষ বিশেষ স্তর লাভ করে, তবুও ধ্যানের স্তর লাভের জন্ত তার আত্মাভিমানের উদয় হয় না অর্থাৎ সে নিজেকে ধ্যানপরায়ণ যোগীপুরুষ বলে ভাবে না, মহালক্ষ্যের পানে এগিয়ে চলাকেই আদর্শ মনে করে। এগুলো সংপুরুষের ভাব প্রকৃতি।

এভাবে সং ও অসং ব্যক্তির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বুদ্ধ শোনালেন ভিক্ষুদের। তাঁরা তদ্‌গত চিত্তে গ্রহণ করলেন এ উপদেশ।

চব্বিশ

এক সময় বুদ্ধ নালন্দায় প্রাবারিকাম্রকাননে বাস করতেন। তখন নিগ্রন্থ দীর্ঘ তপস্বী নালন্দায় ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে আহারের পর বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। বুদ্ধের সঙ্গে সম্ভাষণের পর তিনি একান্তে দাঁড়ালেন। বুদ্ধ তাঁকে বললেন—হে তপস্বী, আসন রয়েছে বসো। তিনি আসন গ্রহণ করলেন। তখন বুদ্ধ তাকে জিজ্ঞেস করলেন—হে তপস্বী, তোমার গুরু পাপ-কর্মের অনুষ্ঠানের জন্ত কয় প্রকার কর্ম নির্দেশ করেন। উত্তরে তপস্বী বললেন—বন্ধু গৌতম, কর্মকে কর্ম বলা আমার গুরুর অভ্যাস নয়, তিনি দণ্ড বলে নির্দেশ করেন।

বুদ্ধ—তাহলে তোমার গুরু পাপকর্মের অনুষ্ঠানের জন্য কয় প্রকার দণ্ড নির্দেশ করেন ?

তপস্বী—পাপকর্মের অনুষ্ঠানের জন্য পাপক্রিয়ার জন্য আমার গুরু তিন প্রকার দণ্ড নির্দেশ করেন—যথা, কায়দণ্ড, বাকদণ্ড ও মনোদণ্ড।

বুদ্ধ—হে তপস্বী, এ দণ্ডগুলো কি ভিন্ন ভিন্ন ?

তপস্বী—হ্যাঁ বন্ধু, এ দণ্ডগুলো ভিন্ন ভিন্ন।

বুদ্ধ—আচ্ছা, এ দণ্ড তিনটির মধ্যে কোনটিকে তিনি পাপক্রিয়ার জন্য গুরুতর বলে বলেন ?

তপস্বী—এ দণ্ড তিনটির মধ্যে কায়দণ্ডকে তিনি পাপক্রিয়ার জন্য গুরুতর বলে বলেন।

বুদ্ধ—হে তপস্বী, কায়দণ্ড বলে তুমি বলছ ?

তপস্বী—হ্যাঁ বন্ধু, কায়দণ্ডই আমি বলছি।

তখন দীর্ঘতপস্বী বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন—বন্ধু গৌতম, পাপকর্মের অনুষ্ঠানের জন্যে পাপক্রিয়ার জন্য তুমি কয়প্রকার দণ্ড নির্দেশ কর ? উত্তরে বুদ্ধ বললেন—হে তপস্বী, দণ্ড বলে বলা তথাগতের অভ্যাসগত নয়, কর্ম বলাই অভ্যাসগত।

তপস্বী—তাহলে তুমি পাপ কর্মের অনুষ্ঠানের জন্য কয় প্রকার কর্ম নির্দেশ কর ?

বুদ্ধ—হে তপস্বী, পাপকর্মের অনুষ্ঠানের জন্য পাপক্রিয়ার জন্য আমি তিন প্রকার কর্ম নির্দেশ করি—যথা, কায়কর্ম, বাককর্ম ও মনোকর্ম।

তপস্বী—বন্ধু গৌতম, এ কর্মগুলো কি ভিন্ন ভিন্ন ?

বুদ্ধ- হ্যাঁ, এগুলো ভিন্ন ভিন্ন।

তপস্বী—আচ্ছা, এ কর্মগুলোর মধ্যে কোনটিকে তুমি পাপক্রিয়ার জন্য গুরুতর বলে বল ?

বুদ্ধ—এ-গুলোর মধ্যে মনোকর্মকে আমি পাপক্রিয়ার জন্য গুরুতর বলে বলি।

তপস্বী—বন্ধু গৌতম, মনোকর্ম বলে তুমি বলছ ?

বুদ্ধ—হ্যাঁ, মনোকর্মই আমি বলছি।

অতঃপর দীর্ঘতপস্বী চলে গেলেন নিজের গুরুর কাছে। গুরু তখন শিষ্যবর্গ পরিবৃত হয়ে বসেছিলেন। তাঁর ভক্ত গৃহপতি উপালিও উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘতপস্বী গুরুর সম্মুখে আদ্যোপান্ত বিবৃত করলেন বুদ্ধের সঙ্গে নিজের

আলাপবৃত্তান্ত। গুরু তাঁর উক্তিকে সমর্থন করে বললেন—হে তপস্বী, তুমি যোগ্যতার সঙ্গে গুরুমত ব্যক্ত করেছ শ্রমণ গৌতমের কাছে, কায়দণ্ডের তুলনায় মনোদণ্ড কিছুই না; পাপক্রিয়ার কায়দণ্ডই সর্বতোভাবে গুরুতর। এ-কথা শুনে গৃহপতি উপালি বলে উঠলেন—ভদন্ত, দীর্ঘতপস্বী আপনার সুযোগ্য শিষ্য; তিনি গুরুমত যথার্থভাবে ব্যক্ত করেছেন; সত্যিই তো বৃহৎ কায়দণ্ডের তুলনায় মনোদণ্ড নিতান্ত তুচ্ছ; ভদন্ত, আমি এ বিষয় নিয়ে শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করব, যদি তিনি ভদন্ত দীর্ঘতপস্বীকে যা বলেছেন, তা স্বীকার করেন; এতে আমি তাঁকে নাস্তানাবুদ করব।

গৃহপতি উপালি সরাসরি বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে একান্তে বসে জিজ্ঞেস করলেন—ভদন্ত, এখানে কি দীর্ঘতপস্বী এসেছিলেন? বুদ্ধ উত্তর করলেন—হাঁ গৃহপতি, দীর্ঘতপস্বী এখানে এসেছিলেন। উপালি আবার জিজ্ঞেস করলেন তাঁর সঙ্গে আপনার কোন বাক্যালাপ হয়েছিল কি? বুদ্ধ সমস্ত আলাপ বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। উপালি তখন মন্তব্য করলেন—দীর্ঘতপস্বী গুরুর সুযোগ্য শিষ্যরূপে গুরুমত যথাযথভাবে ব্যক্ত করেছেন, কায়দণ্ডের তুলনায় মনোদণ্ড কিছুই নয়, পাপক্রিয়ার কায়দণ্ডই সর্বতোভাবে গুরুতর।

বুদ্ধ—হে গৃহপতি, যদি তুমি সত্যকে আশ্রয় করে আলোচনা করতে চাও, তবে এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা চলতে পারে।

উপালি—হাঁ, ভদন্ত! আমি সত্যকে আশ্রয় করেই আলোচনা করতে চাই। এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা হোক।

বুদ্ধ—হে গৃহপতি, ধরো—কোন নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসী রোগাক্রান্ত বেদনাতুর হয়ে শীতল জল পরিত্যাগ করে উষ্ণ জল সেবন করে। শীতল জল না পাওয়ায় সে যদি প্রাণ ত্যাগ করে, তবে কোথায় তার পুনর্জন্ম নির্দেশ করেন তোমার গুরু?

উপালি—ভদন্ত, মনোসত্ত্ব বলে যে দেবলোক আছে, সেখানে এ সন্ন্যাসীর জন্ম হয়। কারণ, ইনি মনোপ্রতিবদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

বুদ্ধ—হে গৃহপতি, স্মরণ করো, স্মরণ করে বলো—তোমার পূর্বেকার উক্তির সঙ্গে এর মিল কোথায়?

উপালি—ভদন্ত, তা হোক, কিন্তু পাপকর্মের অনুষ্ঠানে কায়দণ্ডই গুরুতর।

বুদ্ধ—হে গৃহপতি, ধরো—তোমার গুরু নিখুঁতভাবে ধর্মাচারসম্পন্ন। তাঁর যাতায়াতে বহু ক্ষুদ্র প্রাণী পদতলে নিষ্পিষ্ট হয়; এর কি ফল তিনি নির্দেশ করেন?

উপালি—ভদন্ত, তা হোক, কিন্তু পাপকর্মের অনুষ্ঠানে কায়দণ্ডই গুরুতর।

বুদ্ধ—হে গৃহপতি, কেমন এ নালন্দা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও জনাকীর্ণ।

উপালি—হ্যাঁ, ভদন্ত।

বুদ্ধ—হে গৃহপতি, যদি এখানে কোন ব্যক্তি অসি উত্তোলন করে এসে বলে "আমি এ নালন্দার যত প্রাণী আছে, সকলকেই এক মুহূর্তে কেটে একটি মাংসপুঞ্জে পরিণত করব।" তুমি কি মনে কর, সমস্ত নালন্দার প্রাণীদের এক মুহূর্তে মাংসপুঞ্জে পরিণত করা কি ঐ লোকটির পক্ষে সম্ভব?

উপালি—একজন কেন দশজন, বিশজন, ত্রিশজন, চল্লিশজন, পঞ্চাশজন লোকের পক্ষেও তা সম্ভব নয়।

বুদ্ধ—হে গৃহপতি, যদি একজন ঋদ্ধিমান যোগবলসম্পন্ন যোগীপুরুষ এসে বলেন "আমি এক মুহূর্তে এ নালন্দাকে কোপানলে ভস্মে পরিণত করব।" তুমি কি মনে কর, সমস্ত নালন্দাকে এক মুহূর্তে ভস্মে পরিণত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়?

উপালি—ভদন্ত, তেমন যোগবলসম্পন্ন যোগীপুরুষের পক্ষে এমন পঞ্চাশটি নালন্দাও এক মুহূর্তে ভস্মীভূত করা অসম্ভব নয়।

বুদ্ধ—হে গৃহপতি, স্মরণ করো, স্মরণ করে বলো—তোমার পূর্বেকার উক্তি কোথায় দাঁড়ায়?

উপালি—ভদন্ত, তা হোক, কিন্তু পাপকর্মের অনুষ্ঠানে দায়দণ্ডই গুরুতর।

বুদ্ধ—হে গৃহপতি, তুমি কি শুনেছ দণ্ডকারণ্য, কলিঙ্গারণ্য, মধ্যারণ্য, মাতঙ্গারণ্যের কথা?

উপালি—হ্যাঁ, ভদন্ত।

বুদ্ধ—কে এ অরণ্যগুলোকে অরণ্যে পরিণত করেছে?

উপালি—ভদন্ত, আমি শুনেছি—ঋষিদের কোপদৃষ্টিতে এগুলো অরণ্যে পরিণত হয়েছে।

বুদ্ধ—তাহলে তোমাদের পূর্বেকার উক্তি কোথায় দাঁড়ায়?

উপালি—ভদন্ত, প্রথম উপমায় আমি খুশী হয়েছি, প্রসন্ন হয়েছি; তবুও আপনার বিচিত্র কথাগুলো শোনবার জন্য আমি বিরুদ্ধাচারণ করতে বাধ্য হলাম। আপনি আমাকে সত্যই পথ দেখিয়েছেন, আমার ভ্রম ভেঙেছেন, আজ থেকে আমাকে আপনারাই উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।

অতঃপর বুদ্ধ সুরু করলেন ধর্মালাপ। তার বিচিত্র ধর্মকথা শুনতে শুনতে

তন্ময় হয়ে গেলেন গৃহপতি উপালি। সত্যের আলোক সম্পাতে উদ্ভাসিত হল তাঁর অন্তর। সকল সংশয় চিরতরে ছিন্ন হল।

দীর্ঘতপস্বী শুনলেন গৃহপতি উপালি বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি গুরুকে জানালেন এ বিষয়। কিন্তু গুরু বিশ্বাস করলেন না। তিনি বললেন—তপস্বী, এ অসম্ভব, উপালির মত বিজ্ঞ ভক্ত শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন না; তুমি যাও তাঁর বাড়ী এবং জেনে এসো সমস্ত বৃত্তান্ত। গুরুর নির্দেশে দীর্ঘতপস্বী খবর নিয়ে এসে বললেন—ভদন্ত, গৃহপতি উপালি সত্যিই শ্রমণ গৌতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গুরু বিশ্বাস করলেন না। তিনি নিজেই সদলবলে গৃহপতি উপালির বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। গৃহপতির বিসদৃশ আচরণ ও কথাবার্তা শুনে তিনি স্তম্ভিত হলেন; বললেন—হে গৃহপতি, তোমার কি মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে, তুমি কি নিজেকে বিকিয়ে দিলে গৌতমের কাছে, তাঁর বশীকরণের যাদুমন্ত্রে আবর্তিত হলে। উপালি বললেন—ভদন্ত, এ যাদুমন্ত্র মঙ্গলকর! এ যাদুমন্ত্র কল্যাণময়! আমার প্রিয় আত্মীয় স্বজন যদি এ যাদুমন্ত্রে আবর্তিত হত, তাহলে তাদের চিরকালের হিত সাধিত হত, সকল ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র যদি এ যাদুমন্ত্রে বশীভূত হত, তাহলে তাদের সকলের চিরতরে কল্যাণ হত। বলতে বলতে গৃহপতি উপালি আসন ত্যাগ করে উঠে পড়লেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে বুদ্ধের স্তব করতে লাগলেন।

পঁচিশ

এক সময় বুদ্ধ যখন অঙ্গুত্তরাপের আপন নামক নিগমে থাকতেন, তখন তিনি একদিন পূর্বাহ্নে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে আহারের পর মধ্যাহ্ন যাপনের জন্য আসন্ন বনভূমিতে একটি বৃক্ষতলে বসে রইলেন। ভিক্ষু উদায়ীও আহারের পর সেই বনভূমির অন্যত্র মধ্যাহ্নযাপনের জন্য গেলেন। সেখানে নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি নিবিষ্ট মনে ভাবতে লাগলেন—ভগবান বুদ্ধ বহুলোকের দুঃখের অপনোদক এবং বহু লোকের সুখের জনয়িতা; তিনি একান্তই বহু লোকের পাপহর্তা এবং বহুলোকের পুণ্যের প্রবর্তক। মধ্যাহ্নে নির্জনবাসের পর তিনি আসন্ন সন্ধ্যায় বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে বললেন—ভগবন, আজ মধ্যাহ্নে যখন আমি নির্জনে বসেছিলাম, তখন আমার মনে চিন্তার উদয় হল 'আপনি বহু লোকের দুঃখের অপনোদক এবং বহু লোকের সুখের জনয়িতা; আপনি একান্তই বহু লোকের পাপহর্তা এবং বহু লোকের পুণ্যের প্রবর্তক।' ভদন্ত, আমরা পূর্বে সন্ধ্যায় প্রাতে দিনে রাতে আহার করতাম।

আপনি যখন আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিকাল-ভোজন বর্জনের জন্য (মধ্যাহ্নের পর আহার না করার জন্য), তখন আমার মনে জেগেছিল বিরূপভাব অসন্তোষ—শ্রদ্ধাবান গৃহীরা যে উত্তম খাদ্য ভোজ্য দিয়ে আমাদের সেবা করেন অপরাহ্নে বিকালে, ভগবান তাও বর্জন করবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু আপনার প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে বিকাল-ভোজন সেদিন বর্জন করতে বাধ্য হয়েছিলাম। ভদন্ত, পূর্বে আমরা রাত্রির অন্ধকারে ভিক্ষা করতে গিয়ে কখনো আবর্জনাস্তূপে গিয়ে ঠেকতাম কখনো নর্দমায় পড়ে যেতাম, কখনো কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হতাম, কখনো ঘুমন্ত গরু বাছুর মাড়িয়ে দিতাম, কখনো নিশাচর দুশ্চরিত্রা ভ্রষ্টা নারী অসঙ্গত ইঙ্গিতে আমাদের আহ্বান জানাত। ভদন্ত, আমার মনে পড়ে—এক রাত্রির সূচিভেদ্য অন্ধকারে গুরু গুরু মেঘ গর্জনের মধ্যে ভিক্ষায় বেরিয়েছিলাম, তখন এক রমণী বিদ্যুতের ছটায় আমাকে বাড়ীর দরজায় দণ্ডায়মান দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠেছিল 'মাগো কত বড় ভূত আমার সামনে, আমি গেলাম গো', আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলাম 'বোন, ভয় করো না, আমি ভূত নই। আমি ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছি, তখন সে রমণীর চীৎকারে লোক জড় হয়ে আমাকে ভৎর্সনা করে বলেছিল 'তুমি ভিক্ষু না আর কিছু, রাত্রির অন্ধকারে পেটের জন্য ভিক্ষা করার চেয়ে কসাই-এর ধারালো ছুরি দিয়ে তোমার পেট কেটে ফেলে দেওয়া উচিত।' সেদিনের ঘটনা স্মরণ করলে স্বতঃই আমার মনে হয় 'ভগবান আমাদের দুঃখের অপনোদক সুখের জনয়িতা, ভগবান একান্তই আমাদের পাপহর্তা ও পুণ্য-প্রবর্তক। উদায়িকে সম্বোধন করে বুদ্ধ বললেন—হে উদায়ি, যখন বলতাম এটি ত্যাগ কর', তখন কোন কোন অপদার্থ ব্যক্তিরা বলত 'কেন এ সামান্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো, এ যেন কেবল বাড়াবাড়ি।' একথা বলে তারা গায়ের জোরে আমার নির্দেশ অমান্য করত এবং আমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করত; কিন্তু যারা হত শিক্ষানুরাগী তারা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করত আমার নির্দেশ।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে উদায়ি, 'এটি ত্যাগ করা উচিত' বললে কোন কোন ভদ্রসন্তানগণ বলত 'এ সামান্য বিষয় ত্যাগ করা এমন কি শক্ত' এবং তারা তখনি তা ত্যাগ করে নিস্পৃহ সংযত বিনয়ী হয়ে বাস করত। কারণ তাদের কাছে তা এমন কিছু শক্ত কঠিন ছিল না। হে উদায়ি, রাজার ঈষদন্ত সুপুষ্ট অভিজাত রণহস্তী দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েও একটু নাড়া-চাড়া দিয়ে সে বন্ধন ছিঁড়ে চলে যায়। যদি কেউ বলে এ বন্ধন সে রণহস্তীর পক্ষে দৃঢ় স্থির স্থূল বন্ধন, তবে সে কথা কি ঠিক? উদায়ি উত্তর করলেন—না ভদন্ত, সে সুপুষ্ট

অভিজাত রণহস্তীর পক্ষে সে বন্ধন অতি তুচ্ছ। বুদ্ধ আবার বলতে লাগলেন। হে উদায়ি, তেমনি আমার নির্দেশ পালন সে শিক্ষানুরাগী ভদ্র-সন্তানগণের পক্ষে মোটেই শক্ত ছিল না। হে উদায়ি, ধরো, কোন নিঃস্ব দরিদ্র ব্যক্তি যার আছে জীর্ণ ভগ্ন কুটীর, কদর্য বাসন-পত্র এবং রূপহীনা অপরিচ্ছন্না একমাত্র পত্নী। সে ভিক্ষুদের শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার প্রতি মুগ্ধ হয়ে ভাবে 'আহা কি সুন্দর জীবন! আমিও ভিক্ষু জীবন অবলম্বন করে এমন স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করব; কিন্তু সে পারে না তার জীর্ণ ভগ্ন কুটীরের সামান্য জিনিষ-পত্রের এবং রূপহীনা একমাত্র পত্নীর মায়া কাটিয়ে ভিক্ষুজীবন অবলম্বন করতে। হে উদায়ি, এ নিঃস্ব দরিদ্রের পক্ষে তার সংসার বন্ধন কি ক্ষুদ্র তুচ্ছ বলা চলে? উদায়ি উত্তর করলেন—না ভদন্ত, সে বন্ধন তার পক্ষে দৃঢ় স্থির স্থূল বন্ধন, তাই এ বন্ধন কাটিয়ে আসতে পারে না। বুদ্ধ বললেন—হে উদায়ি, তেমনি অপদার্থ ব্যক্তিদের পক্ষে আমার সামান্য নির্দেশও কঠিন শক্ত ছিল। তাই তারা বলত কেন এ সামান্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো, এ যেন বাড়াবাড়ি। সুতরাং তারা গায়ের জোরে আমার নির্দেশ অমান্য করত এবং আমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করত।

হে উদায়ি, ধরো, কোন ধনাঢ্য সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তি যার আছে রাশি রাশি ধন বহু জায়গা-জমি শত শত দাস-দাসী এবং রূপসী ভার্যার দল। সে শান্ত সমাহিত ভিক্ষুর জীবনযাত্রা দেখে মুগ্ধ হয়ে ভাবে 'আহা কি শান্তিপূর্ণ আনন্দময় জীবনযাত্রা, আমিও এ পথ অনুসরণ করব।' অতঃপর সে সক্ষম হয় সে বিপুল ধন-সম্পদ ত্যাগ করে রূপসী ভার্যাদের মায়া কাটিয়ে ভিক্ষু-জীবন অবলম্বন করতে। হে উদায়ি এ ধনাঢ্য সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তার সংসার-বন্ধন কি অত্যন্ত দৃঢ় স্থির স্থূল বলা চলে? উদায়ী উত্তর করলেন—না, ভদন্ত, সে বন্ধন তার পক্ষে অতি দুর্বল ক্ষুদ্র তুচ্ছ যা সে অনায়াসে কাটতে পারে। বুদ্ধ বললেন—'হে উদায়ি, তেমনি ভদ্রসন্তানগণ আমার কাছে ত্যাগের নির্দেশ পেয়ে বলত এ সামান্য বিষয় ত্যাগ করা কি শক্ত' এবং তারা তখনি তা ত্যাগ করে নিস্পৃহ সংযত বিনয়ী হয়ে বাস করত। কারণ তাদের কাছে তা এমন কিছু শক্ত কঠিন ছিল না।

হে উদায়ি, এ জগতে চারি প্রকারের লোক দেখা যায়। কোন ব্যক্তি কামনা-বাসনাদি ত্যাগের জন্য চেষ্টা করে; কিন্তু যখন কামনা বাসনাদির চিন্তা তার মনে উদিত হয়, তখন সে তা বিনোদন করে না নিশ্চিহ্ন করে না, পরন্তু মনে পোষণ করে। আমি এরকম ব্যক্তিকে সংযুক্ত বদ্ধ বলে থাকি, বন্ধনহীন বিসংযুক্ত নয়। কোন ব্যক্তি কামনা-বাসনাদি ত্যাগের

চেষ্টা করলেও কামনা-বাসনাদির চিন্তা থেকে রেহাই পায় না; তাতে তার মন আক্রান্ত হয়, তবে সে তা মনে পোষণ করে না, বিনোদন করে, ত্যাগ করে। এরকম ব্যক্তিকেও আমি সংযুক্ত বদ্ধ বলে বলি, বন্ধনহীন বিসংযুক্ত নয়। কামনা-বাসনাদি ত্যাগের পথারূঢ় কোন ব্যক্তির মনে কখনো কচিৎ সাময়িক দুর্বলতার জন্য এরকম চিন্তার যখনি উদয় হয়, তখনি তা সে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিনোদন করে, ত্যাগ করে, মনে পোষণ করে না। যেমন নিদাঘের খর রৌদ্রতপ্ত লৌহকটাহে দুই তিন বিন্দু জল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ক্ষয়ে যায়, তেমনি এরকম ব্যক্তির মনে কামনা-বাসনাদির চিন্তা শীঘ্রই সাধন প্রভাবে বিলীন হয়ে যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরকম ব্যক্তিকেও আমি সংযুক্ত বদ্ধ বলে বলি, বন্ধনহীন বিসংযুক্ত নয়। হে উদায়ি, কোন ব্যক্তি কামনা-বাসনাদিকে দুঃখের মূল জেনে সমাধির উচ্চতম স্তর লাভে শুদ্ধ মুক্ত পুরুষ হন। আমি তাঁকেই বন্ধনহীন বিসংযুক্ত মুক্ত পুরুষ বলে বলি। হে উদায়ি, এ চারি প্রকার লোকের কথাই আমি উল্লেখ করেছি।

হে উদায়ি, ইন্দ্রিয় সম্ভোগের কামবস্তু পাঁচ প্রকার, যথা—অভীপ্সিত কমনীয় অনুকূল প্রিয় কামনাসিক্ত মোহাবেশময় রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ। এ কাম্য বিষয়কে অবলম্বন করে যে সুখানুভূতি জাগে, পরিতৃপ্তি হয়, তাই কামসুখ ইন্দ্রিয়রতি। এ প্রাকৃতজনোচিত অনার্য হীন সুখ সেবনীয় নয়, গ্রহণীয় নয়, অনুশীলনীয় নয়, বরং এ বর্বর সুখকে ভয় করা উচিত।

হে উদায়ি, ভিক্ষু যে বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে ধ্যানের বিভিন্ন স্তর লাভ করে আনন্দে শান্তিতে মগ্ন হয়, সে ধ্যান-সুখকে বলা হয় নিষ্কাম সুখ প্রবিবেক সুখ উপশম সুখ জ্ঞান সুখ। এরকম সুখই সেবনীয় অনুশীলনীয়। এ সুখকে ভয় করার কিছুই নেই। তবে এ বিভিন্ন ধ্যান স্তরে যেটুকু সংযোজন বন্ধন আছে, তাও পরিত্যাজ্য বলে আমি বলি। হে উদায়ি, অন্তরের এমন কোন সংযোজন বন্ধন যতই ক্ষুদ্র তুচ্ছ হোক না কেন আছে কি যা আমি বর্জন করতে বলি নি। উদায়ি উত্তর করলেন—না প্রভু। বুদ্ধ নীরব হলেন। উদায়ি সর্বান্তঃকরণে করলেন এ ভাষণ।

ছাব্বিশ
(জেতবন বিহার, শ্রাবস্তী)

পরিব্রাজক বাৎস্যগোত্র এলেন বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য। তিনি আলাপ-সম্ভাষণের পর বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন—ভবৎ গৌতম, 'জগৎ শাশ্বত বা

নিত্য' এই মত পোষণ করেন কি? বুদ্ধ উত্তর করলেন—না, এ মত আমি পোষণ করি না।

বাৎস্যগোত্র—তবে কি 'জগৎ অশাশ্বত বা অনিত্য' এই মত পোষণ করেন।

বুদ্ধ—না, এ মতও আমি পোষণ করি না।

বাৎস্যগোত্র—'জগৎ সীমাবদ্ধ' এ ধারণা পোষণ করেন কি?

বুদ্ধ—না, তাও আমি পোষণ করি না।

বাৎস্যগোত্র—তবে কি 'জগৎ অনন্ত' এটি আপনার ধারণা?

বুদ্ধ—না, তাও নয়।

বাৎস্যগোত্র—'সে-ই জীব সে-ই শরীর' এই কি আপনার মত?

বুদ্ধ—না, তাও নয়।

বাৎস্যগোত্র—'জীব অন্য শরীর অন্য' এটি কি আপনার মত?

বুদ্ধ—না।

বাৎস্যগোত্র—'প্রাণী মৃত্যুর পর আবার হয়' এ ধারণা কি আপনি পোষণ করেন?

বুদ্ধ—না।

বাৎস্যগোত্র—'প্রাণী মৃত্যুর পর হয় না' এ ধারণা পোষণ করেন কি?

বুদ্ধ—না।

বাৎস্যগোত্র—ভবৎ গৌতম, এ মতবাদগুলোর কোনটিই যে আপনি পোষণ করেন না, তার কারণ কি?

বুদ্ধ—হে বাৎস্যগোত্র, প্রত্যেকটি মতবাদ শুধু মতের কান্তার মতের অরণ্য মতের শূল মতের স্পন্দন মতের বন্ধন যা দুঃখযুক্ত জ্বালাযুক্ত এবং যা নির্বেদের জন্য নয় বৈরাগ্যের জন্য নয়, নিরোধের জন্য নয়, উপশমের জন্য নয়, সম্যক জ্ঞানের জন্য নয়, নির্বাণের অনুকূল নয়। এ জন্য আমি কোন মতবাদ গ্রহণ করি না।

বাৎস্যগোত্র—ভবৎ গৌতম, আপনার কোন নিজস্ব মতবাদ আছে কি?

বুদ্ধ—হে বাৎস্যগোত্র, মতবাদ বিষয়টি তথাগতের পরিত্যক্ত। তথাগত দেখেছেন—এ ভৌতিক রূপ, এ ভৌতিক রূপের উৎপত্তি, এ ভৌতিক রূপের বিলয়, এ অনুভূতি, এ অনুভূতির উদয়, এ অনুভূতির বিলয়, তেমনি সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, এগুলোর উদয় ও বিলয়। তাই তথাগত সর্ব মতাবলম্বনের সর্ব অহঙ্কার মানের ক্ষয়ে নিরোধে ত্যাগে বিসর্জনে বিমুক্ত।

বাৎস্যগোত্র—ভবৎ গৌতম, এমনি বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষু কোথায় উৎপন্ন হন?

বুদ্ধ—হে বাৎস্য, উৎপন্ন হয় কথাটি বলা চলে না।

বাৎস্যগোত্র—তাহলে উৎপন্ন হয় না ?

বুদ্ধ—তাও বলা চলে না।

বাৎস্যগোত্র—তাহলে উৎপন্ন হয় এবং হয় ও না ?

বুদ্ধ—না, সে কথাও বলা চলে না।

বাৎস্যগোত্র—তবে না উৎপন্ন হয়, না অনুৎপন্ন হয় ?

বুদ্ধ—না, তাও নয়।

বাৎস্যগোত্র—ভবৎ গৌতম, আমার সকল প্রশ্নের আপনার 'না' 'না' উত্তর আমায় ধাঁধাঁয় ফেলেছে, বিভ্রান্ত করেছে, আপনার পূর্বের কথা শুনে যেটুকু আমার শ্রদ্ধা প্রীতি হয়েছিল, তা সম্পূর্ণরূপে এখন নিশ্চিহ্ন।

বুদ্ধ—হে বাৎস্যগোত্র, এ স্বাভাবিক, এ বিষয় একান্ত জটিল দুর্বোধ্য সূক্ষ্ম তর্কাতীত উপলব্ধিগম্য, অন্য দৃষ্টিভঙ্গী অন্যমত অন্য চিন্তাধারা নিয়ে তোমার পক্ষে এ সুগম নয়। তবে, তোমাকেই এখানে জিজ্ঞেস করি। তোমার যা সঙ্গত মনে হবে, সে উত্তর দেবে। যদি তোমার সম্মুখে আগুন জ্বলে, তুমি কি জানতে পারবে তোমার সম্মুখে আগুন জ্বলছে ?

বাৎস্যগোত্র—হাঁ, আমি জানতে পারব।

বুদ্ধ—যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় 'তোমার সম্মুখে যে আগুন জ্বলছে, সে আগুন কি অবলম্বনে জ্বলছে' ? এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে ?

বাৎস্যগোত্র—আমি বলব আমার সম্মুখের আগুন তৃণ-কাষ্ঠের উপাদানে জ্বলছে।

বুদ্ধ—যদি তোমার সম্মুখের আগুন নিবে যায়, তুমি কি জানতে পারবে—সম্মুখের আগুন নিবে গেল ?

বাৎস্যগোত্র—হাঁ, সম্মুখের আগুন নিবে গেল বলে আমি জানতে পারব।

বুদ্ধ—তখন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় তোমার সম্মুখে যে আগুন জ্বলছিল, সে আগুন নিবে পূর্ব পশ্চিম উত্তর অথবা দক্ষিণ কোন দিকে গেল ?' এর কি উত্তর দেবে ?

বাৎস্যগোত্র—ভবৎ গৌতম, কোন দিকে গেল কথাটি এখানে বলা চলে না। তবে বলতে হয়, যে উপাদান সংযোগে আগুন জ্বলছিল, সে উপাদানের অভাবে অন্য উপাদান না পেয়ে আগুন নিবে গেছে।

বুদ্ধ—হে বাৎস্য, ঠিক তেমনি বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর অবিদ্যাতৃষ্ণাদির ক্ষয়ে অভাবে নির্বাণলাভ হয়। তার সম্বন্ধে 'উৎপন্ন হয়' 'উৎপন্ন হয় না' ইত্যাদির কোনটিই বলা চলে না।

বুদ্ধের এ উক্তি শুনে পরিব্রাজক বাৎস্যগোত্র অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে বললেন—ভবৎ গৌতম, গ্রাম বা নিগমের অনতিদূরে যে বিশাল শালবৃক্ষ থাকে, সে বৃক্ষ যেমন কালক্রমে শাখাপল্লবহীন বল্কলশূন্য হয়ে শুধু সার কাঠে পরিণত হয়, তেমনি আপনার বচনও শাখাপল্লবহীন বল্কলশূন্য এবং শুধু সারযুক্ত। আপনি আমাকে আপনার উপাসক বলে গ্রহণ করুন।

সাতাশ

ভরুকচ্ছ নগরের এক পল্লীতে ছিল একটি সম্ভ্রান্ত ক্ষুদ্র পরিবার। স্বামী পত্নী ও একটি শিশুপুত্রকে নিয়ে তিনজনের সংসার হলেও আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কলহাস্যে এ পরিবারটি থাকত সর্বদা মুখরিত। শিশুপুত্রটির নাম ছিল বর্দ্ধ। সেই নামানুসারে সবাই গৃহস্বামিনীকে বর্দ্ধমাতা বলে সম্বোধন করত। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বর্দ্ধমাতা ও তাঁর স্বামীর স্বভাবমাধুর্যের সংযোগ পরিবারের শান্তিকে অব্যাহত রেখেছিল। এজন্য তাদের গৃহটি ছিল সুখস্বর্গ। তাদের দেখে লোক মনে মনে ঈর্ষাই করত। তাঁদের বাড়ীর অদূরে ছিল সমুদ্র। বর্দ্ধমাতা যখন শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে বেড়াতে যেতেন, তখন সমুদ্রের বিশাল বিস্তার তাঁর মনকে অধিকার করে থাকত। তাঁর মনে হত সমুদ্র কি যেন বলতে চায় তাঁকে আভাসে ইঙ্গিতে—ক্ষুদ্র গৃহকোণ যেন তাঁর স্থান নয়। মাঝে মাঝে মন উন্মনা হয়ে উঠত। তখন গৃহস্থালীর কাজকর্মে মোটেই তাঁর মন বসত না। তিনি নিজেই খুঁজে পেতেন না তাঁর মনের ঠিকানা। মন চাইত সংসারের বাইরের মুক্ত পরিবেশ। গৃহকে মনে হত বদ্ধ কারাগার। এমন সময় তিনি সাক্ষাৎ পেলেন জনৈক শান্ত সমাহিত ভিক্ষুর। তাঁর শান্ত সংযত মুক্ত জীবন বর্দ্ধমাতার মনে গভীর রেখাপাত করল। তিনি শুনলেন সে ভিক্ষুর উদার ধর্মোপদেশ। তা তাঁকে সন্ধান দিল অমৃতলোকের। তার অজানা স্পর্শে তাঁর সমগ্র সত্তা যেন অভিভূত হয়ে গেল। তিনি অনুভব করলেন একটি অজানা আকর্ষণ। এক নিমেষে যেন খসে পড়ল সংসারের সকল বন্ধন।

বর্দ্ধা ভিক্ষুণী হলেন। পত্নীগতপ্রাণ পতি ও প্রিয় পুত্রকে পশ্চাতে ফেলে তিনি চলে গেলেন সুদূর শ্রাবস্তীতে। সেখানে ভিক্ষুণীদের আশ্রমে মহাশ্রমণীর চরণাশ্রয়ে তিনি সাধনায় মগ্ন হলেন। এদিকে শিশু বর্দ্ধ মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে নীড়চ্যুত পক্ষিশাবকের মত আত্মীয়ের গৃহে পালিত হতে লাগলো। বৎসরের পর বৎসর অতীত হয়ে চলল। বর্দ্ধ শৈশবের সীমা ছাড়িয়ে কৈশোরে

উপনীত হল। যতই সে প্রতিবেশীদের কাছে মায়ের কথা শুনত, ততই সে রূপকথার মত মায়ের কাহিনী শোনার আগ্রহ প্রকাশ করত। প্রতিবেশীরাও সোৎসাহে তাকে শোনাত তার মায়ের গুণের কথা। শুনতে শুনতে সে মগ্ন হয়ে যেত। সে মনে মনে সংকল্প করত বড় হয়ে সে বেরিয়ে পড়বে মায়ের খোঁজে। শ্রাবস্তীর বিশাল ভিক্ষুণীমঠের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে মাতা-পুত্রের মিলনে স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি কেমন ভাবে নেমে আসবে তা কল্পনা করতে করতে সে মশগুল হয়ে যেত। এভাবে মাতৃ-সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা তার উদ্দাম হয়ে উঠল। এজন্য সে যৌবনে পদার্পণ করেই সঙ্ঘমঠের আশ্রয় নিল। সে মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় শ্রমণোদ্দেশের বেশ গ্রহণ করে যাত্রা করল শ্রাবস্তীর দিকে। বহু দূর পথ অতিক্রম করে সে পৌঁছল শ্রাবস্তীতে। দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে লাগল, কিন্তু মাতৃসাক্ষাতের সুযোগ ঘটল না তার। অবশেষে সে একদিন অধীর আগ্রহে একাকী প্রবেশ করল ভিক্ষুণীদের আশ্রমে। তাকে অতর্কিতে আশ্রমে প্রবেশ করতে দেখেই তার জননী ভিক্ষুণী তাকে জিজ্ঞেস করলেন—বৎস, কেন তুমি এমনিভাবে একাকী এখানে এসেছ? বর্দ্ধ তার জননীকে চিনতে না পেরে তার অভিপ্রায় জানাল। বর্দ্ধমাতা শান্ত কণ্ঠে বললেন—"বৎস বর্দ্ধ, এ পৃথিবীর তৃষ্ণার অরণ্যে প্রবেশ করো না, আসক্তি বর্জন করো। হে পুত্র, আসক্তির পাশে বদ্ধ হয়ে বার বার দুঃখের অনুসরণ করো না। হে বৎস, যাঁরা সমস্ত সংশয় ছিন্ন করে তৃষ্ণা নির্মূলিত করে মুক্ত শান্ত শুদ্ধ হয়েছেন তাঁরাই প্রকৃত সুখী, তুমি তাঁদের অনুসৃত পথ অনুসরণ করো।" মাতার উপদেশ শুনে বর্দ্ধ একবার মায়ের পানে তাকাল। সে দেখল—তার মুণ্ডিত-শীর্ষা ভিক্ষুণী জননী-সুলভ সকল আবেগ আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে, কোথাও তাঁর বিকার চাঞ্চল্য নেই, উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে শুধু অপূর্ব ধ্যানদীপ্তি। সে অভিভূত হয়ে বলল—মা, তুমি যা বললে তা তোমার বিশ্বস্ত অন্তরের কথা, তাতে মনে হয় তোমার অন্তরের সমস্ত রিপুদল নির্মূলিত। বর্দ্ধমাতা পুত্রের ধারণাকে দৃঢ়তর করে বললেন—হ্যাঁ, বৎস, আমার অন্তরের সমস্ত রিপুদল নির্মূলিত, তার বিন্দুমাত্রও অবশেষ নেই, অনলসভাবে ধ্যানের অনুশীলনে আমি এ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি।

বর্দ্ধ মাতার উপদেশ বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গভীর অধ্যাত্ম-সাধনায় মগ্ন হলেন। অচিরেই তাঁর অন্তর্দৃষ্টি লাভ হল। তিনি অর্হত্ব লাভ করে মাতার উপদেশবাণীকে জীবনে সফল করলেন।

আটাশ

অঞ্জনবন সাকেত নগরের সমীপবর্তী এক অরণ্য ভূমি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-পূর্ণ এই নির্জন ভূভাগ বুদ্ধকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বহু শিষ্য নিয়ে এখানে বাস করতে এসেছিলেন। এখানে থাকবার সময় সকালে সাকেত নগরে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা তাঁর প্রাত্যাহিক কর্তব্য ছিল। একদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্ত তিনি যখন শিষ্যদের নিয়ে সাকেতে প্রবেশ করছিলেন, তখন জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নগর থেকে বেরুতেই তার মুখোমুখি হলেন। দেখা মাত্রই ব্রাহ্মণ তাঁর পদতলে মস্তক লুটিয়ে দিলেন, বললেন—বাবা, জীর্ণ বৃদ্ধ মাতা-পিতার প্রতি পুত্রের কি কর্তব্য নেই, এতকাল তুমি আমাদের দেখা দাওনি; ভাগ্যিস তোমায় দেখলাম, তোমার মাকে একবার দেখা দিয়ে যাও। এই কথাগুলো সহজ সুরে বলে গেলেন ব্রাহ্মণ। ভিক্ষুরা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন ব্রাহ্মণের পানে। বুদ্ধ কোন বাক্য ব্যয় না ক'রে ব্রাহ্মণের সঙ্গে চললেন। ভিক্ষুরাও অনুসরণ করলেন।

এই ব্রাহ্মণ সাকেতের এক অভিজাত বিত্তবান ব্যক্তি। তাঁর সংসারে আছেন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও উপযুক্ত পুত্র-কন্যা। তাঁর বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ী দাঁড়িয়ে আছে নগরের একান্তে আভিজাত্যের স্বাক্ষর নিয়ে। ভিক্ষুসঙ্ঘ-সহ বুদ্ধের অভ্যাগমনে সে বাড়ী যেন মেতে উঠল। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী এসে বুদ্ধকে প্রণাম করে অনুরূপ স্নেহের ভাষায় বললেন—বাবা এতদিন বৃদ্ধ মাতাপিতার কোন খোঁজ নাও নি, তাদের কি দেখতে নেই? অতঃপর তাঁরা উভয়ে আনন্দের আতিশয্যে পুত্র-কন্যাদের বললেন—এতদিন পরে তোমাদের দাদা এসেছেন। তাঁদের সেবার ব্যবস্থা করো। তারা ভ্রাতাভগ্নিও হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে মাতাপিতার আদেশ শিরোধার্য করে আহারের ব্যবস্থা করলেন। আহার্য পরিবেশন করে তাঁরা পরিতৃপ্তি লাভ করলেন এবং ভক্তি নম্র বচনে বললেন—ভদন্ত, আমাদের পরম সৌভাগ্য আপনি যে আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিলেন, যতদিন আপনি সাকেতে থাকেন, ততদিন আপনি সশিষ্যে আমাদের বাড়ীতেই আহার পানীয় গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করবেন। উত্তরে বুদ্ধ বললেন—একই স্থানে ভিক্ষাগ্রহণ বুদ্ধজীবনের রীতি নয়, বুদ্ধেরা একই বাড়ীতে প্রত্যহ ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। একথা শুনে ব্রাহ্মণ অনুরোধ করলেন—তবে যাঁরা আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে আসবেন, তাঁদের নিমন্ত্রণ নিয়ন্ত্রিত করার ভার আমার ওপর অর্পণ করুন। বুদ্ধ নীরবে সম্মতি জানালেন। যতদিন বুদ্ধ অঞ্জন বনে ছিলেন, ততদিন ভক্তরা ব্রাহ্মণের কাছে এসে বুদ্ধপ্রমুখ

ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করতেন। যেদিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকত না, সেদিন ব্রাহ্মণ নিজের বাড়ীতেই তাঁদের আহারের ব্যবস্থা করতেন।

বুদ্ধের একান্ত সাহচর্যে সেবায় সপত্নীক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পেলেন নতুন জীবন। তাঁর অমোঘ উপদেশ তাঁদের অন্তরে এনে দিল আলোর স্পর্শ। তাঁরা গভীর সাধনায় মগ্ন হলেন। জীবন-সায়াহ্নে অধ্যাত্মোপলব্ধিতে তাঁদের জীবন হল সার্থক। তাঁদের অমায়িক সরল ব্যবহার ও অকুণ্ঠ সেবায় মুগ্ধ ভিক্ষুগণ ধর্মমণ্ডপে আলোচনা প্রসঙ্গে কথা তুললেন—এ সরল প্রাণ বৃদ্ধ-দম্পতি ভগবানকে নিজেদের পুত্র বলে সম্বোধন করেন, তাঁর জনক-জননীর মত আচরণ করেন এবং ভগবানও মৌন সম্মতি প্রকাশ করেন; এর কারণ তো বোঝা গেল না। ভগবান ভিক্ষুদের এ আলোচ্য বিষয় অবগত হয়ে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, এই ব্রাহ্মণ দম্পতি তাঁদের পুত্রকেই পুত্র বলে সম্বোধন করছেন, শুধু এক দুই জন্ম নয়, জন্ম জন্ম ধরে এই দম্পতি সুদূর অতীতে আমার জনক-জননী ছিলেন, সেই মাতৃ-পিতৃ স্নেহের সুপ্ত সংস্কার জেগে উঠেছে তাঁদের মনে আমায় দেখেই। বুদ্ধ আবার গাথায় বললেন—বর্তমানের উপকারে যেমন মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা আসে, তেমনি গত জন্মের নৈকট্যে ও জলে শতদলের মত অপরিচিতের প্রতি প্রেম জেগে ওঠে হৃদয়ে, যে অদৃষ্টপূর্ব লোকের প্রতি স্বতঃই মন নিবিষ্ট হয়, চিত্ত প্রসন্ন হয়, তাকে একান্তই বিশ্বাস করবে।

বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘসহ তিনমাস কাল এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতিকে সান্নিধ্য দান করেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁরা উভয়েই তাঁর চরণাশ্রয়ে অধ্যাত্ম-সাধনায় মগ্ন হয়ে নিজেদের শুভ্র-সংস্কারের প্রভাবে চরম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এর অব্যবহিত পরেই তাঁরা একই দিনে দেহত্যাগ করে নির্বৃত হলেন। মহা-সমারোহে একই চিতায় তাঁদের দাহক্রিয়া সম্পন্ন হল। বুদ্ধও সশিষ্যে শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। দর্শনার্থীর জনতার ভিড় দুর্বার হয়েছিল। তখন কতিপয় ভিক্ষু বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন—ভদন্ত, এই দম্পতির পরলোকে গতি কি? উত্তরে বুদ্ধ বললেন—হে ভিক্ষুগণ, এতাদৃশ নিষ্কলুষ ব্যক্তিদের পরলোক বলে কিছু নেই, এঁরা লোকাতীত হয়ে মহানির্বাণ লাভ করেন। আবার তিনি গাথায় বললেন—

"নিত্যসংযত অহিংসক মুনিগণ দেহভঙ্গের পর শোকদুঃখহীন অবিনশ্বর ধাম প্রাপ্ত হন।

বুদ্ধের উত্তর শুনে ভিক্ষুগণ স্তব্ধ হলেন।

ঊনত্রিংশ

অশ্বপুর সেকালের অঙ্গরাজ্যের একটি নগর। এখানকার ভক্তদের আমন্ত্রণে এ নগর সফরের সময় একদিন বুদ্ধ শিষ্যদের সম্বোধন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমরা জনসমাজে শ্রমণ বলে পরিচিত সবাই তোমাদের শ্রমণ বলে জানে এবং তোমরাও নিজেদের পরিচয় দাও শ্রমণ বলে; তোমরা যদি সত্যি-সত্যিই শ্রমণ ব্রাহ্মণের ধর্ম অনুসরণ কর শ্রমণ-ব্রাহ্মণোচিত করণীয়গুলো সম্পাদন কর, তাহলে তোমাদের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাম সার্থক হবে, প্রব্রজ্যা সফল হবে এবং যারা তোমাদের সেবাযত্ন করে অন্নবস্ত্র দেয়, তাদের দানের ফলও হবে বিপুল। ভিক্ষুগণ উৎকর্ণ হয়ে শুনতে বসে গেলেন তাঁর কথা। বুদ্ধ তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি জান শ্রমণ-ব্রাহ্মণের ধর্ম অর্থাৎ কিসে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ হওয়া যায়? ভিক্ষুরা বললেন—ভগবন, আপনিই বলুন, আপনার কাছে শুনে শিখব।

হে ভিক্ষুগণ, তবে শোন।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। এ ধর্ম পালনের প্রথম কথা হল পাপের প্রতি ঘৃণা ও ভয়, পাপকে ঘৃণা করতে হবে পাপভীরু হতে হবে। এ ধর্ম পালনের অভীষ্ট ফল তোমাদের লাভ করতেই হবে। এ থেকে তোমরা নিজেদের বঞ্চিত করো না। কায়িক আচরণে কায়িক কর্মে শুদ্ধ সংযত নিশ্ছিদ্র হও। কিন্তু শুদ্ধ কায়িক আচরণের জন্য শুদ্ধ কর্মের জন্য গর্ববোধ করে আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দায় রত হয়ো না। বাক্ আচারে বাক্ কর্মে শুদ্ধ সংযত নিশ্ছিদ্র হও। শুদ্ধ বাক্ আচারের শুদ্ধ বাক্ কর্মের গর্বে স্ফীত হয়ে আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা করো না। মনকে শুদ্ধ সংযত করো কিন্তু এজন্য গর্ববোধে আত্ম-শ্লাঘা ও পরনিন্দায় রত হয়ো না। শুদ্ধ জীবিকার গর্বে আত্মপ্রশংসা পরনিন্দা করো না। ইন্দ্রিয়দ্বারগুলো রক্ষা করো। চক্ষু দিয়ে যখন রূপ দেখবে, মনে মনে উপভোগ করবে না, রূপের উপভোগে চঞ্চল হয়ে চক্ষুদ্বারে পাপবৃদ্ধি করবে না। তেমনি শব্দাদি বিষয়গুলো অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হলে মনে মনে উপভোগ করবে না, উপভোগে মত্ত হয়ে সে ইন্দ্রিয়দ্বারে পাপবৃদ্ধি করবে না। কায়মন বাক শুদ্ধ পবিত্র হলে জীবিকা নিষ্কলঙ্ক নির্মল হলে ইন্দ্রিয়দ্বারগুলো সুরক্ষিত হলে আত্মতুষ্ট হয়ে ভেবো না আর কোন করণীয় নেই বলে। এগিয়ে চলতে হবে অভীষ্ট ফল তোমাদের লাভ করতেই হবে। এ থেকে তোমরা নিজেদের বঞ্চিত করো না।

তোমরা মিতাহারী হও। আহারকালে আত্মস্থ হয়ে থাকবে—এ আহার

ক্রীড়ামোদের জন্য নয়, মত্ততার জন্য নয়, দৈহিক সৌন্দর্য ও কমনীয়তা বৃদ্ধির জন্য নয়, দেহ পালনের জন্যই জীবন রক্ষার জন্যই যাতে ব্রহ্মচর্য সাধনা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করা যায়।

তোমরা সর্বদা অতন্দ্রিত থাকবে। সারা দিন উপবেশনে স্থিতিতে গমনে আত্মস্থ হয়ে ধ্যেয় বিষয় অনুধ্যান করতে করতে রিপুদলের প্রভাব থেকে মনকে মুক্ত রাখবে। রাত্রির প্রথম যামে চংক্রমনে (পায়চারিতে) উপবেশনে ধ্যেয় বিষয় অনুধ্যান করতে করতে মনকে অক্লিন্ন শুদ্ধ রাখবে। রাত্রির দ্বিতীয় যামে বা মধ্যরাত্রিতে ডান পায়ের ওপর বাম পা রেখে সিংহের মত দক্ষিণ পার্শ্ব ভর করে শয়ন করবে গাত্রোত্থানের সংকল্প নিয়ে আত্মস্থ হয়ে। তৃতীয় যামে গাত্রোত্থান করে চংক্রমণে উপবেশনে ধ্যেয় বিষয়ে মন মগ্ন রেখে শুদ্ধ শান্ত থাকবে।

তোমরা স্মৃতিসম্পন্ন সদাজাগ্রত থাকবে। সম্মুখ গমনে পশ্চাদপসরণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে সংকোচনে প্রসারণে পাত্রচীবর ধারণে পানভোজনে মলমূত্র ত্যাগে গমনে স্থিতিতে উপবেশনে শয়নে জাগরণে এক কথায় সকল শারীরিক ক্রিয়ায় স্মৃতিযুক্ত হয়ে তা অনুশীলন করবে।

তোমরা নির্জনচারী হবে। অরণ্য বৃক্ষতল পর্বতকন্দর গিরিগুহা শ্মশান উন্মুক্ত প্রান্তর প্রভৃতি নির্জন জায়গায় শরীর সোজা রেখে পদ্মাসন করে ধ্যেয় বিষয়ের প্রতি মন নিবিষ্ট রেখে বসবে। লোলুপতা ত্যাগ করে নির্লোলুপ লোভহীন হবে, বিদ্বেষ পরিহার করে সর্বজীবের প্রতি অনুকম্পাপরায়ন হয়ে অবিদ্বিষ্ট মনে অবস্থান করবে। দেহ-মনের অবসাদ জড়তা বিনোদন করে নিরলস হবে। মনের সকল প্রকার চাঞ্চল্য ত্যাগ করে শান্তচিত্ত হবে। সংশয় বিদূরিত করে সংশয়হীন হবে। এভাবে বন্ধনমুক্ত অনাবিল মন নিয়ে বাস করবে।

ঋণগ্রস্ত-ঋণ-মুক্তিতে রোগাতুর রোগের উপশমে কারারুদ্ধ কারামুক্তিতে পরাধীন দাস দাসত্ব-শৃঙ্খল মুক্তিতে স্বাধীনতালাভে বিত্তবান বিত্ত নিয়ে বিপদসঙ্কুল মরুকান্তার অতিক্রমে যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আনন্দ অনুভব করে, তেমনি এরকম বন্ধনমুক্ত মন পরম স্বস্তি অনুভব করে আনন্দে বিভোর হয়। তখন মন কামনা ও কুপ্রবৃত্তির স্তর অতিক্রম করে ধ্যানের প্রথম স্তরে উপনীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সত্তা আনন্দরসে আপ্লুত থাকে। অতঃপর তা সাধনার প্রভাবে ধ্যানের প্রথম স্তর উত্তীর্ণ হয়ে দ্বিতীয় স্তর লাভ করে। তখন প্রীতিতে আনন্দে শান্তিতে সমস্ত চিত্ত প্লাবিত হয়ে যায়।

এভাবে ধ্যানী ভিক্ষু ক্রমশঃ ধ্যানের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে উন্নীত হয়। তার ধ্যানসমৃদ্ধ মন যখন শুদ্ধ নির্মল অচঞ্চল ও নমনীয় হয়, তখন সে আপনার মনকে ঋদ্ধের দিকে পরিচালিত করে এবং বিবিধ যোগবিভূতি প্রকাশে সক্ষম হয়—যথা সে এক হয়ে আপনাকে বহুরূপে রূপান্বিত করে এবং আপনার বহুরূপকে একীভূত করে; সে চোখের পলকে দৃশ্য ও অদৃশ্য হয়. প্রাচীর ও পাষাণের ভিতর দিয়ে অবাধে যাতায়াত করে, ভূগর্ভে প্রবেশ করে পুনরুত্থিত হয়, জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় এবং আকাশ শূন্যমার্গে বিচরণ করে। সে সাধনার প্রভাবে দিব্যকর্ণ লাভ করে দূরের নিকটের মানুষিক অতিমানুষিক সকল শব্দ শুনতে পায়। অতঃপর সে পরের চিত্ত উপলব্ধি করে, আপনার জন্ম-জন্মান্তর দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মত দেখতে পায় এবং জীবজগতের জন্ম-মৃত্যুর গোপন লীলা প্রত্যক্ষ করে। অবশেষে সে চারি আর্য সত্য উপলব্ধি করে অন্তরের সমস্ত রিপুদল নির্মূলিত করে বন্ধনহীন অর্হৎ হয়। তার পুনর্জন্মের অবসান ঘটে, আর কোন কর্তব্য থাকে না।

হে ভিক্ষুগণ, একেই বলা হয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ স্নাতক বেদজ্ঞ শ্রোত্রিয় নিষ্কলুষ অর্হৎ। কারণ, তার ক্লেশকর কষ্টকর দুঃখপ্রদ অনাগত জন্ম-জরা-মৃত্যু ইত্যাদি অকুশলরাশি শমিত বাহিত ধৌত বিদিত শ্রুত দূরীকৃত দূরীভূত।

বুদ্ধের এ ভাষণ শুনে ভিক্ষুগণ আনন্দ প্রকাশ করলেন।

ত্রিশ

সুপ্রিয় ছিলেন বারাণসীর এক সম্পন্ন গৃহস্থ। যেমনি ছিল তাঁর প্রচুর অর্থাগম, তেমনি ছিলেন তিনি দানে অকুণ্ঠহস্ত। সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি ছিল তাঁর বিরাট আকর্ষণ। কোন সাধু-সন্ন্যাসী তাঁর দ্বার থেকে অভুক্ত রিক্তহস্তে ফিরতেন না। তাঁর পত্নী সুপ্রিয়া ও ছিলেন ধর্মে-কর্মে সর্বতোভাবে স্বামীরই অনুগামিনী। স্বভাবলব্ধ গুণে তাঁরা উভয়েই অর্জন করেছিলেন বারাণসীতে খুব সুনাম।

কালক্রমে এই দম্পতি এলেন বুদ্ধের সংস্পর্শে। তাঁর উপদেশে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে আত্মনিবেদন করলেন তাঁর চরণে। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি তাঁদের জন্মাল প্রগাঢ় ভক্তি। দান ও ধর্মচর্যা হল তাঁদের জীবনের ব্রত। তাঁদের দ্বার ভিক্ষুদের জন্য অবারিত। ভিক্ষুরা প্রতিদিন তাঁদের গৃহ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করতেন। কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য চেয়ে তাঁরা কোনদিন বিমুখ হননি। কাজেই সময়ে অসময়ে আবশ্যকীয় বস্তুর জন্য ভিক্ষুরা প্রথমেই এ-গৃহে

উপস্থিত হতেন। এজন্য সুপ্রিয় ও তাঁর পত্নী কখনো বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। তাঁরা অন্তর দিয়ে ভিক্ষুদের সেবা করতেন। ভিক্ষুদের প্রতি তাঁদের অত্যধিক মমতা ভিক্ষুসমাজে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

সুপ্রিয়া যখনি বিহারে যেতেন, তখনি তিনি কার কি আবশ্যক জানতে চাইতেন। সে প্রয়োজন মিটাবার জন্য দুঃসাধ্য সাধনে করতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। একদিন তিনি অভ্যস্ত নিয়মে বিহারে গিয়ে কার কি প্রয়োজন জিজ্ঞেস করলেন। জনৈক রুগ্ন ভিক্ষু ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন, বললেন—ভগিনি আমায় একটু মাংসের যূষ দিতে পারেন? সুপ্রিয়া সম্মতি জানিয়ে বললেন—হ্যাঁ, আপনার জন্য তা পাঠিয়ে দেব, আপনি নিশ্চিন্ত হোন। সুপ্রিয়া বিহার ত্যাগ করে বাড়ী ফিরলেন, স্বামীকে বললেন—একজন রুগ্ন ভিক্ষু মাংসের যূষ চেয়েছেন, বাজার থেকে মাংস আনিয়ে দাও। স্বামী তৎক্ষণাৎ লোক পাঠালেন মাংস কিনে আনার জন্য। সে সমস্ত বাজার ঘুরে কোথাও মাংস না পেয়ে ফিরে এসে গৃহকর্তাকে জানাল—হুজুর, কোথাও মাংস পাওয়া গেল না। গৃহকর্তা আবার অন্যত্র পাঠালেন মাংসের জন্য। এদিকে তিনি নির্দেশ দিয়ে আপনার কাজে চলে গেলেন। লোকটি খুঁজে কোথাও মাংস না পেয়ে ফিরে এসে সুপ্রিয়াকে জানাল—মা, কোথাও মাংস পাওয়া গেল না। সুপ্রিয়া মহাফাঁপরে পড়লেন; রুগ্ন ভিক্ষু মাংসের যূষ চেয়েছে; না পেলে হয়ত ভিক্ষুর রোগ বেড়ে যাবে। তিনি ভাবতে লাগলেন কি করা যায়। তার ওপর তিনি কথা দিয়েছেন যূষ পাঠিয়ে দেবেন বলে। সে আশায় ভিক্ষু বসে থাকবেন। তাঁকে কি এ অবস্থায় নিরাশ করা যায়? যে বাড়ী থেকে কোনদিন কোন ভিক্ষু চেয়ে বিমুখ হননি, সে বাড়ী এমনিভাবে ভিক্ষুকে আশা দিয়ে নিরাশ করবে—একথা ভাবতেই সুপ্রিয়ার মন কেমন করে উঠল। তিনি কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তিনি আপন মনে কি বলতে বলতে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। তার একধারে দেয়ালে টাঙানো ছিল একখানি ঝক্ ঝকে ছুরি। এই শাণিত ছুরিখানি যেন আরও ঝক্ ঝক্ করে উঠল। সুপ্রিয়া ছুরিখানি হাতে তুলে নিলেন, ধার পরীক্ষা করলেন। হঠাৎ তিনি সে ছুরি দিয়ে নিজের উরুদেশ থেকে মাংস কেটে দাসীকে ডেকে তার হাতে মাংস খণ্ড তুলে দিয়ে বললেন—এর যূষ তৈরী করে অমুক ভিক্ষুকে দিয়ে আয়। সুপ্রিয়ার আবৃত ক্ষতস্থান থেকে দরদর রক্ত ঝরতে লাগলো। দাসী অন্ধকার ঘরের এ রহস্য টের পেল না, আপনার কর্তব্য পালনে চলে গেল।

যন্ত্রণায় অধীর হয়ে সুপ্রিয়া শয্যা আশ্রয় করলেন। তাঁর আদেশে ভৃত্যেরা গৃহকর্তাকে বাড়ীতে ডেকে আনল। গৃহকর্তা পত্নীর অবস্থা দেখে প্রথমতঃ ভীত শঙ্কিত হলেন। তারপর তিনি কালবিলম্ব না করে চিকিৎসক আনিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। চিকিৎসায় যন্ত্রণার একটু উপশম হলে তিনি পত্নীকে এ বিপদের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সুপ্রিয়া সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত খুলে বললেন। শুনতে শুনতে স্বামীর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। পত্নীর অনুপম ত্যাগ ও ধৈর্য তাঁকে বিস্মিত করল। এজন্য পত্নীর প্রতি তাঁর জাগলো গভীর শ্রদ্ধা। তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পত্নীর প্রশংসা করতে লাগলেন।

ভক্ত সুপ্রিয় যতই এ ত্যাগের কথা ভাবেন, ততই তাঁর অন্তরে পুলকের সঞ্চার হয়। তিনি সশিষ্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন নিজগৃহে এবং বুদ্ধকে জানালেন সুপ্রিয়ার মহাত্যাগের ইতিবৃত্ত। আহারান্তে বুদ্ধ বিহারে ফিরে গিয়ে ভিক্ষুদের সমবেত করে জিজ্ঞেস করলেন কে সুপ্রিয়ার কাছে মাংস চেয়েছিল। সে ভিক্ষু বুদ্ধের সম্মুখে নতজানু হয়ে বলল—ভদন্ত, আমিই সেদিন মাংসের যূষ চেয়েছিলাম।

বুদ্ধ—তা কি তোমার কাছে পাঠানো হয়েছিল ?

ভিক্ষু—হ্যাঁ, ভদন্ত।

বুদ্ধ—তা কি তুমি খেয়েছ ?

ভিক্ষু—হ্যাঁ, ভদন্ত, তা আমি খেয়েছিলাম ?

বুদ্ধ—তা কিসের মাংস তুমি কি জিজ্ঞেস করেছিলে ?

ভিক্ষু—না, ভদন্ত।

বুদ্ধ—ওহে অপদার্থ, তুমি বিচার না করে তা খেয়ে ফেললে ! ওহে অপদার্থ, তুমি নরমাংস খেয়েছ।

তখন বুদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যেন নরমাংস ভক্ষণ না করে, তা তোমাদের নিষিদ্ধ। এই বলে তিনি একটি বিনয়বিধি প্রবর্তন করলেন।

একত্রিশ

জেতবনের অনতিদূরে ছিল একটি গ্রাম। সে গ্রা:মর একান্তে বইত একটি ক্ষুদ্র নদী। নদীর দুই ধারের জমিগুলো ছিল খুব উর্বর। ফসলের সময় সবুজের সমারোহ। নদীতীরে যেন সৌন্দর্যের হাট খুলে দিত। এ নদীর ধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল সে গ্রামের অধিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের চাষ।

একদিন ব্রাহ্মণ আপনার জমিতে বসে আপন মনে আগাছা তুলে ফেলছিলেন। বুদ্ধ ধীর মন্থর গতিতে নদী তীরে পায়চারি করতে করতে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণ একবার চোখ তুলে তাঁর পানে তাকালেন, পরক্ষণেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আপনার কাজে মনোনিবেশ করলেন। তখন বুদ্ধ মৌনতা ভঙ্গ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—ব্রাহ্মণ, কি করছ? তিনি চোখ না তুলেই উত্তর দিলেন—হে গৌতম, ক্ষেত পরিষ্কার করছি। আর অধিক বাক্য ব্যয় না করে বুদ্ধ প্রস্থান করলেন। পরদিন তিনি আবার সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেদিন জমিতে লাঙল দেওয়া হচ্ছিল। ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান করছিলেন। বুদ্ধ আগের দিনের মত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—ব্রাহ্মণ, কি কাজ হচ্ছে? উত্তর হল—হে গৌতম জমিতে লাঙল দেওয়া হচ্ছে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর পেয়ে বুদ্ধ চলে গেলেন। এভাবে তিনি আরও কয়েকবার নদী তীরে গিয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে আলাপ করলেন। আর একদিন বুদ্ধকে আসতে দেখেই ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে বললেন—এসো এসো, সত্যিই ভাই তুমি মনের মত লোক; সেই ক্ষেত পরিষ্কারের দিন থেকে তুমি আপনজনের মত সহৃদয়ভাবে আমার সঙ্গে আলাপ করেছ; তুমিই সত্যিকার বন্ধু; যদি আমার ক্ষেতে ভাল ফসল হয়, তুমিও তার ভাগ পাবে। এই বলে ব্রাহ্মণ উচ্ছ্বসিত আবেগে বুদ্ধকে বন্ধুরূপে বরণ করলেন।

কিছুদিন কেটে গেল। ফসলের ফলন সুরু হল। সেবার ব্রাহ্মণের ক্ষেতে ফলন হল প্রচুর। শস্যে ঢাকা পড়ল ক্ষেত। তিনি প্রতিদিন ক্ষেতের আলে দাঁড়িয়ে অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে থাকতেন শস্যের পানে। তিনি দিন গুনতে লাগলেন কবে পাকা শস্য ঘরে তুলবেন; যথাসময়ে শস্যে পাক ধরে সোনার রঙ মেতে উঠল। ব্রাহ্মণ কল্পনার রঙীন পাখা ভর করে তাঁর ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির কথা ভাবতে লাগলেন। যথারীতি মজুরের ব্যবস্থা করে শস্য কাটার দিন ঠিক হল। নির্ধারিত দিনের আগের রাতে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। প্রবল ঝড় সুরু হল। ঝড়ের সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে মুষল ধারায় বৃষ্টি নেমে এল। এ দৈব দুর্বিপাকে ব্রাহ্মণের ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই নষ্ট হয়ে গেল। তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি ক্ষোভে দুঃখে ধৈর্যহারা হয়ে আহার ত্যাগ করে শয্যা গ্রহণ করলেন। বাড়ীর লোকেরা নানাভাবে চেষ্টা করেও তাঁকে আহার গ্রহণ করাতে পারলেন না।

সেদিন বুদ্ধ অপরাহ্নে ব্রাহ্মণের বাড়ীর দ্বারে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর আগমন বার্তা শুনে ব্রাহ্মণ বেরিয়ে এলেন এবং সংবর্ধনা করে তাঁকে বাড়ীর

পালাতে লাগলো। সেই সমস্ত গ্রাম ক্রমে জনশূন্য হতে থাকল। তার অত্যাচারে কোশল রাজ্যের এক বিস্তীর্ণ অংশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। এ বৃত্তান্ত যখন রাজার কানে পৌঁছল, তিনি তখন তার বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র অভিযান পাঠাতে সংকল্প করলেন। রাজার বিরাট বাহিনী অরণ্য ঘেরাও করে তাকে বধ করবে।

পুরোহিত ভার্গব ও তার পত্নী জানতেন দস্যু অঙ্গুলিমাল অপর কেউ নয়, এ তাঁদের পুত্র অহিংসক। তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান প্রেরণের সংবাদে ভার্গব বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। কুলাঙ্গার নরঘাতক পুত্রের মৃত্যু তিনি কামনা করছিলেন। কিন্তু মায়ের প্রাণ পুত্রের জীবন আশংকায় চঞ্চল হয়ে উঠল। ছেলেকে রাজরোষ হতে রক্ষার জন্য তিনি ছেলের কাছে যাবেন স্থির করলেন। ভার্গব পত্নীকে সতর্ক করবার জন্য বললেন—তুমি যেওনা তোমাকে ও ছাড়বে না, কেন শুধু প্রাণ দিতে যাবে! অহিংসকের জননী বললেন—আমার প্রাণ দিয়েও আমি তাকে বাঁচাবো, আমাকে যদি সে মারে, তবে মরবার আগে তাকে বলব এ রাজ্য ছেড়ে প্রাণ বাঁচাও।

এই সময় বুদ্ধ কোশলের শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তাঁর প্রতিদিনের নিয়ম ছিল উপযুক্ত পাত্রের জন্য বুদ্ধচক্ষে লোকাবলোকন। সেদিকার লোকাবলোকনে প্রতিভাত হল দস্যু অঙ্গুলিমাল। করুণাঘনের করুণাধারা বইল তার পানে। যে এখন দুর্ধর্ষ দস্যু, তার পেছনে রয়েছে বিরাট সুকৃতি। কিন্তু সে যে আজ গর্ভধারিনী জননীকে হত্যা করবে; তাতে তার সকল সুকৃতি আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, মুক্তির পথ রুদ্ধ হবে। তার আগে যে উজ্জ্বল সংস্কার চাপা পড়েছে তা উদ্ধার করতে হবে, যে শুভ্র চেতনা ঘুমিয়ে আছে তা জাগিয়ে তুলতে হবে? বুদ্ধ জেতবন ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন সেই অরণ্যাভিমুখে। মাতৃহত্যার মহাপাপ থেকে নিবৃত্ত করে অহিংসার পথে আনার অভিযান সুরু হল।

বুদ্ধ যখন লোকালয়ের সীমা অতিক্রম করে সেই অরণ্যপথ ধরে চললেন, রাখাল বালকেরা তাঁকে নিষেধ করল, অনুনয় বিনয় করে বলল—যাবেন না ওদিকে, নিষ্ঠুর নরঘাতক অঙ্গুলিমাল থাকে ওখানে আপনাকে দেখলেই হত্যা করবে, কোন পথচারী একলা গিয়ে ওখান থেকে আর ফিরে আসতে পারে না। তার হাতে প্রাণ হারাবেন না। বুদ্ধ এগিয়ে চললেন নীরবে। রাখাল বালকদের প্রাণ কেঁদে উঠল। তারা শূন্য দৃষ্টিতে তাঁর পানে চেয়ে রইল।

অঙ্গুলিমাল এ পর্যন্ত ৯৯৯ জন লোককে হত্যা করে তাদের অঙ্গুলি সংগ্রহ

করেছে। আর একটি লোককে হত্যা করতে পারলেই তার সহস্র নরহত্যা সম্পূর্ণ হবে। বহু চেষ্টা করেও সে আর একটি মানুষকে ধরতে পারছিল না। কারণ সকলেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। কেউ আর অঙ্গুলিমালের দৃষ্টি সীমায় আসত না। সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ৯৯৯ সংখ্যাকে হাজারে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু কোথাও আর লোকের সন্ধান পাওয়া যায় না। ব্রতভঙ্গের দুর্ভাবনা তাকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। সে অধৈর্য হয়ে পথে পথে বিচরণ করতে লাগলো। এমন সময় সে দেখতে পেল এক সন্ন্যাসী উদাস চোখে অন্যমনা হয়ে পথ বেয়ে চলেছে। অঙ্গুলিমাল তীর বেগে ছুটল তার পানে। আজ সহস্র নরহত্যার ব্রত সম্পূর্ণ হবে। গুরুপদে সহস্র অঙ্গুলির মালা নিবেদন করবে।

অঙ্গুলিমাল যতই বেগে ছোটে সন্ন্যাসীর নিকটে পৌঁছতে পারে না কিছুতেই। তাদের উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সমানই থেকে যায়। অথচ সন্ন্যাসী প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে না। তিনি তো স্বাভাবিক গতিতেই ধীরে মন্থর পদে চলেছেন। তবে কেন অঙ্গুলিমাল এত জোরে ছুটেও তাঁকে ধরতে পারছে না? যে অঙ্গুলিমাল এতদিন অরণ্যে থেকে ব্যাঘ্র মৃগ প্রভৃতি অতিদ্রুতগামী প্রাণীদেরও গতিবেগে পরাস্ত করেছে, আজ সে একজন ধীরগামী সন্ন্যাসীকে ছুটে গিয়েও ধরতে পারছে না! একি আশ্চর্য! অধীর হয়ে অঙ্গুলিমাল শেষে চীৎকার করে বলল—শ্রমণ, তুমি একটু দাঁড়াও, ক্ষণেক অপেক্ষা করো; আমাকে তোমার কাছে যেতে দাও। বুদ্ধ বললেন—আমি তো দাঁড়িয়েই আছি, তুমিই অস্থির হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছো, ক্ষণকাল অবস্থান করো। অঙ্গুলিমালের গতি স্থির হয়ে গেল। তখন বুদ্ধ দিলেন তাকে ধর্মোপদেশ। তাঁর অমৃতবাণী শ্রবণে অঙ্গুলিমালের হৃদয় অভিষিক্ত হল। গভীর অনুতাপ উপস্থিত হল। নিহত ৯৯৯ জনের মৃত্যুকালীন ভয়বিহ্বল পাংশুমুখগুলো তার মানসপটে ভেসে উঠল। সে কাতর হয়ে বলল—ভদন্ত, আমায় রক্ষা করুন, আমার যে অন্যায়ের সীমা নেই।

বুদ্ধ অঙ্গুলিমালকে শিষ্য করে জেতবনে নিয়ে এলেন। এদিকে তার জননী উন্মাদিনীর মত অরণ্যের পথে পথে খুঁজে কোথাও পুত্রের সন্ধান পেলেন না। শেষে পুত্রের জীবন সম্বন্ধে অশেষ উৎকণ্ঠা ও আশংকায় নিপীড়িত হৃদয়ে হতাশ ভাবে গৃহে ফিরলেন। তখন অসংখ্য সুসজ্জিত সৈন্য সেই বন অবরোধ করে অঙ্গুলিমালকে হত্যা করবার জন্য যাত্রায় উদ্যত হয়েছিল। তাকে দমন করতে না পারলে কোশলের লোকের যে নিরাপত্তা নেই।

রাজা প্রসেনজিৎ যেখানেই যান আর যা কিছুই করুন, বুদ্ধের চরণ বন্দনা না

করে এবং তাঁকে সমস্ত না জানিয়ে তিনি একপদও অগ্রসর হতেন না। তাই এ অভিযানের আগেও তিনি উপস্থিত হলেন জেতবনে বুদ্ধের সমীপে। বুদ্ধ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—মহারাজ, কোথায় চলেছেন? উত্তরে রাজা বললেন—দুর্ধর্ষ নরঘাতক দস্যু অঙ্গুলিমালের অত্যাচারে সমগ্র কোশলবাসী উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্যে দিন যাপন করছে, তাকে দমন না করলে আর রাজ্যের কল্যাণ নেই। বুদ্ধ বললেন মহারাজ, ধরুন সে যদি হঠাৎ নরহত্যা বন্ধ করে জীবহিংসা ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষু হয় এবং শান্ত সংযত হয়ে বাস করে, তাহলে আপনি তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন?

প্রসেনজিৎ কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—ভদন্ত, সেই ঘোরতর অপরাধী যদি অনুতপ্ত হয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করে শান্ত সংযত হয়, তবে আমি তার সকল অপরাধ মার্জনা করে তাকে ভিক্ষুর প্রাপ্য ভক্তি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দান করব। বুদ্ধ তখনি ভিক্ষুদের আদেশ দিলেন—তোমরা কেউ অঙ্গুলিমালকে মহারাজের নিকট এনে উপস্থিত করো। এ নির্দেশ শুনে রাজা চমকে উঠলেন। তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি অঙ্গুলিমালের মত দস্যুকে বুদ্ধ তাঁর শিষ্য করবেন।

অঙ্গুলিমাল এসে বুদ্ধকে প্রণাম করে দাঁড়াল। রাজা বিস্মিত নেত্রে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। যার নামে কোশলবাসী সন্ত্রস্ত সে অঙ্গুলিমাল এখন মুণ্ডিতমস্তক পীতবাসপরিহিত শ্রমণ; তার কোথাও নির্মমতার চিহ্ন মাত্র নেই, তার মুখে ফুটে উঠেছে শান্ত সংযত ভাব। রাজা হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন—আশ্চর্য! আশ্চর্য! কঠিন পাষাণ দ্রবীভূত হয়েছে! বজ্র কুসুমে পরিণতি লাভ করেছে! যে ছিল ঘোরতর পাপী সে আজ মহাপুণ্যবান! প্রভু এ তোমার মহিমা; আমি পাপীকে অপরাধীকে রাজদণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করে ব্যথিত ক্লিষ্ট করতে পারি, কিন্তু তার মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারি না, চরিত্র সংশোধন করতে পারিনা, আপনি বিনা দণ্ডে বিনা শস্ত্রে দুর্ধর্ষ দস্যুকে শান্ত করেছেন।

যেদিন ভিক্ষু অঙ্গুলিমাল ভিক্ষাপাত্র হস্তে শ্রাবস্তীতে প্রথম ভিক্ষায় বেরুলেন, সেদিন লোক অঙ্গুলিমাল এসেছে শুনে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগলো। প্রতি গৃহে লোক দ্বার বন্ধ করে রইল। তিনি শূন্য পাত্র নিয়ে জেতবনে ফিরলেন। তাঁকে নির্বিকার দেখে এর পর যখন ভয় ভাঙল, তখন দুষ্ট লোকেরা তাঁকে পথে তিরস্কার ভর্ৎসনা প্রহার করতে লাগলো। প্রতিদিন তিনি লাঞ্ছিত অবমানিত হতে লাগলেন। তিনি এ সমস্ত আপনার কৃত কর্মের

ফল রূপে গ্রহণ করে নীরবে সহ্য করতেন এবং মৈত্রীস্নিগ্ধ অন্তরে তাদের ক্ষমা করতেন। এমনিভাবে প্রহৃত হয়ে একদিন তিনি জেতবনে ফিরবার সময় দেখলেন একটি রমণী পথের ধারে বৃক্ষতলে প্রসববেদনায় অত্যন্ত অভিভূত হয়ে কাতর আর্তনাদ করছে। অসহায়া রমণীর সে দুঃসহ যন্ত্রনা লক্ষ্য করে তাঁর হৃদয় করুণায় বিগলিত হল। তিনি নিজের প্রহার বেদনা বিস্মৃত হয়ে ছুটে গেলেন বুদ্ধের কাছে এবং সেই রমণীর ব্যথা মোচনের জন্য কাতর প্রার্থনা জানালেন। বুদ্ধ বললেন—অঙ্গুলিমাল, তুমি এখনি সেই রমণীর কাছে ফিরে যাও, তাকে বল যে তুমি কখনো স্বেচ্ছায় প্রাণী হিংসা করোনি, এ সত্য বচনের ফলে তার স্বস্তি হোক তার গর্ভের স্বস্তি হোক।

এ নির্দেশ শুনে অঙ্গুলিমাল বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বুদ্ধের মুখের পানে করুণভাবে তাকালেন, বললেন—ভদন্ত, আমি যে দুটি একটি নয়, ৯৯৯ জন লোককে হত্যা করেছি, স্বেচ্ছায় প্রাণী হিংসা করিনি এ কথা কি করে বলি। বুদ্ধ শান্ত কণ্ঠে বললেন—"তা ঠিক বটে, তবে তুমি তখন ছিলে অন্য মানুষ—দস্যু অঙ্গুলিমাল। এখন তোমার নব জন্মলাভ হয়েছে। তুমি এখন নিষ্কলঙ্ক ঋষিকুলের সন্তান, সুতরাং বিনা দ্বিধায় সত্যবচন উচ্চারণ করো।" অঙ্গুলিমাল তখনি ফিরে গেলেন প্রসব-বেদনাতুরা রমণীর কাছে এবং তার কাণের কাছে উচ্চারণ করলেন—ভগিনি, যে থেকে আমি নতুন ঋষি জীবন পেয়েছি, সেই থেকে কখনো স্বেচ্ছায় প্রাণিবধ করিনি। এ সত্য বচনের ফলে তোমার স্বস্তি হোক, তোমার গর্ভের স্বস্তি হোক। বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই রমণীর যন্ত্রনার উপশম হল এবং সে বিনা ক্লেশে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। বুদ্ধ অঙ্গুলি-মালকে বললেন—তোমার অহিংসক নাম আজ সার্থক, তুমি যে নিষ্ঠায় যে অটল বিশ্বাসে সাধনার পথে অগ্রসর হয়েছ, অচিরেই তোমার সিদ্ধিলাভ হবে। সত্যিই অঙ্গুলিমাল অল্পদিনের মধ্যেই অন্তরের সকল বন্ধন ছিন্ন করে অর্হত্ব লাভ করলেন।

বত্রিশ

প্রাত্যহিক ধর্মসভার অধিবেশনের সময় ছাড়াও ভক্তেরা জেতবনে এসে বুদ্ধের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতেন। সাক্ষাৎকালে বুদ্ধ উপযুক্ত আধার বিবেচনা করে ধর্মোপদেশ দান করতেন। একদিন পাঁচজন লোক জেতবনে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষু আনন্দকে অনুরোধ করলেন—ভদন্ত, ভগবানের সাক্ষাতের আশায় আমরা বহু দূর থেকে এসেছি, তাঁর মুখে আমরা ধর্মকথাও শুনতে চাই; অনুগ্রহ করে

এর ব্যবস্থা করুন। ভিক্ষু আনন্দ যথারীতি তাঁদের নিয়ে গেলেন বুদ্ধের কাছে। তাঁরা তাঁর চরণ বন্দনা করে আগ্রহ প্রকাশ করলেন ধর্ম শ্রবণের। সম্ভাষণের পর বুদ্ধ সুরু করলেন ধর্মোপদেশ। এ শ্রোতাদের একজনের চোখের পাতা ভারী হয়ে এল দুই চারি কথা শুনতে না শুনতে। তিনি অল্পক্ষণ পরেই গা এলিয়ে দিয়ে গভীর নিদ্রামগ্ন হলেন। আর একজন মেঝের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আপন মনে আঙুল দিয়ে লিখতে লাগলেন। তৃতীয় ব্যক্তি সমীপস্থ ছারা গাছটিকে নাড়তে লাগলেন। চতুর্থ ব্যক্তি তন্ময় হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এঁদের কারো কর্ণকুহরে ধর্মকথা যে প্রবেশ করছে না, তা লোকের স্থূল দৃষ্টিতেও স্পষ্ট। কিন্তু পঞ্চম ব্যক্তি একাগ্র মনে শুনতে লাগলেন সে ধর্মোপদেশ। বুদ্ধের প্রতি কথা শুধু তাঁর কানে নয়, প্রাণে গিয়ে পৌঁছল। তিনি শুনতে শুনতে মগ্ন হয়ে গেলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ হাতপাখা দিয়ে বুদ্ধকে বাতাস করছিলেন, আর লক্ষ্য করছিলেন এ পাঁচজনের ভাবগতিক। তিনি বিনম্র বচনে বললেন—ভদন্ত, আপনি ধর্মামৃত বর্ষণ করছেন, এ শ্রোতাদের মধ্যে মাত্র একজনই তা শুনছেন, আর সকলে নিজের নিজের ভঙ্গীতেই সময় কাটাচ্ছেন। বুদ্ধ মন্তব্য করলেন—ধর্মকথা শোনা কি অত সহজ যে সবাই শুনবে, এ জন্য চাই শুভ্র সংস্কার, এদের মাত্র একজনেরই আছে সে সংস্কার, তাই সে একাগ্র মনে শুনছে, তার মন ডুবে গেছে।

বুদ্ধের মন্তব্য শুনে আনন্দ বললেন—ভদন্ত, আপনি যখন ধর্মকথা শোনান, তখন মনে হয় অমৃত বারি বর্ষণ হয়, সমস্ত মনপ্রাণ অভিভূত হয়ে যায়, এমন মধুর কথা লোকে কেন শুনতে চায় না?

বুদ্ধ—আনন্দ, তুমি ধর্ম শ্রবণ এত সহজ মনে কর?

আনন্দ—ভদন্ত, তাহলে কি অত্যন্ত কঠিন?

বুদ্ধ—আনন্দ, হাঁ।

আনন্দ—ভদন্ত, কেন?

বুদ্ধ—পূর্ব জন্মের শুভ্র সংস্কার চাই। কয়টা লোক সে সংস্কার নিয়ে জন্মায়? যারা জন্ম জন্মান্তরে ধর্মচেতনাশূন্য অর্থহীন বাক্যালাপে কাটিয়েছে, আমোদ প্রমোদ খুঁজে বেড়িয়েছে, তাদের ভাল লাগবে কেন ধর্মকথা? যেখানে নাচ গান, যেখানে সুরাপান, যেখানে কৌতুক তামাসা, সেখানেই পড়ে থাকে তাদের মন। তারা কি করে হৃদয়ঙ্গম করবে ধর্মের গভীর তত্ত্ব, কি করে জাগবে তাদের মনে ধর্মরসবোধ?

আনন্দ—ভদন্ত, তা হয় কেন?

বুদ্ধ—আনন্দ, অন্তরে উদ্ভূত অনুরাগের জন্য দ্বেষের জন্য মোহের জন্য তৃষ্ণার জন্য মানুষ কল্যাণের পথ পরিহার করে অকল্যাণের পথ অবলম্বন করে।

অতঃপর বুদ্ধ গাথায় বললেন—

"অনুরাগের মত আগুন নেই, দ্বেষের সমান গ্রহণ নেই, মোহের সমান জাল নেই এবং তৃষ্ণার মত নদী নেই।"

[অনুরাগের দহনজ্বালা অত্যন্ত তীব্রতর। একে সহজে নিবানো যায় না। বাঘ, কুমীর ইত্যাদির গ্রহণের চেয়ে দ্বেষাবেশ ভীষণতর। বাঘ ইত্যাদির গ্রহণে একটি মাত্র শরীর হারাতে হয়, কিন্তু দ্বেষ জন্ম জন্মান্তর ধরে অন্তরকে নিষ্পিষ্ট করে অশেষ দুঃখ উৎপাদন করে। মোহের জাল মানুষের মনকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে ক্ষুদ্র সংসারসীমায় বেঁধে রাখে। এই মোহজাল ছিন্ন করে সে সহজে উদার জগতের পানে অগ্রসর হতে পারে না। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদী যতই খরস্রোতা হোক না কেন, এরা দুস্তর নয়। কিন্তু মানুষের অন্তরে প্রবাহিত তৃষ্ণারূপ নদী অতিশয় দুস্তর। এর প্লাবন অন্তহীন। এর কবলে পড়ে জীবের দুঃখ দুর্দশার সীমা থাকে না]

এ উপদেশ শুনে সে আগ্রহশীল ধর্মরসজ্ঞ শ্রোতার অন্তর উদ্বুদ্ধ হল। তিনি ধর্মচক্ষু লাভ করলেন।

তেত্রিশ

শ্রাবস্তীর এক পল্লীতে ছিল একটি মধ্যবিত্ত ক্ষুদ্র পরিবার। পরিবারে তিনটি মাত্র প্রাণী—স্বামী, স্ত্রী ও তাদের একমাত্র পুত্র। ক্ষুদ্র হলেও সংসারটি ছিল সুখের। গৃহকর্তার কর্মকুশলতার জন্য অবস্থা ছিল মোটামুটি ভাল। গৃহিণী ও অনলসভাবে সংসারটিকে গুছিয়ে গুটিয়ে পরিপাটি করে তুলেছিল। পরস্পরের প্রতি তাদের মমতার টান এত বেশী ছিল যে, তারা পরস্পরকে না দেখে থাকতে পারত না। বিশেষভাবে স্বামী স্ত্রী উভয়েই পুত্রকে চোখের আড়াল করতে পারত না। সে অত্যন্ত আদুরে ছিল বটে, কিন্তু কোন আবদার করত না। এজন্য শান্ত ছেলে বলে পাড়ায় তার সুখ্যাতি রটেছিল। কি জানি কেন হঠাৎ ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা তার চিত্তাকর্ষক মনে হল। মাঝে মাঝে সে জেতবনের ধর্মসভায় ও উপস্থিত থাকত। ধর্মবোধ তার যাই হোক না কেন, তার খেয়াল চাপল সে ভিক্ষু হবে। সে যখন তার মনের সংকল্প বাবামাকে জানাল, তারা শিউরে উঠল, বলল—বাবা, তুমি আমাদের একমাত্র পুত্র সবে ধন নীলমণি,

তোমায় ছেড়ে কি করে থাকবো; ওকথা মুখে এনো না এখন, আমাদের মৃত্যুর পর যা খুশী করো। বাবামার সে কথা সে মানতে চাইল না। উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক চলল। যতই বাবামা বাধা দিতে লাগলো, ততই পুত্রের ভিক্ষু হবার আকাঙ্খা দুর্বার হয়ে উঠল।

একদিন তাদের অজ্ঞাতে পুত্র জেতবনে গিয়ে ভিক্ষুদের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করল। তার বাবা খুঁজতে খুঁজতে জেতবনে তার দেখা পেল এবং তাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য অনেক কান্নাকাটি করল। কিন্তু কোন ফল হল না। বাবা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ভাবতে লাগলো—ছেলে যখন চলে গেল, আমার আর সংসারে থেকে লাভ নেই; আমি ও সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু হয়ে ছেলের কাছেই থাকব। অবশেষে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করল। স্বামী পুত্রের প্রব্রজ্যার সংবাদে মর্মাহতা গৃহিণীও ভিক্ষুণীদের আশ্রমে গিয়ে প্রব্রজিতা হল। ঝঞ্ঝাহত ছিন্নমূল বৃক্ষের মত সুখের এই পরিবারটি এভাবে উন্মূলিত হল। সমস্ত বাড়ী যেন শূন্য শ্মশান হয়ে গেল।

স্বামী স্ত্রী ও পুত্র সন্ন্যাস নিল বটে, কিন্তু বৈরাগ্যের বিন্দুমাত্র তাদের মনে এল না। মঠের শান্ত পবিত্র পরিবেশ কোন দাগ কাটল না মনে। তারা তিনজনে খায় দায় এবং বাকী সময় কখনো ভিক্ষুদের মঠে কখনো ভিক্ষুনী আশ্রমে একত্রে বসে সাংসারিক কথাবর্তায় কাটিয়ে দেয়। সারাদিন তাদের এ আলাপ-আলোচনা যেন ফুরোতে চায় না। তাদের অবিশ্রান্ত আলাপগুঞ্জনে মঠের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল এবং ভিক্ষুণীদের সাধনা বিঘ্নিত হতে লাগলো। তাদের আচরণে উত্যক্ত হয়ে ভিক্ষুরা বিষয়টি বুদ্ধের কর্ণগোচর করলেন। তখনি বুদ্ধ তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—ওহে, সত্যিই কি তোমরা একত্র হয়ে সাংসারিক আলাপ-আলোচনায় রত থাক? তারা বিনীতভাবে উত্তর করল—হাঁ, ভদন্ত।

বুদ্ধ—কেন তা কর? এ তো গৃহত্যাগী, প্রব্রজিতের অকর্তব্য, অকরণীয়।

নবাগতত্রয়—ভদন্ত, আমরা পরস্পরকে না দেখে থাকতে পারি না।

বুদ্ধ—তোমরা সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছ। এখানেও সংসারের মায়ার বন্ধনে নিজেদের জড়িয়ে ফেলছ কেন? প্রিয়ের অদর্শন এবং অপ্রিয়ের দর্শন 'দুইটি'ই দুঃখজনক ক্লেশকর। অতএব প্রিয় ও অপ্রিয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনপেক্ষ হয়ে আত্মসাধনায় মগ্ন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অতঃপর বুদ্ধ গাথায় বললেন—"অকরণীয় কর্মে আত্মনিয়োগ করে এবং করণীয় কর্ম ত্যাগ করে

যে আপনার কল্যাণের পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে সুখ খোঁজে, সে অধ্যাত্মসাধনরত ব্যক্তিকে স্পৃহনীয় মনে করে।"

"প্রিয় ও অপ্রিয় উভয় থেকে দূরে থাকবে। প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়সংযোগ দুইটিই দুঃখপ্রদ। অতএব প্রিয়ানুরাগী হয়োনা। যাঁদের প্রিয় অথবা অপ্রিয় কেউ নেই, তাঁদের গ্রন্থি ছিন্ন, তাঁরা বন্ধনহীন।"

বুদ্ধের এ উপদেশের মধ্যে সমবেত বহু ভিক্ষুভিক্ষুনী আলোর সন্ধান পেলেন। কিন্তু যাদের উপলক্ষ্য করে এ উপদেশ বর্ষিত হল, সেই নবাগত স্বামীস্ত্রী ও পুত্র পরস্পরের প্রতি অচ্ছেদ্য মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারেই প্রত্যাবর্তন করল।

চৌত্রিশ

একজন ধনী বণিক বিপুল বস্ত্রসম্ভার নিয়ে বারাণসী থেকে এলেন শ্রাবস্তীতে। কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি নদী পেরিয়ে অন্যত্র যাবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন। যেদিন তিনি রওনা হবেন, সেদিন প্রবল বৃষ্টিপাত হয়ে নদীর জল স্ফীত হয়ে উঠল। শকট চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সাত দিন ধরে নদী জলপূর্ণ রইল। বণিকের যাত্রায় বাধা পড়ল। ঠিক এই সময়ে শ্রাবস্তীতে বিঘোষিত হল নক্ষত্রোৎসব। উৎসবে নগরী মেতে উঠল। সপ্তাহকাল ধরে চলল এ উৎসব। উৎসব মত্ত নরনারী ভিড় করল এ বণিকের পণ্য শিবিরে, অপ্রত্যাশিতভাবে বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রচুর অর্থাগম হতে লাগলো। তাঁর আনন্দের সীমা রইল না।

একদিন বুদ্ধ আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষায় বেরুলেন। যখন তিনি সে বণিকের শিবিরের পাশ দিয়ে অগ্রসর হলেন, তখন বণিক গালে হাত দিয়ে চিন্তামগ্ন। তিনি ভাবছিলেন 'এখানে এসে প্রচুর লাভ হল, আরও লাভের সম্ভাবনা আছে। এখনো প্রচুর পণ্য রয়েছে, বাড়ী ফিরে গেলে আসতে দেরী হবে, না বাড়ী যাব না, এখানেই বর্ষা হেমন্ত শীত গ্রীষ্ম কাটিয়ে পণ্য নিঃশেষ করে বাড়ী ফিরব।' ভাবতে ভাবতে তিনি এত তন্ময় হয়ে রইলেন যে কোন দিকে তাঁর খেয়াল নেই। বুদ্ধ একবার তাঁর পানে তাকিয়ে স্মিত হাসি হাসলেন। আনন্দ ও হাসি দেখে ভাবলেন—বিনা কারণে ভগবান হাসেন না, নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে। এ রহস্য জানবার জন্য আনন্দের কৌতুহল জাগলো। তখনি তিনি বুদ্ধকে জিজ্ঞেস

করলেন—ভদন্ত, আপনি হাসলেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন—এই ধনী বণিক মশগুল হয়ে ভাবছে তার লাভের কথা, ভবিষ্যৎ লাভের স্বপ্নে বিভোর হয়ে এখানে 'বর্ষা হেমন্ত শীত গ্রীষ্ম কাটিয়ে দেবার সংকল্প করছে এবং প্রচুর অর্থ নিয়ে বাড়ী প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু সে বুঝতে পারছেনা যে তার দিন ঘনিয়ে এসেছে, তার আয়ুসীমা মাত্র সাত দিন। একথা শুনে আনন্দ যেন একটু বিচলিত হলেন। বণিকের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হয়ে তিনি বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন—ভদন্ত, একথা কি আমি বণিককে জানাতে পারি। বুদ্ধ বললেন—আনন্দ, তুমি স্বচ্ছন্দে একথা তাকে জানাতে পারো।

পরদিন আনন্দ ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে সে বণিকের শিবিরের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি বণিকের ছিল একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ। তাঁর দ্বারে ভিক্ষুকে দণ্ডায়মান দেখে তিনি অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং ভিক্ষুর পাত্রে আহার্য পরিবেশন করলেন। আনন্দ বণিককে জিজ্ঞেস করলেন—শেঠজী, আপনি এখানে আর কতদিন থাকবেন? উত্তরে বণিক বললেন—ভদন্ত, আমি দূর থেকে এখানে এসেছি, বর্ষা, হেমন্ত, শীত, গ্রীষ্ম এখানে থেকে বাকী পণ্যগুলো বিক্রয় করেই বাড়ী ফিরব। আনন্দ সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন—শেঠজী, মানুষ যা ভাবে, তা তো সব সময় হয় না, জীবনান্তরায় জানা যায় না, তবে আপনি সব সময় সতর্ক থাকবেন, অপ্রমত্ত হয়ে চলবেন। একথা শুনেই বণিক চমকে উঠলেন, জিজ্ঞেস করলেন—ভদন্ত সম্মুখে কি আমার কোন বিপদ আছে? আনন্দ বললেন—হাঁ, আপনার আয়ুষ্কাল বেশী নয়।

উত্তর শুনে বণিকের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। স্ত্রী-পুত্র, জ্ঞাতি পরিজনের কথা তাঁর মনে পড়ল। তাদের সংস্পর্শ থেকে বহুদূরে বিদেশ বিভূঁইএ মৃত্যুর কথা ভেবে মন বেদনায় ভরে উঠল। সমগ্র প্রকৃতি তাঁর কাছে বিষণ্ণ মনে হল। সারাদিন তিনি উন্মনা হয়ে রইলেন। রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন—মৃত্যু আসবেই, তাকে ঠেকানো যাবে না; তবে কেন আমি জীবনের বাকী দিন কয়টি হেলায় খেলায় কাটাই, আমি দান ধর্ম করব, সাধুসঙ্গ করব যাতে আমার পরলোক উজ্জ্বল হয়। পরদিন থেকে তিনি দীন দুঃখী আর্তের সেবায় মন দিলেন। তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করে নিজের শিবিরে এনেন। বুদ্ধ উপদেশ প্রসঙ্গে তাঁকে বললেন—উপাসক, এখানে এতকাল থাকব, ও কাজ করব বলে মশগুল হয়ে থাকা উচিত নয়; নিজের জীবনান্তরায়ের কথাও ভাবা উচিত। অতঃপর বুদ্ধ গাথায় বললেন—

"এখানে বর্ষাকাল কাটাব, এখানে হেমন্তকাল, এখানে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করব—এ ধারণা পোষণ সংগত নয়। ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত বিপদের কথা বুঝতে পারে না বলেই সাধারণ ব্যক্তি এ রকম ধারণা পোষণ করে থাকে।"

বুদ্ধের শ্রীমুখ নিঃসৃত এ উপদেশ শুনে বণিকের অন্তর উদ্বুদ্ধ হল। তিনি ভাবে ভক্তিতে গদগদ হয়ে নিজেকে নিবেদন করলেন বুদ্ধের চরণে। বিহারে প্রত্যাবর্তনের জন্য বুদ্ধ যখন গাত্রোত্থান করে অগ্রসর হলেন, বণিক ভাবতন্ময় হয়ে তাঁর অনুগমন করলেন। ফিরে এসেই তিনি অনুভব করতে লাগলেন মাথায় তীব্র যন্ত্রনা। তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন।

পঁয়ত্রিশ

অচিরাবতী নদী যদিও গ্রীষ্মকালে একটি ক্ষীণ ধারায় পরিণত হত, কিন্তু বর্ষাগমে তার স্ফীত জলধারা কখনো কখনো দুই কূল ছাপিয়ে খরবেগে বইত। তখন তার তীরবর্তী বাড়ী সমূহের অধিবাসীরা উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাত। এই নদীর তীরে সবুজ গাছপালা ঘেরা একটি শ্মশান ছিল। তার প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল অত্যন্ত মনোরম। নির্জনতাপ্রিয় শান্তিকামী লোকমাত্রেই এ স্থানটিকে পছন্দ করতেন। তার মনোরম বাঁধানো ঘাট নদীর গভীর জল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সন্ধ্যার মৃদু মন্দ বাতাসে যখন অনন্ত ক্ষুদ্র লহরী তুলে বইত অচিরাবতী, ঘাটের দুই পাশের শিলাসনে উপবিষ্ট লোকদের মন প্রাণ ভরে যেত সন্ধ্যার শান্ত মাধুর্যে। কত ভাবুকের মনে বৈরাগ্যের উদয় হত এখানে বসে। এর অদূরের পথ দিয়ে যাবার সময় যোগী সন্ন্যাসীরা এখানে বসে বিশ্রাম করতেন। এ স্থান তাঁদের ধ্যান সাধনারও অনুকূল ছিল বলে তাঁরা ধ্যানমগ্ন হয়ে কত নির্জন রাত্রি কাটিয়ে দিতেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সাধু সংস্পর্শের পবিত্রতার সংমিশ্রণে স্থানটি ক্রমে ক্রমে মাহাত্ম্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

একদিন বুদ্ধ পরিভ্রমণ করতে গিয়ে মনোরম শ্মশান ঘাটটি দেখলেন। তাঁর ধ্যানপ্রবণ মনকে আকর্ষণ করল সে শ্মশানঘাটের শান্ত পরিবেশ। তিনি তার ছায়াচ্ছন্ন কুঞ্জের নিভৃত বৃক্ষতলে আসন গ্রহণ করলেন। তখনি তাঁর কানে ভেসে এল নারীকণ্ঠের করুণ বিলাপধ্বনি। তাঁর করুণাবিগলিত হৃদয় আর্তের ব্যথায় চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি আসন ত্যাগ করে সেই ধ্বনি

রত্নালঙ্কারাপহরণের চিন্তা। পত্নীর অলঙ্কারের প্রতি তার লোভ দুর্নিবার হল। সে মনে মনে উপায় উদ্ভাবন করে নবোঢ়া পত্নীকে বলল—প্রিয়ে, নগর রক্ষীরা যখন আমায় শৈলশৃঙ্গে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি সে জায়গায় দেবতার কাছে মানত করেছিলাম পূজা দেবার, চলো উভয়ে সে পূজা দিয়ে আসি। ভদ্রা সরল মনে স্বামীর প্রস্তাবে রাজী হল। সে দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রস্তুত করে সুসজ্জিতা হয়ে রথারোহণে যাত্রা করল শৈলশৃঙ্গাভিমুখে। অনুচরবর্গের রথগুলো তাদের অনুসরণ করল। যানচলাচলের পথ পেরিয়ে তারা পদব্রজে শৃঙ্গ আরোহণ করতে লাগলো। একটি নিভৃত জায়গায় অর্ঘ্য রচনার জন্য অনুচরবর্গকে বিদায় দিয়ে তারা উভয়ে শৈলশিখরে এসে পৌঁছল। তার আচরণে ভদ্রার মনে সন্দেহের উদয় হল। সে ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না। স্বামীর দুরভিসন্ধি বুঝতে তার বিলম্ব হল না। স্বামী অট্টহাস্য করে বলল—ভদ্রা, সত্যই কি তুমি মনে করেছ আমি এখানে পূজা দিতে এসেছি; আমি চাই-ই তোমার এ রত্নালঙ্কার, দেহ থেকে এক একটি খুলে আমায় দাও। ভদ্রা সপ্রতিভভাবে বলল—প্রিয়তম, এ অলঙ্কার তো তোমার, আমিও তোমার, এ আবার খুলে দিতে হবে!

"সে সব কথা থাক, আগে খুলে দাও অলঙ্কার।"

"প্রিয়তম, তুমি যখন হুকুম করছ, তা পালন করব! তবে আমার একটি সাধ পূর্ণ করো।"

"কী সাধ শুনি?"

"প্রিয়তম, সালঙ্কারা হয়ে একবার তোমায় আলিঙ্গন করতে দাও।"

"আচ্ছা তা হোক।"

"আলিঙ্গনের ছলে ভদ্রা তাকে অতর্কিতে ধাক্কা দিয়ে শৈলশৃঙ্গ থেকে নিয়ে ফেলে দিল। তার পরিণাম দেখার ধৈর্য তখন ভদ্রার ছিল না। সে শৃঙ্গ থেকে ধীরে নীচে নেমে এল।

সংসারের ওপর তার মন তিক্ত হয়ে উঠল। সে আর বাড়ী ফিরল না। সে নিগ্রন্থদের আশ্রমে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করল। কথিত আছে, মস্তক মুণ্ডনের পর কুণ্ডলীকৃত হয়ে আবার কেশোদ্গম হওয়ায় সে কুণ্ডলকেশা নামে অভিহিতা হয়। অল্পকালের মধ্যেই অসামান্য প্রতিভাবলে সন্ন্যাসিনী কুণ্ডলকেশা নিগ্রন্থদের শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করলেন। তিনি পরিব্রাজিকার বেশে নানাস্থানে অধ্যয়নপূর্বক বিবিধ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করে অত্যন্ত বিদুষী হলেন। তাঁর তর্ক করবার শক্তি ছিল অসাধারণ।

বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি অনায়াসে জয়লাভ করতেন। কেউ তাকে হারাতে পারতেন না। বিজয়গর্বদৃপ্তা হয়ে তিনি নানাস্থান পরিভ্রমণ করতে সুরু করলেন। তাঁর সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে পণ্ডিতগণ সাহস করতেন না। পরে তিনি যেখানে যেতেন জম্বু বৃক্ষের শাখা বালুকাস্তূপে রোপণ করে বলতেন—আমার সঙ্গে যিনি তর্ক করতে ইচ্ছুক, এ শাখাটিকে তিনি পদদলিত করুন। সপ্তাহকাল পর্যন্ত শাখাকে দণ্ডায়মান দেখে শাখা নিয়ে তিনি প্রস্থান করতেন।

কুণ্ডলকেশা এভাবে গ্রাম নিগম ঘুরে শ্রাবস্তীতে এসেই নগর দ্বারে তিনি জম্বুশাখা উক্ত নিয়মে স্থাপন করলেন। বুদ্ধের অগ্রশিষ্য শারীপুত্র সে শাখা দেখে তদ্রার অহঙ্কার চূর্ণ করতে সংকল্প করলেন। তিনি নিকটস্থ বালকদের বললেন শাখাটি পদদলিত করতে। তারা তাঁর আদেশ পালন করল। কুণ্ডলকেশা এসে সমস্ত অবগত হলেন। তিনি শ্রাবস্তীর পথে পথে বলে বেড়াতে লাগলেন—আজ শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের সঙ্গে আমার তর্কযুদ্ধ হবে, কে দেখতে চান, আমার সঙ্গে আসুন। কৌতূহলপরবশ বহু ব্যক্তি তাঁর অনুসরণ করল। তিনি তাদের নিয়ে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট শারীপুত্রের সমীপে উপস্থিত হলেন। যথারীতি সম্ভাষণ পূর্বক তিনি শারীপুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন—আমার জম্বুশাখা কি আপনার আদেশে দলিত হয়েছে। শারীপুত্র বললেন—হাঁ, আমার আদেশে।

"তাহলে আসুন, আমরা তর্কে প্রবৃত্ত হই।"

"তাই হোক।"

"কে প্রশ্ন করবেন কে উত্তর দেবেন?"

"ভগিনি, আমাকেই প্রশ্ন করুন।"

কুণ্ডলকেশা একটির পর একটি প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং শারীপুত্র অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক উত্তর দিতে লাগলেন। সমবেত জনতার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে প্রশ্ন করতে করতে কুণ্ডলকেশা হঠাৎ নিরস্ত হলেন। তাকে নীরব দেখে শারীপুত্র বললেন—ভগিনি, তুমি আমাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছ, এখন আমি একটি প্রশ্ন তোমায় জিজ্ঞেস করি।

কুণ্ডলকেশা বললেন—দেব, তাই হোক।

"ভগিনি, এক কথায় কি মূর্ত্ ভাবে বলা যায়?"

কুণ্ডলকেশা এ প্রশ্নে হতবুদ্ধি হয়ে রইলেন—দেব, তাতো জানি না। শারীপুত্র এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুনিপুণভাবে ধর্মালাপ সুরু করলেন। তাঁর মুখের

বিচিত্র ভাষণ শুনতে শুনতে কুণ্ডলকেশা তন্ময় হয়ে গেলেন। অবশেষে তিনি ভাবে গদগদ হয়ে বললেন—দেব, আমায় আপনার চরণে স্থান দিন। শারীপুত্র বললেন—ভগিনি, আমার গুরু ভগবান বুদ্ধ রয়েছেন এ শ্রাবস্তীতে, তিনি জ্ঞানের ঘনমূর্তি, করুণাবতার ত্রাতা, নির্বাণদাতা, তুমি তাঁরি চরণে নিজেকে সমর্পণ করো, তোমার কল্যাণ হবে। শারীপুত্রের নির্দেশে তিনি বুদ্ধের ধর্ম-সভার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন। বুদ্ধ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন—অর্থহীন বাগাড়ম্বরবহুল সহস্র শ্লোক উচ্চারণের চেয়ে অর্থপূর্ণ ভাবগম্ভীর একটি শ্লোকই শ্রেয়, যা শুনে অন্তরের শান্তি লাভ হয়। বুদ্ধের এ কথাটির গভীর মর্ম উপলব্ধি করে কুণ্ডলকেশা নতুন চক্ষু লাভ করলেন। তিনি ভিক্ষুনী হলেন। অর্হত্ব প্রাপ্তিতে তাঁর জীবন সার্থক হল।

তৃতীয় পর্ব

উৎসর্গ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু
সুহৃদ্বরেষু—

পূর্বাহ্ন সূর্যের রশ্মি ক্রমশঃ প্রখর হয়ে আসছে। শ্রাবস্তীর সর্বত্র দেখা দিয়েছে কর্মচঞ্চলতা। তার উপকণ্ঠে জেতবন বিহার ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মত স্তব্ধ। বুদ্ধের অগ্রশিষ্য শারীপুত্র জেতবন থেকে বেরিয়ে একটি জনবিরল পথে এগিয়ে চলেছেন শ্রাবস্তীর দিকে ভিক্ষার জন্য। শ্রাবস্তীর জনৈক ব্রাহ্মণের অদ্ভুত খেয়াল হল—পরীক্ষা করতে হবে এ ভিক্ষুর গুণমহিমা কতদূর সত্য। খেয়ালী ব্রাহ্মণ যখন মনে মনে ফন্দি আঁটছিলেন, তখন শারীপুত্র ব্রাহ্মণের পাশ দিয়ে পথ বেয়ে চললেন, হঠাৎ তাঁর পিঠের ওপর দুম করে পড়ল একটা কীল। তিনি পড়তে পড়তে উঠে গিয়ে যেমন চলছিলেন, তেমনি চলতে লাগলেন, একবার পেছন ফিরেও তাকালেন না। আঘাতের প্রতিক্রিয়া তার কোথাও দেখা গেল না, মুখের পানে তাকিয়ে আঘাতকারী ব্রাহ্মণের মনে অনুতাপের কাঁটা বিঁধতে লাগলো— এ অক্রোধী জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষকে অকারণ প্রহার করে কি অন্যায় না আমি করলাম! তাঁর অন্তরে যেন নরকাগ্নি জ্বলে উঠল। তৎক্ষণাৎ তিনি শারীপুত্রের পদতলে মস্তক লুটিয়ে দিয়ে বললেন—প্রভু, আমায় ক্ষমা করুন, আমার অপরাধের সীমা নেই, আপনি সত্যিকার মহাপুরুষ, এ অধমকে মার্জনা করুন। শারীপুত্র তাঁর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে জিজ্ঞেস করলেন—কি অপরাধ তোমার?

"আপনার মাহাত্ম্য পরীক্ষার দুর্বুদ্ধি নিয়ে আপনার মত মহান্ ব্যক্তিকে আমি কঠিন আঘাত হেনেছি। প্রভু, নিজগুণে আমায় মার্জনা করুন।"

স্মিত হেসে শারীপুত্র বললেন—ব্রাহ্মণ, আমি তোমায় ক্ষমা করেছি, তোমার অনুতাপানলে তুমি শুদ্ধ, ওঠ।

"প্রভু, সত্যিই যদি আমায় ক্ষমা করে থাকেন, তাহলে চলুন আমার গৃহে, আজ আমায় ভিক্ষদানের সুযোগ দিন।" শারীপুত্র নীরব সম্মতি জানালেন। তাঁর পাত্র হাতে নিয়ে ব্রাহ্মণ সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁকে গৃহে নিয়ে গেলেন।

সহরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এ অন্যায় আঘাতের কাহিনী। ক্ষুব্ধ জনতা ভিড় করল ব্রাহ্মণের গৃহ-প্রাঙ্গণ। তাঁদের উন্মত্ত চীৎকারে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল। তখনি গৃহের দরজা খুলে গেল। শান্ত সংযত পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন শারীপুত্র, তাঁর পেছনে ব্রাহ্মণ ভিক্ষাপাত্র হাতে। শারীপুত্রকে দেখে জনতা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁর দিকে তাকাল। কয়েকজন এগিয়ে এসে শারীপুত্রকে সম্বোধন করে বলল—প্রভু, আপনি সরে দাঁড়ান, এ

ব্রাহ্মণকে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন। শারীপুত্র জিজ্ঞেস করলেন—কেন, তোমরা কি চাও? "এ ব্রাহ্মণ আপনার ওপর যে দুর্ব্যবহার করেছে, তার প্রতিশোধ আমরা নেবই। তাকে সমুচিত সাজা দেওয়া দরকার।" শারীপুত্র শান্তকণ্ঠে বললেন—"বন্ধুগণ, তোমরা অকারণ উত্তেজিত হও কেন? সে নিজেই সেজন্য ক্ষমা চেয়েছে, আমিও তাকে ক্ষমা করেছি। সে এখন আমার একান্ত অনুগত ভক্ত। আজ তাঁর শ্রদ্ধাদত্ত অন্ন গ্রহণ করেছি। আমার ওপর যদি তোমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে আমার এ ভক্তের কোন অনিষ্ট সাধন না করে তোমরা এখনি ফিরে যাও"।

শারীপুত্রের শান্ত মধুর দৃপ্ত বচন শুনে জনতা মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ তাঁর আদেশ অমান্য করতে সাহস করল না। তারা ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

সন্ধ্যায় যখন ভিক্ষুরা সমবেত হয়ে এবিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন, বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের আলাপ বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন। তাঁরা আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে বিবৃত করে মন্তব্য করলেন—'প্রভু, যে শারীপুত্রের মত গুণী ভিক্ষুকে প্রহার করতে পারে, সে কাকে ছাড়বে? তাকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি ভাল করেন নি। কি জানি কখন সে আমাদের ওপর চড়াও হয়।'

বুদ্ধ শান্তকণ্ঠে বললেন "হে ভিক্ষুগণ, শারীপুত্র যথার্থভাবে আমার শিক্ষা অন্তরে গ্রহণ করেছে—অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করতে হয়। হিংসার মধ্যে অহিংস থাকা, শত্রুর প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হওয়া পবিত্রাত্মা ঋষিদের পন্থা। যতই মনের হিংসা দূর হবে, ততই আসবে শান্তি। তোমরা ও শারীপুত্রের আদর্শ অনুসরণ করো। চিত্তকে প্রশান্ত করো মৈত্রী সাধনায়।"

বুদ্ধের উপদেশ শুনে ভিক্ষুরা নত শিরে বললেন—প্রভু, আপনার অমৃতবাণী আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে; আমরা শারীপুত্রের প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করবো।

দুই

রাজগৃহের একান্তে ধাঙর পল্লীতে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে সুনীতের বাস। সংসারে আপন বলতে তার কেউ না থাকলেও পোষ্যবর্গের অভাব ছিল না। প্রতিদিন ভোরেই সে ঝাড়ু ও ঝুড়ি হাতে নিয়ে এসে পড়ত রাজগৃহের একটি প্রশস্ত পথে। ঐ পথটির নির্দিষ্ট অংশ পরিষ্কার করা তার প্রাত্যহিক কর্ম।

পথ ঝাঁট দিয়ে ময়লা ঝুড়িতে ভর্তি করে সে কাঁধে বয়ে নিয়ে যেত নগরের বাইরে। অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে অনলসভাবে সে সম্পাদন করত এ কর্ম। যদিও কোন ব্যতিক্রম ছিল না, তবুও সে তার ওপরওয়ালার কাছে কোন দিন পেত না সুনাম, পেত শুধু ভ্রূকুটি। পথের আশে পাশের লোকেরাও তিরস্কার করত তাকে। তারা চেঁচিয়ে বলত 'কেন তুই ময়লা রেখে গেছিস এখানে, মেরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দেবো।' সে কোন কথা বলত না, নীরবে গালিগালাজ সহ্য করত। উপায়ও ছিল না। কারণ সে অস্পৃশ্য, তার প্রতিবাদের অধিকার কোথায়? তার জন্ম উচ্চবর্ণের সেবার জন্য। শাস্ত্র শ্রবণ তার নিষিদ্ধ। বিদ্যার্জন তার কাছে স্বপ্ন। জাতীয় পেশাই তার একমাত্র কর্ম। লোকের অনাদর অবহেলা তার চির-অভ্যস্ত। এক একদিন কঠোর পরিশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সে বাড়ী ফিরত, তবুও তার মুখে ফুটে উঠত না বিরক্তির রেখা। এমনি করে তার দিন বয়ে যেত।

সুনীত সংসারী হলেও সংসারে তার কোন দিনই মন ছিল না। আর পাঁচ জনের মত সংসারের লাভ ক্ষতি নিয়ে সে মাথা ঘামাত না। সে ছিল চির উদাসীন। সন্ন্যাসের মুক্ত বন্ধনহীন জীবন তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকত। তাই সাধু সন্ন্যাসী দেখলে সে কেমন হয়ে যেত। যখনি সাধু সন্ন্যাসী তার চোখে পড়ত, তখনি সে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে অপলক নয়নে তাঁদের পানে তাকিয়ে থাকত। তাঁদের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলবার সৌভাগ্য না হলেও তাঁদের মনে হত তার আপন জন।

একদিন প্রভাতে বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘসহ বেরিয়ে পড়লেন রাজগৃহের পল্লীতে ভিক্ষায়। তখন উঠন্ত সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় চারিদিক ঝলমল করছিল। যে পথে ঝাড়ুদার সুনীত আবর্জনাভার কাঁধে নিয়ে আসছিল, সে পথ বেয়ে বুদ্ধ চললেন। তাঁর পেছনে ভিক্ষু-দল। সুনীত দূর থেকে দেখতে পেল তাঁদের। সে ভার কাঁধে নিয়ে যুক্ত করে দাঁড়াল একান্তে, নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে রইল তাঁদের পানে। ধীর মন্থর গতিতে বুদ্ধ এলেন তার কাছাকাছি। যতই তিনি এগোতে লাগলেন, ততই সুনীত সরে দাঁড়াতে লাগলো, পাছে তার ছোঁয়া লাগে। অবশেষে তার দেহ পাঁচিলে গিয়ে ঠেকল। বুদ্ধ তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর করুণাস্নিগ্ধ নয়ন নিবদ্ধ হল সুনীতের ওপর। সে চক্ষু নত করল। বুদ্ধ স্নেহ মধুর কণ্ঠে তাকে সম্বোধন করে বললেন—বৎস সুনীত, তুমি সঙ্কুচিত হয়ো না, তোমার খোঁজেই আমি এসেছি। বুদ্ধের স্নেহ সম্ভাষণে তার সর্বাঙ্গ পুলকে শিউরে উঠল। সে বুঝতে পারল না সে কি স্বপ্ন দেখছে, না জেগে

আছে। কেউ যার স্পর্শ সহ্য করে না, কাছে গেলে যাকে দূরে সরে দাঁড়া বলে সবাই তফাতে রাখে, তাকে আজ সর্বজনমান্য পুরুষ একান্ত আপনার জনের মত সম্বোধন করছেন। তার মন যেন বিশ্বাস করতেই চাইল না। এই রাজ-গৃহের পথে সে দেখেছে এ মহাপুরুষকে কতবার! তার হৃদয় জানিয়েছে অসংখ্য প্রণাম তাঁর চরণে। সে শুনেছে তাঁর অনেক কাহিনী। মন চেয়েছে তাঁর পায়ে নিজেকে নিবেদন করতে। তার এই গোপন বাসনা বামনের হাতে চাঁদ ধরার মতোই অলীক মনে হয়েছে। এমনি করে তিনি আসবেন তার কাছে একথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। বুদ্ধ বললেন—বৎস, আর কতদিন সংসারের এ দুঃখভার বইবে, তুমি এসো আমার সঙ্গে, তুমি হবে মঠের ভিক্ষু। মহাপুরুষের বাক্যগুলো সুনীতের কানে গেল। সে যেন বুঝতে পারে না তার মর্ম। যে রাস্তার ঝাড়ুদার—সবার অবজ্ঞার পাত্র, সে ভিক্ষু হয়ে সঙ্ঘারামের পবিত্র পরিবেশে থাকবে, জনগণের পূজ্য হবে একি কথনো সম্ভব? সে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের পানে। সরাসরি সে সাড়া দিতে পারল না বুদ্ধের কথায়। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সে সঙ্কোচ কাটিয়ে আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল—ভগবন, এ অধমকে আপনার পায়ে স্থান দিন।

দুঃখ দুর্দশাময় পৈতৃক পেশা ত্যাগ করে সুনীত ভিক্ষু হল। মঠের আবহাওয়ায় এসে তার জীবন সম্পূর্ণ বদলে গেল। সঙ্ঘে সকলের সমানাধিকার। সাম্যের মন্ত্রে অস্পৃশ্যতার ভূত ঘাড় থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ও মানুষের মধ্যে জাতিগত ভেদ ভিক্ষু সুনীতের অলীক মনে হল। উচ্চবর্ণের লোক দেখে দূরে সরে যাওয়া অর্থহীন অভিনয় বলে প্রতিভাত হল। শীল সমাধির ভাবনায় প্রচ্ছন্ন শুভ্র সংস্কার রাশি উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর অন্তরে এনে দিল আলোর স্পর্শ। তিনি নতুন জীবন লাভ করলেন। বুদ্ধ স্বয়ং তাঁকে দিলেন অমৃতপদের উপদেশ। সেই উপদেশ অন্তরে বহন করে তিনি রত হলেন গভীর সাধনায়। অল্পকালের মধ্যে তাঁর অন্তর সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করে সফল হল সে সাধনা। তিনি হলেন শুদ্ধ মুক্ত অর্হৎ। এ উন্নততম অবস্থা লাভের পর তাঁর বিপুল অধ্যাত্মসিদ্ধির কথা সর্বত্র প্রচারিত হল। বহু ভক্ত তাঁর চরণ বন্দনা করে সেবার অধিকার প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধ স্মিত মুখে গাথায় বললেন—

দম, সংযম, ব্রহ্মচর্য ও তপস্যায়
যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় তাই উত্তম ব্রাহ্মণত্ব।

তিন

ভিক্ষু মালুঙ্ক্যপুত্র শুধু ভাবেন আর ভাবেন। জগৎ ও জীবন নিয়ে তাঁর ভাবনার অন্ত নেই। মঠের নির্জন কোণে বসে তিনি প্রায় সারাক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে থাকেন। তাঁর দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, ভাষা মৌন। মনে প্রশ্ন ওঠে—

জগৎ কি শাশ্বত বা নিত্য?

জগৎ কি শাশ্বত নয়?

জগৎ কি সীমিত?

জগৎ কি অনন্ত?

দেহ ও জীবাত্মা কি এক?

দেহ ও জীবাত্মা কি ভিন্ন?

মৃত্যুর পর কি অস্তিত্ব থাকে?

মৃত্যুর পর কি অস্তিত্ব মুছে যায়?

মৃত্যুর পর অস্তিত্ব থাকে আবার কি থাকে না?

মৃত্যুর পর অস্তিত্ব থাকে না, আবার থাকে না তাও নয়…এমন কি?

এই প্রশ্ন দশটি তাঁর মন তোলপাড় করতে থাকে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু কোন সমাধান মিলে না। মনে ওঠে অশান্তির ঝড়। তিনি বীতশ্রদ্ধ বুদ্ধের প্রতি, তাঁর শিক্ষা সাধনার প্রতি নিজের জীবনের প্রতিও। সর্বজনবন্দিত সর্বজ্ঞ বুদ্ধ ও যে তাঁকে এ বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেন নি, বিশ্লেষণ করে বলেন নি, তা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।

এক নিভৃত সন্ধ্যায় মালুঙ্ক্যপুত্রের মনে হল তাঁর সন্ন্যাসজীবন অর্থহীন। এভাবে সংশয়দিগ্ধ মন নিয়ে মঠের কোণে পড়ে থেকে তাঁর কি হবে? তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন—বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করব এই প্রশ্নগুলো; যদি যথাযথ উত্তর পাই, তবে থাকবো তাঁর অনুশাসনে, অন্যথা সন্ন্যাস ত্যাগ করে সংসারে যাবো ফিরে। সরাসরি তিনি চলে গেলেন বুদ্ধের কাছে, নিবেদন করলেন ভূলুণ্ঠিত প্রণাম। তারপর তিনি বুদ্ধকে বললেন—ভগবন্! আমি কত ভেবেছি, জগৎ ও জীবন নিয়ে প্রচলিত প্রশ্নগুলোর কোন সমাধান খুঁজে পাইনি, এ গূঢ় প্রশ্নগুলো আমার মনকে দিবারাত্রি দ্বিধায় দ্বন্দ্বে বিড়ম্বিত করছে; আপনি যদি সন্দেহাতীত ভাবে এ বিষয়গুলো আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমি আপনার অনুশাসনে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করব, নতুবা আমি প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে গৃহে ফিরে যাব। তাঁর কথা শুনে বুদ্ধ তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন—হে মালুঙ্ক্যপুত্র, আমি কি

ভোগৈশ্বর্যের আড়ম্বর পশ্চাতে ফেলে সন্ন্যাসের কণ্টকময় পথ অবলম্বন করেছিলেন, তা মুখে মুখে কুরুরাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বয়ং রাজাও এঁর অনুরাগী হয়েছিলেন।

ভিক্ষু রাষ্ট্রপালকে দেখেই পার্শ্বচর চলে গেলেন রাজার কাছে এবং বললেন— মহারাজ আপনি অহরহ যাঁর গুণকীর্তন করেন, সে ভিক্ষু রাষ্ট্রপালকে দেখে এলাম মৃগচীরের নিকটে এক বৃক্ষতলে সমাসীন। এ কথা শুনেই বৃদ্ধ রাজা কৌতুহলাক্রান্ত হলেন রাষ্ট্রপালকে দেখার জন্ম। তিনি প্রিয় পার্শ্বচরকে বললেন—আজ থাক উদ্যান ভ্রমণ, আমি সে ভিক্ষুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। যথারীতি যানবাহনের ব্যবস্থা হল। রাজা সদল বলে সেদিকে যাত্রা করলেন। উদ্যানের কাছে এসে রথের সারি থেমে গেল। সেখানে তিনি রথ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেখানে ভিক্ষু রাষ্ট্রপাল বসে আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে বললেন—মান্যবর, আপনি এ আসনে বসুন। রাষ্ট্রপাল শান্ত কণ্ঠে উত্তর করলেন—মহারাজ, ওখানে আপনিই বসুন, আমি এখানে বেশ আছি। রাজা আসন গ্রহণ করে ভিক্ষুকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর শান্ত ধীর গম্ভীর মূর্তি রাজাকে মুগ্ধ করল। রাজা তাঁর সঙ্গে সম্ভাষণ সমাপন করে বললেন—হে মান্যবর, মানুষের জীবনে চারি রকমের ক্ষতি দেখা যায়, যথা— বার্ধক্য ক্ষতি, ব্যাধি ক্ষতি, ভোগ ক্ষতি, এবং স্বজন ক্ষতি যা মানুষের মনে বৈরাগ্যের চেতনা অঙ্কুরিত করে এবং তাকে সন্ন্যাসের পথে টেনে নেয়; অর্থাৎ মানুষ যখন বার্ধক্যগ্রস্ত জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে, শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে, তখন তার নৈরাশ্যক্লিষ্ট মন স্বতঃই বৈরাগ্যপ্রবণ হয়ে ওঠে; ব্যাধিতে ভুগে ভুগে মানুষ যখন ভোগ-বিলাস বঞ্চিত আশাহত হয়, তখন সে বৈরাগ্যের মধ্যে শান্তি পেতে চায়; দুর্ভাগ্যগ্রস্ত ব্যক্তিও সম্পদ সৌভাগ্য নিঃশেষে হারিয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করবার জন্ত ব্যাকুল হয়; তেমনি প্রিয়জনবিয়োগে জীবনে বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তিও বৈরাগ্যের শান্তি খোঁজে; বৈরাগ্যের এই কারণগুলো আপনার মধ্যে দেখতে পাই না, আপনি তো তরুণ যুবা, সুস্থ, সবল তেমনি সৌভাগ্যসম্পন্ন ও প্রিয়জন পরিবৃত, তবুও আপনি সন্ন্যাস অবলম্বন করলেন কেন?

রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভিক্ষু রাষ্ট্রপাল বললেন—মহারাজ, আমি শুনেছিলাম ভগবান সুগত সম্বুদ্ধের শুধু চারিটি কথা যা আমার চোখ খুলে দিয়েছে, আমাকে অভিভূত করেছে এবং আমার মনে বৈরাগ্যের বীজ উপ্ত করেছে; আমি শুনেছিলাম তাঁর মুখে (১) 'লোক চলন্ত অধ্রুব' (২) 'লোক ত্রাণহীন নিরালম্ব' (৩) 'লোক নিঃস্ব, সমস্ত ছেড়ে যেতে হবে' (৪) 'লোক

অপূর্ণ অতৃপ্ত তৃষ্ণাবশ'—এ কথাগুলোর মর্ম উপলব্ধি করে সংসারবন্ধন ছিন্ন করেছি।

—হে মান্যবর, আপনি যে বললেন 'লোক চলন্ত অধ্রুব' তার অর্থ কী?

মহারাজ, আপনি কি এককালে বিংশবর্ষীয় কিংবা পঞ্চবিংশ বর্ষীয় তরুণ যুবা ছিলেন না, যখন ছিল দেহে প্রচুর শক্তি, অশ্বারোহণে হস্তী-আরোহণে দক্ষতা, ধনুর্ধররূপে খ্যাতি এবং রণনৈপুণ্য?

—হাঁ, এককালে ছিলাম নবীন তরুণ, দেহে ছিল অসাধারণ শক্তি, হস্তী চালনায় অশ্ব চালনায় ধনুর্বিদ্যায় এবং রণদক্ষতায় আমার সমকক্ষ কাউকে দেখতাম না।

—মহারাজ, আজও কি আপনি তাই?

—না না আজ আমি জরাজীর্ণ অশীতিপর বৃদ্ধ, আমার দেহের সকল শক্তি এখন নিশ্চিহ্ন। এক এক বার এক জায়গায় পা ফেলতে গিয়ে আর এক জায়গায় পা পড়ে যায়।

—তাই তো মহারাজ, ভগবান সুগত সম্বুদ্ধ বলেছেন 'লোক চলন্ত অধ্রুব' এ কথার মর্ম যথাযথ উপলব্ধি করে আমি সংসার ত্যাগ করেছি।

—মান্যবর, ভগবানের এ বাণী আশ্চর্য, অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

আচ্ছা, এ রাজকুলে আছে হস্তী-আরোহী সৈন্যদল অশ্বারোহী সৈন্যদল রথারোহী সৈন্যদল পদাতিক সৈন্যদল যারা সঙ্কটকালে আমাদের রক্ষা করে আমাদের রাজ্যকে রক্ষা করে। তাহলে 'লোক ত্রাণহীন নিরালম্ব' এ উক্তির অর্থ কী?

—মহারাজ, আপনার কোন কঠিন পীড়া আছে কি যা মাঝে মাঝে বৃদ্ধি পেয়ে আপনাকে শয্যাশায়ী বেদনাক্লিষ্ট করে?

—হাঁ, আমার আছে তেমন কঠিন পীড়া। যখন তার প্রকোপ বৃদ্ধিতে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি, তখন আমার আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনেরা উদ্বিগ্ন চিত্তে আমার রোগশয্যা ঘিরে আমার মরণ মুহূর্ত অপেক্ষা করে।

—মহারাজ, তখন কি আপনি বলেন 'হে আমার আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনগণ, তোমরা এসো আমার এ ব্যাধি তোমরা ভাগ করে নাও, আমার বেদনা লাঘব করো, রোগযন্ত্রণার উপশম করো' অথবা আপনি নিজেই অসহায়ভাবে সে বেদনা ভোগ করতে থাকেন, রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন?

—মান্যবর, অসহায় ভাবে সে বেদনা ভোগ করা ছাড়া উপায় কি?

কেউ সে ব্যাধির অংশ গ্রহণ করে আমাকে যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দিতে পারবে না।

—তাইতো মহারাজ, ভগবান সুগত সম্বুদ্ধ বলেছেন 'লোক ত্রাণহীন নিরালম্ব।'

—মান্যবর, ভগবানের বাণী আশ্চর্য! অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আচ্ছা, এ রাজকুলে আছে প্রচুর স্বর্ণ রৌপ্য মণিমাণিক্য, বিপুল ভূসম্পত্তি। তাহলে নিঃস্ব...' এ কথার তাৎপর্য কি?

—মহারাজ, আপনি এখন আপনার বিশাল রাজসম্পদ যে ভাবে ভোগ করছেন, মৃত্যুর পরেও কি সে ভাবে তা ভোগ করতে পারবেন অথবা অন্য কেউ তা অধিকার করবেন?

—মান্যবর, মৃত্যুর পর আর এ সম্পদ ভোগ করতে পারব না, অন্যরা এসে অধিকার করবে স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পদ। আমি শূন্য হস্তে চলে যাবো।

তাইতো মহারাজ ভগবান সুগত সম্বুদ্ধ বলেছেন 'লোক নিঃস্ব, সমস্ত ছেড়ে যেতে হবে।'

মান্যবর, ভাগবানের বাণী আশ্চর্য! অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

আচ্ছা, এবার আমায় বুঝিয়ে বলুন 'লোক অপূর্ণ অতৃপ্ত তৃষ্ণাবশ' এ উক্তির মর্ম।

—মহারাজ, আপনি তো সমৃদ্ধ শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন কুরুরাজ্যের অধীশ্বর!

হাঁ।

—মহারাজ, ধরুন কোন বুদ্ধিমান বিশ্বাসী ব্যক্তি এসে আপনাকে বলে মহারাজ, পূর্বদিকে একটি সমৃদ্ধ জনবহুল জনপদ দেখে এলাম, তার ধনরত্ন অফুরন্ত, কিন্তু সামান্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে সহজেই সে জনপদ অধিকার করা যাবে, আপনি এ সুযোগ হারাবেন না।' এ উক্তি শুনে আপনি কি করবেন?

—তাহলে সে জনপদ অধিকার করে রাজ্যসীমা বাড়িয়ে নেব।

মহারাজ, ধরুন তেমনি পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক থেকে অনুরূপ জনপদের খবর আসে, তবে আপনি কি করবেন?

—তাহলে সে জনপদগুলোও জয় করে নেব।

—মহারাজ, যদি সমুদ্রের পরপার থেকে এ রকম সহজে রাজ্য জয়ের সুযোগ আসে, তবে কি করবেন?

—মাস্তবর, সে রাজ্য জয়ের সুযোগ ও হারাব না।

—তাইতো মহারাজ, ভগবান সুগত সম্বুদ্ধ বলেছেন লোক অপূর্ণ অতৃপ্ত তৃষ্ণাবশ।'

—মান্তবর, ভগবানের বাণী সত্যি আশ্চর্য।

এ কথোপকথনের পর ভিক্ষু রাষ্ট্রপাল আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন। অহরহ জগতে দেখা যায় লোক বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েও মত্তভাবে ধন সঞ্চয় করে চলে, আর ও আরও চায় এবং মোহবশতঃ দান করতে কুণ্ঠিত হয়। রাজা আপনার বাহুবলে সসাগরা পৃথিবী জয় করেও অতৃপ্ত হৃদয়ে সমুদ্রের অপর পার অধিকার করতে চায়। রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ এভাবে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়েই পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় গ্রহণ করে মৃত্যুগ্রস্ত হয়। বিষয় ভোগে তৃপ্তি কোথায়? যে বিচিত্র মধুর মনোরম কাম্য বিষয়সমূহ অদ্ভুত ভাবে মনকে মথিত করে, সে বিষয়গুলোর দোষ যথাযথভাবে আমার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হওয়ায় আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি। বৃক্ষের ফলের মত তরুণ বৃদ্ধ নির্বিশেষে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর কালাকাল নেই। জীবনের এ অনিশ্চয়তা আমাকে সন্ন্যাসের পথে ডাক দিয়েছে। সন্ন্যাসকে আমার শ্রেয় মনে হয়েছে।

রাষ্ট্রপালের কথাগুলো শুনতে শুনতে রাজা মগ্ন হয়ে গেলেন।

পাঁচ

শ্রাবস্তীর পূর্বারামে একদিন ব্রাহ্মণগণক মৌদ্‌গল্যায়ন এলেন বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সন্তোষজনক স্মরণীয় আলাপের পর ব্রাহ্মণগণক পূর্বারামের সোপানশ্রেণীর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন—ভবৎ গৌতম, এ সোপানশ্রেণী যেমন ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বদিকে উঠেছে তেমনি ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রাধ্যয়ন আনুপূর্বিকভাবে ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয়, ধনুর্বিদ্যায় ও আমাদের গণিত শাস্ত্রে শিক্ষাদান ও আনুপূর্বিকভাবে ধাপে ধাপে চলতে থাকে; তেমনি আপনার প্রবর্তিত ধর্মবিনয়ে আনুপূর্বিক পদ্ধতি দেখাতে পারেন কি? বুদ্ধ উত্তর করলেন —হাঁ, দেখানো যাবে এ ধর্মবিনয়ে আনুপূর্বিক শিক্ষা আনুপূর্বিক পদ্ধতি; যেমন নিপুণ অশ্বদমনকারী সুন্দর সৌষ্ঠবসম্পন্ন অশ্ব পেয়ে প্রথমে মুখে লাগাম নেওয়া শেখায় এবং পরে অন্যান্য ধারাবাহিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে, তেমনি তথাগত লোককে দীক্ষা দিয়ে প্রথমেই শীল বা চারিত্রিক শিক্ষায় সংযত আচারসম্পন্ন পাপভীরু করে তুলতে চেষ্টা করেন।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে ব্রাহ্মণ, যখন ভিক্ষু শীলবান সংযত আচারসম্পন্ন পাপভীরু হয়, তখন তথাগত তাকে ইন্দ্রিয়সংযম শেখান। সেই শিক্ষা অনুসারে ভিক্ষু রূপ দেখে শব্দ শুনে গন্ধ আঘ্রাণ করে রসাস্বাদন ইত্যাদিতে মনে মনে উপভোগ করে না মত্ত হয় না, যে ইন্দ্রিয়গুলো অসংযত থাকলে লোভ দৌর্মনস্য পাপ মনোবৃত্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে অন্তরকে অভিভূত করে, সে ইন্দ্রিয়গুলোতে সংযত করাহ জন্য প্রবৃত্ত হয়, ইন্দ্রিয়গুলোকে রক্ষা করে।

হে ব্রাহ্মণ, যখন ভিক্ষু ইন্দ্রিয়-সংযমশিক্ষায় সংযতেন্দ্রিয় হয়, তখন তথাগত তাকে শিক্ষা দেন "এসো ভিক্ষু, ভোজনে মাত্রজ্ঞ হও, জ্ঞানযুক্ত সচেতন হয়ে আহার করো, মনে রেখো—তোমার আহার ক্রীড়ার জন্য নয় মত্ততার জন্য নয় দেহকে শ্রীমণ্ডিত করার জন্য নয়, শুধু দেহপালনের জন্য এবং দেহের স্থিতির জন্য।"

হে ব্রাহ্মণ, যখন ভিক্ষু ভোজনে মাত্রজ্ঞ হয়, তখন তথাগত তাকে শিক্ষা দেন "এসো ভিক্ষু, সদাজাগ্রত হও—সারাদিন পায়চারি করে বসে মনের কলুষ বিদূরিত করে মনকে শুদ্ধ অনাবিল করো, রাত্রির প্রথম প্রহরে পায়চারি করে বসে মনকে কলুষমুক্ত শুদ্ধ করো, মধ্যরাত্রে গভীর নিশীথে দক্ষিণ পার্শ্ব ভর করে পায়ের ওপর পা রেখে সিংহশয্যায় শয়ান হও, স্মৃতিমান হয়ে গাত্রোত্থানের সংকল্প নিয়ে এবং রাত্রির শেষ প্রহরে গাত্রোত্থান করে বসে পায়চারি করে মনকে শুদ্ধ অনাবিল করো।"

হে ব্রাহ্মণ, যখন ভিক্ষু এভাবে সদাজাগ্রত হয়, তখন তথাগত তাকে আরও শিক্ষা দেন "এসো ভিক্ষু স্মৃতিমান সজ্ঞান থেকো—অগ্রগতিতে পশ্চাদগমনে দর্শনে শ্রবণে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংকোচনে প্রসারণে পাত্রচীবরধারণে আহারে পানে স্থিতিতে গমনে উপবেশনে শয়নে বাক্যালাপে মৌনতায় এক কথায় সকল অবস্থায় আত্ম-বিস্মৃত না হয়ে প্রতি অবস্থাকে স্মরণে রেখো সজ্ঞান থেকো অবহিত হয়ে বাস করো।"

হে ব্রাহ্মণ, যখন ভিক্ষু সকল অবস্থায় স্মৃতিমান সজ্ঞান হয়ে থাকতে পারে, তখন তথাগত তাকে আরো শিক্ষা দেন "এসো ভিক্ষু, নির্জনবাসে রত হও—অরণ্যে বৃক্ষমূলে পর্বতকন্দরে গিরিগুহায় জনহীন প্রান্তরে গহনবনে সাধনামগ্ন হও।" সে এতাদৃশ নির্জন স্থানে আহারের পর শরীর ঋজু রেখে আসনবদ্ধ হয়ে সাধনারত হয়। সে লোভ বিনোদন করে বীতলোভ চিত্ত নিয়ে থাকে, লোভ থেকে চিত্তকে শুদ্ধ করে, দ্বেষ ত্যাগ করে বিদ্বেষহীন মন নিয়ে সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হয় এবং দ্বেষ থেকে চিত্তকে শুদ্ধ করে, আলস্য জড়তা

বিনোদন করে বিরজস আলোকসম্পন্ন স্মৃতিমান সম্প্রজ্ঞ হয়ে থাকে মনের ঔদ্ধত্য উদ্বেগ পরিহার করে অনুদ্ধত অনুদ্বিগ্ন শান্তচিত্ত হয়, সংশয় বিনোদন করে অসংশয়ী নিঃসন্দিগ্ধ হয় কুশল ধর্মের প্রতি এবং সংশয় থেকে চিত্তকে শুদ্ধ করে।

এ ভাবে সে চিত্তদুর্বলকর চিত্তদূষক পাঁচটি নীবরণ বা আন্তর প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে কামনা ও কুপ্রবৃত্তির কবল থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে ধ্যানের উত্তরোত্তর স্তর লাভ করে। হে ব্রাহ্মণ, যে ভিক্ষুগণ শিক্ষানিবিষ্ট শিক্ষানুরাগী নির্বাণপ্রার্থী লক্ষ্যে অনুপনীত, তাদের জন্ম আমার এ অনুশাসন; তবে যারা অর্হৎ ক্ষীণাস্রব মহালক্ষ্যে উপনীত বন্ধনহীন শুদ্ধ মুক্ত, এ ধর্মগুলো তাদের ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করে।

এ ভাষণ শুনে ব্রাহ্মণ গণক মৌদগল্যায়ণ বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন—ভবৎ গৌতম, এভাবে আপনা দ্বারা উপদিষ্ট অনুশাসিত হয়ে আপনার শিষ্যেরা সবাই কি নির্বাণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন অথবা কেউ কেউ সিদ্ধিলাভে বঞ্চিত হয়? উত্তরে বুদ্ধ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আমার শিষ্যেরা এভাবে উপদিষ্ট অনুশাসিত হয়ে কেউ নির্বাণসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে এবং কেউ করে না।

—ভবৎ গৌতম, এর কারণ কি? নির্বাণ আছে, নির্বাণের পথ আছে এবং আপনি উপদেষ্টা পথপ্রদর্শকও সশরীরে বিদ্যমান, তবুও কেন নির্বাণ সাধনায় কারো সিদ্ধিলাভ হয় এবং কারো হয় না?

হে ব্রাহ্মণ. তবে আপনাকে এখানে জিজ্ঞেস করি। আপনার রুচিসম্মত উত্তর দেবেন। আপনি তো রাজগৃহে যাবার পথ ভাল ভাবেই জানেন?

—হাঁ, ভবৎ গৌতম, রাজগৃহের পথ আমার সুপরিচিত।

—ধরুন, রাজগৃহযাত্রী জনৈক ব্যক্তি আপনাকে রাজগৃহে যাবার পথের নির্দেশ চাওয়ায় আপনি বললেন "ভাই, এ রাস্তা ধরে চলতে চলতে একটি গ্রাম পাবে, সেটি ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলে একটি গ্রামে এসে পৌঁছাবে, সে গ্রাম ছাড়িয়ে চলতে চলতে একটি নিগম পাবে, সে নিগমের অমুক রাস্তা ধরে চলতে থাকবে তারপর দূর থেকে দেখতে পাবে রাজগৃহের ধূম্রায়মান শৈলশ্রেণী, অতঃপর সে রাস্তা ধরে চলতে চলতে রাজগৃহে গিয়ে পৌঁছাবে।" আপনার এ নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সে ব্যক্তি উলটো পথ ধরে অন্য দিকে চলে গেল। কিন্তু আর এক ব্যক্তি আপনার কাছে রাজগৃহে যাবার পথের যথাযথ নির্দেশ নিয়ে ঠিক পথ ধরে চলতে চলতে নির্বিঘ্নে রাজগৃহে গিয়ে পৌঁছল। হে ব্রাহ্মণ, রাজগৃহ আছে তার পথও আছে এবং আপনিও যথাযথ ভাবে পথের নির্দেশ দিয়েছেন; তাহলে কেন একজন উলটো পথ ধরে অন্যত্র চলে গেল।

—ভবৎ গৌতম, আমি এখানে কি করতে পারি? আমি তো পথপ্রদর্শক মাত্র।

—হে ব্রাহ্মণ, ঠিক তেমনি আমিও কি করতে পারি, আমি পথপ্রদর্শক মাত্র, যদি আমার উপদেশে আমার অনুশাসনে আমার শিষ্যেরা কেউ নির্বাণসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে, কেউ করে না।

তখন গণক মৌদগল্যায়ন উচ্ছ্বাসিত আবেগে বলে উঠলেন ভবৎ গৌতম, যে ব্যক্তিরা শুধু জীবিকার জন্য গৃহত্যাগ করে আপনার ধর্মানুশাসনে অশ্রদ্ধায় প্রব্রজিত শঠ মায়াবী উদ্ধত চঞ্চল চপল অসংযতবাক অসংযতেন্দ্রিয় অমিতাহারী অজাগ্রত স্মৃতিহীন শিক্ষায় অননুরাগী বিলাসী অলস হীনবীর্য অসমাহিত বিভ্রান্তচিত্ত দুর্বুদ্ধিপরায়ণ, তারা আপনার থেকে বহুদূরে। কিন্তু যাঁরা শ্রদ্ধায় গৃহত্যাগ করে আপনার নিকট দীক্ষিত সরলপ্রাণ অনুদ্ধত অচঞ্চল অচপল সংযতবাক সংযতবাক সংযতেন্দ্রিয় মিতাহারী জাগ্রত স্মৃতিমান শিক্ষানুরাগী অবিলাসী অনলস দৃঢ়বীর্য সমাহিত একাগ্রচিত্ত প্রজ্ঞাবান, তাঁরা আছেন আপনার সঙ্গে। ভবৎ গৌতম, যেমন সুগন্ধ মূলের মধ্যে কালানুসারী সুগন্ধকাষ্ঠের মধ্যে রক্তচন্দন এবং সুগন্ধ ফুলের মধ্যে যুঁই শ্রেষ্ঠ, তেমনি আপনার উপদেশ ধর্মোপদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

এ উচ্ছ্বাসবাক্য উচ্চারণ করে পরম তৃপ্তি জানিয়ে ব্রাহ্মণগণক মৌদগল্যায়ন সেই থেকে বুদ্ধের উপাসক হলেন।

ছয়

বৈশালীর উপকণ্ঠে ছিল কলন্দ নামে একটি গ্রাম। কলন্দ গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ছিলেন জনৈক শ্রেষ্ঠী। তাঁর পরিবারে ছিল তাঁর প্রৌঢ়া পত্নী, তরুণ পুত্র ও পুত্রবধূ। বিপুল ধনৈশ্বর্যের মালিক শ্রেষ্ঠীর জীবনে কোন ঝড় ঝঞ্ঝা ছিল না তাঁর সুখের সংসার দেখে অনেকেই তৃপ্তি অনুভব করত। সর্বোপরি তাঁর পরিবারের আকর্ষণ ছিল তাঁর একমাত্র পুত্র সুদিন্ন। সুদিন্ন যেমনি সুদর্শন, তেমনি ছিল স্বভাব-নম্র। সেজন্য সে ছিল সবার প্রিয়।

একদিন বন্ধুদের সাথে সুদিন্ন বৈশালীতে গিয়ে শুনল বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে পৌঁছেছেন। তাঁর কথা আগে থেকে সুদিন্নের শোনা ছিল। তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল বুদ্ধকে দেখার জন্য। সে বন্ধুদের অগোচরে যেখানে বুদ্ধ জনতাকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল, তন্ময় হয়ে শুনল তাঁর বাণী। মন ডুবে গেল ভাবের গভীরে। সে অনুভব করল সংসারের

অসারতা। মন চাইল সংসারের বাঁধন ছিঁড়ে প্রব্রজ্যার উদারতার মধ্যে সার সত্যকে সন্ধান করতে।

বহুক্ষণ ধর্মালাপের পর বুদ্ধ নীরব হলেন। সভার সমাপ্তি ঘোষণা হল। জনতা বুদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে সভা ত্যাগ করল। সুদিন্ন ধীরে ধীরে বুদ্ধের কাছে এসে তাকে প্রণাম করে বসল একান্তে, বলল—ভদন্ত, আপনার উপদেশ শুনে আমার মনে হচ্ছে সংসারে থেকে শুদ্ধ শান্ত জীবন যাপন করা কঠিন, আমি আপনার চরণাশ্রয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চাই; অনুগ্রহ করে আমায় প্রব্রজ্যা দান করুন। বুদ্ধ তার শুভ সংকল্প অনুমোদন করে জিজ্ঞেস করলেন—বৎস, তুমি মাতাপিতার অনুমতি নিয়েছ কি, মাতাপিতার অনুমতি ছাড়া কোন কুলপুত্রকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষাদান তথাগতের রীতি নয়। সুদিন্ন বলল—ভদন্ত, তাহলে আমি তাই করব যাতে মাতাপিতার অনুমতি পাই।

সুদিন্ন চলে গেল বাড়ী। তার স্বাভাবিক হাস্য পরিহাসের অভাব ও গম্ভীর মুখ দেখে বাবা মা উদ্বেগ অনুভব করতে লাগলেন। তাই তাঁরা কুশল জিজ্ঞেস করলেন। সুদিন্ন তার সুস্থতা জানিয়ে বলল—বাবা, আমি এক অসাধারণ মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি, তাঁর উপদেশ মেনে জীবন সার্থক করতে হলে সংসারে থাকা চলে না, সংসারের কঠিন নাগপাশে বদ্ধ থেকে জীবনকে পবিত্র সুন্দর করা সহজ নয়; আমি তাঁর চরণাশ্রয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চাই, তোমরা আমায় অনুমতি দান কর। এ কথা শুনে সুদিন্নের বাবামার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তাঁরা বাধা দিয়ে বললেন—বাবা, তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান নয়নের মনি, সুখ বিলাসের মধ্যে লালিত পালিত, দুঃখ বলে কিছু তোমার জানা নেই, মৃত্যুতেও অনিচ্ছায় তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন হব, জীবন থাকতে তোমায় কি করে বিদায় দেব? সুদিন্ন বাবা মাকে বারবার অনুরোধ জানাল তার সন্ন্যাসের পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্য। কিন্তু কোন সুফল হল না।

বাবামার অন্ধ বাৎসল্য তার পথের বাধা হওয়ায় সুদিন্ন ক্ষুব্ধ হয়ে মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল, বলল—আমায় তোমরা সন্ন্যাসের অনুমতি দাও, তা না হলে এখানেই আমার মৃত্যু। সে অনশন আরম্ভ করল। বাবা মা শত চেষ্টা করেও তাকে খাওয়াতে পারলেন না। তাঁরা বলতে লাগলেন—বাবা ওঠ, সমস্ত ঐশ্বর্য তোমার, তুমি সুখে জীবন যাপন কর এবং সংসারে থেকে তুমি ধর্ম কর্ম কর। সে নীরব রইল। তার বন্ধুগণ বাবা মার পক্ষে অনেক যুক্তি দেখিয়ে তাকে নিরস্ত করতে চাইল। কিন্তু সে অটল রইল তার সংকল্পে। অনাহারে কয়েকদিন কেটে গেল। তার বন্ধুগণ তার অবস্থা দেখে বাবামার কাছে গিয়ে বলল—

সুদিন্ন তার সংকল্পে অটল; মৃত্যু আসবে তবুও প্রব্রজ্যার অনুমতি না পেলে অনশন ভঙ্গ করবে না; আপনারা তাকে অনুমতি দান করুন, গৃহত্যাগ করলেও আপনারা তাকে দেখতে পাবেন, যদি সন্ন্যাস তার মনোপূত না হয়, তাহলে যাবে কোথায়, বাড়ী ফিরে আসতেই হবে। অবশেষে বাবা মা অনিচ্ছায় বিষণ্ণমুখে সন্ন্যাসের অনুমতি দিলেন। অতঃপর সুদিন্ন বাবামার পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁদের কান্নার মধ্যে যাত্রা করল বৈশালীর দিকে। একমাত্র পুত্রের গৃহত্যাগে তাদের সংসারে যেন অন্তহীন অন্ধকার নেমে এল। তাঁরা শরাহত বিহঙ্গের ন্যায় দুঃসহ বেদনায় পড়ে রইলেন। সুদিন্ন যথাসময়ে পৌঁছল বুদ্ধের কাছে এবং প্রার্থনা করল দীক্ষা। বুদ্ধ তাকে ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষা দিলেন।

ভিক্ষু সুদিন্ন ভিক্ষুর সমস্ত কঠিন ব্রত অবলম্বন করে বৃজিগ্রামের সমীপবর্তী অরণ্যে বাস করতে লাগলেন। প্রাসাদের বিলাস শয্যা থেকে অরণ্যের পর্ণকুটিরে এসে ভিক্ষান্নে জীবন যাপন তার দুঃসহ মনে হল না, বরং উদার অবকাশে মন যেন আপনাকে খুঁজে পেল। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার সীমা অতিক্রম করে মন অননুভূত আনন্দে মগ্ন হতে লাগলো। তিনি গ্রাম হতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে অরণ্যের নির্জনতার মধ্যে অধ্যাত্ম চর্চায় দিন কাটাতে লাগলেন। এই সময়ে বৃজিরাজ্যে অনাবৃষ্টিতে ক্ষেতের শস্য ক্ষেতে শূন্য শলাকায় পরিণত হল, সূর্যের খর তাপে তৃণ পর্যন্ত পুড়ে গেল। চারিদিক মরুভূমির মত ধূ ধূ করতে লাগলো। সমস্ত রাজ্য জুড়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অনাহারে অর্ধাহারে লোক শীর্ণকায় হয়ে মৃত্যুর দিন গুনতে লাগলো। ভিক্ষু সুদিন্ন প্রতিদিন যে গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতেন, সেখানে ভিক্ষা পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন—অনাহারে অর্ধাহারে আর কতদিন এখানে থাকা যাবে, বৈশালীতেই তো আছে আমার ধনাঢ্য বিত্তসম্পন্ন আত্মীয়গণ, সেখানে গিয়ে থাকি, তাহলে অন্ন কষ্ট হবে না, আমার জন্য ভিক্ষুরাও আমার জ্ঞাতিপ্রদত্ত অন্ন লাভ করবেন এবং জ্ঞাতিরাও দান করবার সুযোগ পাবেন।

অতঃপর ভিক্ষু সুদিন্ন বৈশালীতে গিয়ে মহাবনে বাস করতে লাগলেন। তিনি একদিন ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে কলন্দ গ্রামে গৃহের পর গৃহে ভিক্ষা সংগ্রহ করতে করতে নিজের পিতৃগৃহে উপস্থিত হলেন। তাঁদের দাসী তখন বাসি রুটি ফেলতে গিয়ে তাঁকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। তিনি বললেন—বোন, যদি ঐগুলি ফেলে দেবার হয়, তবে আমার পাত্রে দাও। তাঁর কণ্ঠস্বর ও অবয়ব সমূহ দাসীকে চমকিত করে তুলল। সে বাসি রুটি পাত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করে ছুটে গেল শ্রেষ্ঠী গৃহিনীর কাছে, বলল—মা, আপনাদের ছেলে এসেছে। কথাটি

শুনে তিনি দাসীর দিকে চেয়ে রইলেন, বললেন—যদি তোর কথা সত্যি হয়, তবে তোকে আর দাসীবৃত্তি করতে হবে না। ঠিক এই সময়ে শ্রেষ্ঠী বাড়ী ফিরছিলেন, হঠাৎ পীতবাস পরিহিত পুত্রকে প্রাসাদ প্রাচীরের মূলে বসে আহার করতে দেখে চমকে উঠলেন। পুত্রের কাছে গিয়ে শ্রেষ্ঠী বললেন—বাবা, তুমি বাড়ী না গিয়ে এখানে বসে বাসি রুটি খাচ্ছ। সুদিন্ন উত্তর করলেন—বাবা, আপনার বাড়ী গিয়েছিলাম, সেখান থেকেই এ খাবার সংগ্রহ করে এনেছি। শ্রেষ্ঠী আর বাক্য ব্যয় না করে পুত্রের বাহু ধরে নিয়ে গেলেন বাড়ী। তাঁকে আবার আহার করতে বলা হলে সুদিন্ন অসম্মতি জানিয়ে বললেন—আজকের আহার আমার সমাপ্ত। আর খাব না। শ্রেষ্ঠী বললেন তাহলে কাল এখানে খেও। সুদিন্ন নীরবে সম্মতি জানালেন।

পরদিন সুদিন্নের জননী বিস্তীর্ণ কক্ষতল গোময়লিপ্ত করে রাশি রাশি ধনরত্ন সাজিয়ে রাখলেন এবং মাঝখানে পুত্রের জন্য আসন পাতলেন। সুদিন্ন যথাসময়ে এসে নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর পিতা সেখানে প্রবেশ করেই ধনরত্নরাশির আবরণ উন্মোচন করে বললেন—বাবা, এ হল তোমার মাতামহী-ধন, সামান্য স্ত্রীর মাত্র, এছাড়া রয়েছে তোমার পিতামহের ধন, পিতার ধন তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করে গৃহী হয়ে এ সমস্ত ভোগ কর দান ধর্ম কর। সুদিন্ন নির্বিকার ভাবে বললেন—বাবা, এর জন্য আমার কোন উৎসাহ নেই, সাহস পাই না, আমি ব্রহ্মচর্য ব্রতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বেশ আছি। তাঁর উক্তি শুনে শ্রেষ্ঠী নিরস্ত হলেন না, ঐশ্বর্যের লোভ দেখিয়ে পুত্রকে সন্ন্যাস ত্যাগের জন্য বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। অবশেষে সুদিন্ন বললেন—বাবা, এই বিপুল ধনরত্ন গঙ্গার স্রোতে ফেলে দিন। তাহলে এর জন্য আপনার যে উদ্বেগ, অশান্তি, ভয় হয়, তা থাকবে না। এ কথায় শ্রেষ্ঠী অসন্তুষ্ট হয়ে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

অতঃপর সুদিন্নের ভূতপূর্বা তরুণী পত্নী অপরূপ সজ্জায় সজ্জিতা হয়ে মৃদু হাস্যে তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। কক্ষে যেন রূপের ঢেউ বইল। সুদিন্ন নির্বিকার মনে বসে রইলেন। পত্নী তাঁর পায়ে মস্তক রেখে জিজ্ঞেস করলেন—আর্যপুত্র, যে অপ্সরাদের সঙ্গ সুখের জন্য তুমি ব্রহ্মচর্য পালন করছ, তারা দেখতে কেমন? সুদিন্ন উত্তর করলেন—ভগ্নি, অপ্সরাদের সাহচর্য লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন নয়। পতির 'ভগ্নি' সম্বোধন পত্নীর বুকে শেলের মত বিঁধল। তরুণী সেখানেই মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন।

আহারের পর সুদিন্নের জননী বললেন—বাবা, আমাদের পরিবার সমৃদ্ধ

ধনাঢ্য বিত্তসম্পন্ন, তুমি সংসারে ফিরে এসে এ ঐশ্বর্যের ভার গ্রহণ কর, সুখে থাক, ধর্মকর্ম কর। সুদিন্ন জননীকে বুঝিয়ে বললেন সন্ন্যাসজীবনের গুণ। জননী তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে তাঁকে সন্ন্যাস ত্যাগের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সুদিন্ন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে থাকলেন। অবশেষে জননী বললেন— বাবা, তাহলে একটি বীজ দাও যাতে আমাদের অবর্তমানে এ বিপুল সম্পদ লিচ্ছবিরাজগণের হস্তগত না হয়। সুদিন্ন এতে রাজী হলেন। এবং তিনবার পত্নীর সঙ্গে মিলিত হলেন। পত্নী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যথাকালে পুত্র প্রসব করলেন।

পত্নীর সঙ্গে মিলিত হবার পর থেকে সুদিন্নের দেহমন যেন ভারগ্রস্ত হল। তাঁর মনে অনুতাপের কাঁটা বিঁধতে লাগলো। তাঁর মনে হতে লাগলো তাঁর কার্য নির্মল ভিক্ষু-সঙ্ঘকে কলঙ্কিত করেছে, জীবনে চরম দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছে। দুশ্চিন্তার দংশনে তিনি দিবারাত্র জর্জরিত হতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর মুখের উজ্জ্বলতা নিশ্চিহ্ন হল, চক্ষু কোটরগত হল, শরীর শীর্ণ হল। তাঁর ভিক্ষুসাথীরা তাঁর এ পরিবর্তন লক্ষ্য করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন এর কারণ। তিনি অকপট ভাবে সমস্ত খুলে বললেন। ভিক্ষুরা শুনে স্তম্ভিত হলেন এবং ভিক্ষুর অননুকূল গর্হিত কর্মের জন্য নানাভাবে নিন্দা করতে লাগলেন।

অতঃপর ভিক্ষুগণ এ ঘটনাটি বুদ্ধকে জানালেন। বুদ্ধ ভিক্ষুদের সমবেত করে সুদিন্নকে জিজ্ঞেস করলেন—হে সুদিন্ন তুমি কি সত্যিই ভূতপূর্বা পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলে? সুদিন্ন মস্তক অবনত করে উত্তর করলেন—হাঁ, ভদন্ত। বুদ্ধ এর তীব্র নিন্দা করে বলতে লাগলেন। হে অপদার্থ; এ তোমার পক্ষে অননুকূল অনুপযোগী অকরণীয়। হে মোঘ পুরুষ, তুমি এই সুব্যাখ্যাত ধর্ম বিনয়ে প্রব্রজিত হয়ে কেন পারলে না যাবজ্জীবন পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালন করতে? হে মোঘ পুরুষ, আমি কি ধর্ম দেশনা করিনি বিরাগের জন্য, ত্যাগের জন্য, বিসংযোগ বা বন্ধনচ্ছেদের জন্য; তুমি তা অনুরাগের জন্য, বন্ধনের জন্য গ্রহণের জন্য ভেবেছ। আমি কি বহুভাবে রাগ বিনয়ের জন্য মদ বিনোদনের জন্য পিপাসা ত্যাগের জন্য আলয়চ্ছেদের জন্য তৃষ্ণা ক্ষয়ের জন্য নিরোধের জন্য নির্বানের জন্য ধর্ম বলিনি? আমি কি নানাভাবে কাম পরিত্যাগ কাম বাসনা বিনোদন, কাম জ্বালার উপশমের কথা বলিনি? হে মোঘ পুরুষ, সেখানে তুমি অসৎ ধর্ম গ্রাম্য ধর্ম দুরাচার মৈথুন সেবন করলে! হে অপদার্থ, তুমি বহু অকুশল ধর্মের আদি কর্তা। এইভাবে সুদিন্নের গর্হিত

কর্মের নিন্দা করে বুদ্ধ অনুকূল ধর্মালাপ সুরু করলেন। ধর্মালাপে তিনি ভিক্ষুদের পরিতৃপ্ত করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, সঙ্ঘের সুষ্ঠুতার জন্য নিরাপত্তার জন্য অধার্মিকদের নিগ্রহের জন্য, প্রিয়শীলী ভিক্ষুদের সুবিধার জন্য, সদ্ধর্মের স্থিতির জন্য বিনয়ানুগ্রহের জন্য আমি নিয়ম বাঁধব। সেদিনই তিনি বিনয়ের প্রথম নিয়ম বাঁধলেন—মৈথুন সেবন করলে ভিক্ষুর ভিক্ষুত্ব থাকবে না, সঙ্ঘের সঙ্গে তার সংসর্গ ছিন্ন হবে। এটি বিনয় পিটকে প্রথম 'পারাজিকা' নামে অভিহিত।

সাত

বিনয়ের নিয়মানুসারে ভিক্ষুরা বর্ষাকালে একটি নির্দিষ্ট বিহারে বর্ষাব্রত অবলম্বন করে বর্ষার তিনমাস অতিবাহিত করেন। এমন একটি ঋতুতে রাজগৃহের গৃধ্রকুট পর্বতে বুদ্ধের বর্ষাযাপন স্থিরীকৃত হল। নানা জনপদ থেকে ভিক্ষুরা আসতে লাগলেন রাজগৃহে তাঁর চরণাশ্রয়ে বর্ষাযাপনের জন্য। তাঁদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে রাজগৃহের বিহার সঙ্ঘারামগুলিতে স্থান সংকুলান হল না। ফলে তাঁরা রাজগৃহের আশে পাশে নিজের নিজের বাসস্থান ঠিক করতে লাগলেন। তখন একদল ভিক্ষু 'ঋষিগিরি' পাহাড়ের কোলে তৃণকুটির নির্মাণ করে বর্ষা যাপন করলেন। ভিক্ষু ধনিয় কুমোর সন্তান তাঁদের অনুসরণ করে তৃণকুটিরে বর্ষাব্রত অবলম্বন করলেন। সেই ভিক্ষুগণ বর্ষার অবসানে সেই কুটিরসমূহ ভেঙে ফেলে দেশ দেশান্তর ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু ভিক্ষু ধনিয় সেখানেই বাস করতে লাগলেন। গ্রীষ্মকালে তিনি যখন গ্রামে ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য গেলেন তখন তৃণকাষ্ঠ সংগ্রহকারীরা তা ভেঙে নিয়ে গেল। তিনি আবার তৃণকুটির নির্মাণ করলেন। তার অনুপস্থিতিতে তা আবার তৃণকাষ্ঠ সংগ্রহকারীদের কবলে পড়ল। তিনি যে তৃতীয়বার তৃণকুটির প্রস্তুত করলেন, তারও সেই পরিণতি হল। তখন তিনি ভাবতে লাগলেন—তৃণকুটির এখানে রাখা যাবে না, আমার তো কুম্ভকার কর্ম জানা আছে, সেই শিল্পে আমার নৈপুণ্য রয়েছে, আমি নিজেই কর্দম মর্দন করে মৃত্তিকাময় কুটির তৈরী করব। অতঃপর তিনি কর্দম মর্দন করে মৃণ্ময় কুটির নির্মাণ করলেন এবং তৃণ কাষ্ঠ গোময় সংগ্রহ করে কুটিরখানিকে পোড়ালেন। কুটিরখানি হল অতি মনোরম দর্শনীয় রক্তাভ। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে তার ঝিনি ঝিনি শব্দ ধ্বনিত হতে লাগলো।

একদিন ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ সেই পথ বেয়ে যাবার সময় বুদ্ধের দৃষ্টি পড়ল সেই

করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, সঙ্ঘের সুষ্ঠুতার জন্য নিরাপত্তার জন্য অধার্মিকদের নিগ্রহের জন্য প্রিয়শীলী ভিক্ষুদের সুবিধার জন্য সদ্ধর্মের স্থিতির জন্য বিনয়ানুগ্রহের জন্য আমি নিয়ম বাঁধব। সেদিনই তিনি বিনয়ের দ্বিতীয় 'পারাজিক' বলে উক্ত নিয়ম বাঁধলেন—রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবার উপযুক্ত দ্রব্য অপহরণ করলে ভিক্ষুত্ব থাকবে না, সঙ্ঘের সঙ্গে তার সংসর্গ ছিন্ন হবে।

আট

বুদ্ধ এক সময়ে বৈশালীর মহাবনে ভিক্ষুদের প্রায়ই অশুভ ভাবনা বা দেহের অন্তর্নিহিত রক্ত মাংসাদি অশুচি উপাদান সম্পর্কিত চিন্তা বা ধ্যান সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। এই ধ্যানে দেহের প্রতি অনুরাগ শিথিল হয়ে আসে এবং মন ইন্দ্রিয়ের দ্বার ছেড়ে অন্তর্মুখী হতে থাকে। তাই তিনি ভিক্ষুদের চিত্তকে ধ্যাননিবিষ্ট করবার জন্য এ সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন এবং অশুভ ধ্যানের গুণ বর্ণনা করলেন। ভিক্ষুগণও এ নিয়ে মেতে উঠলেন। তখন তিনি ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, আমি অর্ধ মাস নির্জনে থাকব, আমার আহার বেলায় শুধু একজন ভিক্ষু ছাড়া আর কেউ যেন আমার কাছে না আসে। তাঁর নির্দেশ মেনে কেউ তাঁর নির্জনতা ভঙ্গ করলেন না।

যে অশুভ ভাবনার উপদেশ নিয়ে ভিক্ষুরা মেতে উঠলেন, তার উল্টো ফল দেখা দিল। তাঁরা ইচ্ছামত নানাভাবে ভাবনার অনুশীলন সুরু করলেন। এর ফলে তাঁদের নিজেদের শরীরের প্রতি জাগলো ঘৃণা। বিলাসী যুবক-যুবতী যেমন স্নাত বিভূষিত হয়ে কণ্ঠলগ্ন বিকৃত গলিত শবকে ঘৃণা করে, তেমনি তাঁরা ঘৃণা করতে লাগলেন নিজের দেহকে। দেহের প্রতি ঘৃণায় কুণ্ঠায় বিরক্তিতে তাঁরা দেহ থেকে মুক্তির চাইলেন। মৃত্যুই তাদের কাছে মনে হল মুক্তির পথ। তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে কেউ কেউ আত্মহত্যা করলেন, কেউ কেউ পরস্পরকে হত্যা করলেন। মৃগলণ্ডিক নামে শ্রমণবেশধারী জনৈক উচ্ছিষ্ট-ভোজী বিহারে থাকত। কেউ কেউ তাকে পাত্র-চীবরের লোভ দেখিয়ে তাঁদের হত্যা করবার জন্য অনুরোধ করলেন। দু একজনকে হত্যা করবার পর মৃগলণ্ডিকের এ মর্ম সহজ হয়ে উঠল। সে বিনা দ্বিধায় বহু ভিক্ষুকে হত্যা করে ফেলল।

নদীর জলে রক্তাক্ত অসি ধুয়ে মৃগলণ্ডিক যখন নদী তীরে দাঁড়াল, তার অন্তরে অনুশোচনা এল—আমার চরম দুর্ভাগ্য, আমি আজ কত পাপ সঞ্চয় করলাম এই শীলবান ধার্মিক ভিক্ষুদের হত্যা করে। তখন কে যেন তাকে বলতে

লাগলো হে সৎপুরুষ, তোমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি এত লোককে মুক্তি দিলে। এ কথা শুনে মৃগলণ্ডিকের মনে আর অনুতাপ রইল না। তার মনে হতে লাগলো—সে একজন মুক্তিদাতা, বহুলোককে মুক্তিদান করেছে। মুক্তিদানের পুণ্য লোভে সে শাণিত অসি উত্তোলন করে ফিরে গেল সঙ্ঘারামে এবং উদাত্ত কণ্ঠে বলতে লাগলো—ভদন্তগণ আসুন, কে মুক্তি চান, এখনি আমি মুক্ত করব। তার হাতে অসি ঝক্ ঝক্ করতে লাগলো। যে ভিক্ষুরা ছিলেন অবীতরাগ, অরিপুজয়ী, তাঁরা তার রুদ্র মূর্তি দেখে ভয়ার্ত হলেন আর যে ভিক্ষুরা ছিলেন বীতরাগ অর্হৎ, তাঁরা অচঞ্চল ভাবে তার পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। সে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত বিহার থেকে বিহারে, পরিবেণ থেকে পরিবেণে বিচরণ করতে লাগলো ভিক্ষু হত্যার জন্য।

অর্ধমাস নির্জনবাসের পর বুদ্ধ যখন ভিক্ষুদের মধ্যে ফিরে এসে এ ঘটনার কথা শুনলেন, তখন তিনি বৈশালীর সমস্ত ভিক্ষুকে সমবেত করে বলতে লাগলেন—হে ভিক্ষুগণ, এই আনাপান স্মৃতি ধ্যান ও স্নিগ্ধ শান্ত প্রণীত। এ ধ্যান অভ্যাস করলে ভাবনা করলে জীবনযাত্রা হয় আনন্দপূর্ণ সচ্ছন্দ এবং কলুষমুক্ত হয়ে মন হয় নির্মল নিষ্কলঙ্ক। নিদাঘাবসানে অকাল মেঘের প্রবল বর্ষণ যেমন উত্থিত ধূলিরাশিকে নিশ্চিহ্ন করে, তেমনি এ ধ্যানের অভ্যাসও মনের কলুষরাশিকে বিদূরিত করে। কিভাবে আনাপান স্মৃতি ভাবনা করতে হয়, তা শোন—ভিক্ষু অরণ্যগত বা বৃক্ষমূলগত হয়ে অথবা শূন্য গৃহে গিয়ে ঋজুকায়ে আসনবদ্ধ হয়ে মনকে অন্তর্মুখী করে স্মৃতি জাগ্রত রেখে শ্বাস গ্রহণ করে, নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। সে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করবার সময় দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি বলে জানে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করবার সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করছি বলে জানে, ক্ষুদ্র শ্বাস গ্রহণকালে ক্ষুদ্র শ্বাস গ্রহণ করছি বলে জানে, ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ কালে ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি বলে জানে। সে প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে আদ্যন্তমধ্য অনুভব করতে অভ্যাস করে, দেহের প্রশান্তি অনুভব করতে অভ্যাস করে, প্রীতিসুখ অনুভব করতে শেখে। সে শ্বাস-প্রশ্বাসে চিত্তের অবস্থা অনুভব করতে শেখে, চিত্তের প্রশান্তি অনুভব করতে শেখে, চিত্তকে আনন্দপূর্ণ সমাহিত সংক্লেশ-মুক্ত করতে শেখে। সে সৃষ্টির অনিত্যতা অনুভব করতে শেখে শ্বাস-প্রশ্বাসে। সে বিরাগ দৃষ্টি নিরোধ দৃষ্টি, ত্যাগ দৃষ্টি প্রসারিত করতে শেখে শ্বাস-প্রশ্বাসে। হে ভিক্ষুগণ, এইভাবে আনাপান স্মৃতি ধ্যান ভাবনা করলে সমৃদ্ধ করলে জীবনযাত্রা হয় আনন্দপূর্ণ স্বচ্ছন্দ এবং মন কলুষ-মুক্ত হয়ে নির্মল নিকলঙ্ক হয়।

এই বৈঠকে বুদ্ধ সমবেত ভিক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞেস করলেন—এই ভিক্ষুগণ, সত্যি কি ভিক্ষুরা আত্মহত্যা করেছে, পরস্পরকে হত্যা করেছে, মৃগলণ্ডিককে পাত্র-চীবরের লোভ দেখিয়ে হত্যার প্ররোচিত করেছে? ভিক্ষুগণ উত্তর করলেন—হাঁ, ভদন্ত। বুদ্ধ এর তীব্র নিন্দা করে বলতে লাগলেন—কি করে সেই ভিক্ষুরা আত্মহত্যা করল, পরস্পরকে হত্যা করল, মৃগলণ্ডিককে হত্যায় প্ররোচিত করল, এ তাদের পক্ষে অননুকূল অনুপযোগী অকরণীয়। এইভাবে গর্হিত হত্যাকার্যের নিন্দা করে তিনি বিনয়ের 'তৃতীয় পারাজিক' বলে কথিত নিয়ম বাঁধলেন—হত্যার সংকল্প নিয়ে মানুষের প্রাণ সংহার করলে অথবা তার কারণ হলে ভিক্ষুর ভিক্ষুত্ব থাকবে না, সঙ্ঘের সঙ্গে তার সংসর্গ ছিন্ন হবে।

নয়

বগ্‌গুমুদা বইত বৈশালীর অদূরে। তার পবিত্র জলে অবগাহনের জন্য দূর থেকে লোক আসত। স্নানার্থীর ভিড় জমত অমাবস্যায় পূর্ণিমায় ও অষ্টমী তিথিতে। যজ্ঞধূমে আচ্ছন্ন থাকত স্নানের ঘাটগুলি। মন্ত্র ধ্বনিত মুখরিত হত চারিদিক। তার অদূরে তটসংলগ্ন ছায়াচ্ছন্ন রমণীয় ভূভাগে একদল ভিক্ষু বর্ষাব্রত আরম্ভ করলেন। তাঁরা আসন্ন গ্রামসমূহ থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে অধ্যাত্মচর্চায় রত হতেন। এই সময় দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হল সমগ্র বৃজিরাজ্য জুড়ে। অভাব অনটনের হাহাকার পড়ে গেল। বগ্‌গুমুদা তীরবাসী ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা দুর্বহ হয়ে উঠল। তাঁদের অধ্যাত্ম-চর্চা জঠরাগ্নিতে সমাধি লাভ করল। জীবনধারণ সমস্যা হয়ে দেখা দিল। অথচ বর্ষাব্রত ভঙ্গের ভয়ে তাঁরা স্থান ত্যাগ করতে সাহস করলেন না।

একদিন এই ভিক্ষুগণ কুটির প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে কিভাবে বর্ষাব্রতের বাকী দিনগুলি কাটাবেন মন্ত্রণা করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন সম্পন্ন গৃহস্থদের কর্ম দেখা শোনা করলে তাঁরা ভিক্ষা-লাভে বঞ্চিত হবেন না, কেউ কেউ বললেন কর্ম দেখার গুরুভার না নিয়ে সুষ্ঠুভাবে দূত কার্য সম্পাদন করলে তাঁদের অন্নাভাব ঘুচবে। আবার একজন মন্তব্য করলেন—বন্ধুগণ, কেন আমরা অনর্থক লোকের কর্ম দেখা শোনা করব, কেনই বা দূত কার্য করতে যাব, আমরা শুধু গৃহস্থদের কাছে গিয়ে আমাদের পরস্পরের অলীক অধ্যাত্মসিদ্ধির কথা প্রচার করব, আমরা বলব "এই ভিক্ষু ধ্যানী, এই ভিক্ষু নির্বাণের স্তরলাভী, এই ভিক্ষু দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পান, দিব্য কর্ণে শুনতে পান, এই ভিক্ষুর ছয় অভিজ্ঞান আয়ত্ত হয়েছে" তা হলে ভক্ত গৃহস্থগণ আমাদের সেবার জন্য ব্যাকুল

হবেন এবং আমরা নিরাপদে দিন কাটাতে পারব। এ মন্তব্য সকলের মনোপূত হল। তাঁরা ঠিক করলেন তাঁরা অলীক অধ্যাত্ম সিদ্ধির প্রচারে রত হবেন।

সেই ভিক্ষুগণ অনতিবিলম্বে তাঁদের সিদ্ধান্ত কাজে লাগালেন। তার আশ্চর্য ফল হল। তাঁদের ভক্ত সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগলো। অন্ধ ভক্তির আতিশয্যে পাপপুণ্যোত্তাতুর লোকেরা নিজেদের স্ত্রীপুত্রকে বঞ্চিত করে তাঁদের সেবা করতে লাগলো। সুখাদ্য খেয়ে বিপুল সেবাযত্ন পেয়ে অল্প দিনের মধ্যে তাঁদের চেহারা বদলে গেল। তাঁরা স্বচ্ছন্দে বর্ষা কাটালেন।

তখন ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের পর বুদ্ধদর্শনে যাওয়া ছিল আচরিত প্রথা। অন্যান্য ভিক্ষুদের মত বগ্‌গুমুদা তীরবাসী ভিক্ষুরাও বুদ্ধদর্শনের জন্য বৈশালীতে গেলেন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপে ভিক্ষুরা শীর্ণকায় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এই ভিক্ষুদের সম্পূর্ণ নতুন মনে হল। এঁদের সুন্দর সুঠাম দেহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

বুদ্ধ আগন্তুক ভিক্ষুদের সঙ্গে আলাপ করতেন, কুশল জিজ্ঞেস করতেন। বগ্‌গুমুধা তীরবাসী ভিক্ষুরা যখন তাঁকে প্রণাম করলেন, তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কুশলে আছ তো, তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে নির্বিবাদে নিরাপদে বর্ষা কাটিয়েছ তো, অন্নাভাবে তোমাদের কষ্ট হয়নি তো? তাঁরা উত্তর করলেন—হাঁ, ভগবান, আমরা কুশলে আছি, একতাবদ্ধ নির্বিবাদে নিরাপদে বর্ষা কাটিয়েছি, অন্নের জন্য কোন কষ্ট হয়নি আমাদের। বুদ্ধ জেনেও জিজ্ঞেস করেন, জেনেও জিজ্ঞেস করেন না, সময় বুঝে জিজ্ঞেস করেন, সময় বুঝে জিজ্ঞেস করেন না। তাঁর জিজ্ঞাসা অর্থপূর্ণ, অর্থহীন নয়। দুই কারণে তিনি প্রশ্ন করেন—ধর্মালাপ করবার উদ্দেশ্যে অথবা শিষ্যদের বিনয় সংবিধান প্রবর্তনের জন্য। বগ্‌গুমুদা তীরবাসী ভিক্ষুদের আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি ভাবে সেখানে নির্বিঘ্নে নিরাপদে কাটালে এবং কিভাবে তোমরা অন্নকষ্টকে এড়িয়ে গেলে? সেই ভিক্ষুগণ বুদ্ধকে খুলে বললেন আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত। বুদ্ধ শুনেই খুব নিন্দা করতে লাগলেন। হে মোঘপুরুষগণ, এ তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত অসঙ্গত অননুকূল। তোমরা কি করে উদরের জন্য গৃহস্থদের কাছে পরস্পরের মিথ্যা অধ্যাত্ম-উপলব্ধির কথা প্রচার করলে? হে মোঘপুরুষগণ, এই হীনপন্থা অবলম্বনের চেয়ে তোমাদের উচিত ছিল গোঘাতকের তীক্ষ্ণ অসি দিয়ে উদর ছেদন করা; তার জন্য তোমাদের মৃত্যু হত বা মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে হত, কিন্তু মৃত্যুর পর নরক লাভ হত না।

বুদ্ধ সমবেত ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন। হে ভিক্ষুগণ, জগতে পাঁচজন মহাচোর দেখা যায়। কোন কোন মহাচোরের বাসনা জাগে—আমি কবে দলবল নিয়ে গ্রাম নিগম রাজধানী পরিভ্রমণ করে হত্যায় লুণ্ঠনে রত হব। অপর সময়ে তার বাসনা পূর্ণ হয় অর্থাৎ সে গ্রাম নিগম রাজধানীতে অবাধে হত্যা লুণ্ঠন চালায়। তেমনি কোন কোন পাপী ভিক্ষুর বাসনা হয়—আমি কবে গ্রাম নিগম রাজধানীতে লোক সমাজের কাছে সমাদৃত সম্মানিত হয়ে প্রচুর দ্রব্যসম্ভার উপহার পেয়ে সদলবলে ঘুরে বেড়াব। অপর সময়ে তার সে বাসনা পূর্ণ হয়—এ ধরণের পাপী ভিক্ষু প্রথম মহাচোর। কোন কোন পাপী ভিক্ষু তথাগত দেশিত ধর্ম বিনয় আয়ত্ত করে নিজের উপলব্ধি বলে প্রচার করে—এ ব্যক্তি দ্বিতীয় মহাচোর। যে পাপী ভিক্ষু শুদ্ধ পবিত্র ব্রহ্মচারীকে অব্রহ্মচর্যের মিথ্যা দোষারোপে কলঙ্কিত করে, সে তৃতীয় মহাচোর। যে পাপী ভিক্ষু সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত বিষয় বস্তু দিয়ে গৃহীদের আপ্যায়িত করে, সে চতুর্থ মহাচোর। যে অধ্যায় সাধনায় সিদ্ধি লাভ না করে নিজেকে সত্যদ্রষ্টা সিদ্ধ বলে পরিচয় দেয়, সে পঞ্চম মহাচোর,এবং সবার অধম। কারণ সে পরদত্ত অন্ন চৌর্যাবলম্বনে আহার করে—

> যে নিজেকে মিথ্যা প্রচার করে, সে প্রবঞ্চক ধূর্তের মত চুরি করে খায়। অসংযত অধার্মিক কাষায়ধারীর সংখ্যা অনেক, তারা স্বকীয় পাপ কর্মের জন্ত নিরয় প্রাপ্ত হয়।
>
> দুঃশীল অসংযত হয়ে পরদত্ত অন্ন ভোজন করার চেয়ে অগ্নিশিখাসদৃশ তপ্ত লৌহগোলক গলাধঃকরণ করা শ্রেয়।

বুদ্ধ এইভাবে বগ্‌গুমুদা তীরবাসী ভিক্ষুদের দুষ্ক্রিয়ার তীব্র নিন্দা করে অনুকূল ধর্মালাপে ভিক্ষুদের পরিতৃপ্ত করে বিনয়ের 'চতুর্থ পারাজিক' নামে সংবিধান রচনা করলেন—অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করে নিজেকে সিদ্ধ বা লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী বলে পরিচয় দিলে ভিক্ষুত্ব নষ্ট হবে, সঙ্ঘের সঙ্গে তার সংসর্গ থাকবে না।

দশ

উজ্জয়িণীর রাজা প্রদ্যোতের নামে লোক থর থর করে কাঁপত। সামান্ত কারণে শোণিতের স্রোত বইয়ে দিতে তাঁর কুণ্ঠাবোধ হত না। তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে আকৃতিরও মিল ছিল হুবহু। তাই রাজ্যবাসীর কাছে ছিলেন তিনি সাক্ষাৎ যমদূত। এক সময়ে তিনি পাণ্ডুরোগাক্রান্ত হলেন। রোগের কিছুতে

উপশম হয় না। এজন্য রাজকোষ উন্মুক্ত হল। বহু প্রখ্যাত চিকিৎসক এসে চিকিৎসা করলেন। কোন সুফল হল না। অবশেষে রাজা প্রদ্যোত দূত পাঠালেন রাজা বিম্বিসারের কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়ে মহাভিষক জীবককে পাঠাবার জন্য। মহানুভব রাজা বিম্বিসার রাজা প্রদ্যোতের ব্যাধির বিবরণ শুনে বিচলিত হলেন এবং তখনি জীবককে নির্দেশ দিলেন উজ্জয়িণী যাত্রার জন্য।

মহাভিষক জীবক রাজাদেশে উজ্জয়িণীর রাজপ্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে পরম সমাদর লাভ করলেন। তিনি রাজা প্রদ্যোতকে পরীক্ষা করে বললেন—মহারাজ, আপনার জন্য একটি ঘৃতপাক প্রস্তুত করব, তা আপনি পান করবেন। ঘৃতপাকের কথা শুনে রাজা আঁতকে উঠলেন, বললেন—ওহে, ঘৃত গ্রহণ করতে পারব না, ঘৃত ছাড়া অন্য ব্যবস্থা কর, ঘৃত আমার সয় না, তার গন্ধে আমার বমি আসে। জীবক ফাঁপরে পড়লেন, ভাবতে লাগলেন—রাজার যে ব্যাধি, তা ঘৃতপাক ছাড়া সারবে না, এজন্য আমাকে ঘৃতপাক প্রস্তুত করতেই হবে কষায় রঙের কষায় গন্ধের কষায় রসের। তিনি নানা ভৈষজ্য মিশ্রিত করে তা সম্পাদন করলেন। কিন্তু তিনি জানতেন কিছুক্ষণ পরে ঘৃত পাকের যখন ঢেঁকুর উঠবে, রাজা তখনি টের পাবেন এবং ক্রোধান্ধ হয়ে ভিষককে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হবেন না। তাই জীবক প্রথমেই রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—মহারাজ, আমাদের বৈদ্যদের কোন ধরা বাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকা চলে না, যে কোন মুহূর্তে যে কোন ভৈষজ্য দ্রব্যের দরকার হলে আমাদের ছুটতে হয়, তাই অনুগ্রহ করে হাতীশালে ঘোড়াশালে হুকুম দিন যেন তারা আমাকে ইচ্ছামত হাতী ঘোড়া ব্যবহার করতে দেয় এবং দ্বারপালদের বলে দিন যেন আমি ইচ্ছামত যে কোন দ্বার দিয়ে যে কোন সময়ে আসা যাওয়া করতে পারি। রাজা এ প্রস্তাবে এক কথায় রাজী হয়ে বাহনশালার সকলকে এবং দ্বারপালদের ডেকে যথারীতি হুকুম দিলেন। জীবক কয়েকদিন মহড়া দিলেন। তারপর তিনি রাজার হাতে তুলে দিলেন কষায় রঙের কষায় গন্ধের কষায় রসের ঘৃতপাক এবং বললেন সেবন করুন এ ঔষধ, সেরে যাবে আপনার ব্যাধি। রাজাকে তা খাইয়েই জীবক পলায়ন করলেন ভদ্রবতী হস্তিনীর স্কন্ধ আরোহণ করে যে ছুটতে পারত বাহনশালার সকলের চেয়ে বেশী। পরিপাকের সময় যখন প্রথম ঢেঁকুরে রাজা টের পেলেন জীবক নিষেধ সত্ত্বেও কারসাজি করে তাঁকে ঘৃত খাইয়েছেন, ক্রোধে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো। তিনি উন্মত্তের মত চীৎকার করে বলতে লাগলেন—দুষ্ট

বৈদ্য আমার মানা মানল না, আমায় ঘৃত খাওয়াল, তাকে ধরে নিয়ে এসো আমার কাছে। অমাত্যবর্গ বললেন—মহারাজ, বৈদ্য পলায়ন করেছেন ভদ্রবতীর স্কন্ধে আরোহণ করে। তখনি রাজার হুকুমে তরুণ কাককে ডেকে উপস্থিত করা হল তাঁর সামনে। এ ছিল অত্যন্ত বেগবান পুরুষ, তার গতি ছিল ভদ্রবতী হস্তিনীর চেয়ে দ্রুততর। রাজা তাকে হুকুম করলেন—হে কাক, যাও তুমি এক্ষুনি, বৈদ্যকে ফিরিয়ে আনো, সাবধান! তার দেয়া কিছু মুখে দিও না। বৈদ্যরা যাদুমন্ত্র জানে।

কাক ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে ভিষক জীবকের উদ্দেশে। লোকেরা অবাক হয়ে তাকাতে লাগল তার অদ্ভূত গতিবেগ দেখে। গ্রাম-নিগম মাঠ প্রান্তর অতিক্রম করে দৈত্যবিক্রমে সে ছুটতে লাগলো। তার সঙ্গে পেরে উঠল না ভদ্রবতী। অবশেষে কৌশাম্বীর পথে জীবকের কাছে এসে উপস্থিত হল কাক। তখন জীবক প্রাতরাশ করছিলেন। কাককে দেখে তিনি সমস্ত ব্যাপার অনুমান করলেন। কাক বলল—আচার্য চলুন, রাজা আপনাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য আমায় পাঠিয়েছেন। সুচতুর জীবক বললেন—বৎস, একটু অপেক্ষা কর, খেয়ে নিই। তুমিও এসো, খাও। কাক বলল—আচার্য, না, আমি খাব না; রাজা আমার বারণ করেছেন আপনার হাতে কিছু খেতে। জীবক নখের মধ্যে ঔষধ গোপন করে আমলকীর টুকরো চিবিয়ে জল পান করতে করতে বললেন—আমলকী চিবিয়ে একটু জল পান কর। কাক অসন্দিগ্ধ মনে জীবকের হাত থেকে আমলকীর টুকরা নিয়ে জল পান করল। সঙ্গে সঙ্গে তার দাস্ত সুরু হল। কাতর কণ্ঠে কাক অনুরোধ করল—আচার্য, আমার জীবন দিন। জীবক তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—কাক, ভয় নেই, তুমি বেঁচে যাবে, রাজাও সুস্থ হয়ে উঠবেন, তাই আমি যাচ্ছি না, সুস্থ হয়ে ভদ্রবতীকে নিয়ে তুমি ফিরে যাও।

জীবক রাজগৃহে গিয়ে রাজা বিম্বিসারকে জানালেন আদ্যোপান্ত সমস্ত খবর। রাজা সেই কাহিনী শুনতে শুনতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—জীবক, তুমি উত্তম উপায় অবলম্বন করেছিলে নতুবা সেই ক্রুর নরপতির হাতে প্রাণ হারাতে।

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই উজ্জয়িনী থেকে রাজা প্রদ্যোতের দূত এসে ভিষক জীবককে বলল—আচার্য, রাজা প্রদ্যোত এখন রোগমুক্ত হয়ে আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন এবং আপনাকে যথোচিত উপহার দানে সন্তুষ্ট করতে চান, আপনি চলুন। জীবক বিনীতভাবে বললেন—রাজা যে আমার

প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, তা আমার সৌভাগ্য, আমার কথা যদি তাঁর স্মরণে থাকে, তবে তাতেই যথেষ্ট হবে। দূত চলে গেলেন।

অতঃপর রাজা প্রদ্যোত কুরু রাজ্য থেকে পেলেন অতি উত্তম বস্ত্র-যুগল যার তুলনা মিলে না সৌন্দর্যে সৌকর্যে সূক্ষ্মতায়। ভিষক জীবকের উপকার স্মরণ করে রাজা সেই উত্তম বস্ত্র-যুগল পাঠিয়ে দিলেন জীবকের কাছে। জীবক এই উপহার পেয়ে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন—ভগবান বুদ্ধের যোগ্য এ বস্ত্র অথবা রাজা বিম্বিসারের, অন্ত কারুকে এ মানাবে না। এই সময়ে বুদ্ধের শরীর দোষগ্রস্ত হয়। তিনি আনন্দকে ডেকে বললেন—আনন্দ, আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। আনন্দ জানালেন জীবককে এ বিষয়। জীবক অনুরূপ চিকিৎসা সুরু করলেন। তাঁর সুচিকিৎসায় বুদ্ধ অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। জীবক সেই বস্ত্র যুগল হাতে নিয়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—ভদন্ত, আমি আপনার কাছে একটি বর প্রার্থনা করি। বুদ্ধ বললেন—মহাভিষক, বুদ্ধেরা বর দান করেন না। জীবক উত্তর করলেন—যে বর অনবদ্য ও অনুকূল, তাই প্রার্থনা করব। "তাহলে বল।" জীবক বলতে লাগলেন—ভগবন, আপনি এবং আপনার শিষ্যবর্গ পথের ধুলো থেকে বস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে চীবর প্রস্তুত করে পরেন, আজ রাজা প্রদ্যোতের দেয়া এ বস্ত্র-যুগল গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন এবং ভিক্ষু সঙ্ঘকে নির্দেশ দিন যেন তাঁরা গৃহস্থদের দেয়া বস্ত্র গ্রহণ করেন। বুদ্ধ ধর্মালাপে জীবককে পরিতৃপ্ত করে ভিক্ষু সঙ্ঘকে সমবেত করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে যারা চায় পাংশুকূল (ধূলি হতে কুড়ানো) বস্ত্র পরতে, তারা পাংশুকূল বস্ত্রই পরুক, আর যারা গৃহস্থদের দেয়া বস্ত্র গ্রহণ করতে চায়, তারা তাই করুক, তবে আমি যথালাভ তুষ্টির প্রশংসা করি।

গৃহস্থদের প্রদত্ত চীবর পরিধানের নির্দেশ দানের কথা রাজগৃহে প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত উপাসকগণ ভিক্ষুদের বস্ত্র দানের জন্ম অত্যন্ত উৎসাহিত হলেন। তাঁরা বিপুল বস্ত্ররাশি নিয়ে বিহারে বিহারে ভিক্ষুদের দান করলেন। এরপর জনপদে জনপদে বস্ত্র দানের হিড়িক পড়ে যায়। সেই থেকে ভিক্ষুদের বস্ত্রদান প্রথা প্রচলিত হয়।

এগার

একটা ক্ষুদ্র বিহার। সেখানে থাকতেন কয়েকজন ভিক্ষু। তাঁদের একজন ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি কারু সাথে মেলামেশা করতেন না প্রাণ খুলে।

কারুর অসুখবিসুখ হলে তিনি ছায়া পর্যন্ত মাড়াতেন না। কারু কোন উপকার করা ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁর এই স্বভাবের জন্য তিনি হলেন সবার বিরাগভাজন। সাথীরাও তাকে এড়িয়ে চলতেন। এজন্য তাঁর কোন ক্ষোভ বা দুঃখও ছিলনা। দিন কারু সমান যায় না। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে তাঁর অসুস্থতা কঠিন ব্যাধিতে পরিণত হল। তিনি উত্থানশক্তি-রহিত হয়ে পড়লেন নিজের বিছানায় মল-মূত্র ত্যাগ করতে লাগলেন। তাঁর সর্বাঙ্গ মল-মূত্রে বিকৃত হয়ে উঠলো। দুর্গন্ধে তাঁর কাছে যাওয়া দায় হল। সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার অভাবে তিনি মৃত্যুর দিন গুণতে লাগলেন।

বুদ্ধ মাঝে মাঝে ভিক্ষুদের আবাসগুলি পরিদর্শন করতেন। তিনি আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষুদের শয়নাসন পরিদর্শন করতে বেরুলেন। বিহারের পর বিহার পরিদর্শন করতে করতে তিনি উপস্থিত হলেন সেই বিহারে যেখানে রুগ্ন ভিক্ষুটি অসহায়ভাবে মল-মূত্র-দূষিত শয্যায় শুয়েছিল। ভিক্ষুটি করুণভাবে একবার বুদ্ধের পানে তাকালেন। যখনি বুদ্ধের দৃষ্টি পড়ল সেই ভিক্ষুটির ওপর, তাঁর প্রাণ কেঁপে উঠল। তিনি ধীরে ধীরে গেলেন রুগ্ন শয্যার পাশে, ভিক্ষুটিকে জিজ্ঞেস করলেন করুণার্দ্র কণ্ঠে—হে ভিক্ষু, তোমার কি হয়েছে, তোমায় কি কেউ সেবা করে না। বুদ্ধের করুণার্দ্র বাক্য শুনে ভিক্ষুর নয়ন সজল হয়ে উঠল। তিনি ক্ষীণ স্বরে বললেন—ভদন্ত, আমি কঠিন অতিসারে ভুগছি, আমার কোন সেবক নেই; আমি কোনদিন কারু উপকার করিনি, তাই কেউ আমায় দেখে না। বুদ্ধ আনন্দকে ডেকে বললেন—যাও আনন্দ, জল নিয়ে এসো, স্নান করাব। 'হাঁ ভদন্ত' বলে সাড়া দিয়ে আনন্দ জল নিয়ে এলেন। তাঁরা দুজনে ভিক্ষুটিকে স্নান করিয়ে গা মুছিয়ে দিলেন। তারপর নতুন বিছানা পেতে উভয়ে তাকে শোয়ালেন। ভিক্ষুর সমস্ত দেহ মন স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। তাঁর মন প্রাণ জুড়ে বইল এক অননুভূত পুলকধারা। তিনি অপলক নেত্রে চেয়ে রইলেন বুদ্ধ ও আনন্দের পানে।

বুদ্ধ বিহারের ভিক্ষুদের সমবেত করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, এই বিহারে কোন ভিক্ষু অসুস্থ আছে কি? উত্তর হল—হাঁ ভদন্ত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কি অসুখ হয়েছে? ভিক্ষুরা উত্তরে বললেন—ভদন্ত, অতিসার রোগে একজন ভিক্ষু ভুগছে। বুদ্ধ আবার জিজ্ঞেস করলেন—সেই ভিক্ষুকে কেউ সেবা করে কি? ভিক্ষুগণ—না, ভদন্ত, কেউ সেবা করে না।

বুদ্ধ—কেন সেবা করে না।

ভিক্ষুগণ—কারণ, সে ভিক্ষু কারু কোন উপকার করতে নারাজ এবং কারু সঙ্গে তার ভাব নেই।

বুদ্ধ সমস্ত ব্যাপার শুনে খুশী হলেন না। তিনি বলতে লাগলেন। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে, এখানে তোমাদের মাবাবা নেই যাঁরা অসুখের সময় সেবা করবেন। তোমরা যদি পরস্পরকে সেবা না কর, কে তোমাদের সেবা করবে, সাহায্য করবে? হে ভিক্ষুগণ, যে রোগীর পরিচর্যা করে, সে আমার সেবা করে।

উপদেশ দানের পর বুদ্ধ নিয়ম প্রবর্তন করলেন—যদি উপাধ্যায় থাকে, তবে উপাধ্যায় যাবজ্জীবন শিষ্যের অসুখে সেবা করবে, আরোগ্যকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, আরোগ্যকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে; যদি আচার্য থাকে, তবে আচার্য অন্তেবাসীর অসুখে যাবজ্জীবন সেবা করবে, আরোগ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, যদি সতীর্থ থাকে, তবে সতীর্থ সতীর্থের অসুখে যাবজ্জীবন সেবা করবে, আরোগ্যলাভ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে; যদি উপাধ্যায় বা আচার্য অথবা সতীর্থও না থাকে, তবে সঙ্ঘ তার সেবার ভার গ্রহণ করবে; যদি এর ব্যতিক্রম হয়, 'দুষ্কৃত' বলে কথিত অপরাধ হবে।

বুদ্ধ আরও বলতে লাগলেন। হে ভিক্ষুগণ, পাঁচ রকমের রোগী দুঃসেব্য হয়—অপথ্য সেবন করে, পথ্যের মাত্রা জানে না, ভৈষজ্য সেবন করে না, হিতকামী সেবকের কাছে রোগের যথাযথ বিবরণ প্রকাশ করে না এবং উৎপন্ন শারীরিক অপ্রিয় অবাঞ্ছিত কটু তীব্র দুঃখ বেদনা সহ্য করতে পারে না। পাঁচ রকমে রোগী সুসেব্য হয়—পথ্য সেবন করে, পথ্যের মাত্রা জানে, ভৈষজ্য গ্রহণ করে, হিতকারী সেবকের কাছে রোগের হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদির যথাযথ বিবরণ প্রকাশ করে এবং উৎপন্ন শারীরিক অপ্রিয় অবাঞ্ছিত কটু তীব্র দুঃখ বেদনা সহ্য করতে থাকে।

পাঁচ রকমে সেবক বা শুশ্রূষাকারী রোগীর পরিচর্যার অনুপযুক্ত হয়—ভৈষজ্য সম্পাদনে অক্ষম হয়, পথ্যাপথ্য না জেনে অপথ্য দেয়, পথ্য অপনীত করে, প্রত্যাশায় সেবা করে—মৈত্রী চিত্তে নয়, মলমূত্র থুথু ইত্যাদি পরিষ্কার করতে ঘৃণাবোধ করে, সময়ে সময়ে ধর্মালাপে রোগীকে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করতে পারে না। পাঁচরকমে সেবক বা শুশ্রূষাকারী রোগীর পরিচর্যার উপযুক্ত হয়—ভৈষজ্য সম্পাদনে সমর্থ হয়, পথ্যাপথ্য জেনে পথ্য দেয়, অপথ্য অপনীত করে, নিষ্কামভাবে মৈত্রীপূর্ণ হৃদয়ে সেবা করে, মল-মূত্র থুথু ইত্যাদি

পরিষ্কার করতে ঘৃণা বোধ করে না, সময়ে সময়ে ধর্মালাপে রোগীকে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হয়।

সেই সময়ে কোশল জনপদে দুইজন ভিক্ষু দীর্ঘ পথ ধরে চলছিলেন। তাঁরা আসন্ন সন্ধ্যায় রাত্রিবাসের জন্য একটি বিহারে উঠলেন। সেই বিহারে জনৈক ভিক্ষুকে রোগগ্রস্থ দেখে তাঁরা ভাবলেন—ভগবান্ রোগী পরিচর্যার নির্দেশ দিয়েছেন, এই রুগ্ন রোগী ভিক্ষুর পরিচর্যা করতেই হবে। তাঁরা রোগী পরিচর্যায় লেগে গেলেন। তাঁদের যাত্রা বন্ধ হল। দিনের পর দিন তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবা করতে লাগলেন। কিন্তু রোগের কোন উপশম দেখা দিল না। একদিন সেই রুগ্ন ভিক্ষু সকৃতজ্ঞ নয়নে তাঁদের পানে চেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ভিক্ষুদ্বয় তাঁর দেহ সংকার করে তাঁর পাত্রচীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁরা বুদ্ধের কাছে গিয়ে জানালেন সমস্ত বিষয়। বুদ্ধ তাঁদের সংকার্যের প্রশংসা করে নির্দেশ দিলেন—হে ভিক্ষুগণ, মৃত ভিক্ষুর পাত্রচীবর সঙ্ঘের অধিকারে আসবে, তবে সেবাকারীরা নিতান্ত উপকারী, এই জন্য সেই পাত্রচীবর সঙ্ঘ যেন তাঁদেরই দান করে।

এই দানের রীতিকে পরিস্ফুট করবার জন্য আরও বললেন। সেই রোগী পরিচর্যাকারী ভিক্ষু সঙ্ঘের কাছে উপস্থিত হয়ে বলবে এই নামধারী ভিক্ষু পরলোকগত প্রাপ্ত হয়েছেন, এই তাঁর পাত্রচীবর, তখন বিচক্ষণ ভিক্ষু সঙ্ঘের সম্মুখে ঘোষণা করবে "ভদন্ত সঙ্ঘ শ্রবণ করুণ—এই নামধারী ভিক্ষু পরলোক-প্রাপ্ত হয়েছেন, এই তাঁর পাত্রচীবর, যদি সঙ্ঘ সঙ্গত মনে করেন, এই পাত্রচীবর তাঁর পরিচর্যাকারীদের দিতে পারেন। ঘোষণার পর আবার সেই ভিক্ষু বলবে "ভদন্ত শ্রবণ করুণ—এই পাত্রচীবর মৃত ভিক্ষুর পরিচর্যাকারীদের দেওয়া হচ্ছে, এ বিষয়ে যাঁর সম্মতি আছে তিনি নীরব থাকুন, যাঁর সম্মতি নেই, তিনি বলুন ; সংঘ দান করলেন পাত্রচীবর পরিচর্যাকারীদের, এতে সকলের সম্মতি আছে বলে ধরে নিচ্ছি যেহেতু সবাই নীরব রয়েছেন।

বার

এক সময় বুদ্ধ চম্পার গর্গরা নামক পুষ্করিণীর তীরে বাস করতেন। তখন কাশী জনপদের বাসভ গ্রামে কাশ্যপগোত্র নামক জনৈক ভিক্ষু তথাকার গ্রাম্য বিহারের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সেই গ্রামে ভিক্ষায় সংগ্রহ করে দিন যাপন করতেন এবং গ্রামবাসীদের শোনাতেন ধর্মকথা। তাঁর প্রতি গ্রামবাসীদেরও

ছিল স্বাভাবিক টান। যখনি সেই বিহারে আগন্তুক ভিক্ষুরা আসতেন, তখনি গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে অতিথি সেবায় তিনি মগ্ন হতেন। তাঁর সেবা যত্নের কোথাও ত্রুটি ছিল না। তাঁর প্রযত্নে বিহারেরও উন্নতি হতে লাগলো।

একদিন একদল ভিক্ষু কাশী জনপদে ভ্রমণ করতে করতে বাসভ গ্রামের দিকে অগ্রসর হলেন। ভিক্ষু কাশ্যপগোত্র তাঁদের দূর থেকে দেখেই সসম্মানে আগু বাড়িয়ে নিয়ে আসনে বসালেন, পানীয়াদি সম্পাদনে শ্রান্তি বিনোদন করলেন। তিনি তাঁদের প্রাণ ঢালা সেবা করতে লাগলেন। তাঁর সেবাযত্নে আগন্তুক ভিক্ষুদল সন্তুষ্ট হয়ে কাশ্যপগোত্রের প্রশংসায় মুখর হলেন। দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে লাগলো। আগন্তুক ভিক্ষুগণের যাবার কোন উদ্যোগ দেখা গেল না। তখন ভিক্ষু কাশ্যপগোত্র ভাবলেন—এঁদের পথ শ্রম দূর হয়েছে, রাস্তা ঘাটও চেনা হয়ে গেছে; গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে চিরকাল এঁদের আহার্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে এখন মুস্কিল; কারণ চাওয়া কেউ পছন্দ করেনা। তাই তিনি গৃহস্থদের কাছ থেকে আহার্য সংগ্রহ করার উদ্যোগ আয়োজন ত্যাগ করলেন এবং সেবা যত্নেও বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না।

এ অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন লক্ষ্য করে আগন্তুক ভিক্ষুদল স্তম্ভিত হলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন—এই ভিক্ষু পূর্বে আমাদের স্নানাহারের জন্য কত উদ্যোগ আয়োজন করত, আমাদের জন্য কত কি করত, এখন আর কিছুই করে না, তার মনে নিশ্চয়ই পাপ ঢুকেছে; চলুন আমরা তাকে সংসর্গচ্যুত করি। অতঃপর তাঁরা একদিন তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—বন্ধু, তুমি পূর্বে আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করতে, তার লেশমাত্র আমরা দেখতে পাই না, তুমি যেন কি রকম হয়ে গিয়েছ, তোমার অপরাধ তুমি বুঝতে পারছ কি? কাশ্যপগোত্র বললেন—না, বন্ধুগণ, আমি তো কোন অপরাধ করিনি, যা দেখতে পাব।

বিনয়ের একটি সংবিধান আছে। ভিক্ষু যখন অপরাধ করেও গায়ের জোরে অপরাধ স্বীকার করতে চায় না, তখন সঙ্ঘ সমবেত হয়ে সেই ভিক্ষুকে সংসর্গচ্যুত বলে ঘোষণা করেন এবং ভিক্ষুগণ তার সংসর্গ পরিত্যাগ করেন। এই সংবিধানের নজির তুলে আগন্তুক ভিক্ষুগণ কাশ্যপগোত্রকে সংসর্গচ্যুত করলেন। কাশ্যপগোত্র ভাবতে লাগলেন—এ যে বিষম সমস্যা। এঁদের সেবা যত্ন বন্ধ করার জন্য আমার সত্যিই অপরাধ হল কি না তা তো বুঝতে পারলাম না; অপরাধ না মানার জন্য এঁরা যে আমাকে সংসর্গচ্যুত করলেন, আমি কি যথাযথভাবে

সংসর্গচ্যুত হলাম, না এ প্রহসন মাত্র হল কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না, আমি ভগবানের কাছে গিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞেস করব।

ভিক্ষু কাশ্যপগোত্র বিহারের জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে সমস্ত করণীয় করে চম্পার দিকে রওনা হলেন বুদ্ধের সাক্ষাতের আশায়। তিনি বহু গ্রাম নিগম অতিক্রম করে নদী প্রান্তর পেরিয়ে যথাকালে পৌঁছলেন চম্পায় বুদ্ধের বাসস্থানে। বুদ্ধ অভ্যস্ত নিয়মে আগন্তুক ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন—হে ভিক্ষু, কেমন আছ, পথশ্রমে অত্যধিক কষ্ট হয়নি তো? তুমি কোত্থেকে আসছ? কাশ্যপগোত্র উত্তরে বললেন, ভগবন, ভালই আছি, পথশ্রমে বিশেষ কষ্ট হয়নি; ভদন্ত, কাশী জনপদে বাসভ গ্রাম নামে একটি গ্রাম আছে, সেখানকার স্থানীয় বিহারে আমি থাকি, অতিথি অভ্যাগতের সেবা যত্ন করতে ত্রুটি করি না, আমার প্রযত্নে বিহারেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বুদ্ধ নীরবে শুনছিলেন। কাশ্যপগোত্র বলতে লাগলেন। ভদন্ত একদিন একদল ভিক্ষু জনপদে ভ্রমণ করতে করতে বাসভ গ্রামে এসে পড়লেন। আমি তাঁদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করে বিহারে নিয়ে গিয়ে সেবাযত্ন করতে থাকি। তাঁরা আমার সেবাযত্নে সন্তুষ্ট হয়ে আমার খুব প্রশংসা করলেন। দিনের পর দিন অতিবাহিত হওয়া সত্বেও তাঁরা বিদায় গ্রহণ করেন নি। এ দিকে গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাঁদের আহার্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে মুস্কিল হয়ে উঠল, কারণ লোক চাওয়া পছন্দ করে না। আমি ভাবতে লাগলাম—এঁদের পথশ্রম দূর হয়েছে, রাস্তা ঘাটও চেনা হয়ে গেছে, এখন এঁরা এঁদের বন্দোবস্ত করবেন। এই জন্ত তাঁদের সেবাযত্ন বন্ধ করি। তখন তাঁরা আমাকে বললেন—বন্ধু, আমাদের প্রতি তোমার আগের ব্যবহার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, তোমার ভাব সাব যেন কি রকম, তোমার অপরাধ তুমি বুঝতে পাচ্ছ কি? আমি বললাম—বন্ধুগণ, আমি তো কোন অপরাধ করিনি। এই অপরাধ স্বীকার না করার জন্ত তাঁরা আমায় সংসর্গচ্যুত করেছেন। ভগবন্ আমি কি ধর্মতঃ সংসর্গচ্যুত হলাম, না এ প্রহসনমাত্র হল কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। তাই আপনার কাছে এর সমাধান প্রার্থনা করি। বুদ্ধ স্পষ্ট ভাষায় বললেন—হে ভিক্ষু, তোমার কোন অপরাধ হয়নি, তারা অধর্মতঃ তোমাকে সংসর্গচ্যুত করেছে, সুতরাং তুমি সংসর্গচ্যুত হওনি; যাও তুমি বাসভ গ্রামে গিয়ে বাস কর। ভিক্ষু বুদ্ধের চরণ বন্দনা করে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে বাসভগ্রামাভিমুখে প্রস্থান করলেন।

সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ যখন সমস্ত বিবরণ শুনলেন, তাঁদের মনে অনুতাপের কাঁটা বিঁধতে লাগলো। তাঁরা অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং বলতে লাগলেন—এ

আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা যে নিরপরাধ ভিক্ষুকে সংসর্গচ্যুত করেছি। আমাদের একান্ত অন্যায় হয়ে গেছে, আমরা চম্পায় গিয়ে ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইব। অতঃপর তাঁরা অনুতপ্ত মনে চম্পার দিকে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁরা বুদ্ধের চরণ বন্দনা করলেন। বুদ্ধ যখন কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর জানতে পারলেন বাসভ-গ্রাম থেকে তাঁদের আগমনের কথা, তখনি তিনি বললেন—তোমরা না তথাকার নিবাসী ভিক্ষুকে সংসর্গচ্যুত করেছিলে? উত্তর হল 'হাঁ'।

বুদ্ধ—কি কারণে?

ভিক্ষুগণ—ভদন্ত, সংসর্গচ্যুত করবার উপযুক্ত কারণ ছিল না।

বুদ্ধ তাঁদের ভৎ'সনা করে বললেন—হে মোঘপুরুষগণ, এ তোমাদের পক্ষে নিতান্ত অন্যায় অসঙ্গত তোমরা যে নিরপরাধ ভিক্ষুকে অকারণে সংসর্গচ্যুত করেছ। তখনি তিনি সমবেত সঙ্ঘকে সম্বোধন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, শুদ্ধ নিরপরাধ ভিক্ষুকে সংসর্গচ্যুত করবে না; যদি তা কর, তবে দুষ্কৃত অপরাধ হবে।

তখনি সেই ভিক্ষুগণ বুদ্ধের চরণে মস্তক অবলুণ্ঠিত করে বললেন—ভগবন্, আমাদের অপরাধ হয়েছে, আমরা যে নিরপরাধ ভিক্ষুকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিবু'দ্ধিতাবশতঃ অকারণে সংসর্গচ্যুত করেছি, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন, ভবিষ্যতে আমরা এ রকম অন্যায় আর করব না। করুণার্দ্র বচনে বুদ্ধ বললেন—হে ভিক্ষুগণ, এ ক্ষেত্রে অজ্ঞানবশতঃ নিবু'দ্ধিতাবশতঃ একান্তই তোমাদের অপরাধ হয়েছে; তোমরা যে নিজেদের অপরাধ বুঝতে পেরে যথাধর্ম ক্ষমা চাইছ, তা ক্ষমা করছি; নিজের অপরাধ অবগত হয়ে যথাধর্ম প্রতিকার করা, সংযম অবলম্বন করা একান্ত কল্যাণকর, একে আর্য বিনয়ে শ্রীবৃদ্ধি বলা হয়।

ভেদ

কৌশাম্বীর ঘোষিতারাম বুদ্ধের সময়েই খুব সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। বুদ্ধ এখানে নবম বর্ষা যাপন করেছিলেন। তাঁর অবস্থানকালে জনৈক ভিক্ষু বিনয়-নিয়ম ভঙ্গের অপরাধ হয়েছে মনে করে যথাবিধি প্রতিকার করতে রাজী হলেন। অন্য ভিক্ষুরা তাঁর সে অপরাধকে অপরাধ বলে গণ্য করলেন না। সেজন্য অন্য সময়ে তিনিও একে অপরাধ বলে মানলেন না, কিন্তু পরে ভিক্ষুরা তাঁর অপরাধ হয়েছে বলে ধরে নিলেন। তাই সে ভিক্ষুগণ তাঁকে বললেন—বন্ধু, আপনি তো অপরাধ করেছেন, তা স্বীকার করেন কি? ভিক্ষু উত্তর দিলেন—বন্ধুগণ, আমি এমন কিছু করিনি যাতে আমার অপরাধ হবে। এই

অপরাধ হবে। এই অপরাধ স্বীকার না করায় সেই ভিক্ষুগণ একতাবদ্ধ হয়ে তাঁকে সংসর্গচ্যুত করলেন।

সেই ভিক্ষু ছিলেন নিজে বহুশ্রুত শাস্ত্রবিদ ধর্মধর বিনয়ধর বিদ্বান বুদ্ধিমান শীলবান ও শিক্ষানুরাগী। তিনি পরিচিত বন্ধুভাবাপন্ন ভিক্ষুদের কাছে গিয়ে বললেন—বন্ধুগণ, আমি বিনয় নিয়মভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইনি, এঁরা যে সম্মিলিত হয়ে আমাকে সংসর্গচ্যুত করলেন তাতে আমি সংসর্গচ্যুত হইনি, আপনারা ধর্মতঃ বিনয়তঃ আমার পক্ষাবলম্বন করুন। তাঁর উক্তি শুনে তাঁরা তাঁকে সমর্থন করলেন। তিনি আবার জনপদের পরিচিত ভিক্ষুগণের নিকটও দূত পাঠিয়ে এ বিষয়টি জানালেন। জনপদবাসী ভিক্ষুরাও তাঁকে সমর্থন করলেন। অতঃপর তাঁর সমর্থক ভিক্ষুদল যাঁরা তাঁকে সংসর্গচ্যুত করেছেন তাঁদের কাছে গিয়ে বললেন—বন্ধুগণ, এ ভিক্ষু নির্দোষ, আপনারা অধর্মতঃ এঁকে সংসর্গচ্যুত করেছেন। এ উক্তি শুনে তাঁরা মন্তব্য করলেন—বন্ধুগণ, এ ভিক্ষুর অপরাধই হয়েছে, ইনি নিরাপরাধ নন, এঁকে আমরা ধর্মতঃ সংসর্গচ্যুত করেছি, আপনারা এঁকে সমর্থন করবেন না, এঁর পক্ষাবলম্বন করবেন না। এ মন্তব্য শোনা সত্ত্বেও সমর্থক ভিক্ষুদল নিজেদের সিদ্ধান্তানুসারে সংসর্গচ্যুত ভিক্ষুরই পক্ষাবলম্বন করলেন।

এই পরিস্থিতিতে জনৈক ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদনপূর্বক আদ্যোপান্ত ভিক্ষুদের এই অপরাধ—অনপরাধের দ্বন্দ্বের কথা জানালেন। তখনি বুদ্ধ বলে উঠলেন—ভেঙে গেল ভিক্ষু-সঙ্ঘের ঐক্য ভেঙে গেল ভিক্ষু-সঙ্ঘের ঐক্য! যাঁরা ভিক্ষুটিকে সংসর্গচ্যুত করেছেন তাঁদের কাছে গিয়ে বুদ্ধ বললেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের কি একথা মনে হল না যে যেখানে সেখানে ভিক্ষুকে সংসর্গচ্যুত করা সমীচীন নয়; মনে কর কোন ভিক্ষু বিনয় নিয়মভঙ্গের অপরাধী হয়ে তার অপরাধকে অনপরাধ বলে মনে করে; অন্যান্য ভিক্ষুরা সে অপরাধকে অপরাধ গণ্য করেও যদি জানে যে এই ভিক্ষু বহুশ্রুত শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মধর বিনয়ধর বিদ্বান বুদ্ধিমান শীলবান ও শিক্ষানুরাগী এবং এই ভিক্ষুকে সংসর্গচ্যুত করলে সঙ্ঘের মধ্যে মতানৈক্য ঘটবে, বিগ্রহ বিবাদ এসে পড়বে, তাহলে তাকে সংসর্গচ্যুত করা উচিত নয়।

বুদ্ধ উক্ত মন্তব্য করে সেই সংসর্গচ্যুত ভিক্ষুর সমর্থকদের কাছে গেলেন, বললেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অপরাধকে অনপরাধ মনে করে তার প্রতিকার করতে বিরত হয়ো না; মনে কর কোন ভিক্ষু নিজের আচরণকে নির্দোষ মনে করে অথচ অন্যান্য ভিক্ষুরা তার আচরণকেই অপরাধ বলে গণ্য করে;

এই ভিক্ষুগণকে বহুশ্রুত শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মধর বিনয়ধর বিদ্বান বুদ্ধিমান শীলবান ও শিক্ষানুরাগী বলে বোধ হয় এবং স্বার্থের খাতিরে বিদ্বেষবশতঃ মোহগ্রস্ত হয়ে অথবা ভয়ে পক্ষপাতিত্ব করবে না বলে প্রতীত হয়, তাহলে সঙ্ঘের ঐক্য ভঙ্গের আশঙ্কায় এবং ভিক্ষুদের প্রতি শ্রদ্ধায় সেই তথাকথিত অপরাধ প্রতিকার করা কর্তব্য। এ উপদেশ দিয়ে বুদ্ধ প্রস্থান করলেন।

বুদ্ধ উভয়পক্ষকে উপদেশ দিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু কোন সুফল হল না। ভিক্ষুগণ তাঁর উপদেশে কর্ণপাত না করে দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলেন। তাঁদের সকল অনুষ্ঠান আলাদা চলতে লাগলো। ক্রমে এই মতানৈক্য কলহ বিবাদে পরিণত হল। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড বাক্‌যুদ্ধ দেখা দিল। জনৈক ভিক্ষুর অনুরোধে বুদ্ধ তাঁদের মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন, বললেন—হে ভিক্ষুগণ, অনর্থক কলহে লিপ্ত হয়ো না, বিবাদ করো না। একজন অধার্মিক ভিক্ষু তখনি তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল—ভদন্ত, আপনি নীরব থাকুন, আপনি অধিক না বলে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করুন, আমরা থাকব এ কলহবিবাদে। আবার বুদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অনর্থক কলহে লিপ্ত হয়ো না, বিবাদ করো না। সেই অধার্মিক ভিক্ষু আবার উঠে বলল—ভদন্ত, আপনি নীরব থাকুন, আপনি অধিক না বলে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করুন, আমরা থাকবো এ কলহ-বিবাদে।

বুদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে জনৈক সমৃদ্ধিশালী শক্তিসম্পন্ন রাজা ছিলেন। তাঁর সামরিক কোশলাধীশ্বর দীর্ঘিত ছিলেন অসমৃদ্ধ হীনবল। রাজা দীর্ঘিতির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করলেন রাজা ব্রহ্মদত্ত। অভিযানের খবর পেয়েই রাজা দীর্ঘিতি আপনার মহিষীকে নিয়ে রাজধানী ছেড়ে পলায়ন করলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত বিনা বাধায় কোশলরাজের রাজধানীতে প্রবেশ করে তাঁর সমস্ত অধিকার করে আপনার রাজ্যসীমা বাড়িয়ে নিলেন।

রাজা দীর্ঘিতি মহিষীসহ বহুদূর পথ অতিক্রম করে বারাণসী রাজ্যের সীমান্তে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে কুম্ভকার-গৃহে পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সেই সময়ে মহিষী হলেন অন্তঃসত্ত্বা। তাঁর দোহদ হল সূর্যোদয়ের সময় সুভূমিতে চতুরঙ্গ সৈন্য-সমাবেশ দেখে অসিধৌত জল পানের জন্য। তিনি স্বামীকে জানালেন এ দোহদের কথা। রাজা বললেন—প্রিয়ে, আমরা এখন রাজ্যহারা হয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে দিনপাত করছি. আমাদের চতুরঙ্গ সৈন্য কোথায় তোমাকে যে দেখাব আর কোথায় বা পাব অসিধৌত জল। মহিষী

হতাশ নয়নে রাজার পানে চেয়ে বললেন—যদি আমার এ সাধ না মিটে, তবে আমার মৃত্যু অনিবার্য। রাজা এ উক্তি শুনে মহা ফাঁপরে পড়লেন। এ বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের কুল-পুরোহিতের কথা। এ ব্রাহ্মণ ছিলেন দীর্ঘিতির পরম বন্ধু। একমাত্র এ ব্রাহ্মণই জানতেন তাঁর অজ্ঞাতবাসের কথা। তাঁর প্রতি ব্রাহ্মণের সহানুভূতি অপরিসীম।

রাজা দীর্ঘিতি গোপনে দেখা করলেন সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে, বললেন—বন্ধু আপনার বান্ধবী এখন অন্তঃসত্ত্বা, তিনি চান সূর্যোদয়ের সময় সুভূমিতে চতুরঙ্গ সৈন্য সমাবেশ দেখে অসিধৌত জল পান করতে। ব্রাহ্মণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—মহারাজ আপনি এজন্য ভাববেন না, এর ব্যবস্থা আমি করব, আশা করি, দেবীর শুভাগমন হবে এখানে। রাজমহিষী যথাকালে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দূর থেকে আসতে দেখেই ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলি-পুটে অভ্যর্থনা করে আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—বাঃ কোশলরাজ এখন গর্ভস্থ! বাঃ কোশলরাজ এখন গর্ভস্থ! হে দেবি প্রসন্ন হোন, আপনি সূর্যোদয়কালে সুভূমিতে চতুরঙ্গ সৈন্যসমাবেশ দেখে অসি ধৌতোদকপানে তৃপ্ত হবেন।

অনন্তর রাজপুরোহিত রাজা ব্রহ্মদত্তের সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন—মহারাজ! যে নিমিত্ত দেখা যাচ্ছে, তাতে সূর্যোদয়ে চতুরঙ্গ সৈন্য-সমাবেশ করে অসি ধোবন একান্ত প্রয়োজন। রাজা তখনি হুকুম দিলেন পুরোহিতের নির্দেশ পালনের জন্য। হস্তীস্কন্ধারূঢ় অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্যবাহিনী পূর্ণ সামরিক সজ্জায় সজ্জিত হয়ে প্রত্যুষের প্রশান্তিকে বিক্ষুব্ধ করে দিয়ে সমবেত হল বিস্তীর্ণ চত্বরে। দলে দলে লোক সমবেত হয়ে দেখল চতুরঙ্গ সৈন্য-সমাবেশ ও অসি ধোবনের দৃশ্য। কোশলের রাজমহিষী জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে মিটিয়ে নিলেন আপনার সাধ, অসিধোবন পানে তৃপ্ত হলেন। যথাকালে তিনি প্রসব করলেন পুত্র সন্তান। তার নাম রাখা হল দীর্ঘায়ু।

দীর্ঘায়ু যখন শৈশবের সীমা অতিক্রম করে কৈশোরে পদার্পণ করল, তখন কোশলরাজ ভাবতে লাগলেন তার নিরাপত্তার কথা। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত ছিলেন তাঁদের পরম শত্রু। তাঁদের রাজ্য সম্পদ কেড়ে নিয়েও ব্রহ্মদত্তের পিপাসা মিটেনি। যদি কোশল রাজের অজ্ঞাতবাসের সন্ধান পান, তাহলে ব্রহ্মদত্ত যে নিদারুণ নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে কুণ্ঠিত হবেন না তা ভালরূপে জানতেন কোশল-রাজ। তাই তিনি কিশোর পুত্রের মঙ্গল কামনায় তাকে অন্যত্র পাঠিয়ে

দিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি অলস দীর্ঘায়ু সেখানে বাস করবার সময়ে নানা শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল। শিল্পাচার্যগণ এ বালকের মধ্যে অসাধারণ ধীশক্তি ও বিচিত্রগুণের সমাবেশ দেখে মুগ্ধ হলেন।

রাজা দীর্ঘিতির নাপিত একদিন তাঁর কুটিরের সমীপে অবলীলাক্রমে এসে পড়ল। সে পরিব্রাজকের বেশে রাজাকে দেখতে পেয়েই চিনে ফেলল। নাপিত এর সুযোগ নিতে দ্বিধা করল না। সে পুরস্কারের লোভে রাজা ব্রহ্মদত্তের কাছে ছুটল। সে সেখানে গিয়ে তাঁকে জানাল কোশলরাজের অজ্ঞাতবাসের সমস্ত বৃত্তান্ত। তখনি রাজা ব্রহ্মদত্ত অনুচরদের হুকুম দিলেন সপত্নীক কোশলরাজকে বন্দী করে নিয়ে আসার জন্ত। অনুচরগণ সেই নাপিতকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্য-সীমান্তে ক্ষুদ্রপল্লীতে কুম্ভকারের কুটিরে হানা দিল। কোশলরাজ ও তাঁর মহিষী আত্মসমর্পণ করলেন এবং বন্দী অবস্থায় নীত হলেন বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সম্মুখে। রক্তলোলুপ ব্রহ্মদত্ত পৈশাচিক উন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে হুকুম দিলেন সপত্নীক কোশলরাজকে পশ্চাদ্বাহু শৃঙ্খলাবদ্ধ করে মস্তক মুণ্ডনপূর্বক প্রণবের থরনাদ মুখরিত এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় এবং রাস্তার এক মোড় থেকে অন্য মোড়ে নিয়ে গিয়ে নগরীর দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে নগরীর দক্ষিণ দিকে চার খণ্ড করে চার দিকে কবর দেবার জন্ত।

অমানুষিক রাজাজ্ঞার নিষ্ঠুর লীলা দেখবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত জনতার ভিড় হল নগরীর পথে পথে। তখন কোশলরাজের পুত্র দীর্ঘায়ু মাতাপিতার দর্শনার্থী হয়ে বারাণসীতে পদার্পণ করেই দেখল তার মা বাবাকে পশ্চাদ্বাহু শৃঙ্খলাবদ্ধ করে মস্তক মুণ্ডনপূর্বক প্রণবের থরনাদের সঙ্গে নেওয়া হচ্ছে নগরীর এক পথ থেকে অন্য পথে। এ মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে তার প্রাণের ভিতর পর্যন্ত কেঁপে উঠল। সেখানেই তার ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। সে অতি কষ্টে আপনাকে সামলে নিয়ে জনতার ভিড়ের মধ্যে মিশে মা বাবার কাছে এসে পড়ল। রাজা দীর্ঘিতি দেখতে পেলেন পুত্রকে। তিনি অবিচলিতভাবে ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে বলে উঠলেন—হে বৎস দীর্ঘায়ু, অনন্ত দীর্ঘকালের কথা ভেবে। ক্ষুদ্র কালের বা ক্ষণিকের কথা ভুলে যাও; হে বৎস দীর্ঘায়ু, শত্রুতা দ্বারা শত্রুতার উপশম হয় না, প্রেমের দ্বারাই শত্রুতার অবসান হয়। কোশলরাজের এ উক্তি শুনে সমীপস্থ জনতা বলাবলি করতে লাগল—রাজা দীর্ঘিতি আসন্ন শিরশ্ছেদের কথা ভেবে পাগল হয়ে প্রলাপ বকছেন। দীর্ঘিতি জনতার কলগুঞ্জন শুনে মন্তব্য করলেন—বন্ধুগণ, আমি পাগল হইনি, প্রলাপ বকিনি, শুধু বিজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝবেন আমার কথার মর্ম।

অতঃপর ঘাতকগণ রাজার নির্দেশ মত সপত্নীক দীর্ঘিতিকে এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় এক মোড় থেকে অন্য মোড়ে নিয়ে গিয়ে নগরীর দক্ষিণ দ্বার দিয়ে বের করে নগরীর দক্ষিণে চার খণ্ড করে প্রস্থান করল। দীর্ঘায়ু নগরে ছুটে গিয়ে সুরা এনে শ্মশান রক্ষীদের পান করাল। তারা যখন মাতাল হয়ে মাটিতে পড়ে রইল, তখন দীর্ঘায়ু কাঠ সংগ্রহ করে চিতাশয্যা রচনা করল। মাতাপিতার খণ্ডিত দেহাংশগুলি তার ওপর রেখে কৃতাঞ্জলিপুটে তিন বার চিতা প্রদক্ষিণ করে সে তাতে অগ্নি সংযোগ করল।

দাহক্রিয়া শেষ করে দীর্ঘায়ু বনের আড়ালে বসে মাতা-পিতার শোকে যথেষ্ট রোদন করল। রোদনের পর যখন সে একটু প্রকৃতিস্থ হল, ফিরে এল বারাণসীতে। সেখানে রাজপ্রাসাদের নিকটে হাতীশালে গিয়ে রাজার মাহুতকে বলল—আচার্য আমি হস্তী-শিল্প শিখতে চাই, আমায় তা শিখিয়ে দিন। মাহুত সুদর্শন তরুণের পানে চেয়ে এক কথায় রাজী হয়ে গেল। দীর্ঘায়ু রীতিমত তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। একদিন ভোরে শয্যাত্যাগ করে সুমধুর কণ্ঠে গান গেয়ে চলল আপন মনে, সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল তার হাতের বীণা বিচিত্র রাগিণীতে। ভোরের সমস্ত পরিবেশ অভিভূত করে যেন সৃষ্টি হল এক অপূর্ব সঙ্গীতলোক। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত তন্ময় হয়ে শুনলেন সে সঙ্গীত। তাঁর মনপ্রাণ অভিষিক্ত হয়ে গেল। তিনি অনুচরদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—ওহে কে গান করল আজ ভোরে বীণা বাজিয়ে? উত্তরে তারা বলল মহারাজ, হাতীশালে মাহুতের এক শিষ্য আছে, সে-ই গান গেয়েছে বীণা বাজিয়ে। তখনি রাজা হুকুম দিলেন—সে গায়ককে নিয়ে এসো আমার সামনে। রাজার হুকুমে অনুচরগণ তাকে নিয়ে এল রাজার কাছে। রাজা জিজ্ঞেস করলেন তাকে—ওহে, তুমিই কি আজ ভোরে গান করছিলে বীণা বাজিয়ে? তরুণ উত্তর করল—হাঁ, মহারাজ। রাজা বললেন—আর একবার গাও। তরুণ গুণ গুণ করতে করতে আবার গান ধরল। রাজা মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইলেন তার পানে। সঙ্গীত শেষে রাজা বললেন—বৎস, তুমি আমার কাছে থেকো। 'হাঁ মহারাজ' বলে সম্মতি জানিয়ে সে রাজকার্যে নিযুক্ত হল।

দীর্ঘায়ুর কর্মতৎপরতা, আনুগত্য, প্রিয়ভাষিতা ও বুদ্ধিপ্রাখর্য রাজাকে মুগ্ধ করল। সে অল্পদিনের মধ্যে রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। তার প্রতি বিশ্বাস পাকা হওয়ায় রাজা তাকে আপনার দেহরক্ষীর পদে উন্নীত করলেন। একদিন বারাণসীরাজ তাকে সম্বোধন করে বললেন—হে তরুণ, অরণ্য যাত্রার ব্যবস্থা

করব, মৃগয়ায় যাব। 'হাঁ মহারাজ' বলে সম্মতি দিয়ে দীর্ঘায়ু যানবাহনাদি প্রস্তুত করে যাত্রার আয়োজন করল। রাজা সদলবলে যথাসময়ে যাত্রা করলেন। দীর্ঘায়ুর ব্যবস্থা-কৌশলে একদিকে গেল দলবল অন্যদিকে গেল রাজার রথ। সেই রথে ছিল দেহরক্ষীরূপে দীর্ঘায়ুও। বহু দূর পথ অতিক্রম করে নির্জন বনভূমিতে এসে পড়ল রথ। রথ থেকে নেমে অরণ্যশোভা দেখতে দেখতে দুজনে অনেক দূর অগ্রসর হলেন। রাজা বললেন—হে তরুণ, আমি ক্লান্ত, শুয়ে পড়ব। তখনি দীর্ঘায়ু এক বৃক্ষতলে আসনবদ্ধ হয়ে বসল মাটির ওপর। রাজা তার কোলে মাথা পেতে শুয়ে পড়লেন। তিনি ক্লান্তির জন্য অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হলেন। দীর্ঘায়ুর মনে হল—এই কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত আমাদের পরম শত্রু; ইনি হরণ করেছেন আমাদের বলবাহন, ধন-সম্পদ, রাজ্য সমস্তই ইনি নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন আমার পিতামাতাকে, এই তো উপযুক্ত সময় এঁকে শিক্ষা দেবার। এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতেরঅসি নিমেষের মধ্যে কোষোন্মুক্ত হয়ে ঝক্ ঝক্ করতে লাগলো। সেই মুহূর্তেই তার মনে পড়ল পিতার অন্তিম উপদেশ—"হে বৎস দীর্ঘায়ু, অনন্ত দীর্ঘকালের কথা ভেবো, ক্ষুদ্র ক্ষণের কথা ভুলে যাও, শত্রুতায় শত্রুতার উপশম হয় না, প্রেমের দ্বারাই শত্রুতার অবসান হয়।" পিতার অন্তিম উপদেশ স্মরণ করে দীর্ঘায়ু পিতার প্রতি শ্রদ্ধায় অসিখানিকে খাপে ভরে রাখল। পরক্ষণেই কাশীরাজের সেই রুদ্রলীলা আবার স্মরণ করে সে অসি উত্তোলন করল তাঁর ঘুমন্ত দেহের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল পিতার সে অন্তিম উপদেশ। আবার খাপে ভরে রাখতে বাধ্য হল অসিখানিকে। তৃতীয়বার পর্যন্ত চলল এ অভিনয়। হঠাৎ ভীত ত্রস্ত হয়ে জেগে উঠলেন কাশীরাজ। তাঁর সর্বাঙ্গ তখনও কাঁপছিল। দীর্ঘায়ু জিজ্ঞেস করল—মহারাজ, এত ভীত ত্রস্ত শঙ্কিত কেন? ব্রহ্মদত্ত বললেন—ওহে, আমি স্বপ্ন দেখছিলাম কি জান, কোশলরাজ দীর্ঘিতির পুত্র আমার বক্ষে শাণিত খড়্গ বসিয়ে দিচ্ছে, তাই এতে ভয় পেয়েছি শঙ্কিত হয়েছি। কথা ফুরাবার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘায়ু বাম হস্তে ব্রহ্মদত্তের মস্তক স্পর্শ করে দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন করে বলল—মহারাজ, আমিই সেই কোশলরাজ দীর্ঘিতির পুত্র দীয়ুর্ঘ। তুমি আমাদের পরম শত্রু, তুমি লুণ্ঠন করেছ আমাদের সর্বস্ব, বর্বরভাবে হত্যা করেছ আমার মাতাপিতাকে, এ-ই উপযুক্ত সময় তোমাকে শিক্ষা দেবার। রাজা ব্রহ্মদত্ত ভয়ে কাতর হয়ে মস্তক লুণ্ঠিত করলেন দীর্ঘায়ুর পায়ে। কাতর কণ্ঠে বললেন—বৎস দীর্ঘায়ু, আমায় হত্যা করো না, আমায় জীবন দাও। যুবরাজ পিতৃ

উপদেশ স্মরণ করে অসি কোষবদ্ধ করে বলল—মহারাজ, তবে আমারও জীবন দিন। রাজা তৎক্ষণাৎ মাটি থেকে উঠে হস্ত ধারণ করলেন দীর্ঘায়ুর। উভয়ে করমর্দন করে শপথ করলেন—তাঁরা আর পরস্পর শত্রুতায় লিপ্ত হবে না।

রাজ্যে ফিরে গিয়ে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত অমাত্যবর্গসহ রাজপরিষদের সকলকে সমবেত করে জিজ্ঞেস করলেন—ওহে তোমরা যদি কোশলরাজের পুত্র কুমার দীর্ঘায়ুকে দেখতে পাও, কি করবে? কেউ বললেন 'তার হাত কাটব' কেউ বললেন 'পা কাটব' আবার কেউ বললেন 'মাথা কাটব'। রাজা দীর্ঘায়ুর দিক অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন—ওহে, সামনেই বসে আছে কুমার দীর্ঘায়ু, আমার আদেশ 'তার ওপর জুলুম চলবে না', সে আমাকে জীবন দিয়েছে এবং আমি তাকে জীবন দিয়েছি। তখন রাজা সবার সম্মুখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন—বৎস দীর্ঘায়ু, মৃত্যুকালে তোমার বাবা উর্ধ্বপানে তাকিয়ে বলছিলেন 'হে বৎস দীর্ঘায়ু, অনন্ত দীর্ঘকালের কথা ভেবো, ক্ষণিকের কথা ভুলে যাও, শত্রুতার দ্বারা শত্রুতার উপশম হয় না, প্রেমের দ্বারাই শত্রুতার অবসান হয়" এই কথাগুলো কেন বলছিলেন, এ গুলোর মানে কি? দীর্ঘায়ু পিতার বচনের অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে বলল—যদি আমি পিতার বচন স্মরণ না করে মহারাজকে হত্যা করতাম, তবে মহারাজের হিতৈষীরা আমার প্রাণ বধ করত, সুতরাং শত্রুতা দ্বারা শত্রুতার উপশম নেই; পিতার বাক্য স্মরণ করে আমি মহারাজকে জীবন দান করেছি, মহারাজও আমার জীবন দান করেছেন, এমনিভাবে প্রেমের স্পর্শে আমাদের শত্রুতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

দীর্ঘায়ুর উক্তি শুনে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত বিস্ময়াভিভূত হয়ে উচ্চারণ করলেন—কি আশ্চর্য! কি অদ্ভুত! দীর্ঘায়ু পিতার এত সংক্ষিপ্ত কথার মর্ম এভাবে উপলব্ধি করেছে; তার জ্ঞান বুদ্ধি তো অসাধারণ। ব্রহ্মদত্ত খুশী হয়ে ফিরিয়ে দিলেন দীর্ঘায়ুকে তার রাজ্য বল-বাহন ধন-সম্পদ, সমস্তই এবং নিজের কন্যাকে সম্প্রদান করলেন তার হাতে।

বুদ্ধ এ অতীত কাহিনী বিবৃত করে ভিক্ষুদের উপদেশচ্ছলে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, সেই দণ্ডধারী সশস্ত্র রাজগণের মধ্যেও এমন ক্ষমা ও প্রেম থাকবে, সংসার ত্যাগ করে সুদেশিত ধর্ম বিনয়ে প্রব্রজিত হয়ে ক্ষমা ও প্রেম তোমাদের থাকবে না কেন? এ তো তোমাদেরি শোভা পায়।

বুদ্ধ আবার বললেন—হে ভিক্ষুগণ, অনর্থক কলহে লিপ্ত হয়ো না, বিবাদ করো না। তখনও সেই অধার্মিক ভিক্ষু তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল—ভদন্ত,

আপনি নীরব থাকুন, আপনি অধিক না বলে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করুন, আমরা থাকবো এ কলহ বিবাদে। বুদ্ধ দেখলেন এই ব্যক্তিগণ অত্যন্ত উত্তেজিত এদের বোঝানো যাবে না। তিনি আসন ত্যাগ করে প্রস্থান করলেন।

চৌদ্দ

বুদ্ধ কোশাম্বীতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা গ্রহণ করে ফিরে এলেন বিহারে। আহারের পর শয়নাসন সামলে রেখে পাত্রচীবর নিয়ে তিনি দাঁড়ালেন সমবেত ভিক্ষু সঙ্ঘের সম্মুখে। দাঁড়িয়েই তিনি গাথায় বলতে লাগলেন—

এই কলহকারীরা সকলেই কথায় সমান পটু; নিজের নির্বুদ্ধিতাকে কেউ বুঝতে পাচ্ছে না, সঙ্ঘের মধ্যে যে ভাঙন ধরেছে তা কেউ টের পাচ্ছে না।

জ্ঞানীর বচন এরা আজ ভুলেছে, বাক সংযম হারিয়ে যা মুখে আসছে তাই বলছে, যে কলহ এদের আজ নির্লজ্জ করে তুলেছে, সে কলহকে এরা বুঝতে পারল না।

যারা ভাবে 'আমায় আক্রোশ করল, আমায় প্রহার করল, আমায় পরাস্ত করল, আমায় বঞ্চিত করল' তাদের শত্রুতার উপশম হয় না।

আক্রোশ প্রহার পরাজয় ইত্যাদির চিন্তা যাদের মনে স্থান পায় না, তাদের শত্রুতা সহজেই শান্ত হয়।

কখনো শত্রুতার দ্বারা শত্রুতা শান্ত হয় না, প্রেমের দ্বারাই শত্রুতা শান্ত হয়—এটিই চিরন্তন নীতি।

আমরা যে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি, তা কলহপর মূর্খ ব্যক্তিগণ বুঝতে পারে না; যারা এ কথা বুঝতে পারে, তাদের কলহ বিগ্রহ চিরতরে থেমে যায়।

অস্থিচ্ছেদক প্রাণনাশক ধনহর রাষ্ট্র লুণ্ঠনকারীদের মধ্যেও মিলন হয়, তোমাদের মধ্যে তা হবে না কেন?

যদি সৎসঙ্গরত জ্ঞানী ধার্মিক ধীর ব্যক্তির সাহচর্য লাভ হয়, তবে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করে হৃষ্টমনে অবহিত চিত্তে তাঁর অনুসরণ করবে। যদি এতাদৃশ বন্ধু লাভ না হয়, বিজিতরাজ্যত্যাগী রাজা অথবা বনচর হস্তীরাজের মত একাকী বিচরণ করবে, এরকম একা থাকা ভাল, নির্বোধের সঙ্গে একত্র বাস বিধেয় নয়; হস্তীরাজের মত একা থাকবে, পাপবিরত ও অনাসক্ত হবে।

এই গাথাগুলি উচ্চারণ করে বুদ্ধ বালক লোণকার গ্রামের দিকে রওনা হলেন। তখন সেই গ্রামের বিহারে থাকতেন আয়ুষ্মান ভৃগু। তিনি দূর থেকে

যেতে চলল। হস্তীর আনন্দ ছিল বুদ্ধের জন্য শুঁড় দিয়ে জল আনয়নে ও ফলমূল আহরণে। হস্তীর প্রাণঢালা সেবা যত্নে বুদ্ধ বর্ষা বাস যাপন করলেন বনের নির্জন পরিবেশে পরম শান্তিতে। যিনি বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় জীবন উৎসর্গ করেছেন, তিনি কি জন সংস্পর্শ ত্যাগ করে নিজেকে নিয়ে থাকতে পারেন এমনিভাবে? তাঁর করুণার্দ্র চিত্ত বিগলিত হল জনগণের জন্য। তিনি বনের শান্তিময় পরিবেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন এবং ফিরে এলেন জেতবনে।

বলা বাহুল্য, ভিক্ষুদের বিগ্রহ-বিবাদে বিরক্ত হয়ে বুদ্ধ যে অরণ্য গমন করেছিলেন, তা কারো অজানা রইল না। কলহলিপ্ত ভিক্ষুদের এই দুষ্কৃতি কৌশাম্বীর ঘরে ঘরে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। লোকেরা বলতে লাগলো—এই ভিক্ষুগণ কতই না অনর্থকারী, এঁদের জ্বালায় ভগবান বনে গিয়েছেন; আমরা এঁদের অভিবাদন করব না, এঁরা বুঝবেন কলহের ফল। কয়েক দিনের মধ্যেই এ আলোচনার ফল দেখা দিল। গৃহস্থগণ ভিক্ষুদের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত বন্ধ করল। ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্র নিয়ে সারা কৌশাম্বী ঘুরেও এক মুষ্টি ভিক্ষা পেলেন না। ক্ষুধায় তাঁদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হল। তাঁরা বুঝলেন নিজেদের ভুল, অনুতপ্ত হলেন। এর যথাধর্ম প্রতিকার করে বুদ্ধের কাছে ক্ষমা চাইবার জন্য তাঁরা রওনা হলেন শ্রাবস্তীর দিকে। দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে তাঁরা রওনা হলেন শ্রাবস্তীর দিকে। দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে তাঁরা যখন শ্রাবস্তীর কাছাকাছি এলেন, জেতবনে খবর পৌঁছল কৌশাম্বীর কলহলিপ্ত ভিক্ষুরা আসছেন। সমগ্র জেতবনে ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা বিচলিত হয়ে একে একে বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা হবে। উত্তরে বুদ্ধ বললেন··ধর্মের যা বিধান রয়েছে, তা অবলম্বন করবে।

যথাসময়ে কৌশাম্বীর ভিক্ষুরা জেতবনে প্রবেশ করে বুদ্ধের চরণ বন্দনা করলেন। তাঁরা স্বীকার করলেন নিজেদের অপরাধ, প্রার্থনা করলেন ক্ষমা। ভেদ অনৈক্য মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হল। বিনয়ের বিধান মানা হল। সঙ্ঘের ঐক্য নতুন সুরে বেজে উঠলো। ভাবে প্রেমে মধুর হল সেই মিলন।

পনের

কপিল বাস্তুর ন্যগ্রোধারামে থাকবার সময়ে একদিন বুদ্ধ পূর্বাহ্নে কপিল বাস্তুতে ভিক্ষায় বেরুলেন। ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে আহারের পর তিনি শাক্য

কালক্ষেমের বিহারে উপস্থিত হলেন দিবাযাপনের জন্য। সেখানে অনেক গুলো বিছানা দেখে তিনি ভাবতে লাগলেন—এখানে কি এত ভিক্ষু বাস করে যে এত বিছানা পড়েছে? এ বিহারের অদূরে ছিল শাক্য ঘটায়ের বিহার যেখানে তখন আয়ুষ্মান আনন্দের নেতৃত্বে চীবর বা ভিক্ষুদের পীতবসন নির্মাণের কার্য চলছিল। বুদ্ধ নির্জনে দিবাযাপনের পর সন্ধ্যায় শাক্য ঘটায়ের বিহারে গিয়ে আসন গ্রহণ করে আনন্দকে জিজ্ঞেস করলেন—আনন্দ, শাক্য কালক্ষেমের বিহারে বহু বিছানা দেখলাম, সেখানে কি বহু ভিক্ষু বাস করে? আয়ুষ্মান আনন্দ উত্তরে বললেন—হাঁ ভদন্ত, সেখানে বহু ভিক্ষু বাস করেন, এখন যে আমাদের চীবর নির্মাণের সময়।

বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে আনন্দ আড্ডা জমিয়ে থাকা দল বেঁধে বাস করা আড্ডার প্রতি অনুরাগ বৈঠকী আমোদ-প্রমোদ ভিক্ষুদের পক্ষে শোভনীয় নয় উচিতও নয়। দলানুরাগী আড্ডাবাজ বৈঠকী আমোদ প্রমোদ লিপ্ত ভিক্ষু কখনো বৈরাগ্যসুখ নির্জনবাসের আনন্দ উপশান্তির আরাম এবং সংবোধির বা জ্ঞানযোগের আনন্দ লাভ করতে পারে না। যে ভিক্ষু আড্ডা ত্যাগ করে নির্জনবাসে আত্মস্থ হয়ে থাকে, তার পক্ষেই বৈরাগ্যসুখ উপশান্তির আরাম সংবোধির আনন্দলাভ সম্ভব। এমন কি সে সমস্ত রিপুগুলোকে নির্মূল করে বন্ধনহীন মুক্ত অর্হৎ পর্যন্ত হতে পারে। হে আনন্দ, আমি এমন একটি রূপ দেখছি না যাতে অনুরক্ত আসক্ত হয়ে থাকলে তার বিপরিণতিতে অন্যথাভাবে শোক বিলাপ দুঃখ ক্ষোভ মনকে অভিভূত করে না।

হে আনন্দ, সকল চিন্তন রুদ্ধ করে অধ্যাত্মিক শূন্যতায় চিত্তের অবস্থান তথাগতের আয়ত্ত। এই শূন্যতাবিহারে যখন তথাগতপ্রায়শঃ মগ্ন থাকেন, তখন যদি ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উপাসক-উপাসিকা রাজা-মন্ত্রী অথবা ভিন্ন মতাবলম্বী পরিব্রাজকগণ তাঁর সাক্ষাতের জন্য আসেন, তাহলে তিনি নির্জনতাপ্রবণ নির্জনতাপ্রিয় বৈরাগ্যময় অমলিন শান্ত চিত্তে তাঁদের সাক্ষাৎদান করেন এবং আধ্যাত্মিক আলাপ আলোচনা করেন। হে আনন্দ, যদি কোন ভিক্ষু শূন্যতা-বিহারে অধিকার লাভ করতে চায়, তাহলে তার চিত্তকে অন্তরেই স্থির অচঞ্চল একাগ্র সমাহিত করা উচিত।

হে আনন্দ, এ শূন্যতা-বিহারে অবস্থানকালে যদি তার পায়চারি করতে ইচ্ছা হয়, তখন সে পায়চারি করে এবং সজাগ হয় যেন পায়চারি করবার সময়ে লোভ দ্বেষাদি অকুশল ভাবসমূহ তার মনে স্থান না পায়। যদি তার দাঁড়াবার ইচ্ছা হয়, তখন সে দাঁড়ায় এবং সজাগ থাকে যাতে লোভ দ্বেষাদি

তার মনকে অভিভূত না করে। যদি তার বসার ইচ্ছা হয় অথবা শোবার ইচ্ছা হয়, তখনও সে অবস্থায় থেকে সাবধান হয় যাতে লোভ দ্বেষাদি পাপবৃত্তিগুলো তাকে পেয়ে না বসে। যখন সে আলাপরত হয়, তখন সে সজাগ হয় যাতে তার মুখে না আসে অনার্য অনর্থাবহ অহিতকর বাক্যালাপ—যথা, রাজসম্বন্ধীয় কথা চোরসম্বন্ধীয় কথা সেনাবাহিনীর কথা ভয়ের কথা যুদ্ধের কথা অন্নবস্ত্রাদির কথা গ্রাম নগরের কথা স্ত্রীলোকসম্বন্ধীয় কথা ইত্যাদি। সে বলতে থাকে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞান ও বিমুক্তির কথা যাতে বৈরাগ্যোদয় হয় উপশান্তি আসে নির্বাণোপলব্ধির অভিলাষ হয়। যখন তার মন চিন্তানত হয়, তখন সে সজ্ঞান হয় যেন তার চিন্তা কামনা বিদ্বেষ ইত্যাদিতে কলুষিত না হয়। জ্ঞান, বৈরাগ্য, নির্বাণ ইত্যাদি তার চিন্তাগোচর হয়।

হে আনন্দ, পাঁচটি কাম্যবস্তু, যথা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ যা কমনীয় প্রিয় মধুর কামনানুরঞ্জিত। ভিক্ষুর সর্বদাই প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত এগুলোর কোনটির প্রতি তার মনের প্রবণতা আছে কি?' যদি প্রত্যবেক্ষণে তার দুর্বলতা ধরা পড়ে তাহলে কাম্য বস্তুর প্রতি তার অনুরাগ আসক্তি যে বিগত হয়নি নির্মূল হয়নি তাতে সে সজাগ হয় সচেতন হয়। যদি প্রত্যবেক্ষণে সে কাম্য বস্তুর প্রতি মনের প্রবণতা খুঁজে পায় না, তাহলে সে সজাগ হয় যে তার কামনানুরাগ বিগত।

হে আনন্দ, রূপ (ভৌতিক দেহ) বেদনা (সুখ দুঃখাদির অনুভূতি) সংজ্ঞা (প্রতীতি) সংস্কার (চিত্তবৃত্তিসমূহ) বিজ্ঞান (চিত্ত) এ পাঁচটির উৎপত্তি ও লয়ের যে খেলা চলছে নিজের মধ্যে তা ভিক্ষুর অনুধাবন করা উচিত অনুদর্শন করা উচিত—এ রূপের উৎপত্তি এ রূপের বিলয়, এ বেদনার উৎপত্তি এ বেদনার বিলয় ইত্যাদি। এ ভাবে অবহিত চিত্তে উৎপত্তিলয়ের খেলা অনুধাবন করলে রূপ বেদনাদির মধ্যে 'আমি' 'আমার' ধারণা বিগত হয়। এ অহংভাব ত্যাগ সম্বন্ধে সে সচেতন হয়। হে আনন্দ, এ ধর্মগুলো ঐকান্তিকভাবে পুণ্যাবহ নিষ্পাপ লোকোত্তর।

হে আনন্দ, শুধু শাস্ত্রকথা শোনার জন্য শাস্তা বা গুরুর পিছনে ছোটা শিষ্যের উচিত নয়। যা শুনে বৈরাগ্যোদয় হয় উপশান্তি আসে নির্বাণোপলব্ধির উপায় জানা যায় সে উপদেশ লাভের জন্য তাড়িয়ে দিলেও গুরুর চরণাশ্রয় করা উচিত। তাতে আচার্যোপদ্রব শিষ্যোপদ্রব এবং ব্রহ্মচারী-উপদ্রবের সম্ভাবনা বিদ্যমান।

হে আনন্দ, কোন কোন শাস্তা বা গুরু অরণ্য বৃক্ষমূল পর্বতকন্দর গিরিগুহা

শ্মশান উন্মুক্ত প্রান্তর প্রভৃতি নির্জনস্থানে অবস্থান করেন। তাঁর এ নির্জন-বাসের সময় নগরবাসী বা জনপদবাসী ভক্ত জনতা তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে যাতায়াত করে। তিনি তাদের যাতায়াতে হর্ষোৎফুল্ল হন, তাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং লাভ যশের জন্য লালায়িত হন। একে বলে আচার্যোপদ্রব। তেমনি গুরুর শিষ্যও গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণে নির্জনবাসে রত হয়। তার ব্রতচর্যায় মুগ্ধ জনতা যখন তার কাছে যাতায়াত করে, তখন সে হর্ষোৎফুল্ল হয়, তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং লাভ যশের জন্য লালায়িত হয়। একে বলে শিষ্য-উপদ্রব। হে আনন্দ, ধরো জগতে সুগত সম্যক সম্বুদ্ধ তথাগতের আবির্ভাব হয়। তাঁর নির্জনচর্যায় মুগ্ধ জনতা যখন তাঁর কাছে যাতায়াত করে, তখন তিনি লাভ যশ সম্মান প্রতিপত্তিতে অবিকম্পিত অবিচলিত নির্বিকার হয়ে অবস্থান করেন। কিন্তু যদি তাঁর পথানুসরণকারী শিষ্য সেই লাভ যশ সম্মান প্রতিপত্তির জন্য লালায়িত হয় এবং সেগুলোকে চরম লক্ষ্য বলে মনে করে, তাহলে সে অধোপতনকে বলা হয় ব্রহ্মচারী উপদ্রব এবং এটিই তিনটির মধ্যে নিকৃষ্টতম।

হে আনন্দ, তাই বলি তোমরা আমার প্রতি মিত্রতাচরণ করো, শত্রুতাচরণ করো না। এ মিত্রতাচরণ চিরতরে সুখাবহ হিতাবহ হবে। তোমাদের প্রতি অনুকম্পায় তোমাদের হিতৈষী হয়ে তোমাদের সুখের জন্য তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি ধর্ম দেশনা করি। তোমাদের মধ্যে যারা সেই উপদেশ শোনেনা কথায় কর্ণপাত করে না, উপলব্ধির জন্য তৎপর হয় না, আমার নির্দেশ লঙ্ঘন করেই চলে, তারা আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করে, মিত্রতাচরণ করে না; যারা সেই উপদেশ শোনে কথায় কর্ণপাত করে, উপলব্ধির জন্য তৎপর হয়, তারা আমার প্রতি মিত্রতাচরণ করে। হে আনন্দ, তাই বলি, তোমরা আমার প্রতি মিত্রতাচরণ করো না।

বুদ্ধের এ ভাষণ আয়ুষ্মান আনন্দ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন।

ষোল

বৈশালীর মহাবনে কূটাগারে যখন বুদ্ধ থাকতেন, বৈশালীবাসী জনৈক ভক্ত বুদ্ধের কাছে প্রায়ই আসতেই। তাঁর নাম ছিল উগ্র। নামের সঙ্গে তাঁর প্রকৃতির সামঞ্জস্য ছিল না। তিনি ছিলেন শান্ত ধীর গম্ভীর ও অপগতচিত্ত। ভিক্ষুরা তাঁর স্বভাবের জন্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন। বুদ্ধ তা জেনে একদিন ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, এই বৈশালীবাসী গৃহপতি উগ্রের আটটি

আশ্চর্য গুণ আছে যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না। এ কথা বলে বুদ্ধ আসন ত্যাগ করে বিহারে প্রবেশ করলেন।

গৃহপতি উগ্রের প্রতি বুদ্ধের এ মন্তব্য কৌতূহল জাগাল ভিক্ষুদের মনে। তাঁর আটটি আশ্চর্য গুণের কথা তাঁরা শুনলেন, কিন্তু জানতে পারলেন না সেগুলো কি। জনৈক ভিক্ষু সকালেই গৃহপতি উগ্রের গৃহে উপস্থিত হলেন। গৃহপতি তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিজের কক্ষে নিয়ে গেলেন। ভিক্ষু বললেন—গৃহপতি, ভগবান বলেছেন আপনি নাকি আটটি আশ্চর্যগুণের অধিকারী, আপনার সেই আটটি আশ্চর্যগুণ কি তা একবার পরিষ্কার করে বলুন।

গৃহপতি বিনীতভাবে উত্তর করলেন—ভদন্ত, ভগবান আমার আটটি কোন আশ্চর্য গুণের কথা উল্লেখ করেছেন জানি না, তবে আটটি বিষয় আমারও আশ্চর্য মনে হয়।

গৃহপতি উগ্র বলতে লাগলেন। ভদন্ত, আমি যখন প্রথম দূর থেকে বুদ্ধকে দেখতে পাই, দেখা মাত্রই তাঁর প্রতি আমার চিত্ত অনাবিল শ্রদ্ধায় ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে—এটি প্রথম আশ্চর্য বিষয়। ভদন্ত, আমি এই ভাবে প্রসন্ন চিত্তে বুদ্ধের সান্নিধ্য লাভ করি। তিনি আমাকে আনুপূর্বিক ধর্মকথা শোনান যথা-দান, শীল, স্বর্গ, কামনার দোষ সংক্লিষ্টতা ও নৈষ্ক্রম্যের প্রশংসা; তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমি মগ্ন হয়ে যাই, ভাবে ভক্তিতে হৃদয় কানায় কানায় ভরে ভরে ওঠে। তখন তিনি চারি আর্যসত্যের গভীর তত্ত্ব আমার কাছে প্রকাশ করেন। তাঁর অপূর্ব বর্ণনা আমার প্রাণমন অভিভূত করে একটি আলোর স্পর্শ বয়ে আনে। সেই উদার স্পর্শে হঠাৎ আমার চোখের আবরণ খসে পড়ে। যেমন অমলিন শুভ্র বস্ত্র রঙে চোয়ালে সম্যকভাবে রঙ গ্রহণ করে বদলে যায় তেমনি আমার দৃষ্টি সম্পূর্ণ বদলে গেল—আমার দৃষ্টিতে জগৎ অনিত্য সারহীন প্রতিভাত হল। এই নতুন দৃষ্টিলাভ করে নতুন উপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত সংশয় নির্মূল করে নির্ভয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে সঙ্ঘের শরণগত হই এবং ব্রহ্মচর্য-পূত শীল গ্রহণ করি। এটি দ্বিতীয় আশ্চর্য বিষয়।

ভদন্ত, আমার চার তরুণী ভার্যা ছিল। আমি তাঁদের বললাম প্রিয়াগণ, আমি এখন ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেছি, ভোগ বিলাস পরিহার করে নিষ্কাম পবিত্র শুদ্ধ জীবন যাপন করব, তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভ্রাতা ভগ্নির, যদি ইচ্ছা হয়, তোমরা এখানে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো সম্পত্তি ভোগ করে অথবা পিতৃগৃহে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারো, আর যদি চাও কোন পুরুষের পত্নী হতে, আমাকে তার নাম বলো, আমি তার হাতে সমর্পণ করব। আমার এ প্রস্তাব

তনে আমার প্রথম পক্ষের পত্নী বললেন—আর্যপুত্র, অমুক যুবককে আমি পতিরূপে গ্রহণ করতে চাই। আমি কালবিলম্ব না করে সেই যুবকটিকে আমার বাড়ীতে এনে প্রিয়তমা ভার্যাকে তার হাতে সমর্পণ করি। তাতে আমার মন বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। এটি আমার তৃতীয় আশ্চর্য বিষয়।

ভদন্ত, আমাদের পরিবার সম্পদ-সমৃদ্ধ। পূর্বপুরুষেরা প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করে গিয়েছেন। আমি সে ধনভাণ্ডার খুলে রেখেছি সাধু সজ্জনের সেবায়।

তাঁদের সেবায় এ পর্যন্ত খরচ করব বলে সীমারেখা টেনে দিইনি। যতদিন একটা কানাকড়ি থাকবে ততদিন সেই সেবা থামবে না। এইটি চতুর্থ আশ্চর্য বিষয়।

ভদন্ত, যখন আমি যে শ্রমণকে সেবা করি, তখন একান্ত মনে একান্ত প্রাণে তাঁর সেবায় রত হই। কখনো আমার দ্বিধাবোধ হয় না, অনুতাপ আসে না। নিষ্ঠায় ঐকান্তিকতায় শ্রদ্ধার সৌজন্যে সেই সেবা হয় পবিত্র মধুর। এইটি পঞ্চম আশ্চর্য বিষয়।

ভদন্ত, যদি সে শ্রমণ আমাকে ধর্মকথা শোনান, আমি তদ্‌গত মনে সশ্রদ্ধ ভাবে তা শুনি, আমি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করি না, অমনোযোগী হই না। যদি তিনি ধর্মোপদেশ না দেন, আমি নিজে ধর্মালাপ সুরু করি। এইটি ষষ্ঠ আশ্চর্য বিষয়।

ভদন্ত, দেবতাদের সঙ্গে হয় আমার বার্তালাপ। তাঁরা আমার কাছে আসেন অথবা তাঁদের সঙ্গে আলাপে রত হই বলে আমার মনে গর্ববোধ নেই, চাঞ্চল্য নেই। এইটি সপ্তম আশ্চর্য বিষয়।

ভদন্ত, কাম ক্রোধ ইত্যাদি পাঁচ নিম্নভাগীয় সংযোজন বা বন্ধন বলে যেগুলিকে ভগবান নির্দেশ করেছেন, সেই গুলির কোনটিই আমার মধ্যে অপরিত্যক্ত দেখতে পাই না অর্থাৎ আমি সে বন্ধন থেকে মুক্ত। এইটি অষ্টম আশ্চর্য বিষয় ভদন্ত, এই আটটি, আশ্চর্য গুণ আমার মধ্যে দেখেছেন, তা আমি জানি না।

ভিক্ষু গৃহপতি উগ্রের আট আশ্চর্য গুণের বর্ণনা তাঁর মুখে শুনলেন, কোন মন্তব্য করলেন না। অতঃপর তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করে বিহারে ফিরলেন। আহারের পর তিনি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন এবং প্রণাম-পূর্বক একান্তে বসে গৃহপতি উগ্রের সঙ্গে তাঁর আলাপ আদ্যোপান্ত জানালেন। বুদ্ধ বললেন—হে ভিক্ষু, গৃহপতি উগ্র ঠিক কথাই বলেছেন, তাঁর বর্ণনা যথার্থ, তাঁর এই আটটি আশ্চর্য গুণের কথাই আমি সেদিন

পায় না। তাতে তার চিত্ত স্থির অচঞ্চল একাগ্র ও সমাহিত হয়। এভাবে সে কায়ানুস্মৃতি ধ্যান অভ্যাস করে।

পুনশ্চ সে গমন কালে জানে 'গমন করছি' দাঁড়ান কালে সে জানে 'দাঁড়িয়ে আছি।' উপবেশনকালে সে জানে 'বসে আছি' শয়ান কালে সে জানে 'শুয়ে আছি।' যে যে অবস্থায় শরীর বিদ্যমান থাকে, সে সে অবস্থাকে স্মরণে রাখে। সে যখন এভাবে যত্নপর অনলস অপ্রমত্ত হয়ে এ অভ্যাস করতে থাকে, তখন তার মনে বৈষয়িক চিন্তা বিগত হয়। বৈষয়িক চিন্তার পরিত্যাগে চিত্ত স্থির অচঞ্চল একাগ্র ও সমাহিত হয়। এভাবেও সে কায়ানুস্মৃতি ধ্যান অভ্যাস করে।

পুনশ্চ সে অগ্রগতিতে পশ্চাদ্‌গমনে দর্শনে-শ্রবণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংকোচনে প্রসারণে পাত্রচীবর ধারণে আহারে পানে স্থিতিতে গমনে উপবেশনে শয়নে বাক্যালাপে মৌনতায়। এক কথায় সকল অবস্থায় সজাগ হয়ে প্রতি অবস্থাকে স্মরণে রেখে সজ্ঞান থেকে অবহিত হয়ে বাস করে। এভাবে ও সে কায়ানুস্মৃতি ধ্যান অভ্যাস করে।

পুনশ্চ সে এ শরীরকে আপাদমস্তক নানাপ্রকার অশুচি কদর্য পদার্থ সমূহে পরিপূর্ণ ভাবে। এ শরীরে আছে কেশ লোম নখ দাঁত ত্বক মাংস স্নায়ু অস্থি অস্থিমজ্জা বৃক্ক হৃৎপিণ্ড যকৃৎ ক্লোম প্লীহা ফুসফুস্ অন্ত্র উদরীয় পুরীষ মগজ পিত্ত শ্লেষ্মা পুঁজ রক্ত স্বেদ মেদ অশ্রু চর্বি থুথু শিঙ্ঘনী লালা মূত্র। যেমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ধান যব মুগ তিল তণ্ডুলাদি পূর্ণ দুমুখো আধার খুলে তার ভিতরকার শস্যগুলো পর্যবেক্ষণ করে, তেমনি ভিক্ষু নানা অশুচি কদর্য পদার্থ সমূহে পরিপূর্ণ আপাদমস্তক এ শরীরের অশুচি পদার্থ গুলোকে পর্যবেক্ষণ করে। এ ভাবেও সে কায়ানুস্মৃতি ধ্যান অভ্যাস করতে থাকে।

পুনশ্চ সে যথাস্থিত যথাপ্রবর্তিত এ শরীরের ধাতু বিশ্লেষণ করে দেখ—এ শরীরে আছে পৃথিবী ধাতু অপধাতু তেজধাতু এবং বায়ুধাতু যেমন কসাই অথবা তার অনুচর পশু বধ করে রাস্তার চৌমাথায় পৃথক পৃথক অংশ করে বসে। তেমনি ভিক্ষু যথাস্থিত যথাপ্রবর্তিত শরীরের ধাতু বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষণ করে। এভাবেও সে কায়ানুস্মৃতি ধ্যান অভ্যাস করে।

পুনশ্চ সে যখন শ্মশানে পরিত্যক্ত পঁচা বিকৃত শব দেখে, কাক শকুনি দ্বারা অথবা শৃগাল কুকুর ইত্যাদি জন্তু দ্বারা ভক্ষ্যমান শব দেখে, মাংস লোহিত যুক্ত অস্থিপঞ্জর অথবা রক্তলিপ্ত মাংসহীন অস্থিপঞ্জর অথবা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অস্থিরাশি দেখে, তখন সে পর্যালোচনা করে নিজদেহের পরিণতি 'এ দেহের

ধর্মও এই, এ দেহ এ সব অবস্থার অনতীত।' সে যখন অনলস অপ্রমত্ত হয়ে নিবিষ্ট মনে নিজ দেহের এতাদৃশ পরিণতির কথা পর্যালোচন করে, তখন তার বৈষয়িক চিন্তার লেশ থাকে না। তাতে তার চিত্ত স্থির অচঞ্চল একাগ্র ও সমাহিত হয়। এভাবেও সে কায়ানুস্মৃতি ধ্যান অভ্যাস করে।

পুনশ্চ সে কামনা ও কুপ্রবৃত্তির কবল থেকে মুক্ত হয়ে প্রথম ধ্যান আয়ত্ত করে বাস করে। তার সর্বকায় কামনাদির অভাবজাত প্রীতিতে আনন্দে স্নিগ্ধ পূর্ণ পরিব্যাপ্ত হয়। তার কিছুই প্রীতিতে আনন্দে অস্পৃষ্ট থাকে না। এর পর সে বিতর্ক (যে চিত্তবৃত্তি ধ্যেয় বিষয়ের দিকে চিত্তকে আকর্ষণ করে) এবং বিচারের (যে চিত্তবৃত্তি ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তকে বার বার বিচরণ করায়) উপশমে দ্বিতীয় ধ্যান আয়ত্ত করে। তখন সর্বকায় সমাধিজাত প্রীতিতে আনন্দে পরিপ্লুত হয়।

পুনশ্চ সে প্রীতির বিরাগে তৃতীয় ধ্যান লাভ করে। তার সর্ব কায় আনন্দপ্লাবিত আনন্দমগ্ন হয়। এ আনন্দময় অবস্থা অতিক্রম করে সে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে। তার নির্লিপ্ত শুদ্ধ মনের দ্বারা সর্বকায় প্রশান্তিমগ্ন হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে কেউ কায়ানুস্মৃতি ধ্যান অভ্যাস করে আয়ত্ত করে, জ্ঞানরাজ্যের আলোর জগতের সকল কুশল ধর্ম বা পুণ্য বৃত্তি গুলো তার অধিগম্য হয়। যেমন সমুদ্রের কথা ভাবলে সমুদ্রগামী নদী উপনদী বাদ পড়ে না, তেমনি কায়ানুস্মৃতি ধ্যান অভ্যাস করলে আয়ত্ত করলে সকল ধর্ম বা পুণ্যবৃত্তিগুলো তার অন্তর্ভুক্ত হয়।

হে ভিক্ষুগণ, যে কায়ানুস্মৃতি ধ্যান অভ্যাস করে না আয়ত্ত করে না, পাপী মার তার মধ্যে অবকাশ লাভ করে সুযোগ পায় তাকে আয়ত্ত করে। ভেজা নরম মাটিতে নিক্ষিপ্ত ভারী শিলাখণ্ড যেমন সেখানে অবকাশ লগ্ন হয়, তেমনি কায়ানুস্মৃতিধ্যানহীন ব্যক্তির মধ্যে মার অবকাশ পায় তাকে আয়ত্ত করে। যে কায়ানুস্মৃতি ধ্যান অভ্যাস করে, পাপী মার তার মধ্যে অবকাশ লাভ করে না সুযোগ পায় না তাকে আয়ত্ত করতে পারে না যেমন ভেজা কাঠ মন্থন করে আগুন জ্বালানো যায় না, তেমনি মার কায়ানুস্মৃতি ধ্যান-আয়ত্তকারী ব্যক্তিকে অভিভূত করতে পারে না।

হে ভিক্ষুগণ, কায়ানুস্মৃতি ধ্যান অভ্যাস করলে আয়ত্ত করলে চিত্ত সকল অতীন্দ্রিয় অনুভূতির যোগ্য হয় এবং দশ রকমের ফল পাওয়া যায় যথা—১) মনের উৎকণ্ঠা উদ্বেগ দূরীভূত হয় ২) ভয় ভীতি মনকে অভিভূত করতে পারে না, সহজেই ভয় ভীতিকে জয় করা যায়। ৩) সহিষ্ণুতা আসে।

৪) বিভিন্ন ধ্যানস্তর লাভে সমর্থ হয়। ৫) অলৌকিক বিভূতি আয়ত্ত হয়। ৬) দিব্যকর্ণ আয়ত্ত করে কাছের দূরের সকল শব্দ শুনতে সমর্থ হয়। ৭) পরচিত্ত জানার ক্ষমতা লাভ হয়। ৮) জাতিস্মর জ্ঞানলাভে জন্ম-জন্মান্তর স্মরণ করা যায়। ৯) দিব্যচক্ষু লাভে প্রাণিজগতের জন্মমৃত্যুর খেলা লক্ষ্য করা যায়। ১০) আস্রব সমূহের ক্ষয়ে শুদ্ধ মুক্ত অর্হৎ হওয়া যায়।

ভিক্ষুগণ তদ্‌গত চিত্তে বুদ্ধের এ ভাষণ শুনে মুগ্ধ হলেন।

আঠার

বার্ধক্যে উপনীত বুদ্ধ জেতবনে বাস করছিলেন। একদিন তাঁর প্রধান শিষ্য শারীপুত্র যথারীতি তাঁর সেবাব্রত সম্পাদন করে দিবা বিহারের পর চর্মাসনে বসে ধ্যানমগ্ন হলেন। ধ্যানভঙ্গের পর শারীপুত্রের মনে প্রশ্ন জাগল—ভগবান এখন জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ, মৌদ্‌গল্যায়ন এবং আমিও বার্ধক্যে উপনীত, আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, তবে ভগবান কি আগে পরিনির্বাণ লাভ করবেন অথবা আমরা তাঁর আগে দেহত্যাগ করব? তখনি তিনি দিব্য দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলেন—তাঁদের দুইজনের পরিনির্বাণ দিন আসন্ন, ভগবানের আগে তাঁরাই পরিনির্বাণ লাভ করবেন। পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল নিজের বৃদ্ধা জননীর কথা। যদিও তিনি শারীপুত্র সহ সাতজন সিদ্ধপুরুষের গর্ভধারিণী জননী, তবুও শুচিবায়ুগ্রস্তা অন্ধকুসংস্কাররতা এ বৃদ্ধা আলোর স্পর্শ থেকে বঞ্চিতা আচারসর্বস্বা। জননীর দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে শারীপুত্রের অন্তর কেঁপে উঠল। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন সকল কুসংস্কারের অন্তরালে যে শুভ্র সংস্কার চাপা পড়ে আছে তা খুলে দেবে জননীর ধর্মচক্ষু। এ কর্তব্যের দায় তাঁকেই পালন করতে হবে। তিনি সংকল্প করলেন—মায়ের ধর্মচক্ষু উন্মীলন করে জন্মস্থানেই পরিনির্বাণ লাভ করবেন। কালবিলম্ব না করে তিনি নিজের সংকল্প জানালেন ভিক্ষুদের। বহুভিক্ষু তার অনুগামী হতে প্রস্তুত হলেন। তিনি গেলেন বুদ্ধের কাছে, তাঁর চরণ বন্দনা করে স্তুতি গাথায় বললেন—

"হে লোকনাথ মহামুনি! গ্রহণ করুন আমার অন্তিম প্রণাম, আমার ভবলীলা সংবরণের দিন আসন্ন, আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে, এ দেহভার শীঘ্রই ফেলে দিয়ে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবো। হে ভগবান আমায় অনুমতি দিন; হে সুগত, আমায় বিদায় দিন।"

এই বলে বুদ্ধের নিকট অনুমতি চাইলেন তাঁর প্রধান শিষ্য। বিদায়ানুমতি চাওয়া মর্মন্তুদ হলেও বন্ধনহীন শুদ্ধ মুক্ত পুরুষদের কাছে ব্যথা বেদনার নয়।

তবে পরিনির্বাণের অনুমতি দিতে গিয়ে এ কথা কি বলা যায় হাঁ পরিনির্বাণ লাভ করো।' এতো মৃত্যুবরণেরই অনুমোদন। তেমনি 'এখন পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হয়ো না' এ কথাও তার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এতো ভববাসনারই সমর্থন। তাই তিনি অবিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—শারীপুত্র, তুমি কোথায় পরিনির্বাণ লাভ করবে। উত্তরে শারীপুত্র বললেন—ভদন্ত, মগধ রাজ্যের নালক গ্রামে আমার জন্মভূমির শীতল ক্রোড়ে পরিনির্বাণ লাভ করব। বুদ্ধ তাঁকে নির্দেশ দিলেন ভিক্ষুদের ধর্মকথা শোনাবার জন্য। তিনি অপূর্ব লীলাভঙ্গীতে ভিক্ষুদের উপদেশদানে অনুপ্রাণিত করলেন। অতঃপর তিনি ধর্ম-মণ্ডপ ত্যাগ করে বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে বললেন—ভগবন, এবার আমার যাত্রার সময় হয়ে এলো। তখন জেতবনের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। ধর্ম সেনাপতি শারীপুত্রের চির বিদায়ের কথা শুনে সমগ্র শ্রাবস্তীর আবাল বৃদ্ধ বণিতা জেতবনে সমাগত। বুদ্ধ ধর্মাসন ত্যাগ করে গন্ধকুটির দিকে অগ্রসর হয়ে সোপানে উঠে দাঁড়ালেন। শারীপুত্র তাঁকে তিনবার প্রদক্ষিণ পূর্বক চরণ বন্দনা করে কৃতাঞ্জলিপুটে বুদ্ধকে সম্মুখে রেখে যাত্রা করলেন। যতক্ষণ দেখা গিয়েছিল, ততক্ষণ তিনি অপলক নয়নে বুদ্ধের দিকে তাকিয়ে চলেছিলেন। ভিক্ষুগণ যখন জেতবনের ফটক পর্যন্ত তাঁর অনুগমন করলেন, তখন তিনি বললেন—বন্ধুগণ, আপনারা আর অগ্রসর হবেন না, অপ্রমত্ত হোন, তাঁরা সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনুগামী ভিক্ষুরাই সঙ্গে চললেন। এই বিদায়-দৃশ্য দেখে কারো চোখ অনার্দ্র রইল না। ভক্তদের মধ্যে বহু নরনারী 'আপনি যে চললেন আর তো ফিরবেন না, আপনাকে আর দেখতে পাব না' বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন। তাঁদের সে ক্রন্দনধ্বনি আকাশ বাতাস ধ্বনিত করে তুলল। তিনি তাঁদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। যখন তাঁরা শ্রাবস্তীর প্রান্ত সীমায় এসে পড়লেন, তখন ক্রন্দনধ্বনি আরও বিপুলতর হয়ে উঠল। তিনি সান্ত্বনা বাক্যে তাঁদের উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন।

বিরাট ভিক্ষুবাহিনী পরিবৃত হয়ে শারীপুত্র চললেন জন্মভূমি লক্ষ্য করে। গ্রাম নগর প্রান্তর অতিক্রম করে স্থানে স্থানে ভক্তদের ধর্মোপদেশ দিয়ে সপ্তাহকাল পরে অবশেষে আসন্ন সন্ধ্যায় তাঁরা এসে পৌঁছালেন রাজগৃহের নালক গ্রামে। গ্রামের প্রান্তে বিরাট বটবৃক্ষ ছিল অনন্ত শাখা মেলে। তার তলায় দাঁড়িয়ে শারীপুত্রের মনে জেগে উঠল বাল্যের স্মৃতি। জীবনের প্রান্ত সীমায় সে অতীত স্বপ্নের মত মনে হল। ভাবাবেশে তার চোখ মুদে এল। তখনি পরিচিত কণ্ঠের 'ভদন্ত' সম্বোধন শুনে তিনি চোখ মেলে দেখলেন তাঁর চরণে

প্রণত নিজের ভাগিনের উপরেবতকে। শারীপুত্র তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার দিদিমা বাড়িতে আছেন কি? উপরেবত উত্তর দিলেন 'হাঁ'।

"যাও, তাঁকে বলো—আমরা এসেছি।"

"আপনারা কয়জন?"

"পাঁচ শ ভিক্ষুর ব্যবস্থা করতে বলো।"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

উপরেবত তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন বাড়ী, দিদিমাকে জানালেন মাতুলের আগমন সংবাদ। পুত্রের অপ্রত্যাশিত আগমন সংবাদ শুনে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর আনন্দের সীমা রইল না। পুত্রের নির্দেশ মত তিনি সমস্ত আয়োজন করালেন।

সন্ধ্যা তখন অতীত প্রায়। চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছে। দূরের কুটিরগুলোতে আলো জ্বলে উঠেছে। আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে পিতৃগৃহের পানে অগ্রসর হলেন। তাঁর সংবর্ধনার জন্য আগত গ্রামবাসীদের কলরোলে তাঁর পৈতৃক বিরাট প্রাসাদ মুখরিত হয়ে উঠল এবং আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করল। তিনি ভিক্ষুদের নিয়ে চত্বর পেরিয়ে ধীর পদক্ষেপে প্রাসাদে ঢুকলেন। তখন তাঁর শরীর শ্রান্ত ক্লান্ত। তাঁর নির্দেশে ভিক্ষুরা চলে গেলেন তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে। তিনি নিজের জন্মকক্ষে প্রবেশ করেই শয্যাশায়ী হলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র যন্ত্রনা শুরু হল। রক্তবমি হতে লাগল। তিনি অনভিভূতভাবে বেদনা সহ্য করতে লাগলেন।

রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হয়ে চলল। চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। বৃদ্ধা জননীর চোখের সামনে যেন পট পরিবর্ত্তন হল। তিনি মহাপুরুষ পুত্রের অমলিন মুখের পানে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র জননীর মনের অবস্থা লক্ষ্য করে উপদেশ শুরু করলেন। শুনতে শুনতে তাঁর মন ডুবে গেল ভাবের গভীরে। উন্মীলিত হল তাঁর ধর্মচক্ষু।

রাত্রির শেষ প্রহর অতীত হবার সঙ্গে সঙ্গে আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভিক্ষুদের ডেকে আনলেন তাঁর সম্মুখে। তিনি আয়ুষ্মান চুন্দকে সম্বোধন করে বললেন—হে চুন্দ, আমায় ধরে বসাও। চুন্দ তাঁকে বসালেন। তখন তিনি ভিক্ষুদের বললেন—বন্ধুগণ, দীর্ঘকাল তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, যদি অপ্রিয়কর কিছু বলে থাকি, তাহলে তোমরা আমায় ক্ষমা করো। ভিক্ষুগণ বললেন—ভদন্ত, এতকাল আপনি ছায়ার মত আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আপনার আচরণে অপ্রিয়কর কিছুই দেখিনি, আপনিই আমাদের ক্ষমা করুন। এই বলে তাঁরা নীরব হলেন। ঘরময় নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। শারীপুত্র মৌন

ভিক্ষুসঙ্ঘের পানে একবার তাকালেন। ভিক্ষুদের ব্যাকুল দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ। প্রত্যুষের প্রশান্তির মধ্যে তিনি হঠাৎ চক্ষু মুদ্রিত করে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলেন। মনে হল প্রবল ঝটিকায় একটি দীপ নিবে গেল।

শারীপুত্রের পরিনির্বাণের সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম জনস্রোত বইল তাঁর পিতৃগৃহের পানে। ভক্তদের আনীত পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবকে ঢাকা পড়ে গেল শবাধার। অতঃপর কক্ষের সম্মুখে পুষ্পরাশি স্তুপাকার ধারণ করল। নির্দিষ্ট সময়ে বিরাট শোভাযাত্রা সহ সুসজ্জিত শবাধারে পূতদেহ শ্মশানে নীত হল। গ্রামান্ত থেকে শ্মশান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল লোকেলোকারণ্য হয়ে উঠল। অগণিত ভক্তের স্তব পূজা বন্দনার মধ্যে মহাসমারোহে দাহক্রিয়া সুসম্পন্ন হল। আয়ুষ্মান চুন্দ শারীপুত্রের ব্যবহৃত পাত্রচীবরাদি নিদর্শন সহ পূতাস্থি নিয়ে শ্রাবস্তীর দিকে যাত্রা করলেন। যথাকালে জেতবনে পৌঁছে তিনি বুদ্ধের সম্মুখে রাখলেন প্রধান শিষ্যের পূত দেহাস্থি ও নিদর্শন। অতঃপর সেগুলো জেতবনের সভাগৃহের সুসজ্জিত বেদীতে রাখা হল। এ বার্তা রটে গেল শ্রাবস্তীতে। জনতার ভিড় দুর্বার হয়ে উঠল। কয়েক দিন ধরে চলল ভক্তদের পূজা বন্দনা। অতঃপর জেতবনের একান্তে সেই পূত দেহাস্থি ও নিদর্শন প্রোথিত করে প্রতিষ্ঠিত হল শারীপুত্রের ধাতুচৈত্য। বুদ্ধ আনন্দকে ডেকে রাজগৃহগমনের সংকল্প প্রকাশ করলেন। আনন্দ যথারীতি সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত হয়ে বুদ্ধ অগ্রসর হলেন রাজগৃহের দিকে।

বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয়ের অন্যতম আয়ুষ্মান মৌদ্‌গল্যায়ন তখন রাজগৃহেই ছিলেন। তাঁর প্রতি রাজগৃহবাসীদের ছিল অকুণ্ঠ ভক্তি। সমগ্র রাজগৃহ যেন মৌদগল্যায়নগতপ্রাণ। তাঁর প্রসাদে লব্ধ আহার পানীয়ের প্রাচুর্যে ভিক্ষুসঙ্ঘের কোন অভাব ছিল না। এজন্য কোন কোন সন্ন্যাসীসম্প্রদায় তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন। কারণ জনগণের ভিক্ষুসঙ্ঘপ্রীতির জন্য তাঁদের ভক্তসংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পেয়েছিল। এজন্য তাঁরা মৌদ্‌গল্যায়নকে দায়ী মনে করলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতিপত্তির মূলোচ্ছেদের জন্য মৌদ্‌গল্যায়নের অপসারণ তাঁদের বাঞ্ছনীয় হল। তাঁর গুপ্তহত্যার ব্যবস্থা করতে দেরী সইল না। একদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার পর তিনি যখন কালশিলায় তাঁর নির্জনাবাসে ধ্যানাসনে বসার উদ্যোগ করেছিলেন, তখন তিনি গাছের আড়ালে সন্দেহজনকভাবে দণ্ডায়মান কয়েকজন ব্যক্তির ফিস্ ফিস্ আলাপ শুনলেন। তাদের দুরভিসন্ধি টের পেয়ে তিনি অলৌকিক শক্তিবলে স্থান

ত্যাগ করে আত্মরক্ষা করলেন। দুর্বৃত্তরা ক্ষুণ্ণমনে চলে গেল। আর এক রাত্রে অনুরূপ অবস্থায় তারা আবার এসে তাঁর বাসস্থান ঘেরাও করল। সেবারও তিনি সেইভাবে আত্মরক্ষা করলেন। কিন্তু তৃতীয়বার যখন তারা এসে হাজির হল, তখন তিনি স্থানত্যাগ না করে ভাবতে লাগলেন কেন এরা বার বার তাঁকে এভাবে ঘেরাও করছে। তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে প্রতিভাত হল তাঁর পূর্বজন্মার্জিত দুষ্কৃতির ফল—নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান। তিনি আর আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন না। আততায়ীদের আক্রমণের পূর্বে তিনি তদ্‌গত চিত্তে প্রণাম নিবেদন করলেন বুদ্ধের উদ্দেশে, বসে গেলেন ধ্যানাসনে। সেই মুহূর্তেই তারা ক্ষুধিত শার্দূলদলের মত তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং নিরন্তর মুদ্গর প্রহারে তাঁর দেহকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করে প্রস্থান করল।

মর্মান্তিকভাবে নরঘাতকের হাতে মৌদগল্যায়নের জীবনাবসানের কথা পরদিনই রাজগৃহে ছড়িয়ে পড়ল। ভক্তদের ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠল। সমস্ত রাজগৃহ ক্ষুব্ধ হল। এ ব্যাপারে জড়িত ব্যক্তিদের হীন চক্রান্ত প্রকাশ হয়ে পড়ল। রাজা অজাতশত্রু তাদের যথোচিত শাস্তি দেবার জন্য হুকুম দিলেন। সেদিনই বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে রাজগৃহে উপস্থিত হলেন। অবীতরাগ ভিক্ষুগণ মৌদগল্যায়নের মর্মন্তুদ হত্যাকাহিনী শুনে ভেঙে পড়লেন। তাঁদের করুণ ক্রন্দন সমস্ত পরিবেশকে শোকাচ্ছন্ন করে তুলল। বুদ্ধ অগ্রশিষ্যের নিষ্প্রাণ দেহ স্তব্ধভাবে দর্শন করলেন।

যথাসময়ে বিরাট শোভাযাত্রাসহ মৌদগল্যায়নের পূত দেহ শারীপুত্রের চিতাশয্যার পাশে নেওয়া হল। রাজগৃহবাসী ও দূরাগত বহু ভিক্ষু ভিক্ষুণী ও অগণিত ভক্তের অশ্রুসজল দৃষ্টির সম্মুখে দাহক্রিয়া সুসম্পন্ন হল। রাজগৃহেই বুদ্ধের পুণ্য উপস্থিতিতে তাঁর দেহাবশেষের ওপর গড়ে উঠল বিরাট স্তূপ।

উনিশ

অগ্রশিষ্য মৌদগল্যায়নের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর বুদ্ধ রাজগৃহেই গৃধ্রকূট পর্বতে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করতে লাগলেন। তখন রাজা অজাতশত্রু বৈশালীর বৃজিরাজগণের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের আয়োজন করছিলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন—ভগবান বুদ্ধ তো এখানেই আছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দেখি তিনি কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেন কি এ ব্যাপারে ; তাঁর বাক্য ব্যর্থ হয় না। একদিন তিনি তাঁর মহামন্ত্রী বর্ষকারকে সম্বোধন করে বললেন—হে ব্রাহ্মণ, যাও ভগবান বুদ্ধের কাছে তাঁকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাও, তাঁর কুশল

জিজ্ঞাসা করো এবং বলো 'আমি শক্তিশালী তেজস্বী বৃজিবংশ ধ্বংস করবো, নিশ্চিহ্ন করবো।' একথা শুনে তিনি যা মন্তব্য করবেন, তা সুষ্ঠুভাবে অবধারণ করে আমাকে জানাও, তাঁর বাক্য ব্যর্থ হয় না।

রাজার নির্দেশ শিরোধার্য করে মহামন্ত্রী সদলবলে যাত্রা করলেন গৃধ্রকূট পর্বত লক্ষ্য করে। সুন্দর শোভন রথগুলোর চাকার শব্দে প্রশস্ত রাজপথ মুখরিত হয়ে উঠল। রথগুলো নগর পেরিয়ে প্রান্তরপথে গৃধ্রকূটের পাদদেশে এসে থামল। মহামন্ত্রী রথ থেকে অবতরণ করে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে পর্বতারোহণে বুদ্ধের বাসস্থানে গিয়ে উপনীত হলেন। বুদ্ধের সঙ্গে আলাপ সম্ভাষণ করে একান্তে আসন গ্রহণ করলেন, বললেন—ভবৎ গৌতম, মগধরাজ অজাতশত্রু আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন এবং আপনার কুশল জানতে চেয়েছেন, তিনি নাকি অভিযান করে শক্তিশালী তেজস্বী বৃজিবংশ ধ্বংস করবেন, নিশ্চিহ্ন করবেন। সেই সময় আয়ুষ্মান আনন্দ বুদ্ধকে পাখার বাতাস করতে করতে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন—হে আনন্দ, তুমি কি শুনেছ বৃজিরা সর্বদাই সম্মিলিত হয়?

"হাঁ, ভদন্ত। আমি শুনেছি, তাঁরা সর্বদাই সম্মিলিত হন।"

"হে আনন্দ, যতদিন পর্যন্ত বৃজিরা সর্বদা সম্মিলিত হবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের হানি হবে না, শ্রীবৃদ্ধিই হবে।"

"হে আনন্দ, তুমি কি শোননি বৃজিরা একতাবদ্ধ হয়ে করণীয়গুলো করে?"

"হাঁ ভদন্ত, শুনেছি।"

"যতদিন পর্যন্ত বৃজিরা একতাবদ্ধ হয়ে চলবে একতাবদ্ধ হয়ে করণীয় করবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের হানি হবে না, শ্রীবৃদ্ধিই হবে।"

"হে আনন্দ, তুমি কি শোননি বৃজিরা কথায় কথায় নিয়ম কানুন রচনা করে না, পুরাতন নিয়ম কানুন উড়িয়ে দেয় না, প্রাচীন বৃজিধর্মকে মেনে চলে?"

"হাঁ ভদন্ত, শুনেছি।"

"যতদিন পর্যন্ত তারা কথায় কথায় নিয়ম কানুন রচনা করবে না, পুরাতন নিয়ম কানুন উড়িয়ে দেবে না, প্রাচীন বৃজিধর্ম মেনে চলবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের হানি হবে না, শ্রীবৃদ্ধিই হবে।"

"হে আনন্দ, তুমি কি শোননি বৃজিরা তাদের বংশের বৃদ্ধগণকে মানে সম্মান করে পূজনীয় মনে করে এবং বৃদ্ধদের বচন শোনে?"

"হাঁ ভদন্ত শুনেছি।"

"যতদিন পর্যন্ত তারা বৃদ্ধদের মানবে সম্মান করবে বচন শুনবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের হানি হবে না' শ্রীবৃদ্ধিই হবে।"

হে আনন্দ, তুমি কি শোননি বৃজিরা কখনো কুলনারীর কুলকুমারীর অসম্মান করে না?"

"হাঁ ভদন্ত শুনেছি।"

"যতদিন পর্যন্ত তারা কুলনারীর কুলকুমারীর অসম্মান করবে না, পর্যন্ত তাদের হানি হবে না, শ্রীবৃদ্ধিই হবে।

"হে আনন্দ, তুমি শোননি বৃজিরা তাদের রাজধানীর ও বহির্রাজ্যের দেবস্থানগুলোকে মানে সম্মান করে পূজা করে এবং এগুলোর পূর্বপ্রবর্তিত দান যজ্ঞাদি হ্রাস করে না?"

"হাঁ ভদন্ত, শুনেছি।"

"যতদিন পর্যন্ত তারা তাদের রাজধানীর ও বহির্রাজ্যের দেবস্থানগুকে মানবে সম্মান করবে পূজা করবে এবং এগুলোর পূর্বপ্রবর্তিত দানযজ্ঞাদি হ্রাস করবে না, ততদিন পর্যন্ত তাদের হানি হবে না শ্রীবৃদ্ধিই হবে।"

"হে আনন্দ, তুমি কি শোননি যাতে অনাগত পবিত্রাত্মা সিদ্ধ মহাপুরুষগণ তাদের রাজ্যে আসেন এবং আগত পবিত্রাত্মা সিদ্ধ মহাপুরুষগণ নিরাপদে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন, তজ্জন্য বৃজিরা সকল ব্যবস্থা করেছেন?"

"হাঁ ভদন্ত, শুনেছি।"

"যতদিন পর্যন্ত তারা পবিত্রাত্মা সিদ্ধ মহাপুরুষদের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হবে, তাঁদের সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের কোন হানি হবে না, শ্রীবৃদ্ধিই হবে।"

আয়ুষ্মান আনন্দের সঙ্গে কথাবার্তার পর বুদ্ধ মগধ-মহামন্ত্রী বর্ষকারকে বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আমি যখন একদা বৈশালীর সারন্দদ চৈত্যে থাকতাম, তখন ও আমি বৃজিদের এ সাত গুণের কথা আলোচনা করে ধর্মভাষণ দিয়েছিলাম। হে ব্রাহ্মণ, যতদিন পর্যন্ত বৃজিদের মধ্যে এ সাতটি গুণ বিদ্যমান থাকবে বৃজিদের কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই, শ্রীবৃদ্ধিই আশা করা যাবে। এ মন্তব্য শুনে মহামন্ত্রী বললেন—ভবৎ গৌতম, সাতটি কেন, এরকম গুণ একটিই বৃজিদের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট; মগধরাজ অজাতশত্রু এঁদের কখনো যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবেন না কূটনীতি ছাড়া পরস্পর-বিচ্ছেদ ছাড়া। একথা বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

মগধমহামন্ত্রী বর্ষকারের প্রস্থানের পর বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন—হে আনন্দ, যাও রাজগৃহে যত ভিক্ষু আছে, তাদের সবাইকে ধর্মশালায় সমবেত করো। 'হাঁ ভদন্ত' সায় দিয়ে আনন্দ রাজগৃহবাসী ভিক্ষুদের জানালেন ভগবানের নির্দেশ। ভিক্ষুরা যথানির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হলেন সেখানে। বুদ্ধ তাঁদের সম্বোধন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের নিকট সাতটি অক্ষতিকর নীতি প্রকাশ করছি, তোমরা শোন। তিনি বলতে লাগলেন।

হে ভিক্ষগণ, ভিক্ষুরা যতদিন পর্যন্ত সর্বদা সম্মিলিত হবে, ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের অবনতি হবে না, শ্রীবৃদ্ধিই হবে।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা একতাবদ্ধ হয়ে চলবে একতাবদ্ধ হয়ে সঙ্ঘকরণীয় করবে, ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের অবনতি হবে না, শ্রীবৃদ্ধিই হবে।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা বর্ষীয়ান চির-প্রব্রজিত সঙ্ঘপিতা সঙ্ঘানায়ক ভিক্ষুদের মানবে সম্মান করবে পূজার্হ মনে করবে এবং তাদের বচন শুনবে, ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের অবনতি হবে না, শ্রীবৃদ্ধিই হবে।

হে ভিক্ষুগণ, যতই ভিক্ষুরা অন্তরে উদ্ভূত তৃষ্ণার বশীভূত হবে না, ততই ভিক্ষুদের অবনতি হবে না, শ্রীবৃদ্ধিই হবে।

হে ভিক্ষুগণ, যতই ভিক্ষুরা অরণ্যবাসের জন্য আগ্রহান্বিত হবে ততই ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধি হবে।

হে ভিক্ষুগণ, যতই ভিক্ষুরা সুশীল সুসংযত সতীর্থদের সেবার জন্য যত্নপর হবে, ততই ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধিই হবে।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের মধ্যে এ সাতটি গুণ বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না, শ্রীবৃদ্ধিই আশা করা যাবে।

বুদ্ধ বললেন,—হে ভিক্ষুগণ, আরও সাতটি অক্ষতিকর নীতির কথা শোনো। তিনি বলতে সুরু করলেন।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা অধ্যাত্মসাধনার বহির্ভূত কর্ম নিয়ে ব্যস্ত হবে না, ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের অবনতি হবে না, শ্রীবৃদ্ধিই হবে।

হে ভিক্ষুগণ যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা ধর্মভাববিরহিত অধ্যাত্মরসরিক্ত আলাপ-আলোচনায় রত হবে না মশগুল হবে না, ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধিই হবে, অবনতি হবে না।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা নিদ্রাপরায়ণ হবে না ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধিই হবে, অবনতি হবে না।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা আড্ডারত আড্ডাবহুল হবে না,...

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা পাপেচ্ছ পাপেচ্ছার বশীভূত হবে না,...

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা অসৎসঙ্গরত হবে না পাপপ্রবণ হবে না,...

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা সামান্যমাত্র আধ্যাত্মিক উৎকর্ষলাভে গর্বোদ্ধত না হয়ে উত্তরোত্তর উন্নতির চেষ্টা পরিহার করবে না, ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের শ্রীবৃদ্ধিই হবে, অবনতি হবে না।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের মধ্যে এ সাতটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের কোন ক্ষতির আশংকা থাকবে না, শ্রীবৃদ্ধিই আশা করা যাবে।

ভিক্ষুগণ তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন বুদ্ধের উপদেশ। তাঁদের তন্ময়তা লক্ষ্য করে বুদ্ধ আরও নানাভাবে অক্ষতিকর সপ্তনীতি সম্বন্ধে বলে চললেন। তাঁর অপূর্ব ভাষণ অপূর্ব ব্যঞ্জনা তাঁদের অন্তর মথিত করে অধ্যাত্ম লোক সৃষ্টি করল। পরিশেষে ভিক্ষুগণ পরম পরিতৃপ্তি জানিয়ে তাঁর দীর্ঘ ভাষণ অভিনন্দিত করলেন।

কুড়ি

বুদ্ধের রাজগৃহত্যাগের সময় আসন্ন হয়ে এল। তিনি প্রতিদিনই শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞান সম্বন্ধে ভিক্ষুদের উপদেশ দিতে লাগলেন। তাঁর উপদেশের মধ্যে এ কথা সুস্পষ্ট—সম্যকভাবে শীল পালনে বা চারিত্রিক শুদ্ধিলাভে সমাধি বা চিত্তের একাগ্রতা পরিপূর্ণ হয়ে প্রজ্ঞান বা মহাজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় এবং প্রজ্ঞানসমৃদ্ধ চিত্ত হয় মুক্ত বন্ধনহীন। এভাবে তিনি শীল সমাধি ও প্রজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব প্রায়ই বলতে লাগলেন।

যে রাজগৃহে বুদ্ধ প্রথম সন্ন্যাস নিয়ে এসেছিলেন, যেখানে বুদ্ধত্ব লাভের পর তাঁর প্রথম সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে তাঁর অগ্রশিষ্যদ্বয়কে দীক্ষাদান করেছিলেন এবং যেখানে বিভিন্ন ভাষণ দিয়ে পাঁচ বর্ষা যাপন করেছিলেন, এভাবে তাঁর নানা স্মৃতিজড়িত সেই রাজগৃহ চিরতরে ত্যাগ করে তিনি এলেন বিরাট ভিক্ষুসঙ্ঘ নিয়ে সমীপবর্তী অম্বলট্ঠিকায়। সেখানকার রাজপ্রাসাদে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হল। সেখানেও তিনি শীল সমাধি ও প্রজ্ঞান সম্বন্ধে ভিক্ষুদের উপদেশ দিতে লাগলেন। কয়েকদিন অবস্থানের পর তিনি এলেন

নালন্দায় প্রাবারিক আম্রকাননে। তাঁর সেই উপদেশ অনর্গল চলতে লাগলো।

নালন্দা ত্যাগ করে পদব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ভিক্ষু সঙ্ঘসহ তিনি পৌঁছুলেন পাটলিগ্রামে। তাঁর আগমনবার্তা শুনে পাটলিগ্রামবাসীরা দলে দলে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে বললেন—ভদন্ত, আমাদের বিরাট অতিথিশালায় আপনি ভিক্ষুসঙ্ঘসহ পদার্পণ করে বাধিত করুন। তিনি নীরবে সম্মতি জানালেন।

গ্রামবাসীরা তখনি বিছানাপত্রাদির ব্যবস্থা করলেন। অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁদের উদ্যোগে অতিথিশালা সুসজ্জিত হয়ে উঠল। জল ইত্যাদির সুব্যবস্থা হল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘসহ প্রবেশ করলেন আলোকোজ্জ্বল অতিথিশালায়। তিনি মধ্যস্থ স্তম্ভ হেলান দিয়ে পূর্বদিকে মুখ করে বসলেন। ভিক্ষুরা পশ্চিমের দেয়াল পশ্চাতে রেখে তাঁর দিকে মুখ করে বসলেন। পাটলিগ্রামবাসীরা পর্বের দেয়াল পশ্চাতে রেখে তাঁর মুখোমুখি হয়ে আসন গ্রহণ করলেন। বুদ্ধ সুরু করলেন ধর্মালাপ। রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হয়ে চলল। তিনি দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত তাঁদের ধর্মালাপে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করে বিদায় দিলেন এবং শূন্য কক্ষে প্রবেশ করলেন।

সেই সময় মগধমহামন্ত্রীদ্বয় সুনীধ ও বর্ষকার পাটলিগ্রামে নগর প্রতিষ্ঠা করছিলেন বৈশালীর বৃজিদের প্রতিরোধ করবার জন্য। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের জমি ক্রয়ের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। বুদ্ধ প্রত্যূষে পায়চারি করতে করতে লক্ষ্য করলেন নগর প্রতিষ্ঠার আয়োজন। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন—হে আনন্দ, কে এখানে নগর প্রতিষ্ঠা করছে? আনন্দ উত্তরে বললেন—ভদন্ত, মগধমহামন্ত্রীদ্বয় সুনীধ ও বর্ষকার নগর প্রতিষ্ঠা করছেন বৃজিদের প্রতিরোধের জন্য। বুদ্ধভবিষ্যদ্বাণী করে বললেন—হে আনন্দ, এই পাটলিপুত্র আর্যাবর্তে বাণিজ্যকেন্দ্রে শ্রেষ্ঠ নগর হবে, তবে এর তিনটি বিপদের আশঙ্কা থাকবে—অগ্নি, বন্যা এবং অন্তর্বিরোধ।

অতঃপর মহামন্ত্রীদ্বয় বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে একান্তে বসলেন এবং ভিক্ষুসঙ্ঘসহ তাঁদের বাসস্থানে আহার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি নীরব সম্মতি জানালেন। মহামন্ত্রীদ্বয় বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করে পূজাভোগের আয়োজন করতে লাগলেন। যথাকালে সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল। বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে তাঁদের বাসস্থানে উপস্থিত হলেন। তাঁরা উভয়ে সহস্তে পরিবেশন করে পরিতৃপ্তি লাভ করলেন। আহারের পর তিনি

ধর্মালাপে তাঁদের পরিতুষ্ট করে গাত্রোত্থান করলেন। তাঁরা তাঁর অনুগামী হলেন, সিদ্ধান্ত করলেন—তিনি যে দ্বার দিয়ে বের হবেন তার নামকরণ করবেন "গৌতম দ্বার" এবং যে ঘাটে পার হবেন' তার নাম রাখবেন "গৌতম ঘাট"।

বুদ্ধ গঙ্গাতীরে উপনীত হয়ে দেখলেন—প্লাবনে নদীর বিশাল বিস্তার পরিপূর্ণ হয়ে কানায় কানায় জল উঠেছে। পারাপারের জন্য লোকের ব্যস্ততার অন্ত নেই। নদী পার হয়েই তিনি আবেগ-গাথায় বললেন—

যাঁরা দুস্তর তৃষ্ণাসমুদ্র উত্তীর্ণ হন, সে মহাজ্ঞানীরা আর্যমার্গের সেতু দিয়ে অসিক্ত দেহে উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন, আর এ নদী পার হবার জন্য লোকের এত ব্যস্ততা!

একুশ

বুদ্ধ কোটিগ্রামে এসে অবস্থান করলেন। সেখানে তিনি ভিক্ষুদের চারি আর্য সত্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন হে ভিক্ষুগণ, চারি আর্যসত্য বুঝতে না পারায় উপলব্ধি করতে না পারায় সুদীর্ঘ কাল ধরে সংসারাবর্তে নিমজ্জিত হয়ে ঘুরপাক খেতে হয়েছে তোমাদের এবং আমার। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, বিচ্ছেদ, বিয়োগ, অপ্রিয়সংযোগ, ক্ষয়, ক্ষতি, নৈরাশ্য, শোকসন্তাপ ইত্যাদি অনন্ত দুঃখের ঢেউ বইছে জগতে। এ দুঃখকে যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে না পারায় উপলব্ধি করতে না পারায় সুদীর্ঘকাল ধরে সংসার আঁকড়ে ঘুরপাক খেতে হয়েছে তোমাদের এবং আমার। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা অনুরাগ বা আসক্তিই দুঃখের উৎস বা মূল। মূল থাকলে উৎস রোধ না হলে দুঃখ আসবেই। এ দুঃখের উৎসকে জানতে না পারায় বুঝতে না পারায় দীর্ঘকাল সংসারে ঘুরপাক খেতে হয়েছে তোমাদের এবং আমার। দুঃখের উৎস তৃষ্ণা বা আসক্তির উৎপাদনে ক্ষয়ে সকল দুঃখজ্বালার অবসান হয়। এই সত্য উপলব্ধি করতে না পারায় দীর্ঘকাল সংসারে ঘুরপাক খেতে হয়েছে তোমাদের ও আমার। যার অনুসরণে তৃষ্ণার মূলোচ্ছেদ হয়, অন্তরে আনন্দ ও শান্তির উৎস খুলে যায়, সে দুঃখরোধের পন্থা অষ্টাঙ্গ আর্যপথ উপলব্ধি করতে না পারায় সংসারে দীর্ঘকাল ঘুরপাক খেতে হয়েছে তোমাদের ও আমার। হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ, দুঃখের উদয়, দুঃখরোধ ও দুঃখরোধের পন্থা—এই চারি আর্যসত্য এখন উপলব্ধ জ্ঞাত, ভবতৃষ্ণা নির্মূলিত উৎখাত, এখন আর পুনর্জন্ম নেই। ভাবাবেগে তিনি এ কথাই গাথায় উচ্চারণ করলেন।

বুদ্ধ আরও কিছুদিন কোটিগ্রামে রইলেন। তিনি নানাভাবে ভিক্ষুদের

উপদেশ দিতে লাগলেন শীল সমাধি ও প্রজ্ঞান সম্বন্ধে। অতঃপর তিনি নাতিকা গ্রামে উপস্থিত হলেন। তাঁর উপস্থিতিতে সমস্ত গ্রাম মেতে উঠল। তখন ভিক্ষুণী নন্দা ও ভক্ত গ্রাম মেতে উঠল। তখন ভিক্ষু সাল্হ ভিক্ষুণী নন্দা ও ভক্ত সুদত্ত প্রভৃতি সে গ্রামে পরলোক গমন করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন শুদ্ধাচারী ধর্মাত্মা। একজ তাঁরা গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। বুদ্ধের মুখে তাঁদের পারলৌকিক গতি শোনবার জন্য গ্রামবাসীদের আগ্রহ দেখে আয়ুষ্মান আনন্দ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন প্রথমেই ভিক্ষু সাল্হের পারত্রিক গতির কথা। বুদ্ধ উত্তরে বললেন—হে আনন্দ, ভিক্ষুক সাল্হ ছিল শুদ্ধ মুক্ত অর্হৎ, দেহ ভঙ্গে তার পুনর্জন্ম নেই, সে পরিনির্বাণ লাভ করেছে। এভাবে অন্যদের ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্তর বর্ণনা করে তিনি তাঁদের পারত্রিক গতি প্রকাশ করলেন। এ পারত্রিক গতির কথা শুনে আরও অনেক পরলোকগত ভক্তের গতি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠল। প্রত্যেকটির উত্তর দিতে তিনি বললেন—হে আনন্দ, মানুষের মৃত্যু স্বাভাবিক, মানুষ মরলে তোমরা যে তথাগতের কাছে এসে মৃতের পারলৌকিক গতি সম্বন্ধে জানতে চাও, তা তথাগতের পক্ষে বিরক্তিকর, তাই ধর্মদর্পণ নামক ধর্মপর্যায় প্রকাশ করছি যাতে ধার্মিক, পবিত্রাত্মা ব্যক্তি ইচ্ছা করলে নিজের সম্বন্ধে নিজেই বলতে পারে—সে পারলৌকিক দুঃখ দুর্গতির অতীত অপতনশীল আলোকপরায়ণ স্রোতাপন্ন বা ধর্মস্রোতে স্নাত। মানুষ যেমন দর্পণে মুখাবয়ব প্রতিবিম্বিত করে দেখে, তেমনি ধার্মিক পবিত্রাত্মা ব্যক্তি এ ধর্মপর্যায় অনুসরণে নিজেই নিজেকে ব্যক্ত করতে পারবে। যখন তার অন্তরে এমন শ্রদ্ধার উদয় হয়, যা অবিকম্পিত অবিচলিত অচল অটল এবং তার শীল চারিত্রিক আচার হয় অক্লিষ্ট অটুট শুদ্ধ নির্মল বিজ্ঞপ্রশংসিত ধ্যানপ্রবণ, তখন সে যথার্থভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারবে ধর্মস্রোতে স্নাত বলে। এ অবস্থায় তার পতন নেই, উত্তর জীবনে দুঃখ দুর্গতির অবকাশ নেই এবং উত্তরোত্তর উপলব্ধির আলোকে তার নির্বাণগতি সুনিশ্চিত।

বুদ্ধ নাতিকায় ভিক্ষুদের নিরন্তর শীল সমাধি ও প্রজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগলেন। এভাবে আলাপ আলোচনায় কয়েকদিন অতিবাহিত হবার পর তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন বৈশালী গমনের। আনন্দ সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘসহ বুদ্ধ যাত্রা করলেন বৈশালীর দিকে। যথাকালে বৈশালীতে পৌঁছে তিনি আম্রপালীর আম্রকুঞ্জে বাস করতে লাগলেন। সেখানে তিনি ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর

স্মৃতিমান সদাজাগ্রত সজ্ঞান সচেতন হয়ে থাকা উচিত, তোমাদের প্রতি এটিই আমার অনুশাসন। তিনি বলতে লাগলেন। কি ভাবে স্মৃতিমান সদাজাগ্রত হয়? ভিক্ষু শরীরের যথাযথভাব পর্যবেক্ষণ করে। সে এ শরীরকে আপাদমস্তক নানাপ্রকার অশুচি কদর্য পদার্থসমূহে পরিপূর্ণ ভাবে— এ শরীরে আছে কেশ, লোম, নখ, দাঁত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড, যকৃত, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, উদরীয়, পুরীষ মগজ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, চর্বি, থুথু, শিথণী, লালা, মূত্র। তেমনি সে অন্তরের অনুভূতিগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে। সুখদুঃখাদির যে অন্তরের অনুভূতি যখন থাকে, প্রত্যেক অনুভূতিকে সে লক্ষ্য করে। মন যখন যে অবস্থায় থাকে, তখন তাকে সে অবস্থায় অবহিত হয়ে পর্যবেক্ষণ করে। মনের ভাবসমূহের প্রবর্তন সে অবহিত চিত্তে লক্ষ্য করে। সে অনলস অপ্রমত্ত হয়ে মনের হিংসালোভাদি পাপবৃত্তিসমূহকে বিদূরিত করে। এভাবে সে স্মৃতিমান সদাজাগ্রত হয়।

কিরূপে সে সজ্ঞান সচেতন হয়? সে অগ্রগতিতে পশ্চাদ্ গমনে দর্শনে শ্রবণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংকোচনে প্রসারণে পাত্রচীবর ধারণে আহারে পানে স্থিতিতে গমনে উপবেশনে শয়নে বাক্যালাপে মৌনতায় এক কথায় সকল অবস্থায় আত্মবিস্মৃত না হয়ে সজ্ঞান সচেতন থাকে। হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর স্মৃতিমান সদাজাগ্রত সজ্ঞান সচেতন থাকা উচিত—এটিই তোমাদের প্রতি আমার অনুশাসন।

আম্রপালীর আম্রকুঞ্জে কিছুদিন থেকে তিনি ভিক্ষুদের নিয়ে বৈশালীর সমীপবর্তী বিল্বগ্রামে গেলেন। তখন আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি আসন্ন। এ তিথি থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিনমাস ভিক্ষুদের বর্ষাব্রত যাপন করতে হয় এক স্থানে। বুদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমরা বৈশালী রাজ্যে নিজের নিজের পরিচিত জায়গায় বর্ষাব্রত অবলম্বন করো, আমি এখানেই বর্ষা যাপন করব। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি প্রথম বর্ষা যাপন করেছিলেন বারাণসীর ঋষিপতনে। তার পর রাজগৃহ, বৈশালীর মহাবন, পারিলেয় বন, শ্রাবস্তী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বর্ষাযাপন করে তিনি তাঁর ৪৫শ বর্ষা বা শেষ বর্ষা যাপন করেন এই বিল্বগ্রামে। এজন্য বিল্বগ্রামের এ বর্ষাবাস বিশেষত্বপূর্ণ।

বর্ষাবাস আরম্ভের পরেই বুদ্ধ কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হলেন। তিনি প্রাণান্তকর বেদনায় আক্রান্ত হয়েও স্মৃতিমান অবহিত থেকে তা সহ্য করতে

লাগলেন অবিচলিতভাবে। তিনি ভাবতে লাগলেন—সেবককে না ডেকে ভিক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞেস না করে তাঁর দেহত্যাগ সুসঙ্গত হবে না। তিনি সমাধিজাত পরাক্রমে সে ব্যাধি বিদূরিত করে আয়ুর সীমা বাড়িয়ে নিলেন।

রোগমুক্তির পর তিনি একদিন অপরাহ্নে বিহারের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ তাঁকে বললেন—ভদন্ত, এতদিনে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম, ভগবানের আরোগ্য দেখলাম, আপনার অসুখের সময় আমি দিকসমূহ অন্ধকার দেখেছি, ধর্মও আমার প্রতিভাত হত না, তবে আমার ভরসা ছিল ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘকে কিছু না বলে পরিনির্বাণ লাভ করবেন না।' এ উক্তি শুনে বুদ্ধ বললেন—হে আনন্দ, ভিক্ষুসঙ্ঘ আমার কাছে কি প্রত্যাশা করে, আমি তো ধর্ম পরিপূর্ণভাবে প্রচার করেছি, আচার্যেরা যেমন শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব মুষ্টিবদ্ধ রাখে, তেমনি আচার্যমুষ্টিতে কিছুই গোপন রাখিনি। তিনি বলতে লাগলেন। হে আনন্দ, যে ভাবে 'ভিক্ষুসঙ্ঘ আমার আশ্রিত, আমি তাদের পরিচালনা করব' সে বলতে পারে ভিক্ষুসঙ্ঘকে তার বক্তব্য। হে আনন্দ, আমি ভাবি না 'ভিক্ষুসঙ্ঘ আমার আশ্রিত অথবা তাদের আমিই পরিচালনা করি।' অতএব আমার কি বক্তব্য থাকতে পারে তাঁদের উদ্দেশে ?

হে আনন্দ, এখন আমি জীর্ণ বৃদ্ধ জীবনের শেষ সীমায় উপনীত, আশি বৎসর আমার পূর্ণ। হে আনন্দ, জর্জর শকট যেমন জুড়ে তেড়ে চালানো হয়। তেমনি চলছে এ ভাঙা শরীর। হে আনন্দ, যখন তথাগত (নিজেকে লক্ষ্য করে) অনিমিত্ত শূন্যময় সমাধিমগ্ন থাকেন, তখনই তাঁর শরীরের সুস্থতা বোধ হয়। হে আনন্দ, তোমরা নিজের প্রতিষ্ঠা নিজে গড়ো, নিজের দীপ নিজে জ্বালো, নিজের আশ্রয় নিজে হয়, কারো মুখাপেক্ষী হয়ো না, ধর্মকে ভিত্তি করো, ধর্মের আশ্রয় নাও। হে আনন্দ, যে ভিক্ষুরা এখন অথবা আমার অবর্তমানে নিজের প্রতিষ্ঠা নিজে গড়বে, নিজের দীপ নিজে জ্বালবে নিজের আশ্রয় নিজে হবে, অন্য কারো মুখাপেক্ষী হবে না, ধর্মকে ভিত্তি করবে, ধর্মের আশ্রয় নেবে, সেই ভিক্ষুরা শ্রেষ্ঠতা অর্জন করবে।

বাইশ

সকালবেলা। বর্ষণক্লান্ত আকাশ উদীয়মান সূর্যের আভায় অপরূপ সৌন্দর্যে মেতে উঠেছে। জলহারা সাদা মেঘের স্নিগ্ধতা যেন চারি দিকে ঝরে পড়ছে। বুদ্ধ বৈশালীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে বেরুলেন। ভিক্ষান্ন সংগ্রহের পর তিনি যথাকালে আহার সমাপ্ত করলেন। তখন সূর্য মাথার ওপরে। স্থির মধ্যাহ্নে

তিনি আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন—হে আনন্দ, বসবার আসন নাও, আজ চাপাল চৈত্যে দিবা যাপন করব। 'হাঁ ভদন্ত' বলে আনন্দ সায় দিলেন। বুদ্ধ অগ্রসর হলেন চাপাল চৈত্য লক্ষ্য করে। আনন্দ আসন হাতে নিয়ে তাঁর পদানুসরণ করলেন।

চাপাল চৈত্যে পৌঁছে আনন্দ আসন পাতলেন। বুদ্ধ পা ধুয়ে তার ওপর বসলেন, বললেন—হে আনন্দ, কী সুন্দর বৈশালী, কী সুন্দর উদয়ন চৈত্য, কী সুন্দর গৌতম চৈত্য, কী সুন্দর সপ্তাম্র চৈত্য, কী সুন্দর চাপাল চৈত্য; হে আনন্দ, যে কোন ব্যক্তির চারি ঋদ্ধিপাদ বা দিব্য বিভূতি আয়ত্ত ভাবিত সুপরিচিত, ইচ্ছা করলে তিনি আয়ুর সীমা বাড়িয়ে নিতে পারেন; হে আনন্দ, তথাগতের (নিজেকে লক্ষ্য করে) এই চারি ঋদ্ধিপাদ আয়ত্ত ভাবিত সুপরিচিত, তিনি অনায়াসে আয়ু সীমা বাড়িয়ে নিতে সমর্থ। এ ভাবে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া সত্ত্বেও আনন্দ বুঝতে পারলেন না বুদ্ধের উক্তির মর্ম। তিনি অনুরোধ করলেন না বুদ্ধকে জনহিতায় জন সুখায় অর্থাৎ বহুলোকের কল্যাণে আয়ু বাড়িয়ে নেবার জন্য। তীক্ষ্ণধী আনন্দের বুদ্ধিবৃত্তি যেন দৈবদুর্বিপাকে সে মুহূর্তে জড়তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

বুদ্ধ আবার বললেন—হে আনন্দ, কী সুন্দর বৈশালী, কী সুন্দর উদয়ন চৈত্য...

হে আনন্দ, তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ আয়ত্ত ভাবিত সুপরিচিত, তিনি অনায়াসে আয়ুসীমা বাড়িয়ে নিতে সমর্থ। দ্বিতীয়বারও আনন্দ নীরব রইলেন, অনুরোধ করলেন না বুদ্ধকে বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় আয়ু বাড়িয়ে নেবার জন্য। দৈবদুর্বিপাকে তিনি যেন হতবুদ্ধি হলেন ক্ষণকালের জন্য। বুদ্ধের তৃতীয়বারের উক্তিও তেমনি বিফল হল। আনন্দের কোন সাড়া না পেয়ে বুদ্ধ বললেন—হে আনন্দ, এখন তুমি যেতে পারো। আনন্দ তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে অন্য একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলেন।

আয়ুষ্মান আনন্দের প্রস্থানের পর চারিদিক স্তব্ধতাময় হল। গভীর প্রশান্তি বিরাজ করতে লাগলো। সেই স্তব্ধতার বুক চিরে যেন ধ্বনিত হল—হে ভগবন, পরিনির্বাণ লাভ করুন, হে সুগত, পরিনির্বৃ'ত হউন, আপনার পরিনির্বাণের সময় আসন্ন। তখনি বুদ্ধ চাপাল চৈত্য প্রতিধ্বনিত করে বললেন—অচিরেই তথাগতের পরিনির্বাণ হবে, তিনমাস পরেই তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করবেন। আবার বুদ্ধকণ্ঠে বাণী উত্থিত হল—

তুলমতুলঞ্চ সম্ভবং
ভবসংখারমবস্সজি মুনি,
অজ্ঝত্তরতো সমাহিতো
অভিন্দি কবচমিবত্তসম্ভবং

অর্থাৎ অধ্যাত্মরত সমাহিত মুনি (নিজেকে লক্ষ্য করে) ভব ও ভবপার নির্বাণ তুলনা করে দেখে ভবসংস্কার বা ভবপাথের আয়ু বিসর্জন দিলেন এবং দেহধারণ বর্মের মত ভেঙে ফেললেন।

ঠিক সে মুহূর্তে আনন্দের মনে হল যেন পৃথিবী ওলট পালট করে একটি প্রলয় কাণ্ড বেধে গেছে। একটি অস্বাভাবিক ভাব তাঁর অন্তর কাঁপিয়ে তুলল। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি নিজের আসন গুটিয়ে চলে গেলেন বুদ্ধের কাছে এবং ব্যক্ত করলেন আপনার ভাব। বুদ্ধ বললেন—হে আনন্দ, এখনি এ চাপাল চৈত্যে আমি আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিয়েছি; অচিরেই তথাগতের পরিনির্বাণ হবে, তিনমাস পরেই তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করবেন। এ কথা শুনে আনন্দ নতজানু হয়ে তাঁকে বললেন—ভগবন, আয়ুসীমা বাড়িয়ে নিয়ে থাকুন জনহিতায়, সুগত আয়ু বাড়িয়ে নিন। উত্তরে বুদ্ধ বললেন—হে আনন্দ, অনর্থক তথাগতকে অনুরোধ কোরো না, এখন তথাগতকে অনুরোধ করার সময় নয়। আনন্দ আবার অনুরোধ করলেন। তৃতীয়বার যখন সে অনুরোধ হল, তখন তিনি আনন্দকে জিজ্ঞেস করলেন—হে আনন্দ তুমি কি তথাগতের বুদ্ধত্বে বিশ্বাস কর।

"হাঁ, ভদন্ত।"

'তা' হলে, তৃতীয়বার পর্যন্ত পীড়াপীড়ি করছ কেন?'

"ভদন্ত, আপনার মুখেই শুনেছি—যাঁর চারি ঋদ্ধিপাদ আয়ত্ত ভাবিত সুপরিচিত, তিনি অনায়াসে আয়ুসীমা বাড়িয়ে নিতে পারেন; আপনারতো এগুলোতে পূর্ণ অধিকার, তাই আপনাকে অনুরোধ করছি আয়ু বাড়িয়ে নেবার জন্য জগতের কল্যাণে।"

"হে আনন্দ, এতে যদি তোমার আস্থা থাকে বিশ্বাস থাকে, তবে তিনবার ইঙ্গিত দেওয়া সত্ত্বেও তুমি আমাকে অনুরোধ করনি কেন আয়ু বাড়িয়ে নিতে? এর আগেও বহুবার বহুস্থানে ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। তুমি তো কখনো এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করনি। আজ আমি যে আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিলাম পরিনির্বানের দিন ঘোষণা করলাম, তুমি কি করে আশা কর তথাগত তা প্রত্যাহার করবেন? হে আনন্দ, তথাগত অদ্বয়বাদী, তুমি যে ইঙ্গিত দেওয়া

সত্ত্বেও যথাসময়ে তথাগতকে অনুরোধ করনি আয়ু বাড়িয়ে নিতে, তা তোমারই ভুল, তোমারই অপরাধ। তুমি যদি অনুরোধ করতে, তাহলে তথাগত প্রথমবার অথবা দ্বিতীয়বার তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতেন, কিন্তু তৃতীয়বারের অনুরোধ রক্ষা করতে বাধ্য হতেন। হে আনন্দ, আমি কি প্রথমেই বলিনি প্রকাশ করিনি যে সকল প্রিয়জন থেকে আপনার জন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে বিদায় নিতে হবে? যা জাত উৎপন্ন বিনশ্বর, তার বিনাশ ধ্বংস কিছুতেই রোধ করা যায় না। আমি আয়ু বিসর্জন দিয়েছি, একান্তভাবেই বলেছি—অচিরেই তথাগতের পরিনির্বাণ হবে, তিনমাস পরেই তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করবেন। বাঁচার জন্ম এ বাক্যের অন্যথা হতে পারে না।" বুদ্ধ নীরব হলেন। আনন্দের মুখে কোন বাক্‌স্ফূর্তি হল না। চারিদিক আবার নিস্তব্ধতামগ্ন হল। আনন্দ শূন্য দৃষ্টিতে ছায়াছন্ন তরুলতার পানে তাকিয়ে রইলেন।

মধ্যাহ্ন তখন অতীত। বুদ্ধ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সমীপবর্তী মহাবনে যাবার জন্ম। সেদিক লক্ষ্য করে তিনি অগ্রসর হলেন। আনন্দ অনুসরণ করলেন। সেখানে পৌঁছে বুদ্ধ বললেন—আনন্দ, যাও বৈশালীতে যত ভিক্ষু আছে, তাদের সমবেত হতে বলো এই অতিথিশালায়। আনন্দ বৈশালীর বিহারে বিহারে গিয়ে ভিক্ষুদের শোনালেন ভগবানের নির্দেশ। সন্ধ্যায় বিরাট অতিথিশালা ভিক্ষুদের উপস্থিতিতে জনপূর্ণ হল। আনন্দ প্রত্যাবর্তন করে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে কৃতাঞ্জলি পুটে বললেন—ভদন্ত, ভিক্ষুরা সমবেত হয়েছেন অতিথিশালায়, যদি সময় হয়ে থাকে, সেখানে পদার্পণ করুন। বুদ্ধ ধীরে ধীরে অতিথিশালায় উপস্থিত হয়ে আসন গ্রহণ করলেন, বললেন—হে ভিক্ষুগণ, আমি যে ধর্ম উপলব্ধি করে তোমাদের নিকট দেশনা করেছি প্রচার করেছি, তা সুষ্ঠুভাবে শিখে নিয়ে আচরণ করবে অভ্যাস করবে জীবনে প্রতিফলিত করবে যাতে এ আদর্শ অমর চিরস্থায়ী হয় জনহিতায় জনসুখায়। তিনি ধর্ম বিশ্লেষণ করে দেখাতে লাগলেন। ভিক্ষুরা তন্ময় হয়ে গেলেন। অবশেষে তিনি তাঁদের বললেন—হে ভিক্ষুগণ, সৃষ্টি অনিত্য, অপ্রমত্ত হয়ে কর্তব্য সম্পাদন করো, অচিরেই তথাগতের পরিনির্বান হবে, তিনমাস পরেই তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করবেন। আবার বুদ্ধকণ্ঠে বাণী উদগত :—

পরিপক্কো বযো মষ্‌হং পরিত্তং মম জীবিতং
পহায বো গমিস্‌সামি কতংমে সরণমত্তনো।
অপ্‌পমত্তা সতিমন্তো সুসীলা হোথ ভিক্‌খবো
সুসমাহিত সঙ্কপ্‌পা সচিত্ত মনুরক্‌খথ।

যো ইমস্মিং ধম্মবিনয়ে অপ্পমত্তো বিহেস্সতি
পহায জাতিসংসারং দুক্খস্সন্তং করিস্সতি।

অর্থাৎ আমার বয়স পরিপক্ক, আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, তোমাদের ছেড়ে আমি চলে যাব, তবে পরম আশ্রয় আমি গড়ে তুলেছি। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অপ্রমত্ত স্মৃতিমান সুশীল হও, সংসংকল্পরত সুসমাহিত থাকো এবং নিজের চিত্তকে অনুরক্ষণ করো। যে কেউ এ ধর্মানুশাসনে অপ্রমত্ত হয়ে বাস করবে, সে জন্ম-জন্মান্তর পরিভ্রমণ থেকে অব্যাহতি পেয়ে দুঃখের অবসান ঘটাবে।

তেইশ

সেদিনকার পূর্বাহ্নে বুদ্ধ ভিক্ষায় বেরুলেন বৈশালীতে। ভিক্ষাসংগ্রহের পর আহার সমাপ্ত করে নাগদৃষ্টিতে তিনি বৈশালীর দিকে তাকিয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন—হে আনন্দ, এ আমার শেষ বৈশালী-দর্শন, চলো ভাণ্ডগ্রামের দিকে অগ্রসর হই। 'হাঁ ভদন্ত' বলে আনন্দ সায় দিলেন, তখনি তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘসহ যাত্রা করলেন। ভাণ্ডগ্রামে পৌঁছে তিনি চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে ভিক্ষুদের উপদেশ দিতে লাগলেন। সেখানে কয়েকদিন থাকবার পর বিভিন্ন গ্রাম সফর করে তিনি পৌঁছলেন ভোগ নগরে। সেখানকার আনন্দচৈত্যে তিনি ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন—'হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের কাছে কোন ভিক্ষু এসে বলতে পারে এ বিষয়টি আমি ভগবানের মুখেই শুনেছি, তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করেছি, এ তাঁরই বাণী' সে ভিক্ষুর সেই উক্তির প্রতিবাদ না করে সমর্থন না করে বরং ধর্মের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে মিলিয়ে দেখবে, তাতে যদি সে উক্তি ধর্মের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে মিলে না খাপ খায় না, তাহলে জানবে তা বুদ্ধবচন নয়, সে ভিক্ষুরই ভুল উক্তি; তা তখনই বর্জন করবে, যদি মিলাতে গিয়ে দেখ যে ভিক্ষুর উক্তি ধর্মের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে খাপ খাচ্ছে, তাহলে তা বুদ্ধবচন বলে গ্রহণ করবে। বুদ্ধ বলতে লাগলেন। হে ভিক্ষুগণ, যদি কোন ভিক্ষু এসে তোমাদের বলে 'অমুক বিহারে নায়কসহ ভিক্ষুসঙ্ঘের কাছে এ বিষয়টি জেনেছি, এটি ধর্ম ও তৎপ্রবর্তিত বিনয়' সে ভিক্ষুর সে উক্তির প্রতিবাদ না করে সমর্থন না করে বরং ধর্মের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে, তাতে যদি সে উক্তি ধর্মের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে মিলে না খাপ খায় না, তাহলে তা তার ভুল উক্তি বলে জানবে, বর্জন করবে; যদি ধর্মের সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে মিলে যায় খাপ খায়, তাহলে তা গ্রহণ করবে।

বুদ্ধ ভোগনগরে আরও কিছুদিন অবস্থান করে আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন—চলো, আনন্দ, এবার আমরা পাবায় যাই। 'হাঁ, ভদন্ত' বলে আনন্দ সায় দিলেন। অতঃপর ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ তিনি যাত্রা করলেন পাবার দিকে। সেখানে পৌঁছে তিনি চুন্দের আম্রবনে উঠলেন। এ সংবাদ পেয়ে ভক্ত চুন্দের আনন্দের সীমা রইল না। তিনি সরাসরি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ তাঁকে ধর্মালাপে পরিতৃপ্ত করলেন তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর গৃহে আহার গ্রহণের জন্য। বুদ্ধ মৌন সম্মতি জানালেন।

চুন্দ বাড়ী প্রত্যাবর্তন করেই বিরাট দান যজ্ঞের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। পরদিন সকালেই উত্তম খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল। এর সঙ্গে প্রচুর * সূকর মদ্দবের ও আয়োজন হল। যথাসময়ে বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ উপস্থিত হলেন চুন্দের বাসভবনে। চুন্দ সহস্তে পরিবেশন করতে লাগলেন। বুদ্ধ তাঁকে বললেন—হে চুন্দ, সূকর মদ্দব শুধু আমার পাতে দাও, ভিক্ষুদের দিও না, তাদের অন্য আহার্য পরিবেশন কর। চুন্দ তাই করলেন। বুদ্ধ আবার তাঁকে বললেন—হে চুন্দ সূকর মদ্দব যা অবশিষ্ট থাকবে, তা গর্ত খুঁড়ে পুতে দিও, এমন কেউ নেই যে তা হজম করবে। আহারান্তে তিনি চুন্দকে ধর্মোপদেশে উৎসাহিত করে প্রস্থান করলেন।

আহারের অব্যবহিত পরেই বুদ্ধের অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। পেটে তীব্র যন্ত্রনা অনুভূত হল। তা অত্যন্ত বেড়ে উঠল। সে মরণান্তিক বেদনা তিনি অম্লান বদনে সহ্য করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে দাস্ত সুরু হল, রক্তাতিসার দেখা দিল। তিনি আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন—এসো আনন্দ আমরা কুশীনগরের দিকে অগ্রসর হই। আনন্দ সায় দিলেন। যাত্রা সুরু হল। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বুদ্ধ পথ থেকে নেমে একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন—হে আনন্দ, চার ভাজ করে চীবর পেতে দাও,

* "সূকর মদ্দব" কারো মতে সূকরভক্ষ্য ওল। কেউ বলেন শূকরের নরম মাংস, কেউ বলেন পঞ্চগোরসমিশ্রিত পরমান্ন, আবার কেউ বলেন রসায়ন বিশেষ। অর্থকথাসমূহের রচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত এ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। তবে শেষোক্ত মতটি অধিকতর প্রামাণ্য। শরীরের উত্তেজনা বৃদ্ধি ও বলাধানের জন্য বার্ধক্যে এজাতীয় পথ্য বিধেয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে 'গবপান' 'মকরধ্বজ' প্রভৃতি ঔষধসমূহের নামের সঙ্গে যেমন অর্থের সঙ্গতি নেই, তেমনি 'শূকর মদ্দব' সম্বন্ধে এ ন্যায় প্রযোজ্য। পালি সাহিত্যে মাংসকে 'মংস' বলা হয়, মদ্দব নয়।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, একটু বসব। আনন্দ তাঁর নির্দেশ মত চীবর পেতে দিলেন। তিনি অবসন্ন দেহে বসেই বললেন—হে আনন্দ, একটু পানীয় জল এনে দাও, আমি পিপাসার্ত, জল পান করব। আনন্দ বিনীতভাবে জানালেন ভদন্ত, এখনি বহু গরুর গাড়ী এ জলের ওপর দিয়ে গিয়েছে, ক্ষুদ্র নদীর অগভীর জল গাড়ীর চাকায় আবিল পঙ্কিল হয়ে বইছে, অদূরেই স্বচ্ছসলিলা সুবিস্তীর্ণা রমণীয়া ককুধা নদী, সেখানে পৌছেই আপনি স্বচ্ছ শীতল স্নিগ্ধ জল পান করবেন। বুদ্ধ তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে আবার বললেন—আনন্দ আমি পিপাসার্ত, আমার জন্য জল নিয়ে এসো। অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে আনন্দ জল আনতে চললেন সে ক্ষুদ্র নদীর দিকে। সেখানে গিয়ে তিনি যা দেখলেন, তাতে অবাক হয়ে গেলেন। একটু আগে যার ওপর দিয়ে শত শত শকটের সারি যাওয়াতে জল আবিল পাঙ্কিল হয়ে বয়েছিল, সে নদীর জল এখন কাচের মত স্বচ্ছ প্রসন্ন। তিনি হৃষ্টমনে পাত্রভরে জল নিয়ে এসে বুদ্ধের হাতে দিলেন, বললেন—ভদন্ত, কী আশ্চর্য! অল্পক্ষণ আগে যে জল ছিল আবিল পঙ্কিল, আপনার জন্য সেখানে যাওয়া মাত্র সে জল হয়ে উঠল কাচের মত স্বচ্ছ প্রসন্ন, ভগবন তা পান করুন, সুগত তা পান করুন। বুদ্ধ পান করলেন জল।

তখন আঢ়ার কালাম ঋষির উপাসক মল্লপুত্র পুক্কুস সে পথ ধরে যাচ্ছিলেন। তিনি বৃক্ষতলে বিশ্রামরত বুদ্ধকে দেখতে পেয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে একান্তে বসলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বুদ্ধকে বললেন—ভদন্ত, কী আশ্চর্য! সন্ন্যাসীরা শান্তভাবে অবস্থান করেন। তিনি বলতে লাগলেন। ভদন্ত, বহুকাল পূর্বে একদিন ঋষি আঢ়ার কালাম দীর্ঘপথ ধরে চলতে চলতে পথের ধারে একটি গাছের ছায়ায় বসলেন। তখন বিরাট শকটের সারি তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল। তিনি এমন ভাবমগ্ন ছিলেন যে তিনি কিছুই টের পাননি। এক ব্যক্তি এসে যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করল 'ভদন্ত' একদিক দিয়ে কি শকটের সারি চলে গিয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন শকটের সারি তো দেখতে পাইনি। লোকটি জিজ্ঞেস করল 'আপনি কি জেগেছিলেন'? উত্তর হল 'হাঁ, তাই জেগেই ছিলাম।' সে অবাক হয়ে বলল আশ্চর্য! 'এতগুলো গাড়ী আপনার পাশ দিয়ে গেল, আপনি দেখেননি, শব্দও শোনেননি, অথচ গাড়ীর চলার ধূলোয় আপনার উত্তরীয় ছেয়ে গিয়েছে।' মল্লপুত্র পুক্কুস ঘটনাটি বিবৃত করে আলাঢ় কালামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন। এপ্রসঙ্গে বুদ্ধ নিজের একটি ঘটনা বলা সঙ্গত মনে করলেন। তিনি বলতে

লাগলেন। হে পুক্কুস, একদিন আমি আতুমায় একটি খড়ের ঘরে ছিলাম। তখন বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল, মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জনে বজ্রনির্ঘোষে বিদ্যুৎছটায় যেন প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য চলছিল। আমি কিন্তু এর কিছুই টের পাইনি। যখন ঘরের বারান্দায় এসে পায়চারি করতে লাগলাম, তখন একটি লোক এসে আমায় প্রণাম করে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টি পড়ল অদূরে সমবেত জনতার ওপর। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ওহে ওখানে এত লোক জড় হয়েছে কেন? সে উত্তর দিল—এখনি এখানে প্রবল বৃষ্টির সময় দুইজন চাষী ও চারটি বলদ বজ্রঘাতে পঞ্চত্ব লাভ করেছে, এজন্য লোকের ভিড় জমেছে। সে জিজ্ঞেস করল আপনি কি গভীর নিদ্রাভিভূত ছিলেন, শুনতে পাননি বজ্রের আওয়াজ? আমি উত্তর করলাম—না, আমি জেগেই ছিলাম, শুনতে পাইনি। সে অবাক হয়ে বলল—ভদন্ত, আশ্চর্য! আপনি জেগে থেকে বজ্রের কানফাটা আওয়াজ শুনতে পাননি সমীপস্থ দুর্ঘটনার বিন্দুমাত্র টের পাননি। এ মন্তব্য করে সে আমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রস্থান করল।

বুদ্ধের উক্তি শুনে মল্লপুত্র পুক্কুস উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলেন—অতি সুন্দর! অতি সুন্দর! আমি আজ থেকে আপনার শরণাগত হলাম। আপনার ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ নিলাম। তখনি তিনি তাঁর একজন অনুচরকে আদেশ দিলেন তাঁর নব সংগৃহীত স্বর্ণবর্ণ উত্তরীয়দ্বয় নিয়ে আসার জন্য। অনুচর কাল বিলম্ব না করে উত্তরীয়দ্বয় নিয়ে এল। সেগুলো বুদ্ধের দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—ভদন্ত এগুলো আপনি গ্রহণ করুন আমার প্রতি অনুকম্পায়। বুদ্ধ বললেন—তাহলে তুমি একখানা আমায় দাও, আর একখানা আনন্দকে দাও। পুক্কুস তাই করলেন। বুদ্ধ তাঁকে দিলেন ধর্মোপদেশ। তিনি আনন্দোৎফুল্ল মনে বুদ্ধকে প্রণাম করে প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রস্থান করলেন।

পুক্কুসের প্রস্থানের পর আয়ুষ্মান আনন্দ সোনালী উত্তরীয়খানি বুদ্ধকে পরালেন। তাঁর শরীরে তা নিষ্প্রভ মনে হল। আনন্দ অবাক হয়ে তাঁকে বললেন—ভগবন্, আজ আপনার গায়ের রঙ এত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে যে সোনালী উত্তরীয়খানি আপনার নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে। বুদ্ধ বললেন—আনন্দ, ঠিক বলেছ, তথাগতের গায়ের রঙ দুইদিন অত্যন্ত উজ্জ্বল থাকে—যেদিন তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন আর যেদিন তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন; হে আনন্দ, আজ রাত্রির শেষ প্রহরে মল্লদের শালবনে যুগ্মশালের অন্তরালে তথাগতের পরিনির্বাণ হবে, তাই বর্ণের এই উজ্জ্বলতা।

অতঃপর বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘসহ ককুধনদীর তীরে উপস্থিত হলেন। তিনি নদীতে অবগাহন করে সমীপস্থ আম্রকাননে প্রবেশ করলেন, আয়ুষ্মান চুন্দককে বললেন—হে চুন্দক, চার ভাঁজ করে এখানে উত্তরীয় পেতে দাও, অত্যন্ত ক্লান্ত একটু শোব। চুন্দক তাঁর নির্দেশ পালন করলেন। তিনি দক্ষিণ পার্শ্ব ভর করে সিংহশয্যায় শয়ন করলেন আত্মস্থ হয়ে। কিছুক্ষণ পরে তিনি আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন—হে আনন্দ, হয়ত কেউ কর্মকার চুন্দের অনুতাপ উৎপাদন করে বলতে পারে 'বন্ধু চুন্দ, তোমার দুর্ভাগ্য যে তোমার আহার গ্রহণ করে ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করলেন' তখন তোমরা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলবে—চুন্দ, এ তোমার পরম সৌভাগ্য যে ভগবান তোমার হাতে অন্তিম আহার গ্রহণ করে পরিনির্বাণ লাভ করলেন।' তাকে আরও বলবে 'আমরা ভগবানের মুখে শুনেছি ভগবানকে প্রদত্ত দুইটি আহারদানের সমান ফল যে আহার গ্রহণ করে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন আর যে আহার গ্রহণ করে তিনি পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হন।

চব্বিশ

ভিক্ষুসঙ্ঘপরিবৃত বুদ্ধ ক্লান্ত পদে এগিয়ে চললেন। অদূরেই স্বচ্ছতোয়া হিরণ্যবতী নদী। তার অপর তীরে কুশীনগরের মল্লদের ছায়াচ্ছন্ন শালবন তাঁকে যেন মৌন ম্লান আহ্বান জানাল। তিনি হিরণ্যবতী নদী পার হয়ে ধীরপদে সেই মল্ল শালবনে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়েই তিনি আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন—হে আনন্দ, এ যুগ্মশালের অন্তরালে উত্তর শিয়রে খাটিয়া পেতে দাও, আমি শ্রান্ত ক্লান্ত, শুয়ে পড়ব। আনন্দ তাঁর নির্দেশমত খাটিয়া পেতে দিলেন। বুদ্ধ দক্ষিণপার্শ্ব ভর করে সিংহ-শয্যায় শয়ন করলেন আত্মস্থ হয়ে। রোগগ্রস্ত অবসন্ন দেহে ফুটে উঠল অপূর্ব দিব্যজ্যোতি। অনুপম লাবণ্যে উদ্ভাসিত হল দেহ। মুখমণ্ডলে অনির্বচনীয় প্রশান্তি। সেইসময় শালগাছগুলো ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছিল। গাছ থেকে ফুলের পাপড়ি খসে ঝরে পড়তে লাগলো তাঁর দেহে। উত্তরীয় ও বিছানা ঢাকা পড়ল তাতে। প্রকৃতি যেন নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে তাঁর পূজায়। বুদ্ধ বললেন—হে আনন্দ, ভক্তেরা যে আমার পূজা করে ফুল দিয়ে মালা দিয়ে দীপ ধূনা দিয়ে আরও নানাভাবে, তাতে তথাগতের প্রকৃত পূজা হয় না; যারা আমার উপদেশ যথাযথভাবে পালন করে আদর্শ অনুসরণ করে ধর্মপ্রাণ হয়, তারাই তথাগতকে প্রকৃত

তাবে মানে পূজা করে পরমপূজায় ; হে আনন্দ তাই তোমরা ধর্মনিষ্ঠ হবার জন্ম কৃতসংকল্প হও।

আয়ুষ্মান আনন্দ মনের আবেগে বললেন—ভদন্ত, আপনার দর্শনের জন্ম সেবার জন্ম বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্ন দিক থেকে কত পবিত্রাত্মা মনের মত ভিক্ষুরা আসেন, তাঁদের দেখে আনন্দ লাভ করি ; আপনার অবর্তমানে তাঁদের তো আর দেখতে পাব না। বুদ্ধ যেন সান্ত্বনার সুরে মন্তব্য করলেন—হে আনন্দ, যেখানে তথাগত জন্মগ্রহণ করেছেন, যেখানে তাঁর বুদ্ধত্ব লাভ হয়েছে, যেখানে তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছেন এবং যেখানে তাঁর পরিনির্বাণ-লাভ হবে, সেই চারিটি স্থানে দর্শন করে ভক্তেরা চিরকাল অনুপ্রেরণা লাভ করবে ; সে স্থানসমূহে অনাগতকালে আসবে শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উপাসক-উপাসিকা শ্রদ্ধানিবেদনের জন্ম ; তীর্থভ্রমণের সময় যে কেউ প্রসন্নচিত্তে পবিত্রমনে দেহত্যাগ করবে, তার সুগতি সুনিশ্চিত।

আনন্দ জিজ্ঞেস করলেন—ভদন্ত, মাতৃজাতির প্রতি আমাদের আচরণ কি রকম হওয়া বাঞ্ছনীয় ?

উত্তর হল—অদর্শন।

—যদি দর্শন।

—যদি দর্শনের প্রয়োজন হয় তাহলে কি হবে ?

আলাপ করবে না।

—তাহলে স্মৃতি জাগ্রত রাখবে।

—ভদন্ত, তথাগতের দেহ সংকারে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করব ?

হে আনন্দ, তথাগতের দেহ পূজার জন্ম তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। হে আনন্দ, তোমরা পরম সিদ্ধির জন্ম যত্নপর হও, অপ্রমত্ত বীর্যবান দৃঢ়নিষ্ঠ হয়ে অগ্রসর হও। হে আনন্দ, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিকুলে তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বহু গৃহীভক্ত আছেন যাঁরা তথাগতের দেহসংকার নিয়ে মেতে উঠবে

ভদন্ত, তাহলেও তথাগতের দেহসংকারের ব্যবস্থা আমাদের জানা আবশ্যক।

—হে আনন্দ, যে ভাবে রাজচক্রবর্তীর দেহসংকার হয়, সেভাবেই তথাগতের দেহসংকার হওয়া উচিত। দেহসংকারের পর চারি মহাপথের সংযোগস্থলে তথাগতের জন্ম স্তূপ নির্মিত হওয়া আবশ্যক। তার বেদীমূলে যারা মালা ধূপ ধুনা ইত্যাদির অর্ঘ্য নিবেদন করবে, প্রণাম করবে এবং প্রসন্ন হবে, তারা তাতে পুণ্যার্জন করবে।

—হে আনন্দ, চারিজনের জন্য স্তূপ নির্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যথা—তথাগত অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ, অধ্যাত্মোপলব্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী-পুরুষ, পবিত্রাত্মা শ্রাবক এবং ধর্মপরায়ণ রাজচক্রবর্তী। যেহেতু এঁদের স্তূপ দেখে বহুলোক আনন্দিত হবে অনুপ্রেরণা লাভ করবে সে কারণে এঁরা স্তূপের যোগ্য।

তথাগতের সঙ্গে কথাবার্তার পর আয়ুষ্মান আনন্দ বিহারে প্রবেশ করেই ভেঙে পড়লেন। তাঁর শোক উথলে উঠল। রুদ্ধ অশ্রু বাঁধ মানল না। তিনি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বালকের মত কেঁদে উঠলেন—আমার পরম হিতৈষী তথাগত চললেন, আমার করণীয় তো এখনো শেষ হয়নি। সেই মুহূর্তেই ভগবান ভিক্ষুদের জিজ্ঞেস করলেন—হে ভিক্ষুগণ আনন্দ এখন কোথায়? তাঁরা জানালেন তাঁকে আনন্দের শোকবিহ্বলতার কথা। বুদ্ধের নির্দেশে একজন ভিক্ষু তাঁকে ডেকে আনলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বুদ্ধ বললেন—হে আনন্দ, অযথা শোক কোরো না বিলাপ করো না, তোমাদের কি আমি আগেই বলিনি—সমস্ত প্রিয়জন প্রিয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে বিদায় নিতে হবে, আঁকড়ে থাকা যাবে না; যার জন্ম হয়েছে সৃষ্টি হয়েছে, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তাকে বিনাশ থেকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই। বুদ্ধ বলতে লাগলেন—হে আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল তথাগতের সেবা করেছ, মৈত্রীপূর্ণ প্রেমস্নিগ্ধ কায়মনোবাক্যে তুমি তথাগতের পরিচর্যারত ছিলে, তুমি তো কৃতপুণ্য ব্যক্তি, সাধানারত হও, শীঘ্রই তোমার পরম সিদ্ধিলাভ হবে। অতঃপর ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বুদ্ধ বললেন—হে ভিক্ষুগণ, অতীতে যে সম্যক সম্বুদ্ধগণ আবির্ভূত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে যে সম্বুদ্ধগণ আবির্ভূত হবেন, তাঁদের সকলের সেবক আনন্দের মতই; হে ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যখন সে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উপাসক উপাসিকাদের ধর্মোপদেশ দেয়, তখন তারা সকলেই তদ্‌গত চিত্তে তার ভাষণ শুনে আনন্দিত হয় আরও শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়, সে তথাগতের দর্শনার্থীদের সময় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত।

আয়ুষ্মান আনন্দ, বিনীতভাবে বুদ্ধকে বললেন—ভগবন, এ ক্ষুদ্রনগরে অপ্রসিদ্ধ জনপদে আপনি পরিনির্বাণ বরণ করবেন না ভগবন অন্য মহানগরীসমূহ রয়েছে, যেমন চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, বারণসী যেখানে আপনার বহু ভক্তরা আছেন, এর কোনটিতে আপনি পরিনির্বাণ বরণ করুন, সেখানে তাঁরা তথাগতের যথোচিত দেহসংকার করবেন। বুদ্ধ বাধা দিয়ে বললেন—হে আনন্দ, এ কথা বলো না, সুদূর অতীতে এ কুশীনগর অত্যন্ত সমৃদ্ধ জনবহুল উন্নত নগর ছিল; তুমি যাও

কুশীনগরে প্রবেশ করে মল্লদের বলো আমার পরিনির্বাণের কথা, যেন বলতে না পারে আমাদের জনপদে তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করলেন, অথচ আমরা জানতে পারলাম না।

বুদ্ধের আদেশ শিরোধার্য করে আয়ুষ্মান আনন্দ কুশীনগরে গেলেন। তখন মল্লরাজগণের অধিবেশন চলছিল তাঁদের মন্ত্রনাসভায়। আনন্দ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সম্বোধন করে বললেন—হে বাশিষ্টগণ, আজ রাত্রির শেষ প্রহরে তথাগতের পরিনির্বাণ লাভ হবে আপনাদের শালবনে, আপনারা চলুন সেখানে পরে অনুতপ্ত হবেন না, বলবেন না যে আমাদের জনপদে তাঁর পরিনির্বান হল, আমরা জানতে পারলাম না। এ কথা শুনে সভা স্তব্ধ হল। সমবেত মল্ল মল্লগৃহিণীরা মল্লপুত্র মল্লবধুরা যেন বজ্রাহত হলেন। তাঁদের মধ্যে যারা বুদ্ধের একান্ত ভক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়ে গেল। তাঁদের বিলাপধ্বনি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। যথাসময়ে তাঁরা শালবনে উপস্থিত হলেন তথাগতের অন্তিম দর্শন লাভের জন্য তাঁদের উপস্থিতিতে শালবনের সমস্ত পরিবেশ শোকাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। আনন্দ ভাবলেন—যদি এঁদের সকলকেই তথাগতের চরণ বন্দনার অবকাশ দিই তাহলে রাত্রি ফুরিয়ে যাবে বন্দনা শেষ হবে না। তিনি উপায় উদ্ভাবন করে বলে যেতে পরিবারানুক্রমে লাগলেন—অমুক মল্ল সস্ত্রীক সপুত্র সবধু সপরিজন ভগবানের চরণ বন্দনা করছে। এভাবে তিনি প্রথমেই কুশীনগরের মল্লদের বুদ্ধবন্দনা শেষ করলেন।

কুশীনগরবাসী পরিব্রাজক সুভদ্র যখন শুনলেন শ্রমণ গৌতম আজই রাত্রির শেষ প্রহরে পরিনির্বাণ বরণ করবেন, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন—প্রবীণ আচার্য প্রাচার্যের মতে শ্রমণ গৌতমের মত মহাপুরুষের আবির্ভাব জগতে বিরল, আজ তিনি দেহ ত্যাগ করবেন, যদিও আমার রয়েছে তাঁর প্রতি অনাবিল শ্রদ্ধা, তবুও তাঁর ধর্ম কথা শুনে আমার ক্ষুদ্র সংশয়টুকু অপনোদন করতে চাই। এই ভেবে তিনি মল্লদের শালবনে গিয়ে আনন্দের কাছে বুদ্ধসাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করে বললেন—ভবৎ আনন্দ, আমি শ্রমণ গৌতমের প্রতি প্রসন্ন, তবে আমার সামান্য সংশয় আছে, তাঁর বচন শুনে সেটুকু আমি নিরসন করতে চাই, আমাকে তাঁর দর্শনলাভের সুযোগ দিন। আনন্দ বাধা দিয়ে বললেন—বন্ধু সুভদ্র, তথাগত এখন শ্রান্ত, তাঁকে পীড়ন করা সংগত হবে না। পরিব্রাজক সুভদ্র আনন্দের কথায় কর্ণপাত না করে আবার বুদ্ধসাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আনন্দ রাজী

হলেন না। পরিব্রাজক তৃতীয়বার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আনন্দ সেইভাবেই তা প্রত্যাখ্যান করলেন। করুণাঘন শুনলেন উভয়ের বাক্যালাপ। তিনি নিজের বেদনা উপেক্ষা করে আনন্দকে বললেন—হে আনন্দ, সুভদ্রকে বারণ করোনা, তাকে আসতে দাও, সে জানার আকাঙ্খা নিয়েই প্রশ্ন করবে, তাতে আমার অসুবিধা হবে না; সে হৃদয়ঙ্গম করবে আমার বাণী। তখন আনন্দ পরিব্রাজককে বললেন—বন্ধু সুভদ্র, ভগবান আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন, আপনি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন—এই যে খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ জনগুরু গণাচার্য তীর্থঙ্কর সাধুপুরুষগণ আছেন যেমন কাশ্যপ, মক্খলি গোশাল, নিগ্র'ন্থ নাথপুত্র, সঞ্জয়, প্রকুধ কাত্যায়ন, কেশকম্বলী অজিত, তাঁরা কি সবাই সর্বজ্ঞ শুদ্ধ মুক্ত পুরুষ? বুদ্ধ বললেন—হে সুভদ্র, এ প্রশ্ন তুলে লাভ নেই, তুমি শোনো আমার ধর্মকথা। বুদ্ধ সুরু করলেন ধর্মোপদেশ। সুভদ্রের মন ডুবে গেল সে উপদেশের গভীরে। তিনি ধর্মকথার অবসানে ভাবে গদ্‌গদ হয়ে বললেন—আমায় দিন আপনার চরণে স্থান। এই সুভদ্র হলেন বুদ্ধের অন্তিম প্রত্যক্ষ শিষ্য।

পঁচিশ

রাত্রি তখন গভীর। বৈশাখী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় চারিদিক উজ্জ্বল। বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন[1] করে বললেন—হে আনন্দ, আমার অবর্তমানে তোমাদের মনে হতে পারে 'আমাদের শাস্তা নেই, শাস্ত্র শাস্তাহীন' একথা ভাববে না, আমি যে ধর্ম বিনয় প্রচার করেছি, আমার অবর্তমানে তা হবে তোমাদের শাস্তা। তিনি বলতে লাগলেন। হে আনন্দ, এখন যে ভিক্ষুরা পরস্পরকে বন্ধু বলে সম্বোধন করে, আমার অবর্তমানে তা সংগত হবে না। জ্যেষ্ঠ কণিষ্ঠকে নাম গোত্র ধরে ডাকবে অথবা বন্ধু বলে সম্বোধন করবে। এবং কণিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে ভদন্ত অথবা আয়ুষ্মান বলে সম্বোধন করবে। হে আনন্দ, আমার পরিনির্বাণের পর যদি সঙ্ঘ ইচ্ছা করে, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ বা বিনয় নিয়ম সমূহ বাতিল করে দিতে পারে। হে আনন্দ, আমার অবর্তমানে ভিক্ষু ছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দান করবে, ছন্ন অসংযতবাক; মুখে যা আসে তা বলে, ভিক্ষুরা তার সঙ্গে কথা বলবে না, তাকে উপদেশ দেবে না, অনুশাসন করবে না—এটিই তার ব্রহ্মদণ্ড।

বুদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বোধন করলেন। ভিক্ষুরা ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁর পানে তাকালেন। তিনি বললেন—যদি কোন ভিক্ষুর বুদ্ধের প্রতি ধর্মের প্রতি

সঙ্ঘের প্রতি অথবা পন্থার প্রতি সংশয় থাকে, আমায় জিজ্ঞেস করুক, কিন্তু পরে সুযোগ সত্ত্বেও ভগবানকে এ বিষয়টি জিজ্ঞেস করিনি বলে অনুতপ্ত হয়ো না। একথা শুনে ভিক্ষুরা নিরুত্তর রইলেন। বুদ্ধ আবার একথা বললেন। শুনে ভিক্ষুরা নিরুত্তর রইলেন। বুদ্ধ আবার একথা বললেন। ভিক্ষুরা নিরুত্তর রইলেন। বুদ্ধ আবার একথা বললেন। ভিক্ষুরা রইলেন নীরব। তাঁর তৃতীয় বারের উক্তিতেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আবার তিনি বললেন—যদি আমার প্রতি গৌরববশতঃ তা বলতে সঙ্কোচ বোধ কর, তাহলে নিজের বন্ধুর কাছে তা প্রকাশ কর। এ উক্তি শুনেও ভিক্ষুরা মৌন রইলেন। তখন আনন্দ বলে উঠলেন—ভগবন্, আশ্চর্য এ ভিক্ষুদের মধ্যে একজনেরও বুদ্ধের প্রতি ধর্মের প্রতি সঙ্ঘের প্রতি অথবা পন্থার প্রতি কোন সংশয় নেই। অতঃপর বুদ্ধ বললেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের সম্বোধন করছি, সকল সৃষ্টি অনিত্য ভঙ্গুর। অপ্রমত্ত হয়ে কর্তব্য সম্পাদন করো। এটিই তথাগতের অন্তিম বাণী।

শেষ বচন উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ প্রথম ধ্যানে মগ্ন হলেন। প্রথম ধ্যান থেকে তাঁর চিত্ত দ্বিতীয় ধ্যানে উত্তীর্ণ হল। এভাবে একটির পর একটি স্তর অতিক্রম করে তিনি নিরোধ সমাধি মগ্ন হলেন। দেহের নিস্পন্দ অবস্থা লক্ষ্য করে আনন্দ আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন—ভদন্ত অনিরুদ্ধ, ভগবান কি পরিনির্বাণ লাভ করলেন? উত্তরে অনিরুদ্ধ বললেন—না, বন্ধু আনন্দ, ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করেননি, নিরোধ সমাধি মগ্ন হয়ে আছেন। পরক্ষণেই ভগবান নিরোধ সমাধি থেকে নেমে এলেন অরূপ সমাধির চতুর্থ স্তরে। এভাবে তিনি ক্রমশঃ প্রথম ধ্যানে নেবে এলেন। আবার তাঁর চিত্ত প্রথম ধ্যান থেকে দ্বিতীয় ধ্যান স্তর অতিক্রম করে চতুর্থ ধ্যান মগ্ন হল। চতুর্থ ধ্যান থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলেন। তখনি অর্হৎ অনিরুদ্ধের কণ্ঠে বাণী উদ্‌গত হল—

নাহু অস্‌সাস পস্‌সাসো ঠিতচিত্তস্‌স তাদিনো
অনেজো সান্তিমারব্ভ যং কালমকরী মুনি
অসল্লীনেন চিত্তেন বেদনং অজ্‌ঝবাসয়ী
পজ্জোতস্‌সেব নিব্বানং বিমোক্‌খো অহু চেতসো।

অর্থাৎ চিরশান্তিময় নির্বাণ লক্ষ্য করে বীততৃষ্ণ মুনি কালগত হলেন। সেই স্থিতচিত্ত অচঞ্চল প্রভুর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বইছে না। তিনি অলীন চিত্তে সকল বেদনা সহ্য করলেন। দীপনির্বাণের মত চিত্তের বিমোক্ষ লাভ হল।

বিষণ্ণ শালবনে ক্রন্দনের রোল উঠল। আকাশ বাতাস ক্রন্দনে ছেয়ে গেল। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন অবীতরাগ অমুক্ত, তাঁরা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন—অতি তাড়াতাড়ি ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করলেন। অতি তাড়াতাড়ি সুগত অন্তর্ধান করলেন, বীতরাগ অর্হৎ ভিক্ষুগণ ভগবানের অন্তিম শয্যার চারিদিকে স্তব্ধভাবে দাঁড়ালেন। আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ ক্রন্দনপর ভিক্ষুদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—বন্ধুগণ, অনর্থক আপনারা শোক করবেন না, ভগবান আগেই তো আমাদের বলেছেন 'সমস্ত প্রিয়জন প্রিয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, বিদায় নিতে হবে, আঁকড়ে থাকা যাবে না, যার জন্ম হয়েছে, তার বিলোপ অনিবার্য, তাকে বিনাশ থেকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই।' আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ ও আনন্দ অবশিষ্ট রাত্রি তথাগতের অন্তিম শয্যার পাশে ধর্মকথায় কাটিয়ে দিলেন।

প্রভাতে আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধের নির্দেশে আয়ুষ্মান আনন্দ কুশীনগরে গিয়ে ভগবানের পরিনির্বাণের খবর মল্লরাজদের জানালেন। সে খবর দাবাগ্নির মত রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত রাজধানী বিষাদমগ্ন হল। ঘরে ঘরে ভক্তদের কান্নার রোল উঠল। মল্লরাজের হুকুমে পাঁচশ নতুন বস্ত্রসহ কুশীনগরের সমস্ত ধুপ ধুনা বাদ্য বাজনা সংগ্রহ করে আনা হল সংসদ্ ভবনে। সেখান থেকে এগুলো নিয়ে বিরাট শোকযাত্রা বের হয়ে পৌঁছল শালবনে। মাল্য গন্ধে ধুপ ধুনায় নৃত্য বাদ্যে চলল ভগবানের দেহপূজা। এভাবে ছয়টি দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। তখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে ও মালা ও সুগন্ধি নিয়ে দলে দলে ভক্তগণের সমাবেশে কুশীনগর জনাকীর্ণ হয়ে উঠল। রাস্তাঘাটে সর্বত্র ফুলের ছড়াছড়ি হল। সপ্তম দিনে সুসজ্জিত শবাধারে বহু নতুন সূক্ষ্ম বস্ত্রে দেহ আবৃত করে স্থাপন করা হল এবং মল্লপ্রধানগণ সে শবাধার কাঁধে বহণ করে রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রম করে সুসজ্জিত চিতায় আরোপন করলেন। এ সময়ে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পাঁচশ ভিক্ষুসহ পাবা থেকে কুশীনগরে আসছিলেন। পথিমধ্যে একটি গাছের ছায়ায় যখন তিনি বিশ্রাম করছিলেন. তখন জনৈক পরিব্রাজকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি পরিব্রাজককে কুশীনগর থেকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন···বন্ধু, আপনি কি আমাদের শাস্তাকে জানেন। পরিব্রাজক উত্তর করলেন—হাঁ, বন্ধু জানি, সাত দিন হল তিনি দেহ ত্যাগ করেছেন, সেখান থেকেই এই ফুলটি আমি নিয়ে এসেছি। পরিব্রাজকের মুখে এ কথা শুনে অবীতরাগ অমুক্ত ভিক্ষুগণের মাথায় যে আকাশ ভেঙে পড়ল।

তাঁরা উচ্চস্বরে রোদন করতে লাগলেন। ভিক্ষুগণ স্থির অচঞ্চল চিত্তে সৃষ্টির অনিত্যতার কথা ভাবতে লাগলেন। তখন বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত সুভদ্র নামক জনৈক ভিক্ষু রোদনরত ভিক্ষুদের কাছে গিয়ে বললেন—বন্ধুগণ, আপনারা অনর্থক কাঁদছেন কেন, সে মহাশ্রমণের হাত থেকে আমরা তো এখন মুক্তিলাভ করলাম, তিনি সর্বদাই বিধিনিষেধের বেড়াজাল রচনা করে আমাদের বিরক্ত করতেন এখন আমরা যথেচ্ছভাবে চলতে পারব। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভিক্ষুদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

শবাধার চিতায় আরোপণের পর স্নাত নববস্ত্র পরিহিত চারি জন মল্লপ্রমুখ লয়ে অগ্নিসংযোগ করার চেষ্টা করেও বিফল মনোরথ হয়ে আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন—আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সদল বলে পাবা থেকে এখানে আসছেন, তাঁর না আসা পর্যন্ত চিতা জ্বলবে না। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ কুশীনগরে পৌঁছেই ভিক্ষুর বিরাট বাহিনী নিয়ে চিতায় উপস্থিত হলেন। তিনি তিন বার চিতা প্রদক্ষিণ করে ভগবানের পদদ্বয় মস্তকে বন্দনা করলেন। ভিক্ষুরাও তাঁর অনুসরণ করলেন। মহাকাশ্যপের প্রণামের পর চিতা জ্বলে উঠল। দাহক্রিয়ার অবসানে ভগবানের পূত দেহবিশেষ মল্লদের সংসদ ভবনে নীত হলেন। সেখানে সাত দিন ধরে অগণিত ভক্তের পূজা চলল।

মগধরাজ অজাতশত্রু ভগবানের পরিনির্বাণ সংবাদ পেয়েই মল্লদের কাছে দূত পাঠিয়ে বলে দিলেন—ভগবান ও ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়, তাঁর শরীরাবশেষের অংশ আমার প্রাপ্য, আমি স্তূপনির্মাণ করে পূজা করব। বৈশালী লিচ্ছবিদের কাছ থেকে ও এভাবে ভগবানের শরীরাবশেষের দাবী এল। কপিলবাস্তুর শাক্যরা বলে পাঠালেন—ভগবান তাঁদের কুলগৌরব, তাঁর শরীরাবশেষের অংশ তাঁদের একান্তই প্রাপ্য। এভাবে অল্লকপ্প পাবা প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্য থেকে পূত শরীরাবশেষের দাবী আসতে লাগলো। নানা দিক থেকে দাবীর পর দাবী আসাতে মল্লরাজগণ উত্যক্ত হয়ে বললেন—ভগবান আমাদের রাজ্যে পরিনির্বাণ বরণ করেছেন, তাঁর পূত শরীরাবষের অংশ আমরা বিলিয়ে দিতে পারি না। এ উক্তি শুনে দূতগণ ক্ষুব্ধ হলেন। বিষয় ঘোরালো হয়ে উঠল। বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ দ্রোণ অবস্থা আয়ত্তের বাইরে যাবার আগেই সবাইকে লক্ষ্য করে উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—

বন্ধুগণ, শুনুন আমার একটি কথা ,আমাদের বুদ্ধ ছিলেন ক্ষমার জীবন্ত আদর্শ। সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষের শরীরাবশেষের ভাগাভাগি নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ

কখনো বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। আসুন বন্ধুগণ সবাই সম্মিলিত হয়ে আনন্দের সঙ্গে তা আটভাগে বিভক্ত করি। দিকে দিকে তাঁর স্তূপ গড়ে উঠুক। বহু লোক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

ব্রাহ্মণের এ প্রস্তাব সবাই এক বাক্যে গ্রহণ করলেন। তাঁরা তাঁকে অনুরোধ করলেন ভাগ করে দেওয়ার জন্য। তিনি নৈপুণ্যের সঙ্গে এ কাজ সম্পন্ন করলেন এবং নিজে চেয়ে নিলেন 'তুম্ব' বলে কথিত মাপক।

শরীরাবশেষ বণ্টনের পর পিপ্‌পলিবনীয় মৌর্যগণের কাছ থেকে দূত এলেন মল্লসভায় পূতাস্থির অংশের জন্য। মল্লগণ তাঁকে বললেন—ভগবানের শরীরাবশেষ বণ্টন করা হয়ে গিয়েছে, এখন আপনারা তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে যেতে পারেন। পিপ্‌লবণীয় মৌর্যগণের দূত চিতাভস্ম নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এভাবে মগধের রাজগৃহে বৈশালীতে কপিলবস্তুতে অল্লকপ্পে কোলীয়দের রামগ্রামে বেঠদীপে পাবায় এবং কুশীনগরে গড়ে উঠল তথাগতের পূত শরীরাবশেষের ওপর আটটি স্তূপ। ব্রাহ্মণ দ্রোণ যে তুম্ব বলে কথিত মাপক নিয়েছিলেন, তার ওপর ও একটি স্তূপ গড়ে উঠল। পিপ্‌লিবণীয় মৌর্যরা তাঁদের রাজ্যে নির্মাণ করলেন ভস্মের ওপর একটি স্তূপ। বলা বাহুল্য. তথাগতের পরিনির্বাণের অল্পকাল পরেই বিভিন্ন রাজ্যে এই দশটি স্তূপ গড়ে উঠেছিল।

ছাব্বিশ

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভুলতে পারেননি বৃদ্ধ প্রব্রজিত সুভদ্রের সে কথাগুলো। তিনি যখন ভিক্ষুদের নিয়ে তথাগতের অন্তিম দর্শনলাভের জন্য কুশীনগরে আসছিলেন, তখন জনৈক পরিব্রাজকের মুখে তথাগতের পরিনির্বাণ সংবাদ পেয়ে অবীতরাগ ভিক্ষুরা ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁদের করুণ বিলাপধ্বনি প্রান্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তুলেছিল। সে রোদনরত ভিক্ষুদের কাছে গিয়ে বলেছিল—বন্ধুগণ, কেন আপনারা অনর্থক শোক করছেন বিলাপ করছেন, সে মহাশ্রমণের হাত থেকে আমরা এখন মুক্তি পেলাম, তিনি সর্বদাই 'এটা করো' 'এটা করো না' বলে জ্বালিয়ে মারতেন, এখন আমরা যথেচ্ছভাবে চলতে পারব। তার এ উক্তি মহাকাশ্যপের কানে বিদ্রূপের মত বেজেছিল। তাঁর অন্তরে সেদিন প্রশ্ন জেগেছিল—ভগবানের নরদেহ ভস্মসাৎ হবার পূর্বেই

পাপাচার ভিক্ষুরা যদি এ মনোভাব পোষণ করে, তাহলে বুদ্ধশাসনের ভবিষ্যৎ কি ? এ প্রশ্ন সেদিন থেকেই তাঁর অন্তর অধিকার করেছিল।

ভগবানের দাহক্রিয়ার পর নানা দিগ্‌দেশাগত গৃহিভক্তগণ কুশীনগর ত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু আগন্তুক ভিক্ষুদের অনেকেই কিছুদিন ধরে কুশীনগরে ছিলেন। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপই বয়োজ্যেষ্ঠতার অধিকার বলে স্বাভাবিক সঙ্ঘনেতা হলেন। তাঁর অধিনায়কত্বে ভিক্ষুরা প্রায় সম্মিলিত হতেন। এমন একটি সমাবেশে তিনি বুদ্ধপ্রব্রজিত সুভদ্রের সে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন। তা শুনে ভিক্ষুরা স্তম্ভিত হলেন। যাঁর তিরোধানে সর্বত্র শোকের করাল ছায়াপাত হয়েছে, জগৎ শূন্য মনে হয়েছে, তাঁর অভাবে খুশী হতে পারে উল্লসিত হতে পারে এমন ভিক্ষুও সঙ্ঘে আছে—একথা ভাবতেই তাঁদের প্রাণ শিউরে উঠল। উত্তরকালে এ পাপিষ্ঠের দল সংখ্যায় ভারী হলে বুদ্ধ-শাসনের যে সমাধি রচনা করবে, তা তাঁদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠল। এর প্রতি-বিধানের যৌক্তিকতা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করলেন। এ অধর্মবাদী অবিনয়বাদী ভিক্ষুবেশধারী অভিক্ষুদের মাথা তুলবার আগেই বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মবিনয়কে সুগ্রথিত করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করলেন। এ জন্য তাঁরা একটি সংগীতি আহ্বান করার সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

সর্বসম্মতিক্রমে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ প্রস্তাবিত সংগীতির অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন। তাঁর ওপর ভার পড়ল সংগীতির সদস্য মনোনয়নের। তিনি ৪৯৯ জন শুদ্ধ মুক্ত অর্হৎ ভিক্ষুকে সদস্য মনোনয়ন করলেন। শুধু একটি আসন খালি রইল। ভগবানের পার্শ্বচর ধর্মভাণ্ডারী আনন্দকে বাদ দিয়ে সংগীতির কথা তিনি ভাবতেই পারলেন না। কিন্তু আনন্দ তখনও অধ্যাত্ম সাধনায় চরম সিদ্ধি অর্হৎ লাভ করেননি। এজন্য তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। আনন্দ ভগবানের অনুগত সেবকরূপে ভিক্ষুসঙ্ঘের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তাঁর ধর্মপরতা ও নিপুণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও ছিল প্রচুর। ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বে ছিল তাঁর অসামান্য অধিকার। ভিক্ষুরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহাকাশ্যপকে অনুরোধ করে বললেন ভদন্ত, যদিও আয়ুষ্মান আনন্দ অর্হত্ত্ব লাভ করেননি, তবুও তিনি নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধ পুরুষ এবং ভগবানের একান্ত সান্নিধ্য লাভে ভগবানের বাণী আয়ত্ত করেছেন, তাঁকে খালি আসনটি দিন। তাঁদের অনুরোধে মহাকাশ্যপ আনন্দকে সংগীতির সদস্যতালিকাভুক্ত করে সদস্য সংখ্যা পাঁচ শ করলেন।

পাঁচ শ ভিক্ষুর ধর্ম মহাসভা অনুষ্ঠিত হবে বুদ্ধ বাণী সংগ্রহের জন্য। এর অধিবেশন চলবে বহুদিন ধরে। এ ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান কুশীনগরের মত ক্ষুদ্র

রাজ্যে সম্ভব হতে পারে না। সে যুগে সমৃদ্ধ রাজগৃহে ছিল আঠারটি বিরাট সঙ্ঘারাম। সেখানে সংগীতির সদস্যদের বাসস্থানের অসুবিধার প্রশ্ন উঠতে পারে না। তেমনি রাজগৃহ ছিল সুভিক্ষ যেখানে সাধু সন্তদের কোনদিন ভিক্ষান্নের অভাব হত না। তাই সংগীতিকারগণ এক বাক্যে রাজগৃহকেই এ ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করলেন। তাঁরা ঠিক করলেন পরবর্তী আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত অর্থাৎ বর্ষাব্রতের তিন মাস সংগীতির অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবেন। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পর তাঁরা কুশীনগর ত্যাগ করলেন।

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের পাত্রচীবর নিয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে শ্রাবস্তীর দিকে রওনা হলেন। পথিমধ্যে যে যে স্থানে তাঁরা উপস্থিত হলেন, সে সে স্থানে তাঁদের দেখে ভক্তদের কান্নার রোল উঠল। অবশেষে তাঁরা শ্রাবস্তীতে পৌঁছিলেন। শ্রাবস্তীর জনতা যেন তাঁদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে পড়লেন। জনতার ক্রন্দনধ্বনি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। শাস্তার পরিনির্বাণদিনের যেন পুনরভিনয় হল। আয়ুষ্মান আনন্দ তাঁদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। রোরুদ্যমান জনতার মধ্য দিয়ে তিনিও তাঁর সহযাত্রী ভিক্ষুগণ জেতবনে প্রবেশ করলেন।

শাস্তাহীন জেতবন তাঁদের চোখে আজ বিষণ্ণ শোকের মূর্তি। তার গৌরব রবি চিরতরে অস্তমিত। সঙ্গে সঙ্গে সকল সৌন্দর্য যেন অন্তর্হিত। তার ভিতরের কান্না যেন ফেটে পড়তে চায়। আয়ুষ্মান আনন্দ জেতবনে প্রবেশ করেই বুদ্ধাবাস গন্ধকুটিতে গেলেন। তিনি সেখানে চারিদিকে ছড়ানো শুষ্ক ম্লান মালাগুলো একত্র করে বাইরে ফেলে দিলেন, আসন বিছানাপত্র ও ও ব্যবহার্য দ্রব্যগুলো ঝেড়ে মুছে যথাস্থানে রাখলেন। বুদ্ধের জীবদ্দশায় যেভাবে তিনি গন্ধকুটির সেবাযত্ন করতেন, সেভাবে আজও তিনি গন্ধকুটির সকল করণীয় সমাপ্ত করলেন। কর্মকার চুন্দের গৃহে আহারান্তে ভগবানের পীড়ার দিন থেকে এ পর্যন্ত আনন্দের শরীর যাত্রায় কোন নিয়মের বালাই ছিল না। এ অনিয়মের দরুণ তাঁর শরীর ক্রমশঃ অবসাদগ্রস্থ হতে লাগলো। তিনি ভিষকের পরামর্শে ক্ষীর বিরেচন নামক একটি ঔষধ সেবন করে একদিনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। সেদিনই শ্রাবস্তীর ভক্ত উপাসক শুভ লোক পাঠালেন তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর গৃহে। আনন্দ তাঁকে বললেন— বৎস, আজ আমি ঔষধ সেবন করে বিশ্রাম করছি, কাল যাবো। পরদিন তিনি জনৈক ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে শুভের গৃহে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে

ধর্মোপদেশে পরিতৃপ্ত করলেন। এ ধর্মভাষণ শুভসূত্র নামে পরিচিত হয়ে দীঘ নিকায়ে স্থান লাভ করেছে।

আয়ুষ্মান আনন্দ জেতবনে কিছুকাল অবস্থান করে আশ্রমের সংস্কারকার্য সম্পন্ন করলেন। বর্ষাব্রত আরম্ভ হবার পূর্বেই তিনি রাজগৃহে উপস্থিত হলেন। তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ও আয়ুষ্মান অনিরুদ্ধ প্রমুখ সংগীতির সদস্যবৃন্দ সেখানে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করেছিলেন। রাজগৃহের আঠারটি সঙ্ঘারাম তাঁদের উপস্থিতিতে গমগম করছিল। পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল—শুধু সংগীতির সদস্যরাই সংগীতির অধিবেশন কালে রাজগৃহে অবস্থান করবেন। এজন্য তথাকার সাধারণ ভিক্ষুরা রাজগৃহ ত্যাগ করে অন্যত্র বর্ষাযাপন করতে গেলেন। এ ঐতিহাসিক মহাসভার অনুষ্ঠানের কথা শুনে মগধরাজ অজাতশত্রু অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সকল ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করলেন। বিহারসমূহের সংস্কার কার্যে ভিক্ষুদের ঔৎসুক্য জেনে তিনি বহু ছুতার ও রাজমিস্ত্রী পাঠিয়ে দিলেন। বৈভার পর্বতের ধারে সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণ সংগীতির স্থান নির্ণীত হলে রাজা অজাতশত্রু সে স্থানটিকে বহু অর্থব্যয়ে দেবসভার মত রমণীয় করে তুললেন। এ যেন বিশ্বকর্মার নির্মিত অপূর্ব কারুকার্যখচিত প্রকাণ্ড সভাগৃহ। তার চারদিকে ঝুলতে লাগলো বিচিত্র রংবেরঙের ফুলের মালাসমূহ। সভামণ্ডপে পাঁচশ ভিক্ষুর বসার জন্য বহুমূল্য আস্তরণসমূহ পাতা হল। মাঝখানে পাতা হল বুদ্ধাসনের মত পূর্বমুখী ধর্মাসন। সেখানে রাখা হল দন্তখচিত বীজন। ধর্মাসনের ঈষৎ দক্ষিণে উত্তরমুখী স্থবিরাসন পড়ল।

সংগীতির অধিবেশন আরম্ভ হবার মাত্র একদিন বাকী। আয়ুষ্মান আনন্দের মনে পড়ে গেল পরিনির্বাণ দিনে তাঁর সম্বন্ধে তথাগতের আশ্বাসবাণী। তথাগত তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—হে আনন্দ, তুমি তো কৃতপুণ্য ব্যক্তি, সাধনারত হও, শীঘ্রই তোমার পরমসিদ্ধি লাভ হবে! তথাগত-বচনের খণ্ডন নেই। একথা স্মরণ করতেই তাঁর অন্তরে এল অদম্য উদ্যম, প্রাণে অমিত বল। যে সংগীতিতে তাঁকে বাদ দিয়ে সবাই সিদ্ধ অর্হৎ, সেখানে অসিদ্ধ অবস্থায় তিনি প্রবেশ করবেন—একথা ভাবতেই তাঁর মন কেমন করে উঠল। তিনি পূর্ণ উদ্যমে সাধনায় রত হলেন। এভাবে তাঁর দীর্ঘ রাত্রি অতিবাহিত হল। তিনি যখন মগ্ন মনে রাত্রির শেষ প্রহরে শয্যা আশ্রয় করতে গেলেন, তখন তাঁর পা দুটি মেঝে থেকে উঠেছে মাত্র এবং মাথা বালিশে পড়েনি এ অবস্থায় তাঁর মন সকল বন্ধন ছিন্ন করে অর্হত্বে উপনীত হল, মুক্তি লাভ করল।

এ ভাবে তিনি শয়ন উপবেশন স্থিতি ও গমন এ চারি দৈহিক অবস্থান পরিহার করে শুদ্ধ মুক্ত অর্হৎ হলেন।

নির্দিষ্ট দিবসে আহারের পর সদস্যগণ সংগীতিমণ্ডপে উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দের শূন্য আসন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অধিবেশন আরম্ভ হবার পূর্ব মুহূর্তে যখন তাঁর খোঁজ পড়ল, তখনি তিনি আপনার শূন্য আসনে অলৌকিকভাবে আবির্ভূত হলেন। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সমবেত সদস্যদের সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন—বন্ধুগণ, আমাদের সংগীতির কাজ শুরু হচ্ছে, ধর্ম ও বিনয়ের সংগায়ন হবে, এ দুইটির মধ্যে কোনটি আমরা প্রথমে গ্রহণ করবো? উত্তরে সদস্যগণ একবাক্যে প্রথমেই বিনয় সংগায়নের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যেহেতু (ভিক্ষু জীবনের রীতি-নীতি) এ বিনয় বুদ্ধশাসনের আয়ু বলে পরিগণিত।

আয়ুষ্মান উপালি শ্রেষ্ঠ বিনয়ধর রূপে সুপরিচিত। জীবদ্দশায় বুদ্ধই তাঁকে বিনয়ধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছিলেন। তাঁর ওপরই পড়ল বিনয়সংগায়নের ভার। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ সর্বসম্মতিক্রমে স্থবিরাসন গ্রহণ করে বিনয়জিজ্ঞাসার জন্য প্রস্তুত হলেন। আয়ুষ্মান উপালিও বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে ধর্মাসন গ্রহণ করে দন্তখচিত বীজন হাতে নিয়ে যথাযথ উত্তর দানে বিনয় সংগায়নের জন্য স্বীকৃত হলেন। সংগীতির গুরুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অধিনায়ক মহাকাশ্যপ শ্রেষ্ঠ বিনয়ধরকে জিজ্ঞেস করলেন—প্রথম পারাজিকা নামে অভিহিত বিনয়ের প্রথম সংবিধান কোথায় কাকে উপলক্ষ্য করে কোন ঘটনায় বিধিবদ্ধ? আয়ুষ্মান উপালিও অনর্গলভাবে যথাযথ উত্তর দিতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে হল তার বিশদ আলোচনা। এভাবে একটির পর একটি বিনয়ের সমস্ত নিয়মকানুন নিয়ে দিনের পর দিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তরদানের মধ্য দিয়ে চলল আলোচনা। শুদ্ধ মুক্ত অর্হৎ সদস্যবৃন্দ তদ্‌গত চিত্তে একাগ্র মনে তা শুনতে লাগলেন। বিনয়সংগায়নের অবসানে আয়ুষ্মান উপালি দন্তখচিত বীজন রেখে দিয়ে ধর্মাসন থেকে নেমে নিজের নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। তখন উপস্থিত সকলেই সমবেত কণ্ঠে সমগ্র বিনয় আবৃত্তি করতে সুরু করলেন। বলা বাহুল্য, সে যুগে শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করার পরিবর্তে আচার্য পরম্পরা মুখে মুখে আবৃত্তি করা হত এবং প্রখর স্মৃতির মনি-কোঠায় সংরক্ষিত হত। এজন্যই সমবেত কণ্ঠে এ আবৃত্তি।

বিনয়াবৃত্তি শেষ হলে সর্বসম্মতিক্রমে ধর্মভাণ্ডারী আনন্দ বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে দন্তখচিত বীজন হাতে নিয়ে ধর্মাসন গ্রহণ করলেন।

অধিনায়ক মহাকাশ্যপ ধর্মভাণ্ডারীকে জিজ্ঞেস করলেন ব্রহ্মজালসূত্র কোথায় কাদের উপলক্ষ্য করে কিভাবে উক্ত? আয়ুষ্মান আনন্দ 'এবং মে সুতং—অর্থাৎ আমি এরকম শুনেছি' বলে অনর্গল বলতে সুরু করলেন ব্রহ্মজাল সূত্র। এ ভাবে একটির পর একটি সূত্রের আলোচনা প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলো। আলোচনা শেষে ধর্মভাণ্ডারী ধর্মাসন ছেড়ে নিজের জায়গায় এলেন। পূর্বোক্ত নিয়মে সমবেত কণ্ঠে আবার ধর্মসূত্রগুলোর আবৃত্তি হল।

এভাবে ধর্ম বিনয় সংগায়ন শেষ হলে আয়ুষ্মান আনন্দ সদস্যদের সম্বোধন করে বললেন—ভদন্তগণ, ভগবান পরিনির্বাণের সময় নির্দেশ দিয়েছেন 'হে আনন্দ, আমার দেহান্তে যদি ভিক্ষুসঙ্ঘ ইচ্ছা করে, তবে তারা বিনয়ের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ বা নিয়মগুলো বাতিল করে দিক। তখন জনৈক সদস্য তাঁকে প্রশ্ন করলেন—বন্ধু আনন্দ, আপনি কি ভগবানকে জিজ্ঞেস করেছেন কোনগুলো ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ যেগুলো বাতিল করা যাবে। উত্তরে আনন্দ বললেন—আমি ভগবানকে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করিনি। 'কোনগুলো ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ?' প্রশ্ন উঠল মহাসভায়। নানাসদস্য এ সম্বন্ধে নানামত প্রকাশ করলেন। এ মতানৈক্য লক্ষ্য করে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ মন্তব্য করলেন—বন্ধুগণ, আমাদের এমন কতকগুলো শিক্ষাপদ আছে, যেগুলো গৃহিরাও জানেন 'এ সমস্ত ভিক্ষুর করণীয় অথবা এ সমস্ত ভিক্ষুর করণীয় নয়', যদি আমরা এখনি ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলো বাতিল করে দিই, তবে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা বলবে 'শ্রমণ গৌতমের শিষ্যেরা তাঁর চিতাগ্নির ধুমশিখা নির্বাপিত হতে না হতেই তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাপদগুলো বাতিল করে দিয়ে যথেচ্ছচারী হয়ে পড়েছে; অতএব আমাদের কোন শিক্ষাপদই বাতিল করা সমীচীন হবে না এবং ভগবানের অপ্রবর্তিত কোন নিয়মও রচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে না। আবার তিনি বললেন—বন্ধুগণ আমার এ কথা যদি আপনাদের মনোপূত হয়, তাহলে নীরব থাকুন, এবং যাঁর মনোপূত না হয়, তিনি তাঁর বক্তব্য বলুন। তিনবার তিনি এ ঘোষণা করলেন। সভা নীরব নিস্তব্ধ রইল, কোন প্রতিবাদের রব উঠল না। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হল।

বয়োজ্যেষ্ঠ স্থবির ভিক্ষুরা আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন—বন্ধু আনন্দ, যে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলো কি কি ভগবানকে জিজ্ঞেস করনি, তা তোমার অপরাধ, তুমি তার প্রতিকার কর। উত্তরে আনন্দ বললেন—ভদন্তগণ, আমি ভুলে সেকথা জিজ্ঞেস করিনি, এতে আমার কোন অপরাধ আছে বলে মনে করি না, তবু ও আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আপনাদের

সম্মানার্থে তা অপরাধ বলে স্বীকার করছি এবং যথোচিত প্রতিকার করতে কুণ্ঠিত নই। তাঁরা আবার তাঁকে বললেন—বন্ধু আনন্দ, তুমি যে ভগবানের পরিধেয় পায়ে মাড়িয়ে সেলাই করেছ, তাও তোমার অপরাধ, তুমি তার প্রতিকার কর। আনন্দ উত্তর করলেন—ভদন্তগণ, আমি ভগবানের প্রতি অসম্মান প্রকাশের জন্য তা করিনি, অতএব তাতে আমার অপরাধের কিছুই নেই, তবুও আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আপনাদের সম্মানার্থে তা অপরাধ বলে মেনে নিয়ে প্রতিকার করছি। তারপর উঠল ভগবানের পরিনির্বাণকালে মহিলাদের দিয়ে প্রথম ভগবানের চরণ বন্দনার কথা। তাঁদের অশ্রুপাতে তাঁর চরণ অশ্রুসিক্ত হয়েছিল। এও আনন্দের অপরাধ বলে গণ্য হল। আনন্দ বিনীতভাবে বললেন—ভদন্তগণ, মহিলাদের বাড়ী প্রত্যাবর্তনে যাতে রাত না হয়, সেজন্যই তাদের প্রথম ভগবানের চরণ বন্দনার সুযোগ দিয়েছিলাম, তবুও আপনাদের সম্মানার্থে তা অপরাধ বলে স্বীকার করে প্রতিকার করছি। আবার অভিযোগ এল—আয়ুষ্মান আনন্দ স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া সত্ত্বেও ভগবানকে আয়ু সীমা বাড়িয়ে নেবার জন্য অনুরোধ করেননি, তা তাঁর আর একটি অপরাধ। আনন্দ ব্যক্ত করলেন সেদিনের ঘটনা তিনি কি ভাবে হতবুদ্ধি হয়ে ভগবানের সে ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করেননি আয়ু সীমা বাড়িয়ে নিতে জনহিতায় জনসুখায়। তিনি বললেন—এ আমার ইচ্ছাকৃত নয়, তবু আপনাদের সম্মানার্থে তা আমার অপরাধ বলে স্বীকার করছি এবং তার যথাযথ প্রতিকার করব। আনন্দের বিরুদ্ধে আর একটি অনুযোগ উঠল তিনি তথাগত-প্রবর্তিত ধর্ম বিনয়ে নারীদের সন্ন্যাসদানে বার বার অনুরোধ করে তথাগতকে রাজী করেছিলেন এবং এও তার অপরাধ। আনন্দ শান্তভাবে উত্তর দিলেন—ভদন্তগণ. বুদ্ধবিমাতা গৌতমী আপনার স্তন্য দিয়ে শৈশবে বুদ্ধকে পরিপালন করেছিলেন; এ মহীয়সী মহিলার সন্ন্যাসের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে তাঁর সন্ন্যাসের জন্য ভগবানকে অনুরোধ করতে বাধ্য হয়েছিলাম, এ ব্যাপারে আমার কোন দুরভিসন্ধি ছিল না, তবুও আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আপনাদের সম্মানার্থে তা অপরাধ বলে স্বীকার করছি এবং তার প্রতিকারে কুণ্ঠিত হব না।

অবশেষে প্রস্তাব উঠল ভিক্ষু ছন্নের ব্রহ্মদণ্ড সম্বন্ধে। আয়ুষ্মান আনন্দ এ প্রসঙ্গে বললেন—ভদন্তগণ, পরিনির্বাণের সময় ভগবান আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ভিক্ষুছন্নকে ব্রহ্মদণ্ড দানের জন্য। জনৈক সদস্য আনন্দকে প্রশ্ন

করলেন—আপনি কি ভগবানকে জিজ্ঞেস করেছেন ব্রহ্মদণ্ড কি? তিনি উত্তর দিলেন—হাঁ, আমি ভগবানকে জিজ্ঞেস করেছি; ভিক্ষু ছন্ন অসংযতবাক্, মুখে যা আসে তাই বলে, ভিক্ষুরা ছন্নকে উপদেশ দেবেন না, অনুশাসন করবেন না, তার সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন না, এটিই তথাগত নির্দিষ্ট ব্রহ্মদণ্ড। এ প্রস্তাব ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা হল সংগীতির। এর সদস্য সংখ্যা অন্যূন অনধিক পাঁচশ হওয়ায় একে বলা হয় পঞ্চশতী সংগীতি।

এভাবে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের অধিনায়কত্বে এবং মগধরাজ অজাতশত্রুর অকুণ্ঠ সহায়তায় রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপে অনুষ্ঠিত স্থানে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন সময়ে ভাষিত বুদ্ধবচন। রচিত হল প্রামাণ্য মূল বৌদ্ধ শাস্ত্র। তখন সুপণ্ডিত আয়ুষ্মান পুরাণ বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে দক্ষিণাগিরি ভ্রমণ শেষ করে রাজগৃহে এলেন। তিনি সংগীতিতে সুগ্রথিত বুদ্ধবচন আদ্যোপান্ত শুনে উচ্ছ্বসিত আবেগে বললেন—সুগ্রথিত ধর্মবিনয়, সুগৃহীত বুদ্ধবচন, ভগবানের বাণী যেন ভগবানের মুখেই শুনলাম। সমগ্র বৌদ্ধসঙ্ঘ অভিনন্দিত করলেন এ মহাঅনুষ্ঠানকে, গ্রহণ করলেন সংগীত ধর্মবিনয়কে চিরকালের প্রামাণ্য শাস্ত্ররূপে।